



বুদ্ধ দেব বসু
তি থি ডো র

একটি মেয়ে শৈশব থেকে কৈশোরে এবং কৈশোর থেকে যৌবনে উন্মীলিত হলো, এই অতি সাধারণ এবং অতি আশ্চর্য ঘটনা অবলম্বন করে বুদ্ধদেব বসু সমসাময়িক বাঙালি সমাজের সম্পূর্ণ ছবি এঁকেছেন। সামাজিক পরিবর্তনের সূত্র ধরে ধীরে অগ্রসর হতে হতে, গত যুদ্ধের আরম্ভ, ভাঙনের সূত্রপাত এবং রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পার হয়ে বই শেষ করেছেন জাপানি বোমায় আতঙ্কিত ১৯৪১-এর ডিসেম্বরের অন্ধকার কলকাতায়। স্বাভাবিক কবিত্বে এবং মননশীলতায় গ্রন্থটি সমৃদ্ধ, যা সর্বশ্রেণীর পাঠকের উপভোগ্য, অথচ যাতে অভিজ্ঞতার তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন বয়সের পাঠক বিচিত্রতর, বহুলতর আনন্দের আন্বাদ পাবেন।



বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)। জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লায়। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই সাহিত্য রচনায় দক্ষ সব্যসাচী সাহিত্যিক। অল্প বয়স থেকেই কবিতা লেখায় মনোনিবেশ করেন। ‘প্রগতি’ ও ‘কম্পোল’ দুটি পত্রিকায় তাঁর বহু রচনার প্রথম প্রকাশ ঘটে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই রবীন্দ্র-প্রভাবাধিত সাহিত্যের পরিসর থেকে নিজেকে সযত্নে সরিয়ে রেখেছিলেন বুদ্ধদেব। পাশ্চাত্য সাহিত্যে গভীর অনুরাগ তাঁকে ছাত্রজীবন থেকেই ইংরেজি ভাষার প্রতি আকৃষ্ট করে। এই অনুরাগের বশেই তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরবর্তী কর্মজীবনে বহুবার বক্তৃতা-সফর করেন ও অগাধ প্রশংসা পান। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁরই হাতে গড়ে ওঠে তুলনামূলক সাহিত্য-আলোচনার ধারা। বুদ্ধদেব বসুর পরিণত বয়সের রচনাগুলি গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত ভাষার ধ্রুপদী সাহিত্যের উপমায় সমৃদ্ধ। তাঁর সম্পাদিত ‘কবিতা’ পত্রিকা এক সময় জীবনানন্দ দাস সহ বহু নবীন, প্রতিভাধর কবির আশ্রয়স্থল ছিল। ‘তপস্বী ও তরঙ্গিনী’ নাটকের জন্য বুদ্ধদেব ১৯৬৭ সালের আকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত হন। ১৯৭০-এ লাভ করেন ‘পদ্মভূষণ’। ‘তিথিডোর’ ছাড়া বুদ্ধদেব বসুর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা ‘শীতের প্রার্থনা’, ‘হঠাৎ আলোর ঝলকানি’, ‘কলকাতার ইলেক্ট্রা’, ‘রাতভোর বৃষ্টি’ ইত্যাদি।

তি থি ডো র

নিউ এজ পাবলিশার্স
কলকাতা

প্রথম প্রকাশ

১৯৪৯

সপ্তম সংস্করণ

২০০৯

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে

৮/১ চিত্তামণি দাস লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে

অমিতাভ সেন কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদের ছবি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

প্রচ্ছদ রূপায়ণ

সৌম্যেন পাল

ISBN: 81-7819-006-0

২০০ টাকা

ਸੂਚੀ

ਪ੍ਰਥਮ ਸਾਡੀ : ਪ੍ਰਥਮ ਭਾਗ	੧
ਕਰੁਣ ਰਭਿਨ ਪਥ	੮੦
ਯਵਨਿਕਾ ਕਸਪਮਾਨ	੧੮੦

প্রথম শাড়ি : প্রথম শ্রাবণ

বাজেনবাবু মানুষটি একটু শৌখিন। শৌখিন মানে বাবু নয়। হাঁটুর কাছে কাপড় তুলে, দু-হাতে দুই ঝুলি নিয়ে বাজার করে আসতে আপত্তি নেই তাঁর, কিন্তু শোবার সময় বালিশে একটু সুগন্ধ চাই। এক জামা পরে সপ্তাহের ছদিন আপিশ করবেন, এদিকে কাচের গেলাসে ছাড়া জল খাবেন না। ঠিকে-ঝি কামাই করলে রাত থাকতে বিছানা ছেড়ে উনুন ধরিয়ে রাখবেন, তারপর বারান্দার ভাঙা তক্তায় খালি গায়ে বসে গুনগুন করবেন—ভৈরবী কি যোগিয়া।

পনেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়ে, বাপের বাড়িতে এক বছর কাটিয়ে শিশিরকণা প্রথম যখন স্বামীর ঘর করতে এলেন, স্বামীর এসব ছোটোখাটো শখগুলি তাঁর মনে বিস্ময়কর কৌতুক জাগিয়েছিল। এমন কি এর কিঞ্চিৎ প্রশ্রয়ও তিনি দিয়েছিলেন বিছানার তলায় অগুরু শিশি লুকিয়ে রেখে—তার চেয়েও বেশি, ঠিকে-ঝির সাহায্যে সংগৃহীত কয়েকটি পথে-ঝরা বকুল কোনো রাতে নিজের আঁচলে বেঁধে নিয়ে। সুগন্ধ ভালো, সুগন্ধের উৎসটা আরো ভালো হতে দোষ কী? কয়েক মাস পরে শিশিরকণা যখন অন্তঃসত্ত্বা হলেন আর রাজেনবাবু বললেন—বেশ হল, ছোট্ট ফুটফুটে একটা মেয়ে হবে, বেশ—তখন স্বামীর এই নতুন শখটিতে বেশি সুখী না হয়ে তিনি বললেন—কেমন, মেয়ে কেমন?

—ছেলে হলে তো শুধু হাফপ্যান্ট আর ডান্ডাগুলি। আর মেয়ে? রং-বেরঙের ফ্রক, রিবন, ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া, কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল—আর একটু বড়ো হলে তো কথাই নেই। কিন্তু স্বজাতির সংখ্যাবৃদ্ধির সম্ভাবনায় শিশিরকণাকে বিশেষ উৎফুল্ল দেখা গেল না। যে রকম কথা নিজের মার মুখে অনেকবার তিনি শুনেছেন, তারই পুনরুক্তি করলেন এই ভাবী-মা—ফ্রক, রিবন, বাঃ! মেয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা তো ভালোই!

তা তুমি যা-ই বলো, একটা মেয়ে থাকলে ঘর আলো।

কয়েক মাস পরে আলো হল ঘর। আর তিন দিন পরে রাজেনবাবু তাঁর শৌখিনতার আর একটি নমুনা দেখালেন। মেয়ের নাম তিনি রাখলেন—শ্বেতা।—না বাবা, আঁতুড়-ঘরের দরজায় বসে বলে উঠলেন শিশিরকণার বিধবা পিসিমা—সীতা নাম রেখো না, বড়ো দুঃখিনী সীতা। সীতা নয়, শ্বেতা—গম্ভীরভাবে রাজেনবাবু বললেন, তালব্য-শ আর ব-ফলা দুটোই স্পষ্ট উচ্চারণ করে।

ওসব বিলিতি নাম আমাদের মুখে তো আসবে না, তবে হ্যাঁ—মেয়ে তোমার মেমের মতোই রূপসী হবে।—বিলিতি নয় তো—রাজেনবাবুর কথা কেটে দিয়ে আর একটি কণ্ঠস্বর উঠল আঁতুড়-ঘরের ভিতর থেকে—ওঁর কথায় তুমি আবার কান দাও পিসিমা, ওঁর তো ঐরকমই! মেয়ের নাম আমি মঞ্জু রেখেছি। শেষের কথাটি শিশিরকণা একটু চোঁচিয়ে বললেন, যাতে যথাস্থানে নির্ভুলভাবে পৌঁছয়। পৌঁছলো, কিন্তু যথাস্থানটি অবিচলিত। মাসখানেকের মধ্যে একটা নামের লড়াই লেগে গেল বাড়িতে। মেয়েকে বুকে চাপড়ে-চাপড়ে আদর করেন শিশিরকণা—মঞ্জু—মঞ্জুল—মঞ্জুলি-ই। আর রাজেনবাবু ঠিক সুরে সুর মিলিয়ে বলে ওঠেন—মঞ্জু—ঝুমঝুম—লজনচু—য! তারপর কাছে এসে মেয়ের গালে একটু আঙুল ছুঁয়ে ডাকেন—শ্বেতা! চোখের পাতা মিটমিট করেন কন্যা, যেন এই নামই তাঁর পছন্দ। তা হতেই পারে, যা ফুটফুটে ফর্সা!

প্রথম সন্তান যুবক পিতার কণ্ঠক, এ কথা যাঁরা বলেন, নিশ্চয়ই তাঁরা রাজেনবাবুকে দ্যাখেননি। হাঁটু ঝেঁকে-ঝেঁকে মেয়েকে ঘুম পাড়াচ্ছেন তিনি, বোতলে দুধ খাওয়াচ্ছেন, কোলে নিয়ে বেড়াচ্ছেন বিকেলে, রাত্তিরে বদলে দিচ্ছেন কাঁথা। প্রথম ছ-মাসের মধ্যে একটি রাত্রিও ঘুমের ব্যাঘাত হল না নতুন মার, বাঙালি পরিবারের পক্ষে যার তুল্য আশ্চর্য কথা আর নেই। কিন্তু এ সুখের একটি দাম দিতে হল। শ্বেতার জামাটা কোথায়—শ্বেতার পাউডারটা দাও—শ্বেতা তো খুব ঘুমোচ্ছে আজ—সব সময় এই শুনতে শুনতে শিশিরকণাও মাঝেমাঝে শ্বেতা বলে ফেলতে লাগলেন। প্রথমে ঠাট্টা করে ‘তোমার শ্বেতা’। যেমন—তোমার শ্বেতার তো রূপের খ্যাতি হচ্ছে খুব, কি—শ্বেতা কী রকম হাসে দেখেছ? তারপর শুধুই শ্বেতা। সীতা কিংবা সীতুও নয়, একেবারেই শ্বেতা। মঞ্জু যুদ্ধে হেরে দেশান্তরী হল, রাজেনবাবু মহৎ যোদ্ধার মতো নিজের জয় মেনে নিলেন সবিনয়ে।

দেড় বছর পরে আর একটি মেয়ে যখন জন্মাল, রাজেনবাবু তক্ষুনি তার নাম দিলেন মহাশ্বেতা। তৃতীয় কন্যাটি অতদিনও সবুর করল না। মহাশ্বেতার সঙ্গে চোদ্দ-মাসের ব্যবধান রেখে শিশিরকণার কোলে এল সরস্বতী।

থাক, থাক, আর সোহাগ করে নাম দিতে হবে না—শিশিরকণা বলে উঠলেন।

নাম তো একটা চাই—

ছাই!—নিজের অজান্তে শিশিরকণা একটা পদ্য রচনা করে ফেললেন। দ্বিতীয়বারের তার বিশ্বাস ছিল, ছেলে হবে। তবু মহাশ্বেতাকে সহ্য করেছিলেন ভবিষ্যতের আশায়। কিন্তু এবারেও! তিন-তিনটে মেয়ে! তাঁর বিরক্তি, তাঁর বিক্ষোভ আর তিনি গোপন রাখতে পারলেন না। রাজেনবাবু বললেন—কী সুন্দর চুল হয়েছে সরস্বতীর!

হয়েছে, হয়েছে, যাও এখন—বলে শিশিরকণা নবজাতার একদম কাঁকড়া চুলের দিকে একটু তাকালেন আড়চোখে। কেন, তিনটি সুন্দর সুন্দর মেয়ে, ভালো লাগে না তোমার?

ও, এখনো মেয়ের শখ মেটেনি দেখছি! তোমার জন্যই, তোমার জন্যই তো খালি-খালি মেয়ে হচ্ছে আমার, আর মেয়ের নাম মুখেও এনো না।—কিন্তু মুখে না আনলে হবে কী, রাজেনবাবুর মনের এই একটি শখ ভালোরকম মিটিয়ে দিতে ভাগ্যবিধাতার আশ্চর্য তৎপরতা দেখা গেল। বছর সাতেক চূপচাপ থেকে শিশিরকণা হঠাৎ আবার উঠে পড়ে লাগলেন। সতেরো বছরের বিবাহিত জীবনে পঞ্চ-কন্যার পিতা হলেন রাজেনবাবু। এক ফাঁকে একটি ছেলেও অবশ্য এসে গেল। বোনদের সঙ্গে তার পার্থক্য একেবারে লাল কালিতে টেনে দিয়ে রাজেনবাবু তার নাম রাখলেন বিজন। সে কী! শিশিরকণার চোখ উঠল কপালে—মেয়েদের নামের

জাঁকজমকে তো পাড়ার লোক অস্থির, আর ছেলেটা বিজন!

পুরুষের সাধারণ নামই ভালো। কী হবে না হবে জানি না তো, মিছিমিছি একটা লম্বা-চওড়া নাম দিয়ে...

আর মেয়েরাই-বা তোমার কোন রাজকন্যা?

তা আমার মেয়ে যখন, রাজকন্যা তো বলাই যায়।

তাহলে ছেলেই-বা রাজপুত্র নয় কেন?

তা বলে বিক্রমাদিত্য তো নাম রাখা যায় না!

এত কষ্টের, এত দিনের চেষ্টার একটা মাত্র ছেলে, তার সম্বন্ধে স্বামীর এই অবহেলা শিশিরকণার সহ্য হল না। জ্বলে উঠে বললেন—মেয়ে-মেয়ে করে তুমি পাগল, মেয়ের হাতে তোমার অনেক লাঞ্ছনা আছে বলে দিচ্ছি। সত্যি, মেয়েদের সম্বন্ধে রাজেনবাবু একটু বেশিই মুগ্ধ। আর কপালও তাঁর—পাঁচটি মেয়ের যে-কোনোটির দিকে তাকালে চোখ ফেরে না। শিশিরকণা সেকেলে ধরনের সুন্দরী—ফর্সা রং, টানাটানা নাক-চোখ, রাজেনবাবুও দেখতে ভালোই। কিন্তু তাই বলে এত রূপ হবে প্রত্যেকটি মেয়ের, এরকম তো কথা ছিল না। না-ও তো হতে পারত। আর শুধু কি রূপ!

অবশ্য পাঁচটি মেয়েকে একসঙ্গে বাড়িতে পাওয়া রাজেনবাবুর ভাগ্যে ঘটে উঠল না। স্বেতার বিয়ে হয়ে গেল স্বাতী জন্মাবার আগেই। শিশিরকণার বিয়ে হয়েছিল একটু বেশি বয়সে, তাঁর সময়ের পক্ষে বেশি। স্পষ্ট মনে পড়ে অবিবাহিত অবস্থায় তিনি সুখী ছিলেন না, বিয়ে হয়ে যেন বাঁচলেন। বড়ো মেয়ে পনেরোয় পড়া মাত্র, তাই তার বিয়ের জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। রূপের জোরে পাত্র জুটল মৈমনসিং-এর এক ছোটোখাটো জমিদারের পুত্র। ছেলের ফোটোগ্রাফ দেখে শিশিরকণা পছন্দ করলেন। ছেলের বাপ পছন্দ করলেন সশরীরে পাত্রীকে দেখে। বিয়ে হয়ে গেল। স্বাতী তখন মাতৃগর্ভে সাত-মাসের। ঐ অবস্থায় নবজামাতার সামনে লজ্জাই করছিল শিশিরকণার, কিন্তু উপায় কী?

বিজন জন্মেছে দু-বছর আগে। শুধুই কতগুলো বোনের মধ্যে বড়ো হয়ে উঠতে তার ভাল লাগবে না বলে সে-ই ডেকে আনছে একটি ভাইকে, মনে মনে এই রকম যুক্তি প্রয়োগ করেছিলেন শিশিরকণা। খাটল না... আবারও মেয়ে। তেরো বছরের মহাশ্বেতা, আরো বছরের সরস্বতী আর পাঁচ বছরের শাস্বতী যখন আঁতুড়ঘরের দরজায় ভিড় করত, নেহাতই শোওয়া থেকে উঠতে পারছিলেন না বলে, নয়তো ঠিক ওদের গালে ঠাশ-ঠাশ চড় বসিয়ে দিতেন। রাজেনবাবু বললেন—বেশ হল, এক মেয়ে গেল স্বশুরবাড়ি, আশ্রয় মেয়ে এল। শিশিরকণা চোখ বুজে মনে মনে বললেন—হে ঈশ্বর, আর যেন কখনো আমার কিছু না হয়।

ভাগ্যবিধাতার কানে পৌঁছল এই প্রার্থনা। কিন্তু একটু ভুল করে, এরকম ভুল দেবতাটি প্রায়ই করে থাকেন। কিছুটা বেশিই মঞ্জুর করে ফেলেন তিনি। স্বাতীর জন্মের কয়েক মাস পর থেকে একটু একটু করে বোঝা যেতে লাগল যে শিশিরকণা শুধু যে আর নতুন প্রাণ পৃথিবীতে আনতে পারবেন না তা নয়, তাঁর নিজের প্রাণই যেন থরথর করছে ঝরে পড়ার জন্য। মাস কটিল, বছর কটিল, শরীর আর সারে না। ডাক্তারে বিরক্ত হয়ে রাজেনবাবু ছুটি নিলেন দু-মাসের। অনেক খরচ করে মস্ত পরিবারটি নিয়ে মিহিজামে এলেন। শিশিরকণা অনেকটা সেরে উঠলেন, কলকাতায় ফিরেও বেশ ভাল থাকলেন কিছুদিন। আবার আস্তে-আস্তে খারাপ হল, আবার শয্যা নিতে হল। এ অবস্থাতেই কায়েমি হলেন তিনি। মাঝে-মাঝে ডাক্তার আসে, চিকিৎসায়

উপকারও হয় তাঁরপর। ডাক্তার যেই বলে—এইবার আপনি ঠিক সেরে উঠছেন, তখনই নতুন কোনো উপসর্গ দেখা দেয়। মাঝে-মাঝে এমনিতেই বেশ ভাল থাকেন, আবার শুয়ে থাকতে হয় দিন পনেরো। রাজেনবাবু নিয়ম করে বছরে একবার কলকাতার বাইরে যেতে লাগলেন সকলকে নিয়ে। সমুদ্র, পাহাড়, শুকনো হাওয়া, দুধকুণ্ডের জল সবই হল, কিন্তু কীসের কী! হঠাৎ একদিন দেখা যায় শিশিরকণা কিছুই খাচ্ছেন না, কেমন চূপচাপ হয়ে আছেন, আবার বিছানা। বিশৃঙ্খলা এল সংসারে, অকুলোন ঘটল। শুয়ে-শুয়ে অসহায় চোখে শিশিরকণা তাকিয়ে দ্যাখেন চাকরদের চুরি, মেয়েদের অপব্যয়, ছেলেটার হতচ্ছাড়া চেহারা। সংসার! দিনে দিনে গড়েছেন একে, তিলে তিলে ভরেছেন, সকল গহ্বর পূর্ণ করেছেন তাঁর শরীর দিয়ে। শরীর ছাড়া আর কী আছে মেয়েদের? পুরুষ কত কিছু পারে তার শক্তি, তার সাহস, তার অর্থ দিয়ে। মেয়েরা যা পারে শুধু শরীর দিয়েই পারে। স্বামীর এই আয় আর কবে থেকে, তাঁরা তো গরিবই ছিলেন, অথচ কখনো একটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য কি ঘটতে দিয়েছেন? কখনো কি ওরা একটা ময়লা জামা পরেছে, না খারাপ খেয়েছে, না কি ওঁকেই কখনো গুনতে হয়েছে যে হাতে টাকা নেই?

ক্ষীণ কণ্ঠ যথাসম্ভব চড়িয়ে তিনি ডাকলেন—মহাশ্বেতা! সরস্বতী! মহাশ্বেতা! কী নামই রেখেছে বাপু! কোনো রকমে যে একটু ছোটো করে নিয়ে ডাকব, এত বছরের চেষ্টায় তা পারলাম না। মহাশ্বেতা ঘরে এসে বলল—কেন, মা?

বিজুটা কী রকম নোংরা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখিস না তোরা! বাথরুমে নিয়ে গিয়ে দে-না ওকে একটু পরিষ্কার করে।

বাথরুমে সরস্বতী, মা।

তবে নিচে নিয়ে যা কলতলায়। আলমারি খুলে দ্যাখ তো ওর জামা-কাপড় কী আছে। মহাশ্বেতা আলমারি খুলে একটি ভেলভেটের নিকারবোকার বের করল।

বুদ্ধি তোর! এই গরমে—! আর এটা ছোটোও হয়ে গেছে ওর। একটা সাদা প্যান্ট আর একটা গেঞ্জি বের কর। কিন্তু খুঁজে খুঁজে গেঞ্জি পাওয়া গেল না কোথাও। মহাশ্বেতার মুখ লাল হল, কপাল ঘেমে উঠল, একটা টানতে গিয়ে তিনটে ফেলল মেঝেতে। শিশিরকণা অনেক ধৈর্য খাটিয়ে বললেন—ঐ পপলিনের শার্টটা—আঃ, ভাল করে গুছিয়ে রাখ। আর আঁচলটা তোল না গায়ে! ভাইয়ের শার্ট-প্যান্ট নিয়ে মহাশ্বেতা একটু দ্রুত ভদ্রভাবে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে বলল—বিজু আসছে না, মা।

আসছে না আবার কী! জোর করে ধরে নিয়ে যা।

আমি কি ওর সঙ্গে জোরে পারি নাকি?

না, এত বড়ো মেয়ে, ঐটুকু ছেলের সঙ্গে তুমি পার না!

বিজু বড্ডো মারে। শিশিরকণা হেসে বললেন—মার না খেলে আর দিদি কী? আর এত বড় মস্ত মা-র মতো দিদি! দুই ঠোটে একটা বিরক্তির শব্দ করে মহাশ্বেতা মাথা ঝুঁকে উঠল। কিছু বললেই এ-রকম করিস কেন রে?

আমি পড়ব না? পরীক্ষা না আমার? মহাশ্বেতার গলা শুনে শিশিরকণা স্তম্ভিত হলেন। মা-র কথার উত্তরে এরকম গলা বের করা যায়, সেটা কল্পনাতেই ছিল তাঁদের ছেলেবেলায়। চূপ করে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন—আচ্ছা যা, পড় গিয়ে। তক্ষুনি অন্তর্হিত হল মহাশ্বেতা।

বাঁচল যেন। সেদিনই সন্ধেবেলায় শিশিরকণা স্বামীকে বললেন—রাজকন্যাদের জন্য রাজপুত্র খুঁজতে লেগে যাও এবার।

—হবে, হবে, তুমি সেরে ওঠো তো।

—আমি যা সারব তা জানি! একসঙ্গেই ব্যবস্থা করো দুজনের, খরচও বাঁচবে, আমিও বাঁচব।

—এত ব্যস্ত কী! ছেলেমানুষ, ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে পড়বে, আজকাল তো আর সেদিন নেই যে—

সেদিন নেই মানে—মৃদু স্বরে কিন্তু খুব স্পষ্ট করে শিশিরকণা বললেন—মেয়েদের বিয়ে হতে পারছে না, তাই ও নিয়ে কেউ আর কিছু বলছে না আজকাল; কিন্তু যৌবন তো আর দেরি করে আসছে না তাই বলে।

—ও রোগের একমাত্র চিকিৎসা বুঝি বিয়ে? একটু হাসলেন রাজেনবাবু।

ঠাট্টা কী, ঠিকই তো, তোমার মেয়েদের তো আর অন্যদের অবস্থা নয়। রূপ আছে, তরে যাবে। ঠাট্টার সুরটা বজায় রেখে রাজেনবাবু বললেন—তা পাণিপ্রার্থী রাজপুত্রেরাই আসবে কদিন পরে।

—দু-একটি এসে গেছে মনে হচ্ছে। ও ঘরে এত হৈচৈ কীসের?

খুব আড্ডা জমিয়েছে ওরা।

কারা?

কারা আবার। মহাশ্বেতা, সরস্বতী—

আরো কার গলা পাচ্ছি যেন?

ও-তো অরুণ।

অরুণ? শিশিরকণা ভুরু কঁচকোলেন।

আহা, অরুণকে ভুলে গেলে? শ্বেতার দেওয়, সেই যে ডাক্তারি পড়ে—

অরুণ এসেছে নাকি? কেন?

প্রায়ই আসে তো।

প্রায়ই আসে? আমার সঙ্গে তো দেখা করে না।

তোমাকে আর বিরক্ত করে না। জানে তো, শরীর ভাল নেই।

তোমার সঙ্গে?

আহা, আমার সঙ্গে আবার আলাদা করে দেখা করবে কী! ছেলেমানুষ সবাই, সন্ধেবেলা একসঙ্গে বসে গল্প-টল্প করে, আমি আর ও ঘরে যাই-টাই না। উঁচু-করা বালিশের ঢালু থেকে শিশিরকণার টানা-টানা ক্লান্ত দুটি চোখ স্বামীর মুখের উপর স্তব্ধ হল।

এতদিন আমাকে বলনি এ-কথা!

আহা, এ আবার একটা—

তুমি কী!—শিশিরকণা সোজা হয়ে উঠে বসলেন—আমি মরে গেলে উপায় হবে কী তোমার? যত বাজে—!

অরুণকে একটু ডেকে দাও আমার কাছে।

—পাগল নাকি! কুটুম্ব মানুষ—

তা, শিশিরকণা একটু ভাবলেন—শ্বেতার আপন দেওর তো নয়। আর যদি আপনও হত, তাহলেও কী—

—লক্ষ্মী-তো শিশু, মিছিমিছি শরীরটাকে আরো খারাপ কোরো না। ওকে তো দেখেছ। সুন্দর ছেলে, খুব ভাল। ঝড়ের মতো ঘরে এসে বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাঁচ বছরের স্বাতী— বাবা, শোনো... বলেই প্রকাণ্ড কান্না। কী রে, কী?—কোমরে হাত রেখে বীরের ভঙ্গিতে দাঁড়ানো বিজু পিছন থেকে বলে উঠল—কিছু না বাবা, ছোড়দি কিনা ওর চকোলেটগুলি দেখতে চেয়েছিল একটু...

—না বাবা। চোখের জলে বাপের কোল ভিজিয়ে দিতে দিতে স্বাতী বলল—না বাবা, কেড়ে নিয়েছে আমারটা—

—মিথ্যুক! হিংসুটি! দরজার কাছ থেকে বাবরি দুলিয়ে ঠেঁচিয়ে উঠল রঙিন ফ্রক-পরা শাশ্বতী— সবটা নিয়ে কেঁদে হাট বাধানো চাই! তোকে তো আর দেয়নি—

তোমাকেই যেন দিয়েছে—রোদনের রক্ত-পথে বেরিয়ে এল স্বাতীর প্রত্যুত্তর। দিয়েছে তো সেজদিকে!—ঠিক বোঝা গেল না, বিজু কোন পক্ষের সৈনিক। বিজুর কথায় শিশিরকণা একটু চমকালেন। বললেন—সেজদিকে একটু ডেকে দিস তো বিজু।

দাও আমার চকোলেট—আনুমানিক আর্তস্বর বের করল স্বাতী।—যাঃ! চাই না একটাও! আহুদি মেয়ে! শাশ্বতীর লম্বা সাদা হাতটা ঝিলিক দিয়ে উঠল, আর মেঝের উপর, ঠিক শিশিরকণার পায়ের কাছে ছড়িয়ে পড়ল চিকচিকে ম্যাজেস্টা আর সবুজ আর রূপোলি রাঙতায় মোড়া কয়েকটা চকোলেট। হঠাৎ বিজুর ছোট্টো শরীরে ডিগবাজি খাওয়ার মতো একটা ভঙ্গি হল, চকিতে সব কটা কুড়িয়ে এক লাফে ঘর পার হল সে, শাশ্বতী চীৎকার করে ছুটল তার পিছনে। স্বাতী অবিশ্রান্ত ঝঁ-ঝঁ করে কাঁদছে। রুগ্ন শরীরে গর্জন করে উঠলেন শিশিরকণা—স্বাতী, চুপ! সঙ্গে সঙ্গে স্বাতীর গলা আর শোনা গেল না, কিন্তু কান্না উদ্বেল হল দ্বিগুণ। চুপ, থামাও কান্না! মেয়েকে কাঁধের উপর ফেলে রাজেনবাবু তাড়াতাড়ি চলে এলেন বারান্দায়। পাইচারি করতে করতে মেয়ের কোঁকড়া-কোঁকড়া ঘন চুলের মধ্যে আশ্বে আঙুল চালাতে-চালাতে গুনগুন করে বলতে লাগলেন—স্বাতী, আমার স্বাতীসোনা, আর কাঁদে না... লক্ষ্মী-তো, মণি-তো, আর কাঁদে না... বাঃ, কী-সুন্দর চোখ, দেখি, দেখি একটু...কী সুন্দর হাসি! সত্যি সুন্দর। সরস্বতীর চেয়েও সুন্দর চুল হয়েছে ওর। স্বাতী—বাড়ির ছোটো-ছোটো মানুষগুলির মধ্যে সবচেয়ে ছোটো, পাঁচটি সুন্দরীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, পাঁচটি মধুর নামের মধ্যে সবচেয়ে মধুর নাম। এ নাম তিনি তো ওর কোনো দিদিকেও দিতে পারতেন... সরস্বতীকে, কি শাশ্বতীকে : ভাগ্যিস দেননি, আর কাউকে মানাত না... নিজেরই অজান্তে এ নাম তিনি রেখে দিয়েছিলেন সবশেষের সবচেয়ে ভালোটির জন্য। স্বাতী শান্ত হল, স্তব্ধ হল, মাথাটি ভারি হল কাঁধের উপর! আহা, ঘুমিয়ে পড়ল... সারাদিন ছোটোছুটি দাপাদাপি করে... মার অসুখে কি মার ছেলেমেয়ের কোনো হাল থাকে! আমি আর কতটুকু পারি, সারাদিন তো আপিশ। উজ্জীড়া বাপকে দিয়ে কি হয় এসব... হয় সব! একটু বেশি আহুদি হয়েছে মেয়েটা, বড্ডো আখুট, জেদ—তা হবে না, জগ্নে থেকে ও মাকে তো পায়ইনি বলতে গেলে। লুটিয়ে-পড়া চুল মুখ থেকে সরিয়ে দিয়ে ভিজ্জে-ভিজ্জে ঠান্ডা নরম ঠোঁটের উপর একবার চুমু খেলেন রাজেনবাবু। তারপর আশ্বে ঘরে নিয়ে এসে নিজের খাটে গুইয়ে দিলেন। শিশিরকণা শুয়ে ছিলেন চোখে হাত রেখে আলো আড়াল করে। না-তাকিয়েই বললেন—ঘুমিয়ে পড়ল তো? একদিনও ওর খাওয়া হয় না রাত্রে— হয়েছে হয়েছে—রাজেনবাবু তাড়াতাড়ি বললেন—আমি ডেকে খাওয়াব এখন। সারাদিনের খাটুনির পরে এই কর আর কী, ঈশ্বর!

তুমি ওরকম কোরো না তো, শিশু! আমার বেশ ভালই লাগে এসব। চোখ থেকে হাত সরিয়ে ঘুমন্ত স্বাতীর দিকে একটু তাকিয়ে শিশিরকণা বললেন—এত যে সোহাগ করলে মেয়েদের নিয়ে, হল কী তাতে? তিনটে টেকি-টেকি মেয়ে যে বাড়িতে, সেখানে তোমার ঐ স্বাতী-সুন্দরীও কি আর ওদের চেয়ে ভালো হবে?

কী যে বলো তুমি! আমার মেয়ে মন্দ! কী রে সরস্বতী? ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে সরস্বতী বলল—কী মা? ডেকেছিলে?

অনেক আগেই ডেকেছিলাম। মার কথাটার তাৎপর্য বুঝতে পারল না সরস্বতী। মিষ্টি করে একটু হাসল।

—চকোলেট কে দিয়েছে?

—অরুণদা তো!

—তোকে দিয়েছে?

—আগে একদিন মহাশ্বেতাকে দিয়েছিল কিনা, আজ আমাকে দিয়েছে। তা সকলে মিলেই তো খাই। কী সুন্দর বাস্কাটা, দেখবে মা? এক ছুটে সরস্বতী নিয়ে এল কাচের মতো কাগজে মোড়া মস্ত রঙিন বাস্কা। মার হাতের কাছে বিছানায় রেখে বলল—দ্যাখো মা। শিশিরকণা গম্ভীর স্বরে বললেন—দেখছি তো। কেন দিয়েছে?

—কেন মানে?

—এ রকম দেয় বুঝি মাঝে মাঝে?

দিলে কী হয়? ‘কী’-টাকে অনেকখানি টানল সরস্বতী, একটু আত্মা দরনে। সুন্দর, সরল, উজ্জ্বল মুখে এগিয়ে আসছে আশঙ্কার ছায়া, আবার তাকে হঠিয়ে দিচ্ছে আনন্দের অন্ধ বিশ্বাস। সেইদিকে তাকিয়ে শিশিরকণা হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারলেন না। ‘আর সেই সুযোগে রাজেনবাবু বললেন—কিছু হয় না যা। সরস্বতী মা-র দিকে একবার তাকাল। নিশ্বাস ফেলে শিশিরকণা বললেন—যা। অরুণকে একবার ডেকে দিস আমার কাছে।

সরস্বতী চলে যাওয়ায় রাজেনবাবু ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন—অরুণকে আবার কেন? এই শরীর তোমার, তার মধ্যে—

চকোলেটের বাস্কাটার অন্তত দশ টাকা দাম হবে, কী বলো?

পাগল! অত কি আর! আর হলেই বা কী—ভাল লাগে বলেই তো—

এসব ভাললাগা ভাল না।

যত তোমার! ওকে তুমি কিছু বলে বোসো না কিন্তু।

তুমি ভেবো না, আমি ঠিক কথাই বলব।

শুয়ে শুয়ে শিশিরকণা বুঝলেন অরুণকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে মহাশ্বেতা আর সরস্বতী বিদায় নিল। দরজার বাইরে জুতো ছেড়ে অরুণ একটু কুণ্ঠিতভাবে ঘরে ঢুকল। রোগা, উশকোখুশকো, একটু যেন দিশেহারা। এগিয়ে এসে অনভ্যস্ত আড়ষ্টভাবে প্রশ্ন করল শিশিরকণাকে। গৃহস্থমীকেও করা উচিত কিনা তা-ই বোধহয় ভাবছিল মনে মনে, রাজেনবাবু তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন—দাঁড়িয়ে কেন, বোসো। ভাল তো? বাড়ির সব ভাল? চেয়ার উপেক্ষা করে বিছানাতেই বসল অরুণ, শিশিরকণার পায়ের কাছে। সলজ্জ হেসে বলল—কেমন আছেন, মাসিমা?

আমি তোমার মাঐমা হই—শিশিরকণা বললেন।

মাঐমা! সে আবার কী? না, না, ওটা বিব্রী, ও আমি ডাকতে পারব না! রীতিমত কাতর শোনা অরুণের অনুনয়। শিশিরকণা হেসে ফেললেন। অরুণ বিজ্ঞভাবে জিজ্ঞেস করল—
কী অসুখ আপনার?

‘অসুখ কিছু না, ডাক্তারদের বুজরুকি।

নিশ্চয়ই ডাক্তারদের চাপ দেননি? তক্ষুনি প্রতিবাদ করল ভাবী ডাক্তার।

তুমি ডাক্তার হলে আমাকে সারাতে পারতে বইকি। কিন্তু তুমি যদি ডাক্তার হবে তদ্দিনে হয় অসুখ থাকবে না, নয় আমি থাকব না। শিশিরকণার দিকে এক পলক তাকিয়ে বড়োসড়ো ডাক্তারি ধরেনেই সাস্তুনা দিল অরুণ—আমি-তো তেমন-কোনো অসুখ দেখছি না আপনার। শিশিরকণা বললেন—তোমাকে দেখেই কমে গেল যে অসুখ। ভাল ডাক্তার তুমি। আরো দুচারটে কথার পর অরুণ বিদায় নিল। যেসব কথা শিশিরকণা বলবেন ভেবেছিলেন, কিছুই তাঁর বলা হল না, বলতে পারলেন না। বাজে! কিন্তু বাজে কেন? ছেলেটি ভালই, কিন্তু বিপদ যারা ঘটায় তারা কি সকলেই মন্দ লোক?

* * *

শরীরটা নিতান্তই অবসন্ন না লাগলে শিশিরকণা মাঝেমাঝে ডেকে পাঠাতে লাগলেন অরুণকে। কেমন-একটা অনামনস্ক এলোমেলো ভাব ছেলেটির অথচ কথাবার্তায় বেশ সপ্রতিভ, হঠাৎ না-জেনে এক-একটা মজার কথা বলে ফেলে। শিশিরকণা লক্ষ করলেন যে সে সময়ে মেয়েরা কেউ আসে না ঘরে, শাস্ত্রী পর্যন্ত কেমন এড়িয়ে এড়িয়ে চলে, নিশ্চয়ই দিদি দুজনেরই অনুকরণে। কোনো-কোনোদিন ইচ্ছে করে এবং নিজের শরীরের উপর অনেকটাই জবরদস্তি করে, অরুণকে ঘণ্টাখানেকও আটকে রাখেন। কিন্তু যুবকটি একটুও চঞ্চল হয় না, কোনো লক্ষণেই এমন বোঝা যায় না যে তার মন অন্য কোথাও পড়ে আছে। মনের অনেক তলায়, অন্ধকার অপ্রকাশিত অংশে ছেলেটির জন্য একটু-একটু দুঃখও হল শিশিরকণার; মেয়ের কাছে পৌঁছবার আশায় ওকে কতই-না পূজো দিতে হচ্ছে মার বিমর্ষ রোগশয্যায়। আর একজন সঙ্গী অবশ্য জুটেছিল। মার ঘরে অরুণদার সাড়া যেই পাওয়া, তক্ষুনি ছুটে আসা চাই স্বাতীর। এসেই মেঝেতে চিত হয়ে পড়তে লেগে যাবে কোনো ছেঁড়াখোঁড়া ‘হিজিবিজি’ কি ‘স্বাভী ছবি’ নয়তো দিদিদের কোনো পরিত্যক্ত খাতার কোনো একটি সাদা কাগজে, ভাঙা প্রেসসিলে বার-বার জিভ ঠেকিয়ে, অত্যন্ত মন দিয়ে ছবি আঁকবে উপুড় হয়ে। অরুণ যদি তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে বলল—কী, ছবি আঁকা হচ্ছে? তাহলে আর কথা নেই, খাতার উপর বুক পেতে লজ্জায় মূর্ছা গেল।

দেখি না, দেখি না একটু! অল্প একটু সাধ্য-সাধনার পরেই স্বাভী মুখ তুলে বলল—না বিব্রী হয়েছে। কিন্তু তক্ষুনি খাতাটি নিয়ে এসে দাঁড়াল অরুণদার কাছে। অরুণ খাতার দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি কোনটা ঐকেছ?

এই তো!

ও মা, এটা তোমার আঁকা! আমি ভাবছিলাম তোমার দিদিদের বুঝি! সত্যি তুমি ঐকেছ? এই কলাগাছ, নদী, সূর্য—সব? বাঃ, কী সুন্দর!

মোটোও না! মোটোও না! কোঁকড়া চুল নেচে উঠল স্বাতীর মাথায়, ছোট্টো সুঠাম শরীরটিতে নানারকম ভঙ্গির ঢেউ উঠল, অরুণের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে-থেকে বলল—সত্যি ভাল হয়েছে?

ভাল মানে? এ রকম আঁকতে পারে নাকি কলকাতার শহরে আর কোনো পাঁচ বছরের মেয়ে?
আর কোনো শহরে পারে?

তা তো জানি না—অরুণ অবিচল গাভীরে উত্তর দিল, বিলেতে-টিলেতে পারে বোধহয়।
বিলেতটা এত দূরে যে সেখানে তাঁর সমকক্ষের সম্ভাবনা স্বাভাবিক হাসিমুখেই মনে নিল। তার
এরপরের প্রশ্ন হল—অরুণদা, তেঁতুলগাছ কী রকম?

তেঁতুলগাছ!

এই কলাগাছের পাশে একটা তেঁতুলগাছ আঁকব, কিন্তু তেঁতুলগাছ কী রকম কিছুতেই মনে
করতে পারছি না। মা, আমি তেঁতুলগাছ দেখেছি?

তোমার বকবকানি থামা তো রে একটু! এর চেয়ে মোলায়েম কোনো উত্তর মার কাছে আশা
করা স্বাভাবিক ছেড়ে দিয়েছে অনেকদিন। মুখ একটুও মলিন না করে আবার বলল—অরুণদা,
বলো না তেঁতুলগাছ কী রকম? অরুণ হেসে বলল—আমিও ঠিক মনে করতে পারছি না
এখন। কাল বলব তোমাকে।

পরের দিন অরুণ নিয়ে এল কুচকুচে কালো পেইন্টিংবক্স আর মস্ত ড্রইংখাতা। হাতে পেয়ে
বিদ্যুৎ খেলে গেল স্বাভাবিক চোখে-মুখে। মেজদি-সেজদি-ছোড়দি—চীৎকার করে বিদ্যুতের মতোই
সে ছুটে গেল। এ সুযোগ শিশিরকণা হারালেন না। একটু তীক্ষ্ণ সুরেই বললেন—এ কী অন্যায
তোমার!

অন্যায? অন্যায আমি কী করলাম? ব্যাকুল জিজ্ঞাসা অরুণের।

মিছিমিছি টাকা নষ্ট।

নষ্ট কেন? বাচ্চারা তো সব খেলনাই ভেঙে ফেলে, তাই বলে কি টাকা নষ্ট হয়?

শোনো, অরুণ, তোমাকে একটা কথা বলি। তুমি বাড়ির ছেলের মতো। আসো, যাও, সে বেশ
কথা, কিন্তু তুমি উপহার কিনে-কিনে এত টাকা খরচ কর সেটা আমার ভাল লাগে না।
অরুণের নিচু-করা মাথার দিকে তাকিয়ে শিশিরকণা বুঝলেন যে তার কাছে এটা একেবারে
অপ্রত্যাশিত, বজ্রপাতের মতো। নিষ্ঠুর, নিশ্চয়ই তবু না-বলে পারলেন না—টাকা যদি তোমার
এতই বেশি হয়ে থাকে, সংসারে গরিব-দুঃখীরও কি অভাব? কয়েকটা অপরিপক্ব মেয়ের
উচ্ছ্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে লাভ কী! বয়স অনুপাতে তোমাকে খুব বুদ্ধিমান মনে হয়, আমার
কথা তুমি বুঝবে নিশ্চয়ই? অরুণ মুখ তুলতে পারল না অনেকক্ষণ। উঠে দাঁড়াল যখন, সে
মুখ দেখে শিশিরকণার কষ্ট হল।

খানিক পরে মহাশ্বেতা এসে বলল—মা, অরুণদা কোথায়?

—চলে গেল এইমাত্র।

চলে গেল! কী মুশকিল এখন আমি অঙ্কটা বুঝে নিই করে কাছে!

দুদিন, চারদিন, সাতদিন কেটে গেল—অরুণ আর আসে না। বিকেলবেলা আস্তে আস্তে উঠে
মেয়েদের ঘরে এলেন শিশিরকণা। তাঁকে প্রথম দেখতে পেল স্বাভাবিক—মা! মা এসেছে! কী মজা!
ছুটে গিয়ে সে জড়িয়ে ধরল মাকে, মেয়ের আদরের ধাক্কা সইতে না-পেরে মা এলিয়ে পড়লেন
পাশাপাশি পাতা তিনটি খাটের প্রথমটিতে। এক লাফে পাশে শুয়ে পড়ল স্বাভাবিক। গলা জড়িয়ে
ধরে মুখে মুখ ঘষে বলতে লাগল—মা, তুমি তবে ভাল হয়ে গেছ?...মা, আজ একটু বেড়াতে
যাবে আমাকে নিয়ে?...মা, চলো না! শাম্ভবীও এসে বসল বিছানায়, মার কপালের একটি
চুল দু-আঙুলে লম্বা করে টেনে বললে—ইশ, মা! কত দিন পরে তুমি এলে এ ঘরে। বড়ো

দুই মেয়ে এসে কাছে দাঁড়াল। পশ্চিমের ঘর, রোদ্দুর এসেছে লম্বা লম্বা ফালিতে, হাওয়া দিচ্ছে ঝিরিঝিরি। মুহূর্তের জন্য শিশিরকণার মনে হল তিনি সত্যিই সেরে গেছেন।

যাবে না মা, বেড়াতে? ঈষৎ নাকি সুর স্বাতীর।

এই ছোটটাকে কিছুই করতে পারলাম না! মার আকাঙ্ক্ষা মিটল না ওর।

যাবে না? দ্বিগুণ হল অনুনাসিকতা।

আমি কি হাঁটতে পারি রে!

তবে ট্যান্ডিতে চলো। রিকশাতে চলো।

আজ থাক, আর-একদিন—

যেদিনই তোমাকে বলি—আজ থাক, আজ থাক!—মার গলা ছেড়ে দিয়ে স্বাতী বিছানায় গড়াল একটু। দুচ্ছাই—কিছু ভাল লাগে না—অরুণদা এলেও একটু গল্প-টল্প করতে পারতুম! শাম্বতী হেসে উঠল কথা শুনে। সত্যি রে! অরুণ যেন আসে না ক-দিন? কেন?—বলে শিশিরকণা মহাশ্বেতার মুখে চোখ রাখলেন। মহাশ্বেতা লালও হল না, চোখও নামাল না, চুলের বিনুনি করতে করতে উদাসভাবে বলল—কী জানি।

রাগ-টাগ করেনি তো?—শিশিরকণা চোখ সরালেন সরস্বতীর মুখে।—বোধহয় সরস্বতী হাসল।

সেদিন স্বাতী যা চুল ধরে টেনেছিল—উরেব্-বাপ!

মোটোও না! মোটোও চুল ধরে টানিনি আমি!

বাঃ টানলি না! জোগান দিল শাম্বতী—টানতে-টানতে ফন্দাফাই করে দিলি!

টেনেছি তো টেনেছি, বেশ করেছি! তোমাদের তো আর পেইনটিংবক্স দেয়নি। আমাকেই তো দিয়েছে। খুপ করে খাট থেকে নেমে শাম্বতীর পড়ার টেবিলের তলা থেকে তার পেইনটিংবক্স বের করে নিয়ে সগর্বে বেরিয়ে গেল স্বাতী।

সুন্দর হাঁটে মেয়েটা—অনেকটা নিজের মনেই শিশিরকণা বললেন। জানো মা—শাম্বতী বলে উঠল, ও নাচতে পারে। কত নাচে আমাদের সামনে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একা-একাও নাচে। এক দিন দেখবে মা ওর নাচ? শাম্বতী দুহাতে মার একটি হাতে চাপ দিল।—থাক আর নেচে কাজ নেই, শাম্বতীর উৎসাহে ঠান্ডা জ্বল ঢেলে দিয়ে শিশিরকণা আস্তে আস্তে উঠলেন। তিন বোন সাজগোজ করে বেরিয়ে গেল বেড়াতে। ওদের কলকল কথা সিঁড়ির শেষ ধাপটি পর্যন্ত শুনতে পেলেন তিনি। ওরা হাসছে, বেড়াচ্ছে, সন্ধ্যাবেলা নিজেবাই আড্ডা জমাচ্ছে যথারীতি। একটুও তো আঁচড় পড়েনি ওদের মনে। আজকালকার মেয়েগুলো কী? নির্বোধ? না হৃদয়হীন? না কপটতায় ওস্তাদ?

অরুণের না-আসাটা ছোট্ট একটি কাঁটার মতো বিঁধে রইল শিশিরকণার মনে। আরো দিন দুই পরে অরুণ এল। সোজা শিশিরকণার কাছে এসে সলজ্জভাবে বলল—কলেজ ছুটি হল; দেশে যাচ্ছি কাল। মুখের দিকে একটু তাকিয়ে শিশিরকণা বললেন—একদিন যে আসনি?

ছুটির আগে অনেক কাজ শেষ করতে হল—খুব সহজভাবে উত্তর দিল অরুণ।

ভাল আছ তো?

ভাল আছি, মাসিমা। এই যে স্বাতী, কী খবর?

স্বাতী বেগে ছুটে আসছিল, মাঝপথে থমকে দাঁড়িয়ে শরীর মোচড়াতে লাগল।—এসো, এসো, লজ্জা কী। একদিন না-দেখাই লজ্জা? তাহলে ছুটির পরে এলে তো চিনতেই পারবে না! স্বাতী একটু কাছে আসতেই অরুণ এক হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল, আর সঙ্গে সঙ্গে বিহুল

হয়ে গা এলিয়ে দিল সে। আরেক হাতে তার চুলে আদর করতে করতে অরুণ কানে-কানে বলল—কটা ছবি আঁকলে? ঠিক তেমনি গোপন, অন্তরঙ্গ সুরে স্বাভী খুব নিচু গলায় জবাব দিল—অনেক।

দেখাবে না আমাকে? স্বাভী মাথা নাড়ল।

নিয়ে এস খাতাটা। স্বাভী ছুটল।

শিশিরকণা একটু হেসে বললেন—এখানে তোমাকে পেলে স্বাভীটা আর ছাড়তে চায় না। দিদিদের মহলে বিশেষ পাস্তা পায় না তো বেচার।

বলেন কী, মাসিমা! ওকে পাস্তা না দিয়ে সাধি আছে কারো।

মাথার চুলসুদ্ধ উপড়ে নেয়, কী বলো? স্বাভী, লক্ষ্মী-মা ও ঘরে যাও, অরুণদাকে ছবি দেখাও বসে-বসে। বেশি চ্যাঁচামেচি কোরো না, আমার মাথা ধরেছে বড্‌ডা। আর অরুণ, একেবারে রাস্তিরে খেয়েই যেয়ো এখান থেকে, কেমন? সে রাগেই শিশিরকণা স্বামীকে বললেন—তুমি তো পারলে না, এদিকে আমি ঘরে বসেই মেয়ের পাত্র ঠিক করলাম। শোবার আগের ওষুধ ঢালতে ঢালতে রাজেনবাবু বললেন—তোমার সঙ্গে আমার তুলনা।

অরুণ সুপাত্র, সন্দেহ কী। চেনাশোনা বলেই তো মন খুঁতখুঁত করে, তা না হলে কি এতদিন ভাবতুম! কিন্তু আমি ভাবছি—

এই যে, ওষুধ—বহুদিনের অভ্যস্ত নিপুণতায় ওষুধটা একেবারে গেলাস থেকেই কঠিনালীতে চালান করে দিলেন শিশিরকণা—ভাবছি ওর কাকে পছন্দ, মহাশ্বেতাকে না সরস্বতীকে। বোধহয় দুজনকেই—জলের গেলাস এগিয়ে দিয়ে রাজেনবাবু বললেন—মনস্থির করতে পারছে না। একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে শিশিরকণা বলে উঠলেন—ভাল মেয়ের বাপ!

তুমিই মনস্থির করো ওর হয়ে।

মনস্থির আবার কী। বড়োর আগে তো আর ছোটোর হতে পারে না। তা আর একটি পাত্রের খোঁজ করো তুমি। আর কালই চিঠি লেখ অরুণের বাপকে।

শিশু, এত তোমার তাড়া কেন? মহাশ্বেতার তো আর ক-মাস পরেই ম্যাট্রিক, এত ষ্টেটুটে পরীক্ষাটা দিতে পারবে না!

কেন, বিয়ের পরেও তো কত মেয়ে পরীক্ষা দেয়।

তা কি আর হয়ে ওঠে সব সময়?

না-হয় না-ই হল। মেয়েদের জীবনে বিয়েই আসল। একটু কাছে ঘেঁষে বসলেন রাজেনবাবু। একটু চুপ করে থেকে বললেন—সত্যি তো দু-জনেই খুব ছেলেমানুষ এখনো। থাক না আর কয়েকটা দিন। চলে তো যাবেই। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন শিশিরকণা।

কী বলো? শিশিরকণা আস্তে আস্তে বললেন—সবই বুঝি আমি, কিন্তু না, তুমি অমত কোরো না। বোঝো না, কবে মরে যাই—রাজেনবাবু তাঁর কুড়ি বছরের সঙ্গিনীকে দুহাতে জাপটে ধরলেন।—ইশ্, মরো তো! মরা অত সোজা! কিন্তু চিঠি লিখে দিলেন পরের দিনই। জবাব এল চটপট। অরুণের বাপ জানিয়েছেন যে রাজেনবাবুর সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপন তাঁদের পরিবারে একবার যখন সুখের হয়েছে, তখন আর একবারও হবে আশা করা যায়। তবে তাঁর পুত্রের ইচ্ছা যে তৃতীয় কন্যাটির সঙ্গেই—

কেমন! বলে উঠলেন শিশিরকণা। রাজেনবাবু বললেন—আশ্চর্য! অরুণের এতটা—এতটা কী তা আর বললেন না। পাত্রীরা কিছুই জানল না। ভূগোল, জ্যামিতি আর মাসিকপত্রের গল্প

পড়তে লাগল নিশ্চিন্ত মনে। এদিকে আর একটি পাত্রের সন্ধানে রাজেনবাবু চর লাগিয়ে দিলেন দিগ্বিদিকে। রেঙ্গুনের হোমস্ বর্ধনকেই শিশিরকণা পছন্দ করলেন। লোহালক্কড়ের ব্যবসা তার। ধনী, ছোটো অবস্থা থেকে নিজের চেষ্টায় উঠেছে। বিয়ে করবার সময় হয়নি এতদিন। এবার এসেছে কলকাতায় বৌ নিয়ে ফিরবে বলে। বয়স একটু বেশি, তা তো হবেই।

* * * * *

দুটি বন্ধু নিয়ে নিজেই পাত্রী দেখতে এলেন বর্ধন। মাত্র আগের দিন খবরটা দেওয়া হয়েছিল মহাশ্বেতাকে। অনেক চ্যাঁচামেচি, কান্নাকাটি করল সে—আমি কি অদ্ভুত একটা জন্তু যে লোকের কাছে দেখানো হবে! আমি কি একটা পুতুল যে সাজিয়ে রাখবে দোকানে!... কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশমানি রঙের একটা মূর্শিদাবাদ শাড়ির উপর লম্বা চুল ছেড়ে দিয়ে আলতাপরা টুকটুকে পায়ে যথাসময়ে সভাস্থলে এসে দাঁড়াল লক্ষ্মী মেয়েটি। সরস্বতীকে নরের ভিতরে লুকিয়ে রাখা হল, পাছে দিদির রূপকে সে নিষ্প্রভ করে দেয়, আর বর্ধনও অরুণের মতেই মত দিয়ে ফেলে। চাঁচাছোলা, পাতলাঠোঁট, ঘাড়ছাঁটা চেহারা, কিন্তু মুখের কোথায় যেন খুব একটা ভালোমানুষিও আছে। বর্ধন প্রায় সমস্ত সময় মাথা নিচু করেই থাকল, কথাবার্তাও বিশেষ বলল না। কিন্তু পরের দিন খবর পাঠাল যে অম্বানের প্রথমই বিয়ে হওয়া চাই।

বলিনি আমি তোমাকে! স্ত্রীর মুখে এরকম হাসি অনেকদিন দ্যাখেননি রাজেনবাবু। তোমার রূপসী মেয়েদের আবার ভাবনা! আর কী, লেগে যাও কাজে, একসঙ্গে দুটো বিয়ে তো হাঙ্গামা কম না! একসঙ্গে দুটো বিয়ে... একসঙ্গে চলে যাবে দুজন! হঠাৎ কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগল রাজেনবাবুর বুকের ভিতরটা। সন্ধ্যাবেলা শাস্ত্রী বলল স্বাতীকে—জানিস, যে-একজন কাল এসেছিল না, তার সঙ্গে মেজদির বিয়ে, আর অরুণদার সঙ্গে সেজদির। স্কিপিং রোপটা দুহাতে ধরে মাথার কাছে তুলতে গিয়ে স্বাতী থেমে গেল—মোটাই না!

মোটাই না কী রে?

অরুণদার সঙ্গে সেজদির মোটেই বিয়ে না।

নিশ্চয়ই! রেগে উঠল শাস্ত্রী—আচ্ছা, বাজি রাখ। বেট! দুবার দড়ি-লাফ দিয়ে হাত দিয়ে কপালের চুল সরিয়ে, ঠোট বেঁকিয়ে বলে উঠল স্বাতী—অরুণদাকে তো আমি বিয়ে করব। জানো কি? হাসতে-হাসতে, হাতে তালি দিতে-দিতে শাস্ত্রী চৈচিয়ে উঠল—এ মা! এ মা! স্বাতী অরুণদাকে বিয়ে করবে! বলে দেব! বলে দেব সবাইকে! স্কিপিং-রোপ ফেলে দিয়ে, দুটি হাত টান করে দুদিকে ঝুলিয়ে, স্বাতী স্থির হয়ে দাঁড়াল। চকচকে চোখে তাকিয়ে বলল করবই তো, নিশ্চয়ই করব!

এ মা! এ মা! কী বলে স্বাতী। ও মেজদি, ও সেজদি, শুনেছ?

এত হাসির কথা কী? বেতের মতো সোজা দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল পাঁচ-বছরের স্বাতী। তার ভাব-ভঙ্গি দেখে মুখে আঁচল চেপে লুটিয়ে পড়ল বড়ো দুই দিদি।

হাসছ কেন তোমরা?

না, হাসবে না! ক্যাবলা কোথাকার!

ফুলকি ছড়াল স্বাতীর দুই চোখ, বড়ো নিশ্বাস পড়ল... বেড়ালের মতো ফুলে-ফুলে উঠল ঘাড়, তারপর হঠাৎ তার ডান হাতটি উঠে এল যেন খাপ থেকে তলোয়ার। ঠাশ করে এক চড়

বসিয়ে দিল তার চেয়ে এক মাথা লম্বা, পাঁচ বছরের বড়ো শাশ্বতীর গালে। শাশ্বতী ছাড়ল না, উপযুক্ত উত্তর দিল। তুমুল লেগে গেল দুই বোনে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে যেতে-যেতে রাজেনবাবু শুনলেন চ্যাঁচামেচি। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দ্যাখেন, একেবারে রোলা-রুলি কাণ্ড। শাশ্বতী দাঁড়িয়ে আছে উশকোখুশকো চুলে দেয়ালে ঠেঁষ দিয়ে, স্বাতী লাফিয়ে উঠে-উঠে তাকে মারছে। আর বড়ো দুই বোন হেসে গড়িয়ে পড়ছে এ ওর গায়ে, আর মাঝেমাঝে চেষ্টা করছে ওদের ছাড়াতে।

কী হয়েছে রে?—বাবাকে দেখে বড়ো দুজন হাসতে হাসতে মুখ ঢেকে ফেলল।

হয়েছে কী?

দ্যাখো বাবা, শাশ্বতী আরম্ভ করল—স্বাতী বলছিল—

বলেছি তো বলেছি! ঘামে, রাগে, চোখের জলে, গনগনে, গরমলাল, ময়লা-কালো মুচড়নো মুখে গর্জে উঠল স্বাতী—বেশ করেছে! নিশ্চয়ই আমি অরুণদাকে বিয়ে করব, হ্যাঁ, করবই তো, তোমার তাতে কী! রাজেনবাবু তাকালেন এক মেয়ের মুখ থেকে আরেক মেয়ের মুখে। মহাশ্বেতা হাসি বন্ধ করে বলল—শাশ্বতী হেসেছিল, সেইজন্যে। রাজেনবাবু গম্ভীরভাবে বললেন—সত্যি-তো, হাসবার কী আছে এতে। শাশ্বতী, যা মুখ-চোখ ধুয়ে ফ্যাল।

আমাকে যে মারল, তুমি কিছু বললে না বাবা?

আহা, তুমিও যেন মারোনি! যা, আর ঝগড়া করতে হবে না। মার অসুখ না? এগিয়ে এসে ডাকলেন—স্বাতী।

বাবা! স্বাতী নতুন করে আকুল হল কান্নায়। শোন—বলে রাজেনবাবু যেই হাত বাড়ালেন, অমনি স্বাতী ছটকে দূরে গিয়ে উপুড় হয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। রাজেনবাবুর মনে হল, ঠিক যেন নষ্টকের নায়িকা মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন রঙ্গমঞ্চে। রাজেনবাবু নিচু হয়ে তার মাথায় হাত রাখলেন। কান্নার মধ্যে ফুঁশে উঠে স্বাতী বলল—করব তো! নিশ্চয়ই করব! তাতে কার কী? রাজেনবাবু তাকে মেঝে থেকে তুলে শুইয়ে দিলেন মহাশ্বেতার বিছানায়। বালিশে মুখ চেপে সে এমন করে কাঁদতে লাগল যেন এক টুকরো বরফের মতো গলে মিলিয়ে যাবে। স্বাতী! আমার স্বাতীসেনা!

বাবা!—হাত বাড়িয়ে বাবার হাত আঁকড়ে ধরল স্বাতী। রাজেনবাবু চুপ করে পাশে বসে রইলেন। কী রকম পাগলাটে হল মেয়েটা—এক্কেবারে অবুধ, না কি বড়ো বেশি বোঝে? অত বড়ো-বড়ো দিদিদের সঙ্গে প্রচণ্ড রেষা-রেষি, ছোট্টো বলে একটু কম নেবে না কোনো জিনিস। নিজের চেষ্টায় পড়তে লিখতে শিখে ফেলল শুধু শাশ্বতীর হিংসেয়। দিদির বন্ধুদের নাম ধরে ডাকবে। বরং একা থাকবে, কিন্তু সমবয়সী কোনো মেয়ের সঙ্গে খেলবে না। যখন যেটা চাই, খুন হয়ে যাবে তক্ষুনি সেটা না-পেলে। এত মজা তার মনে চলবে কে, এত জেদ রাখবার জায়গা কোথায় পৃথিবীতে? ভাবতে গেলে সত্যি-তো তার দোষ অনেক। দোষ? ঐটুকু তো মানুষ। চুলে-ভরা তার মাথাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন রাজেনবাবু। এত লাভণ্য আর কার মুখে? আর কার চোখের তাকানো এত সুন্দর? রাস্তিরে যে গলা জড়িয়ে ধরে ঘুমোয়, ঘুমের মধ্যে যে ‘বাবা’ বলে ডেকে ওঠে, এই তো সে—তার দোষ! তীব্র অভিমান, আত্মসম্মান, ভালবাসায় ভরে দিতে হবে ওকে। মার প্রয়োজন ওরই ছিল সবচেয়ে বেশি। হে ঈশ্বর, এমনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে যদি জীবন কেটে যায় তাও যাক, তবু ওর মাকে তুমি বাঁচিয়ে রাখো, বাঁচিয়ে রেখো।

আর বেশিদিন তিনি টিকবেন না, এরকম একটা ভয় মাঝেমাঝেই রাজেনবাবুর হতো, কিন্তু শিশিরকণা ধিকিয়ে-ধিকিয়ে আরো কয়েক বছরই বেঁচে রইলেন। বড়ো কষ্ট পেয়ে গেলেন শেষের ক-মাস। স্বাতীর বয়স তখন দশ-পেরোনো। এগারোর দেরি আছে, কিন্তু দেখায় তেরো। মাথায় সে শাস্ত্রতীকে প্রায় ধরে ফেলেছে, দৈহিক বিকাশও চোখে পড়ে— এমনকি, চোখে ঠেকে। সেই যেদিন অরুণদাকে বিয়ে করবে বলে কেঁদেছিল, সেদিন থেকে কনিষ্ঠার জন্য উদ্বেগের অন্ত ছিল না শিশিরকণার। মেয়ে কিছুতেই শাড়ি পরবে না, মা-ও ছাড়বেন না, জোর করে পরিয়ে দিতেন নিজের ভালো-ভালো শাড়ি, কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যেই আবার স্বাতীকে দেখা যেতনির্লজ্জ ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনুরোধ, ক্রোধ, নতুন-নতুন শাড়ির প্রলোভন, কিছুতেই যখন ফল হল না, তখন ঐ মুমূর্ষু শরীরে উঠে বসে শিশিরকণা কল চালিয়ে সেলাই করলেন মেয়ের জন্য যৌবন-আবরণী অন্তর্বাস। রাজেনবাবুকে তাড়া দিয়ে-দিয়ে আনাতে লাগলেন ল'স্বা-ল'স্বা ফ্রক, আরো... আরো ল'স্বা, যে কোনো ফ্রক স্বাতীর ছোটো হয়ে যায় দেখতে-দেখতে, এদিকে তার মাপের ফ্রক কিনতে পাওয়াও দুর্ঘটি হয়ে উঠল—শেষটায় কি মেমসাহেবদের গাউন কিনতে হবে! জীবনের একেবারে শেষ মাসটির আগে পর্যন্ত স্বাতীকে বসতে, শুতে, চলতে, বলতে শেখাতে গিয়ে শিশিরকণা তাঁর আয়ুর স্বল্প সম্বলের অনেকটাই খরচ করে ফেলেছিলেন। শেষটা একটু ইঠাৎ হল বোধহয় সেইজন্যেই।

* * * * *

তিনটি বিবাহিত মেয়ে, তাদের তিনজন স্বামী আর গোনাগুনতিতে পাঁচটি (কেমনা সকলকে আনা হয়নি) ছেলেমেয়ে নিয়ে একে-একে বিদায় নিল শ্রাদ্ধর পরে। রাজেনবাবু চুপ করে বারান্দায় এসে বসলেন। তাহলে অন্য এক জীবন আরম্ভ হল। যখন বিয়ে করেছিলেন, যখন বেলেঘাটার আঠারো টাকা ভাড়ার বাড়িতে শিশু এসে উঠেছিল, তখন যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল, তা তো অনেকদিনই চূকেছে। এতদিন তবু জীবন্ত একটা চিহ্ন ছিল তার, তাও মুছে গেল। বেলেঘাটা থেকে শাঁখারিপাড়ার দোতলায় দুটি ঘর, তারপর হাজরা রোডের দক্ষিণমুখো ফ্ল্যাট—কী ধোঁয়া হত শীতকালে! তারপর, এই তো সেদিন যতীন দাস রোডের এই সস্তর টাকা ভাড়ার আস্ত দোতলা বাড়ি। শ্বেতা এল ছেলে হতে। লেক পর্যন্ত খোলা ছিল তখন, ঝড়ের মতো হাওয়া চৈত্র মাসে, কিন্তু রাত্রে শিশু কাঁদত মশার যন্ত্রণায়।

বাবা—

স্বাতী!... খেয়েছিস তোরা?

খেয়েছি।

বিজু?

ঘুমিয়ে পড়েছে, ছোড়দিও।

তুই একা জেগে আছিস? শুবি না?

তুমি চলো, বাবা।

রাজেনবাবু উঠলেন। বারান্দার অন্ধকার থেকে আলোতে এসে একটু হাসির ধরনে বললেন—
স্বাতী, শাড়ি যে?

হ্যাঁ বাবা, এখন থেকে শাড়িই পরব।

পারে না, বন্ধুদের সামনে বেরোতেও লজ্জা করে। তাহলে আর কতটুকু সময় বাকি রইল! কোনো ছুটির দিনে বাথরুম থেকে শাড়ি পরেই বেরিয়ে আসে গম্ভীরভাবে। কিন্তু ভাত-টাত খেয়ে মেঝেতে যখন উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে গল্পের বই নিয়ে, আর পড়তে পড়তে আস্তে আস্তে পায়ের আঙুল ঘষে মেঝেতে, শাড়ি তখন শাড়ির মনে হাঁটুতে ওঠে। আর শাস্ত্রী শাসন করে—স্বাতী, পা-টা ঢাক।

এক পায়ের দু-আঙুলের সাহায্যে আর-এক পায়ের শাড়ি নামিয়ে দিয়ে স্বাতী আরো গভীর ডুব দিল বইতে।

—কী খালি মেঝেটার উপর গড়াচ্ছিস! ছোটো আচ্ছিস নাকি এখনও?—ঠিক যেন মা, স্বাতীর মনে হল। মুখে বলল—কেন, গড়ালে কী হয়?

হবে আবার কী! মেঝেটা নোংরা না?

বেশ পরিষ্কার তো—

ওঠ! উঠে বোস চেয়ারে। না-হয় খাটেই শো।

শাস্ত্রী কয়েক মাস আগে কলেজে ভরতি হয়েছে। বেশ পাকাপোক্ত যুবতীর মতো তার চাল-চলন। স্বাতীর খুব ইচ্ছে করে ছোড়দির মতো হতে, কিন্তু ছোড়দির কয়েকটা অভ্যেস তার একেবারে পছন্দ না। যেমন, বাড়িতে সারাক্ষণ স্যান্ডেল পরে থাকা, রাস্তির শোবার আগে নিয়ম করে চুল বাঁধা ইত্যাদি।—একটি পায়ের উঁচু-করা গোড়ালির উপর আরেকটি পায়ের বুড়ো আঙুল ন্যস্ত করে সে বলল—ন্না, এ-ই ভাল।

বিশ্রী স্বভাব—! আর কথা না বলে শাস্ত্রী তার অত্যন্ত পরিপাটি করে শুছোনো পড়ার টেবিলে এসে খুলে বসল পেনসিল হাতে নিয়ে ইনডক্টিভ লজিক, স্বাতীর তুলনায় অনেকটা উঁচু দরের জীব মনে হল নিজেকে। একটু পরে ছোট্টো হাই তুলে পাঠ্যবই মুড়ে রাখল, আর তুলে নিল বন্ধুর কাছে দু-দিনের কড়ারে ধার করা হাল আমলের বাংলা নভেল। বইখানা কোলের উপর খুলে টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে চোখ নিচু করল। তারপর কেমন করে বেলা কেটে গেল বুঝল না। এমন সময় বিজু এসে ডাকল—ছোড়দি!

উঁ।

ও ছোড়দি!

আঃ! ধনিটা বিরক্তির নয়, নায়িকার প্রতি অনুকম্পার নিশ্বাস। এ-রকম সময়ে কি বই থেকে চোখ তোলা যায়?

শোনো না—

বল না! দু-পা এগিয়ে এসে বিজু বলল—ছোড়দি, শুভ্রাবু এসেছেন। এমন সুরে বলল যেন মস্ত একটা খবর দিচ্ছে।

শুভ্রাবু! সে আবার কে?

ও মা, হাফ-প্যান্ট-পরা ঈষৎ গোঁফ-ওঠা বিজু কপালে চোখ তুলল। তারপর, যদিও চীৎকার করে বললেও আগন্তুক ভদ্রলোকের শোনবার সম্ভাবনা ছিল না তবু, খুব নিচু গলায় বলল—শুভ্রাবু! সেই যে সরস্বতীপূজার সময় তিনকোণা পার্কে গান করলেন। মনে নেই তোমার?—তা হয়েছে কী? অসহিষ্ণু বিজু মেঝেতে একবার পা ঠুকে বলল—কী যে তুমি, ছোড়দি! শুভ্রাবু—কত জায়গায় তিনি গান করেন আজকাল। এই তো কয়েকটা বাড়ি পরেই থাকেন।

ও, শুবু! ঘরের অন্য কোণ থেকে হঠাৎ বলে উঠল স্বাতী।—শুবুকে তো সেদিনও দেখেছি গোল-গোল চশমা পরে এক পাঁজা বই ঘাড়ে করে ইশকুলে যেত। এর মধ্যে গাইয়ে হয়ে উঠেছে! আবার শুভ্রবাবু! স্বাতীর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বিজু বলল—তুই দেখেছিস, না? তোর চেয়ে কত বড়ো, জানিস? শাস্বতী তাড়াতাড়ি মধ্যস্থ হয়ে বলল—তা বেশ তো, এসেছে কেন?

আমি ধরে নিয়ে এলাম রাস্তা থেকে—বিজু সগর্বে খবর দিল—জানো ছোড়দি, শুভ্রবাবু আমাকে গান শেখাতে রাজি হয়েছেন।

তাকে আর গান শিখতে হবে না, দাদা—স্বাতী ফশ করে বলল—এমনিই তোর গলা দিয়ে সাত সুর বেরোচ্ছে আজকাল।

স্বাতী! চীৎকার করতে গিয়ে সত্যিই তিন-চার রকম আওয়াজ দাঙ্গা বাধিয়ে দিল বিজুর গলায়। আর কোনো প্রতিবাদের চেষ্টা সে করল না। ঘুরে দাঁড়াল মুচ মেয়েলি স্পর্ধার দিকে পিঠ ফিরিয়ে এমন একটা ভঙ্গিতে, যেন অগ্রজের গৌরবের আর সমস্ত পুরুষজাতির গান্ধীর্যের বর্তমানে সে-ই একমাত্র প্রতিনিধি। তা কথাটা এমন মিথ্যেই বা কী! চাপা গলায় ব্যস্তভাবে যে-খবরটা জানাল, সেটা অবশ্য জানা কথাই—ছোড়দি, শুভ্রবাবু বসে আছেন নিচে।

বসে আছেন তো আমি কী করব?

তুমি একবার যাবে না?

যাঃ!

বিজুর মুখ কালি হল। তার এমন যোগ্য কলেজে-পড়া দিদি, দিদির জন্য শুভ্রবাবুর চোখে কত বেড়ে যেত তার সম্মান।

তুই ডেকে এনেছিস—তুই যা, গল্প কর গিয়ে।

নিশ্চয়ই! কিন্তু শুভ্রবাবু কি সুখী হবেন শুধু তার সঙ্গে গল্প করে? বাড়ির লোকদের সঙ্গে আলাপ না হলে আর বাড়িতে আসা কেন?

আচ্ছা, একটু চা পাঠিয়ে দিও, কেমন?

*

*

সন্ধ্যাবেলা আরজি পেশ করল বিজু—বাবা, আমি গান শিখব।

গান শিখবি?—রাজেনবাবু একটু চুপ করলেন। যৌবনে তাঁরও ছিল গানের শ্রদ্ধা। কলকাতার মল্লিক, বড়াল, দেবেদের বাড়ির দরোয়ানদের অপমান সহ্য করে কত স্তব্ধ হয়ে বড়ো-বড়ো ওস্তাদ, বাঈজিদের গান। কোনো বাড়িতে একান্তই যখন ঢুকতে পারেননি, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থেকেছেন একটু ভেসে-আসা সুরের প্রার্থনায়। কিন্তু গানের জগৎটা ভাল না। পদ্মের পক্ষে এত কাদা যে পদ্মের আকাঙ্ক্ষাই মরে যায় অনেকের। অছিড়া তেমন গান কি আর আছে দেশে? বললেন—বড়ো শক্ত রে। ও নিয়েই পড়ে থাকতে হয় দিনরাত।

না তো! সপ্তাহে দু-ঘণ্টা রেওয়াজ করলেই মডার্ন শেখা যায়—বিজু তার মনোনীত সংগীত-শিক্ষকের মত উদ্ধৃত করল।

মডার্ন কী?

মডার্ন জানো না বাবা?—শাস্বতী ভাইয়ের সাহায্যে এল—রেডিও শোনো না কখনো? আধুনিক গান।—

ও! নাকি-কান্না আবার শিখতে হয় নাকি? বাবার এ কথা শুনে বিজু পালাল, শাস্বতী গম্ভীর

হল, কিন্তু স্বাতী লুটিয়ে পড়ল হেসে। বিজু ধরে পড়ল শাস্ত্রীকে—ছোড়দি, লক্ষ্মী-তো, বাবাকে ভাল করে বলো। আমি কথা দিয়েছি শুভ্রবাবুকে, এখন যদি না হয়, ওঁর কাছে আর মুখ দেখাতে পারব না। শাস্ত্রী হেসে বলল—তুই কথা দিয়েছিস কী রে? পুঁচকে ছেলে!—অপমান লাগল বিজুর, কিন্তু সেটা চেপে গিয়ে অনুন্নয় করল—না দিদি, না। তুমি ইচ্ছে করলেই হয়ে যায়। শেষের এই কথাটা মন্দ লাগল না শাস্ত্রীর। কর্তৃত্বের সুরে বলল—আচ্ছা, শিখতে থাক তো। শেষ পর্যন্ত কোনোটাতেই তো অমত করেন না বাবা।

* * * * *

তা-ই হল। সপ্তাহে দুদিন আসতে লাগলেন শুভ্রবাবু। বিজু হারমোনিয়ম টিপে-টিপে তার চৌদ্দ বছরের মোটা গলায় রজনীগন্ধাকে বার-বার প্রশ্ন করতে লাগল, সে আজ রাত করে ফুটল কেন? এটাই রজনীগন্ধার স্বভাব বলে এর কোনো উত্তর সম্ভব নয়, আর বোধহয় সেইজন্যই প্রশ্নটি করতে হল বার-বার, বড্ডেই বার-বার। শুভ্রবাবু না এলেও মাঝে-মাঝে নিচের ঘর থেকে শোনা যায় বিজুর গীতাভ্যাস। বিজু দেখছি গাইয়ে হবেই—রাজেনবাবু মন্তব্য করলেন একদিন। শাস্ত্রী তাড়াতাড়ি ভাইকে আশ্রয় দিল—ওকে কিছু বোলো না বাবা।

মাস্টারটি কে?

কে একজন শুভ্রবাবু—

তা বিজুর কী হবে গান শিখে? তোরা শিখলেই পারিস।

আমি না! স্বাতী বলে উঠল—বাবাঃ! যা বিদ্রী দেখায় দাদাটাকে!

তুই? বাপ তাকালেন শাস্ত্রীর দিকে।

ঐ শুবুর কাছে শিখবে কী! সঙ্গে সঙ্গে স্বাতীর জবাব—ও নিজে গাইতে শিখল কবে যে অন্যকে শেখাবে?

অসভ্য মেয়ে! শাস্ত্রী আস্তে-আস্তে চলে গেল সেখান থেকে।

বিজু মাথা খেয়ে ফেলতে লাগল এই বলে যে বাড়িতে একদিন শুভ্রদার গান হোক।

আমি যদি বলি না, তাহলে নিশ্চয়ই একদিন সময় করে—

খাম তো চালিয়াৎ! শাস্ত্রী হাসল—তোরা শুভ্রদার আবার সময়ের অভাব! বাড়ি বাড়ি সেধে সেধে গেয়ে বেড়ানোই তো তার কাজ।

জানো তুমি! বিজু মুখ লাল করে বলল—কত নেমস্তন্ন ফিরিয়ে দেন, জানো?

তাহলে আর নেমস্তন্ন করে কী হবে?

না, না! বিজু ডবল উৎসাহে বলল—আমি বললে নিশ্চয়ই গাইবো এসে। যত শুনতে চাও। শাস্ত্রীর মনে হল ছাত্রের চাইতে শিক্ষকের উৎসাহ কিছু কম না। আর ভদ্রলোক যখন এত করে শোনাতেই চাচ্ছেন, তখন নিরাশ করা কি উচিত? রাজেনবাবু সাই দিলেন সানন্দে। কতদিনের মধ্যে কোনো কোলাহল নেই বাড়িতে। শান্ত, বিমোহন, চুপচাপ...কত কমে গেছে বাড়ির লোক। যে-তিনজন আছে, তারাও এতটা বড়ো হয়েছে যে নিজেদের মধ্যে তেমন টগবগে ঝগড়াও আর করে না। ছেলেমানুষ, মাঝে-মাঝে একটু আনন্দ-উৎসব না হলে চলবে কেন? বেশ।

একটু লোকজন না হলে গান জমে না, শাস্ত্রী বলল দু-চারজনকে। শুভ্রবাবুও সাড়ম্বরে এলেন। সঙ্গে তাঁর নিজের হারমোনিয়ম, বাঁয়া-তবলা, তবলচি, আর জনা-তিনেক বন্ধু—বন্ধু মানে পরীক্ষিত ও প্রতিশ্রুত ভক্ত। নিচের ছোটো ঘরটি বেশ ভরা-ভরাই দেখাল। হারমোনিয়মে সুর

দিয়ে শুভ্র একবার শ্রোতাদের দিকে তাকাল। শাশ্বতীর কিউটিকুরা পাউডার দু-হাতে মাখিয়ে নিয়ে আঙ্গিন গুটিয়ে প্রস্তুত হল তবলচি। আর গোছা-গোছা পানের রূপোলি তবক পাখার হাওয়ায় কেঁপে-কেঁপে চিকচিক করতে লাগল খুব যেন খুশি হয়ে।

রাজেনবাবুও এসে বসেছিলেন, শুধুই ছেলেমেয়ের মন-রক্ষার জন্য নয়। কিন্তু প্রথম গানটি হয়ে যেতেই আঙ্গু উঠে উপরে চলে গেলেন। ছি, একে এরা গান বলে! হচ্ছে কী দিন-দিন! ভেবেছিলেন চুপে-চুপেই উঠে আসতে পেরেছেন, কিন্তু গাইয়ের চোখ এড়াল না। তবে বেচার-চেহারার প্রৌঢ় ভদ্রলোকের অনুপস্থিতিতে শুভ্র মুমূর্ষু পড়ল না। হারমোনিয়ম নিয়ে দু-চার মিনিট কসরৎ করতে করতে হঠাৎ দ্বিতীয় গানটি ধরল।

লম্বা ছাঁদের মুখ, চুল পিছনে গুটানো, ছোট্টো সরু একটু গৌফও রেখেছে আবার। যে ছেলেকে সে দেখেছে বই ঘাড়ে করে স্কুলে যেতে, তার সঙ্গে একে ঠিক মেলাতে পারল না স্বাতী। মানুষের ছেলেবেলাটা কোথায় পড়ে থাকে, বলা তো? হঠাৎ কি ছেলেমানুষটা মিলিয়ে যায় হাওয়ার মধ্যে, বড়ো একজন তার জায়গায় এসে দাঁড়ায়? আমার এ-আমিটার কী হবে ক-বছর পরে? ছোড়দির মতো হব, তারপর মা যেমন ছিলেন সেইরকম। এখন যা আছি তা তো বেশ লাগছে আমার, তবে কেন এটাকে ছাড়তে হবে? ইশকুলে যাওয়া শুবুটা তো মন্দ ছিল না। হঠাৎ গৌফ গজিয়ে শুভ্রবাবু হয়ে হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান করে লাভটা তার কী হচ্ছে? শুভ্রকে মোটে ভাল লাগছিল না স্বাতীর। এক লাইনের অর্ধেক গেয়ে, প্রশংসার জন্য তাকায় চারদিকে, তারপর বাকি অর্ধেক গায়, বন্ধু তিনজন সজোরে মাথা নাড়ে। কেমন একরকম গোল-গোল চোখে তবলচির দিকে তাকিয়ে হারমোনিয়মের রিডে তিন আঙুলে বাড়ি মেরে-মেরে তাল বুঝিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে বেলা ছেড়ে দিয়ে বাঁ হাতটি উপরে তুলে হা-হা করে ওঠে এমনভাবে যেন পাশের লোকের গায়ে ঢলে পড়ে যাবে, গান গাইতে হলে এ-রকম করতে হয় নাকি? ছোটো ছোটো হাসির বুড়বুড়ি উঠছিল স্বাতীর গলায়, কিন্তু আর কারো মুখে সে রকম কোনো লক্ষণ সে দেখতে পেল না। সকালেই গম্ভীর হয়ে গুনছে, বেশ ভালই লাগছে যেন। স্বাতীও চেষ্টা করল নিজেকে গুটিয়ে নিতে, শুভ্রকে চোখ দিয়ে না দেখে কান দিয়ে তার গান শুনতে। পর-পর তিনটি গান গেয়ে শুভ্র থামল। রুমালে মুখ মুছে বলল—এবার আপনার কেউ। আপনার পরে কে আর গাইবে এখানে—বলে উঠল শাশ্বতীর এক কলেজ-বন্ধুর দাদা, নিজেও পড়ুয়া, বর্তমানে বোনের এসকর্ট। কথাটা অমায়িকভাবে মেনে নিয়ে শুভ্র জমাব দিল—তাতে কী। কেউ কিছু করুন। ঘরের মধ্যে একটা নড়াচড়া ঠেলাঠেলির ঢেউ উঠল। চশমার আড়াল থেকে শুভ্রর চোখ একটু ঘুরে-ঘুরে বেড়াল, তারপর স্থির হল স্বাতীর মুখের উপর—তুমি একটা গাও না? স্বাতী মাথা নেড়ে বলল—না।

না কেন? গাও! শুভ্র উৎসাহ দিল।

পারি না।

তোমাকে দেখে কিন্তু মনে হয় পার—ফুটফুটে বাঁচা মেয়েটির সঙ্গে একটু কৌতুক করল শুভ্র। হঠাৎ চোখ তুলে স্বাতী বলল—দেখে তো এ রকম উন্টোউন্টি কতই মনে হয়। দু-একজন হেসে উঠল কথা শুনে। শুভ্র নিজেও হাসল। সেই হাসির রেশটাই টেনে রেখে মুখখানা বেশ মোলায়েম করে নিয়ে চোখ ফেরাল শাশ্বতীর দিকে—আপনি?

না না!—শাশ্বতীর ভাবটা এইরকম যেন কেউ তাকে পেরেক খেতে বলেছে, কি ভান্ডা কাচ, কি পাথরের কুচি। বিজু চোঁচিয়ে উঠল কোণ থেকে—বলুন, ছোড়দিকে ভাল করে বলুন। ছোড়দি

নিশ্চয়ই গাইবে। ছুটল বিদ্যুতের মতো দৃষ্টি বিজুর দিকে। সে দৃষ্টি কারো-কারো মনে হল পার্থিব রমণীয়তার পরম উদাহরণ।

একটা গান করতে খুব কি কষ্ট হবে আপনার?—মিনতি করল শুভ্র। গাও না শাস্ত্রী—পিছন থেকে জোগান দিল কলেজের বাস্কীট।

একটা!—শুভ্র তিন বন্ধুর একজনের নিবেদন।

আপনার গান শুনব বলে কতদিন ধরে মনে-মনে আমার ইচ্ছা—আরো একটু সাহস করল শুভ্র। গাইতে হল শাস্ত্রীকে। দ্বিধা-ভরা গলায় একবার সুর আর একবার কথা ভুল করে একটি রবীন্দ্রসংগীত। শেষ হওয়া মাত্র বাহবা রব যা উঠল, তাতে ছোটো-ছোটো পোকার মতো ফোঁটা ফোঁটা ঘাম নামল শাস্ত্রীর মেরুদণ্ড বেয়ে।

শুভ্র আসন নিল আবার। একটি, আর একটি, তারপর সকলের উপরোধে আরো একটি গেয়ে শেষ করে দিল। তারপর সিঙাড়া, সন্দেশ, গল্প, চা, পান। বেশ ভাল লাগল সকলেরই। সকলে চলে যেতেই বিজু আনন্দে একবার গড়িয়ে উঠল পাতা ফরাশে—কী গ্রাস্ত হল ছোড়দি। উঃ, ওয়াস্তারফুল! দেয়ালের সঙ্গে ঠেকানো সোফায় বসে জানলা-বাইরের টুকরো-কালো আকাশের দিকে তাকিয়েছিল স্বাভী, মুখ না ফিরিয়েই বলল—ওয়াস্তারফুল বানান কর তো!

—তুই চুপ কর। তোর সঙ্গে কথা বলছি না আমি।

মন্দ না ভদ্রলোকের গান—শাস্ত্রী সান্ত্বনা দিল ভাইকে।

—মন্দ না! হুঁঃ, বলো কী! আর কী-রকম প্রশংসা করলেন তোমার গানের। রাস্তায় আমাকে কী বললেন জানো? বললেন, তোমার ছোড়দি যদি ভাল করে একটু মন দেন গানে—থাম, থাম—আবার বলল স্বাভী—যেমন বাজে তুই, তেমন বাজে লোকের সঙ্গে তোর ভাব। কী!—বিজু লম্ফ দিয়ে এসে খপ করে চেপে ধরল স্বাভীর চুল।

ঠিক! পান খেয়ে ঠিক একটা বখার মতই দেখাচ্ছে—বলে স্বাভী মাথার এক ঝাঁকানিতে চুল ছাড়িয়ে আঁস্বে-আঁস্বে উঠে গেল ঘর থেকে। বিজু রাগ করে কথা বন্ধ করল স্বাভীর সঙ্গে, আর সেটা জানাবার জন্য তার গা ঘেঁষে দুমদাম করে চলে যেতে লাগল নাক উঁচু করে। আর সকালে বিকালে তার গানের রেওয়াজ পাল্লা দিতে লাগল রেডিওর সঙ্গে। এটাও স্বাভীর উপর প্রতিশোধ। কিন্তু শ্রেষ্ঠ প্রতিশোধ ঘটিয়ে দিল স্বাভী নিজেই। হঠাৎ একদিন বিজু শুনল স্বানের পরে বেরিয়ে আসতে-আসতে স্বাভী গুনগুন করছে সেই নীল সাগরের গান, শুভ্রদা সেদিন যেটা সর্বশেষে গেয়েছিলেন। প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে সে বলল—স্বাভী! তবে? স্বাভী চোখ দিয়ে একটু হাসল, গুনগুনানি থামাল না। বাঃ! সুন্দর বসেছে তোর গলায়! মুহূর্তে সমস্ত শক্ততা ভুলে গেল বিজু। বোনের গলা জড়িয়ে বলল—আমি না, একটু আয়, আমরা একসঙ্গে গাই বাজনার সঙ্গে।

—যাঃ!

লক্ষ্মী-তো, আয়! ঈশ, স্বাভী, তুই যদি একটু সিরিয়াসলি—

তুই আর ইংরিজি বলিস না তো, দাদা। বিজু রাগল না, বরং আরো গলে গিয়ে বলল—সত্যি স্বাভী, সত্যি! আচ্ছা আমি গাইব না, তুই-ই ভাল করে গা, আমি শুনি। কিন্তু স্বাভী বসে গেল তার স্কুলের পড়া নিয়ে। বিজু একটু ঘুরঘুর করল, তারপর আর টিকতে না পেরে নিজেই ছুটে গেল হারমোনিয়মের কাছে। সারাটা সকাল হাবুডুবু খেতে লাগল নীল সাগরের তরঙ্গে।

বিজুটার পড়াশুনো হলে হয়—আপিস যাবার মুখে কাঁদো কাঁদো হারমোনিয়মটা আর যেন সহ্য হল না রাজেনবাবুর। ওর খুব মাথা বাবা—শাম্ভতী তাড়াতাড়ি বলল।

তবে আর ভাবনা কী? তুই-ই তো পড়াতে পারিস ওকে।

স্পষ্ট দমে গেল মেধাবী ভাইকে নিয়ে শাম্ভতীর উৎসাহ। বই নিয়ে বসতেই চায় না—তাকে স্বীকার করতে হল। হারমোনিয়মের দেবীও কি সরস্বতী?—বলে রাজেনবাবু আরেকটি পান মুখে দিয়ে আস্তে আস্তে রওনা হলেন।

আশ্চর্য! আর মাসখানেকের মধ্যেই দেখা গেল, মানে শোনা গেল, হারমোনিয়ম আর হাঁ করে না। এত বড়ো একটা ঘটনা চট করে বিশ্বাস করা যায় না, আর সে বিশ্বাসের সময় হবার আগেই হঠাৎ এক সন্ধ্যায় নিচের ঘর থেকে কেঁপে-কেঁপে উঠে এল আর একটি আত্মস্বর, হারমোনিয়মের চেয়ে অনেক বেশি কান্না-পাওয়া, গায়ে-কাঁটা-দেওয়া, দাঁতে-দাঁত-লাগানো। আপিস-ফেরত শরীরটাকে বারান্দায় পাটির উপর এলিয়ে দিয়েছিলেন রাজেনবাবু। একটু চমকে উঠেই বললেন—এ আবার কী? তারপর নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিলেন—বেহালা! বিজু বেহালা শিখছে?

কী জানি! জানি না তো—বলল শাম্ভতী। বা ছোড়িদি!—স্বাতী বলে উঠল—সেদিন সুকোমলবাবুকে দেখলে না বেহালা হাতে নিয়ে আসতে?

কী জানি! ও-সব তুই-ই দেখিস!—খোঁপায় একবার হাত দিয়ে শাম্ভতী বলল।

শুভ্রর বন্ধু সুকোমল! সেই-যে তোমার গান শুনে বলেছিল—

আচ্ছা থাম! বড়ো-বড়ো মানুষদের আর নাম নিয়ে বলতে হবে না তোকে।

রাত্রে খেতে বসে রাজেনবাবু বললেন—বিজু, আবার বেহালা কেন? মধুর একটু হেসে বিজু জবাব দিল—গান আমার হবে না বাবা।

—একটাতে যখন হল না, আর একটাতে বুঝি হবেই?

বেহালাটা আমি পারব—বিজু নিশ্চিত। রাজেনবাবু ভাতের থালার দিকে তাকিয়ে বললেন—একটু যদি পড়িস-টড়িস! উৎসাহে মাথা নেড়ে বিজু জবাব দিল—সে আমি ঠিক করে নেব—তুমি কিচ্ছু ভেব না বাবা। একটু চুপ করে থেকে রাজেনবাবু আবার বললেন—বেহালা পলি কোথায়?

মুখ-চোখ উজ্জ্বল হল বিজুর—সুকোমলদাই এনে দিয়েছেন। চল্লিশ টাকা দাম! একসঙ্গে দিতে হবে না। মাসে পাঁচটা করে টাকা দিও, কেমন বাবা? বলে বিজু তাকাল, স্বামীর নিচু-করা মুখের দিকে। বেহালার মতো একটা সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া যায় মাসে মাত্র পাঁচ টাকা খরচে, তবু বাবা সুখী নন! কী যে!...

* *

বেহালার তারে জং ধরল বেহালার দাম পুরো শোধ হবার আগেই। অবশ্য গান-বাজনার আবহাওয়াটা রইল বাড়িতে। সুকোমল আসে মাঝে-মাঝে, শুভ্রও আসে, আসে শাম্ভতীর সেই বন্ধু আর তার দাদা, পড়শিনিদের মধ্যে কেউ-কেউ। শাম্ভতীর বন্ধু অনেক, বন্ধুত্বরই বয়স তার এখন, থাকেও অনেকে কাছাকাছি। দোতলার ঘরে শাম্ভতীর সভা যখন বসেছে সঙ্কেবেলায়, ঠিক সেই সময়ে বিজু জড়ো করেছে নিচের ঘরে তার সাংগীতিক অগ্রজদের। হাসির ঢেউ গড়িয়ে যায় উপর থেকে নিচে, গানের কলি উড়াল দেয় নিচ থেকে উপরে। দোতলা মাঝে-মাঝে উতলা হয়, একতলা ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলে, আর লাফিয়ে লাফিয়ে পারাপার করে বীর

বিজ্ঞান। তারপর, ঠিক বোঝা গেল না কেমন করে হল, নিশ্চয়ই বিজুরই চেষ্টাতে, কবে উঠল স্বাধীনতার সিঁড়ি, উড়ল সাম্যের নিশান, আর মৈত্রীর তো এমনতেই অভাব ছিল না। এক-একদিন সন্ধ্যাবেলা রাজেনবাবু যখন ক্লাস্ত পায়ে ফেরেন, বাড়িতে পা-দেওয়ামাত্র তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিচের ঘর থেকে ছেলেবয়সের কলোচ্ছাস।

ব্যাপারটা মন্দ লাগল না স্বাতীর। সে-যে গান ভালবাসে, সেকথা এতদিনে বুঝল নিজের মনে। আসরে গাইবার সময় শুভ্রকে বড়ো বোকা-বোকা লাগে। কিন্তু বসে-বসে গুনগুন করে যখন, ভালোই তো। স্নানের সময় কিংবা ঘরে যখন একা থাকে, অন্তত দাদার শুনে ফেলবার সম্ভাবনা থাকে না, তখন সেও গুনগুন করে, কথা বাদ দিয়ে কেবল সুর। গানটাকে শুধুই গুনগুনানি মনে হয় তার। হারমোনিয়ম, তবলা, আলো, লোকজন, কিছুই যেন মেলে না তার সঙ্গে, শুধু একটা গুনগুনানি। যেমন পাতা কেঁপে ওঠে হাওয়ায়, যেমন শুয়ে-শুয়ে দেখি চাঁদ তাকিয়ে আছে মুখের দিকে, সেই চুপচাপ তাকিয়ে-থাকাটা যদি কোনোরকমে কানে শুনতে পেতুম! এমন গান কি জানে কেউ? না, কেউ জানে না। তবু যারাই গান গায়, ঐ গানই মনে-মনে ভাবে, যারাই শোনে ঐ গানই শুনতে চেষ্টা করে মনে-মনে।

চুপ করে যদি গান গাওয়া যেত—মনের কথাটা ব্যক্ত না করে পারল না স্বাতী—তাহলে বেশ হত। না, ছোড়দি?

সে আবার কী?

জবাব দিল আঠারো ধরো-ধরো যুবতী।

আচ্ছা ছোড়দি, রেলগাড়িতে যেতে-যেতে কখনো তোমার মনে হয়নি আকাশ ভয়ে কে যেন গান করছে?

ও! শাস্বতী হাসল—রেলগাড়ির আওয়াজ দিয়ে যা খুশি তা-ই বলানো যায়, গাওয়ানো যায়, কে না জানে?

না, আমি তা বলিনি—থাক, আর বলব না। রেলগাড়ির চাকা যতই চ্যাচাক, কিছুতেই পারে না সেই গানকে চাপা দিতে। আকাশের গান... স্পষ্ট কানে শুনেছে সে, মাইলের পর মাইল, স্টেশনের পর স্টেশনের বলসানি পার হতে-হতে। কিন্তু যেই কোনো বড়ো স্টেশনে গাড়ি চুকল, উঠল মানুষের রোল—আর শোনা যায় না। রেলগাড়িতে চড়ে তো সর্বদাই, আর কেউ শোনেনি? সন্ধ্যাবেলা ছোড়দিকে খুঁজতে-খুঁজতে স্বাতী এল নিচের ঘরে। শুভ্র কী যেন বলছিল নিচু গলায়—শাস্বতী তাড়াতাড়ি বলে উঠল—আয় স্বাতী। কোথায় ছিল এতক্ষণ?

কোথায় আবার থাকব!

একটু বোস। আমি এক্ষুনি আসছি—কেমন-একরকম ঐক্যে চলে গেল শাস্বতী। টেবিলে ছিল আধ-গেলাশ জল, হাত বাড়িয়ে জলটুকু খেয়ে নিয়ে শুভ্র উঠল।—যাচ্ছেন নাকি? স্বাতী একটু অবাক হল।

হ্যাঁ, আজ যাই। কাজ আছে। শুভ্র চলে গেল। আর কেউ এল না, ছোড়দিও আর কথাবার্তা বলল না বেশি। একটু মন-মরাই কাটল সন্ধ্যাটা।

স্বাতী, শোন—শাস্বতী ডেকে বলল দিন-দুই পরে—এ বইটা দিয়ে আয় তো শুভ্রবাবুকে। কোথায় দিয়ে আসব?

নিচে এসে বসে আছেন, আমার শরীরটা আজ ভাল নেই বলিস।—বইখানা হাতে নিয়ে স্বাতী একটু তাকিয়ে বলল—কালই না দিয়ে গেল? কখন পড়লে?

ও আমার পড়া বই।

ছোড়দি, আর-একদিন রাখো না, আমি পড়ব।

না, দিয়ে আয়।

পারব না! তুমি যেতে পারো না, সত্যি-তো আর অসুখ করেনি তোমার!

লক্ষ্মী-তো! আচ্ছা, বইখানা আবার আমি আনি দেব তোকে। এখন দিয়ে আয়, কেমন?—

দু-আঙুলে কপাল টিপে ধরে শাস্তী জুড়ে দিল—উঃ, মাথা যা ধরেছে! স্বাতীর হাত থেকে নিয়েই শুভ্র একবার বইখানা খুলল। সাদাকালো কাগজের গায়ে নীল রঙের একটা খাম ঝিলিক দিল স্বাতীর চোখে। তক্ষুনি বই বন্ধ করে শুভ্র একটু হেসে বলল—ছোড়দি কী করছে? মাথা ধরেছে বোধহয়।

আচ্ছা—শুভ্র উঠল, স্বাতীর সামনে হঠাৎ থেমে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল—তুমি গান শেখো না কেন বলো তো? এত সুন্দর গলা তোমার।

ছোড়দির চেয়েও?—স্বাতীর মুখ দিয়ে যেন বলে উঠল অন্য কেউ। হ্যাঁ, ছোড়দির চেয়েও, তক্ষুনি জবাব দিল শুভ্র—এস না আমার কাছে, খুব ভাল করে শিখিয়ে দেব তোমাকে—বলে শুভ্র তিন আঙুলে স্বাতীর গাল টিপে দিল একটু। উপরে এসে স্বাতী সোজা ঢুকল বাথরুমে, জলের ঝাপটা দিল সমস্ত মুখে, সাবান দিয়ে ঘষে-ঘষে লাল করে ফেলল গাল, পারলে চামড়া তুলে নেয় ওখানকার। তারপর তার গোলাপি রঙের অরগ্যান্ডির ফ্রক ছেড়ে ব্লাউজ আর শাড়ি পরল। সাদা, কালো-পাড়ের মিলের শাড়ি। আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নিতে-নিতে হঠাৎ মনে পড়ল মাকে। এ-দুবছরের মধ্যে এমন করে মনে পড়েনি কোনোদিন। কোনোদিন মনে প্রশ্ন ওঠেনি মা কেন নেই। অসুখ দেখে দেখে ধরেই নিয়েছিল যে একদিন থাকবেন না। আজ মনে হল তাই-তো, অসুখ হলেই কি মানুষ মরে যায়, আর না-ও তো অসুখ হতে পারত। কোনোদিন, আর কোনোদিন শাড়ি ছাড়া কিছু পরবে না, মনে-মনে যতবার একথা বলল সে, ততবার তার চোখ জলে ভরে উঠল একা ঘরে আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে।

* * * * *

স্বাতীকে আর দেখা গেল না একতলার সাক্ষ্য-সভায়। কী রে?—ক-দিন পরে শাস্তী জিজ্ঞেস করল—হয়েছে কী তোর?

—কী আবার হবে!

—কী-রকম একা-একা থাকিস।

—না তো!

জানিস স্বাতী—শাস্তী চেষ্টা করল বোনের মনে ফুটি আনতে। শুভ্রবাবুরা সবাই মিলে একটা গানের স্কুল খুলছেন পাড়ায়। নাচের ক্লাশও থাকবে। ভরতি হবি তুই নাচে?

—না।

—না কেন? ছেলেবেলায় নিজে-নিজেই কত নাচতিস, মনে আছে? শিখলে খুব ভাল হবে, এত সুন্দর ফিগার তোর...

চুপ কর, ছোড়দি!—স্বাতী ঝঁকিয়ে উঠল। শাস্তীর মন বেশ ভাল ছিল সেদিন। বোনের পিঠে হাত রেখে বলল—কী হয়েছে তোর বল তো? সব সময় রাগ? জবাব না দিয়ে আঁচলটা আঙুলে জড়াতে লাগল স্বাতী। শোন, আর দেরি না, তৈরি হয়ে নে—ব্যস্ত ভাব শাস্তীর।

—কেন?

—বা! মিতালি-সঙ্ঘে ম্যাজিক না আজ?

—আমি যাব না।

—সে কী রে! সবাই যাচ্ছে আর তুই যাবি না!

—না।

—চল না, খুব ভাল ম্যাজিক, চল—হাত ধরে টান দিল শাশ্বতী।

—আমি যাব না।

—থাক তবে!—স্বাতীর হাতটায় জোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে শাশ্বতী চলে গেল সাজতে। তার সময় নেই, এখনি এসে পড়বে বন্ধুরা।

* * *

ছাড়া-ছাড়া মেঘ করেছে সেদিন, এলোমেলো হাওয়া। ছাতে পাইচারি করতে-করতে স্বাতী দেখছিল আকাশে চৌরঙ্গির মতো চওড়া ছাইরঙা রাস্তা। আর সেই রাস্তা দিয়ে ছুটে আসা টকটকে লাল দমকলের মত রোদদুরের এক-একটি লম্বা-লম্বা লাইন। আর কিছু করবার ছিল না তার। বাড়ির সব বই অন্তত দশবার করে পড়া হয়ে গেছে, ধার-করা বইও কিছু নেই, আর ভুলেও সে একটা গানে টান দেয় না আজকাল। আশ্বে আশ্বে আলো নিভল আকাশে, মেঘেরা আরো একটু জায়গা জুড়ল, সদ্য-গ্যাস-জ্বলা আবছা রাস্তা দিয়ে স্বাতী দেখতে পেল বাবা আশ্বে আশ্বে আসছেন। সেও সিঁড়ি দিয়ে নামল, আর রাজেনবাবুও দোতলায় এসে পৌঁছিলেন।—বাবা, এত দেরি তোমার!

চাকরি রে, চাকরি—নিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে এলেন রাজেনবাবু। বাবার সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে স্বাতী বলল—আর যেন কেউ চাকরি করে না! সবাই তো ফিরেছে সেই কখন!

নাকি!—বাথরুমের দরজার কাছে আলনার ধারে দাঁড়ালেন রাজেনবাবু। বাবার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কোটের বোতামের উঁচু ধারটায় একটি আঙুল গোল করে একবার ঘুরিয়ে এনে স্বাতী বলল—বাবা তুমি গলা-বন্ধ কোট পর কেন? বেশ স্যুট-টুট পরলেই পার।

রঞ্জে কর!—রাজেনবাবু কোট খুললেন, শার্ট তুললেন।

—তোমার প্যান্টগুলোই বা কী! প্রত্যেকটা ছোটো!

ভাল-তো। ওতেই সুবিধে লাগে আমার।—জুতোর দশ-ঘণ্টার জেলখানা থেকে পা দুটোকে ছাড়িয়ে নিলেন রাজেনবাবু। না বাবা—স্বাতীর ঠোঁটের কাছটা কেমন একটু ককণ হল—ভাল দেখায় না।

এমনিতেই যারা দেখতে ভাল তাদের কি আর সাজতে হয়—চোখ টিপে রাজেনবাবু ঢুকলেন বাথরুমে, বেরিয়ে এলেন হাত-মুখ ধুয়ে খালিপায়ে, ধুতি আর সোজা পরে। তোমার পাটি পেতে রেখেছি, বাবা— স্বাতীর চোখে-মুখে হাসি।

আঃ, কী আরাম!—রাজেনবাবু লম্বা। চা এল, সঙ্গে দুখানা তিন ঘণ্টা আগেকার ভাজা নিমকি। বাবা, তুমি কিছু খাও না কেন?—স্বাতীর প্রশ্ন।

—সে কী রে?

—এই যেমন আমরা কত কিছু খাই, তালশাঁস খাই, পেয়ারা খাই, পাটালি খাই, তুমিই তো বাজার থেকে আন সব, কিন্তু তুমি তো খাও না? মেয়ের মুখের দিকে কৌতূকের চোখে তাকিয়ে রইলেন রাজেনবাবু। শুধু কৌতুক?—লিচু খাবে, বাবা, লিচু? হ্যাঁ বাবা, লিচু তোমাকে খেতেই হবে!—সম্মতির অপেক্ষা না করে স্বাতী ছুটে গিয়ে নিয়ে এল তার পেল্লিল রাখার বাস্কে

লুকোনো চারটি বড়ো-বড়ো ম্যাজেস্টা রঙের লিচু। হাতের কাছে ছড়িয়ে দিয়ে বলল—খাও।
লিচু একটা খেতে হল।—কেমন? ভাল না?

—চমৎকার। মেয়ের একটি হাত নিজের হাতে নিয়ে রাজেনবাবু তাতে তুলে দিলেন আর তিনটি। বারান্দার রেলিঙে পিঠ ঠেকিয়ে হাঁটু উঁচু করে বসে স্বাতী বলল—রোজ তোমার জন্য লিচু রেখে দেব, কেমন? খাবে তো?

আজ যে তুই বাড়িতে?—রাজেনবাবু জিগেস করলেন।—ও মা? আমি-তো বাড়িতেই থাকি রোজ!

—আজ একা বুঝি?—প্রশ্নটা শুনে মনে কোথায় একটু ব্যথা লাগল স্বাতীর। কিছু বলল না।—
তোদের গান-বাজনা কেমন চলছে? এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে স্বাতী বলল—বাবা, তুমি রোজ আপিস থেকে এসে বাড়িতেই বসে থাক কেন?

—ভাল লাগে বলে, আর অভ্যাস বলে।

—মাঝে-মাঝে একটু বেরোলেও তো পার।

—কোথায় যাই বল তো? দাঁত দিয়ে একটি লিচুর খোশা ছাড়াতে-ছাড়াতে স্বাতী আস্তে আস্তে বলল—বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি যেতে পার, কি শনি-রবিবারে সিনেমায়—

—আচ্ছা আচ্ছা ঢের হয়েছে! তা তুই কেন বাড়ি বসে থাকিস সন্ধ্যাবেলা? কোমরের উপর থেকে শরীরটি একটু মুচড়িয়ে স্বাতী বলল—এমনি।

—তোর দিদিটা বেড়ুনি হয়েছে খুব, আর তোর দাদা তো বিশ্ববন্ধু। তোর বন্ধুরা আসে না কেউ?

আমার কোনো বন্ধু নেই—বলে স্বাতী খোশা-ছাড়ানো নীলচে-সাদা নিটোল লিচুটি একেবারে পুরে দিল মুখের মধ্যে।

* * *

সন্ধ্যাবেলাটা সম্প্রতি একটু নির্জনই হয়ে উঠেছিল রাজেনবাবুর। হঠাৎ ভরে উঠল। কত কথা স্বাতীর! রাজেনবাবুর শ্রান্ত শরীরের উপর যেন ফুরফুরে হওয়া বয়ে যায়, আর ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি ঝরে পড়ে। কোনোদিন স্বাতী হয়তো বলল—শোনো বাবা, আমাদের রাস্তা দিয়ে যাক্ষকে কালো নতুন একটা গাড়ি যায়, দেখেছ তুমি?

—নাকি?

—ঐ মোড়ে যে কম্পাউন্ডওলা মস্ত বাড়িটা না, ও-বাড়ির গাড়ি। চারটে গাড়ি ওদের। খুব বড়োলোক ওরা, না বাবা?

—তা হবে।

—কিন্তু চারটে গাড়িতে তো আর একসঙ্গে চড়া যায় না? কী হয় চারটে দিয়ে?

রাজেনবাবু একটু ভেবে বললেন—অনেক লোক বোধহয় বাড়িতে, আর তারা তোর মতো ঘরে বসে থাকে না কেউ। সকলেই খুব বেড়ায়-টেড়ায়।

—বাবা, তুমি একটা গাড়ি কেনো।

—তাহলে বেড়াবি তুই? স্বাতী মুখ টিপে হাসল।—তা মন্দ কী! বেড়াতে হলে তো গাড়িই ভাল। মেয়েরা যে রাস্তায় হেঁটে-হেঁটে বেড়ায়, একটুও ভাল লাগে না আমার। রাজেনবাবু হাসলেন কথা শুনে। স্বাতী বলল—হাসবার কী আছে, ঠিকই তো! আর গাড়ি হলে বেশ তোমাকেও আর ট্রামে চড়ে আপিশ করতে হয় না।

—কেন, ট্রাম তো ভাল।

বিত্তী! কী ভিড় আপিশের সময়! হ্যাঁ বাবা, একটা গাড়ি কেনো।

দেখি।

আচ্ছা বাবা—রাজেনবাবুর সিঁথির উপর দিয়ে একটি আঙুল আস্তে টেনে নিতে-নিতে স্বাতী বলল—আমরা তো এর চেয়ে ছোটো একটা বাড়িতে যেতে পারি। দুটো ঘর তো খালিই পড়ে থাকে।

—তোর দিদিরা এলে লাগে না?

—ওঃ, কবে-না-কবে আসবে দিদিরা, তাই জন্যে! আচ্ছা, আর তো দিদিরা কেউ এল না একবারও?

—আসা কি সোজা রে?

—কেন, মা থাকতে তো কতবার...। রাজেনবাবু একটু হেসে বললেন—মা না থাকলে বাবার কাছে কি আর আসে মেয়েরা?

—আসে না? বল কী তুমি!

—আসে নাকি?

বা রে! আমি! আমি বুঝি আর মেয়ে না তোমার!—বলে স্বাতী বাপের গা ঘেঁষে শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। ঘন চুলে ভরা কৌকড়া কালো মাথাটিকে রাজেনবাবু চোখ দিয়ে চুম্বন করলেন অনেকক্ষণ।

* * *

আশ্চর্য ঘটনা! অভূতপূর্ব প্রস্তাব! কোনো এক শনিবারে আপিশ থেকে এসেই রাজেনবাবু বললেন—কোথায় গো রাজকন্যারা, সিনেমায় যাবে নাকি আজ? স্বাতী ছুটে এসে বাবাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরল—সত্যি বাবা, সত্যি? শাম্ভতী একটু ফাঁপরে পড়ল। শনিবার গীতায়তনে তার ক্লাস, শুভ্রদের ইশকুল ওটা। এদিকে বাবাকে নিরাশ করতেও অনিচ্ছা, হঠাৎ একটা শখ হয়েছেই যখন! কোনটাতে যাবে?—ঠান্ডা গলায় সে জিজ্ঞেস করল।

—যেটাতে ইচ্ছে তোদের।

‘বন্দিনী’টা মন্দ হয়নি শুনেছি—বিজ্ঞ মন্তব্য শাম্ভতীর।—ছাই! বিজুর সাদা কোঁচাট্টা দুলে উঠল দরজার কাছে—দেখতে হয় তো ‘প্রতিশোধ’, ওঃ, গ্লোরিয়াস!

দেখেছিস নাকি তুই? শাম্ভতী যেন যুদ্ধে আহ্বান করল ভাইকে।

ক—বে!

তাহলে এখন আর যাবি না তো?—বলল স্বাতী।—বয়ে গেছে! ঝিলিক দিয়ে উঠল দরজার আড়ালে বিজুর বীরদর্প—বললেও যেতাম না আমি, রিহার্সেল আছে না আমার!

রিহার্সেল! নাটক? সোজা ছেলেকে জিজ্ঞেস না করে রাজেনবাবু শাম্ভতীর দিকে তাকালেন। পাড়ার ছেলেরা বুঝি করছে একটা। আর এ-পাড়ায় কিছু কি হতে পারবে যাতে বিজু নেই! একটু গর্বিতভাবেই শাম্ভতী বলল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রিহার্সেলের মায়া কাটাল বিজু। ট্যান্ডি চড়ে সবাই মিলে যাওয়া হল, আর সবচেয়ে দামি টিকিট কিনে বসা হল দোতলায়। শাম্ভতী বসল চেয়ারে ঠেশান দিয়ে অভিজ্ঞ ধরনে, যতক্ষণ না আরম্ভ হল দর্শকদের মধ্যে ঘুরে বেড়ান তার চোখ। আর আরম্ভ হবার পর থেকে বিজু অবিশ্রান্ত কথা বলতে লাগল তার পাশে বসে—এইবার মেয়েটা রাগ করে

বাপের বাড়ি চলে যাবে, ছেলেটার অসুখ করবে, তাই চোখ দুটো ও-রকম। শাম্ভতী এমনকি একটা চড়ও মারল তার কানের উপর, বেশ জোরেই মারল, কিন্তু বিজু নাছোড়! ফিরতি ট্যান্সিতেও অবিশ্রান্ত বকবকানি তার—জান ছোড়দি, শিবেনের গানগুলি কিন্তু প্লে-ব্যাক। গেয়েছে আর একজন, ছবিতে শুধু ঠোট নেড়েছে।

আচ্ছা হয়েছে, তুই থাম তো এবার! কিন্তু শাম্ভতীর কথার মধ্যেই বলে উঠলেন রাজেনবাবু—সত্যি? ফিল্ম দেখে, মানে, দেখে-শুনে, রীতিমতোই চমকেছিলেন তিনি। সেই কোন জন্মে বোবা বায়োস্কোপ দেখেছিলেন। তখনকার দিনে বায়োস্কোপ বলত। এই প্রথম দেখলেন কথা-বলা ছবি, তাও বাংলা! কী সব কাণ্ড, অ্যা! কী করে করে!

বাঃ, সত্যি না! বাবার উৎসাহে বিজু একেবারে টগবগ করতে লাগল ফুটন্ত জলের মতো—গানগুলি গেয়েছে তো শশাঙ্ক দাশ। ঐ তো মনোহরপুকুরে থাকে, নিউ মডেল স্টুডিওবিকার আছে একখানা।

—অনেক তো খবর রাখিস তুই! কথাটা বিজু প্রশংসা বলেই ধরল, আর প্রশংসাটা মেনে নিল একটুমাত্র হেসে।—শশাঙ্কর গান কত ফিল্মে যে থাকে আজকাল, আর সত্যি গায়ও খুব ভাল, না ছোড়দি? শুভদাও প্লে-ব্যাক করবেন শিগগির। রাজেনবাবু বিষয়টা নিয়ে একটু যেন চিন্তা করে বললেন—তা যাই বলিস তোরা, গানের সঙ্গে-সঙ্গে ঠিকমতো ঠোট নাড়াও কম শক্ত না। আর ছেলেটি দেখতেও...

কী হ্যান্ডসম—কথা কেড়ে নিয়ে বিজু বলল—ও তো সুজিত, এই সেদিন নামল ‘স্বপ্নপুরী’তে, আর এর মধ্যেই... হবে না! চেহারাখানা কেমন!

বিশ্বী। এতক্ষণে স্বাতী কথা বলল—ঠোট দুটো বোকা-বোকা!

—জানিস! বিজু শাসালো—‘রূপরঙ্গে’র ভোট সুজিত ফাস্ট হয়েছে চেহারায়া!

—হোকগে! তার চাইতে ঐ আর একটি ছেলে, ঐ-যে বন্ধু, সে ঢে—র ভাল দেখতে। নায়কের বন্ধুর চেহারাটা একটু চেপ্টা করে মনে এনে রাজেনবাবু বললেন—তাকে ভাল লাগল তোর?
—হ্যাঁ বাবা, ও বেশ সুন্দর। একটু-একটু তোমার মতো।

আমার মতো! রাজেনবাবু হেসে উঠলেন—আমি ও-রকম সুন্দর হলে তো কাণ্ডই করছিলাম! তুমি সুন্দর না? বলে কী!—স্বাতীর আঁটোসাঁটো সারবাঁধা দাঁত বকবক করে উঠল হাসিতে। বাড়ি ফিরেও খানিকক্ষণ চলল সিনেমা-প্রসঙ্গ। ছোড়দিকে উপলক্ষ আর স্বাতীকে লক্ষ্য করে বিজু উন্মুক্ত করে দিল এ বিষয়ে তার অসামান্য জ্ঞানের ভাণ্ডার। স্বাতী চুপ করেই রইল মোটামুটি, যেন অন্যদিকে তাকিয়ে অন্য কথা ভাবছে। আলো-না-জ্বালা বারান্দায় তার আবছা মুখের দিকে তাকিয়ে রাজেনবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন—স্বাতী, তোর জন্মদিন তো শিগগির। স্বাতী দ্রুত ভঙ্গিতে মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

বেশ বড়সড় হলি—এবার তোর জন্মদিন খুব ভাল করে করা যাক।

—হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ, শাম্ভতী হাতে তালি দিয়ে উঠল—খুব ভাল হবে, খুব মজা!

গানের আসর যা হবে একখানা!—বিজু লাফিয়ে উঠল। ওঃ! শশাঙ্ক দাসকেই নিয়ে আসব একেবারে। বাড়িতে লোক ভেঙে পড়বে।

বেশ তো গানের আসর হবে। আর? বলবি কাকে-কাকে?

শোভাদি, লীলা-মাসি, মিঠুদা—বিজু গড়গড় করে আত্মীয়দের নাম বলে গেল।

তা তো হল। আর? ভোদের বন্ধুরা?

সে তো—হঠাৎ থেমে বিজু বলল, আচ্ছা ছোড়দি, হারীতবাবু? হারীতবাবুকে বলি?

যত তোর—!

কী রকম বদ্ভূতা করলেন সেদিন মিতালি-সংঘে! কী স্মার্ট, না? ঈশ, আর একটু থাকতে যদি, ছোড়দি, তোমার সাথে আলাপ হয়ে যেত!

ও, তুই ছাড়িসনি! শাস্ত্রী খুব জোরে হেসে উঠল। রাগে শোবার আগে বাবাকে একা পেয়ে স্বাতী বলল—বাবা, শোনো—

কী রে?

জন্মদিন-টন্মদিন কিন্তু কোরো না।

কেন?

না, ভাল লাগে না।

কী ভাল লাগে তোর বল তো?

কী ভাল লাগে? তা কি সে নিজেই জানে? ছুটির দিনের শাঁ-শাঁ দুপুরবেলায় হঠাৎ মাঝে মাঝে কী একটা আশ্চর্য ভাললাগা ছড়িয়ে পড়ে। সিনেমা, বেড়ানো, নেমস্তল্ল, হৈ চৈ, আর কিছুতেই তো সে রকম হয় না। আর তাই-ই যদি না হল, যত ভালই হোক, কিছুই কি ভাল? আকাশ গান করে তার কানে-কানে। পৃথিবীটাই রেলগাড়ি, স্টেশন নেই, কেবল চলছে। দিনে-রাগ্রে কখনো থামে না গান। আমরা শুনি না, কেউ শোনে না... আমি শুধু শুনি। আর শুনি যদি, সবসময় শুনি না কেন?

—বল না কী তোর ভাল লাগে?

বেশ, যা ইচ্ছে কোরো, একটু হেসে স্বাতী চলে গেল শুতে। জন্মদিনের সকালবেলায় চা খাবার পরে রাজেনবাবু বলল—শাস্ত্রী, একটু বেরোবি আমার সঙ্গে? স্বাতী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। বাবা বললেন— তুমি আজ না, তুমি বাড়িতে থাকো।

হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে স্বাতী দাঁড়িয়ে রইল একটু। তারপর আস্তে আস্তে সরে এল সেখান থেকে। বাবা যে তাকে নিলেন না, তার চেয়েও খারাপ লাগল বাবার মুখের 'তুমি।' মনে পড়ল না আর কোনোদিন বাবা 'তুমি' বলেছেন। জন্মদিন—তো তার দোষ কী! সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আসার শব্দ হল ঘণ্টাখানেক পরে। ডাকাডাকি শুনে সে জবাব দিল বিরক্ত গলায়—ক্যা-নো?

শিগগির আয়! ছোড়দির আর কী, ফুরতি ধরে না! আমি অঙ্ক করছি।—কেন সে দ্রুতবেগে লিখতে লাগল দশমিকের সংখ্যা। অঙ্ক খুব ভাল, অঙ্ক সবচেয়ে ভাল। খনখারাপ হলে ভুলে থাকতে এমন আর কিছু না।

আয় না!

না আমি এখন পারব না।—তোপের মত বেরোল স্বাতীর আওয়াজ।—এই নে! ঝুপ করে তার টেবিলের উপর কী-একটা পড়ল, আর বিজু পালাল দৌড়ে। দোকানের নাম-ছাপানো মস্ত চৌকো বাস একটা। ইশ! এ রকম একটা বাস কতদিন মনে-মনে চেয়েছে সে। কী ভারি, আর কী ভাল, কত জিনিস রাখা যায়! দেখেই তার আবার পুতুল খেলতে ইচ্ছে করছে। কোথায় পেল দাদা? আর বড়ো-যে ভালমানুষ, নিজে না রেখে তাকে দিয়ে গেল? পেনসিল রেখে দিয়ে বাসটা খুলল স্বাতী। ও মা, শাড়ি! কী সুন্দর সবুজের উপর সোনালি বুটি! আবার ব্লাউজও! আর একটা পাতলা ছোটো বাসে চিকচিকে কাগজের তলায় ঠিক জ্যামিতির ত্রিভুজের মতো ভাঁজ-করা হলদে, গোলাপি, ফিকে-নীল রুমাল। বাইরে ছুটে এল স্বাতী। ফুল, সন্দেশ, নতুন

চায়ের পেয়ালা, চকচকে চামচে—কী কাণ্ড!

বাবা বললেন—কেমন? এখন বেশ জন্মদিন-জন্মদিন লাগছে না? বিজু বলল একটু দূরে দাঁড়িয়ে—ভাবিসনে শুধু তোর জন্যই সব এসেছে। এই দ্যাখ আমার ধুতি, আর ছোড়ির শাড়ি। ওঃ, আজ যা হবে! স্বাতী চূপ করে রইল, মুখ তার টুকটুকে লাল। মা থাকতে জন্মদিন হয়েছে তাদের। নতুন ফ্রক-ট্রক এসেছে, পায়ের রান্না হয়েছে, কেউ-কেউ এসেওছে কোনো-কোনো বার। কিন্তু এ রকম! এত ফুল! ঘাস-রঙের পেস্তা-বসানো সাদা-সাদা ফোলা-ফোলা ঠাণ্ডা নরম এত সন্দেশ! আর এ-সব তার জন্য! তার জন্মদিন বলে!

রাজেনবাবু বললেন—শাড়িটা কেমন রে? ভাল?

সিক্কের তো—

সিক্ক ভাল লাগে না তোর? চোখ না তুলে, শরীরটি একটু মোচড়াতে-মোচড়াতে স্বাতী বলল, পুতুলদের যে রকম শাড়ি পরানো থাকে, সে রকম তো—

তা পরবে যে সেও তো পুতুল!

মোটোও না! স্বাতী হেসে ফেলল। ছড়ানো জিনিসগুলির দিকে তাকিয়ে বলল—আচ্ছা বাবা, সকলের জন্যই আনলে, নিজের জন্য তো কিছু আনলে না?

নিজের জন্যই তো সব এনেছি—বললেন রাজেনবাবু।

* * * *

পরতে হল সবুজ সিক্কের শাড়ি, সাটিনের ব্লাউজ, শাস্বতী জোর করে ধরে চুলটা নতুন ধরনে উলটিয়ে দিল ঘাড়ের উপর, কপালে চন্দনের ফোঁটাও বাদ দিল না। দেখে রাজেনবাবুর মনে পড়ল শ্বেতার, মহাশ্বেতার, সরস্বতীর বিয়ের রাতের মুখশ্রী। কত সুন্দর, কত সুখের, আর কত দুঃখে দেখা সেই মুখশ্রী। স্বাতীর কাঁচা মুখের সঙ্গে বেশ-তো মানিয়ে গেছে এই সাজ? একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন রাজেনবাবু।

স্বাতীরও নতুন লাগল নিজেকে, যখন সিক্কের পর দোতলার বড়ো ঘরে এসে বসল। সিঁড়িতে কত জুতো, ঘর ভরা লোক, সকলেই ভাল, সকলেই খুশি। শশাঙ্ক দাসকে বিজু অবশ্য ধরতে পারেনি। তা শুভ্র আর তার দলই আসর জমিয়ে রাখল রাত ন-টা পর্যন্ত। স্বাতীর মনে হল সমস্ত গান ঘুরে-ফিরে এই কথাই বলছে তাকে—তুমি ভাল, আমরা তোমাকে ভালবাসি। যত লোক আছে এখানে, সকলে তাকে ভালবাসে। ভাল, খুব ভাল, এই পৃথিবী ভাল, পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সব ভাল। তা না হলে মানুষ কেন গায়, নাচে, হাসে, আনন্দ করে। তা না হলে এত আনন্দ কোথা থেকে আসে?

এবার তুমি—বলে শুভ্র হারমোনিয়ম ঠেলে দিল স্বাতীর দিকে। তক্ষুনি সুর কেটে গেল। এতক্ষণের সমস্ত ভালোলাগাকে খেতলে দিয়ে অসম্ভব একটা লজ্জা এসে গলা আঁকড়ে ধরল স্বাতীর, সকলেই যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে, বাঁকা চোখে দেখছে তাকে, তার শাড়ি পরাটা যেন ঠিক হয়নি, কোথায় কী ভুল বেরিয়েছে। বিস্মী! উঠতে পারলে বাঁচে, কিন্তু উঠতে গেলেও তো এতগুলো চোখ!

আজ একটা গান শুনবই তোমার—রাষ্ট্রের বেড়াল-ডাকের মতো শুভ্র নরম গলা সে শুনতে পেল। হঠাৎ মুখ তুলে, এক মুহূর্ত আগেও কথাটা চিন্তা না করে, এক ঘর লোককে শুনিয়ে সে বলে উঠল—আপনি আমাকে ‘তুমি’ বলবেন না!

ঘরে উঠল অস্পষ্ট শুভ্র। চশমার পিছনে শুভ্র চকচকে চোখ দুটি দপ করে নিবে গেল,

মুখে যতখানি সুখ আর যেটুকু লালিত্য তার ছিল সব মুছে গিয়ে চেহারাটা হয়ে গেল যেন অন্য মানুষের। অনেকেই যেন কিছু বলতে চাচ্ছে, বলতে পারছে না। এইরকম একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে খুব সপ্রতিভ কেউ একজন স্পষ্ট গলায় বলে উঠল—আপনি একটা গান করলে আমরা সকলেই খুব সুখী হই। স্বাতী তাকিয়ে দেখল, কথটা যে বলল সে বসেছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে। জিন-প্যাণ্টে ঢাকা হাঁটু দুটো উঁচু করে, খাটো হাতায় আদ্রেক ঢাকা একটি হাত হাঁটুর উপর, আর এক হাতে উল্টো করা পাইপ ধরা। মনে হল না আগে কখনো দেখেছে ঐকে। না-ই দেখল, মুখে জবাব এল তার—গান শুনলে সুখী হন, না আমার গান শুনলে? মনে করুন আপনার গান—পাইপ-ধরার চোখে মুখে কৌতুক। স্বাতীও সকৌতুকে তাকাল কালো রঙের মসৃণ মুখের দিকে। বলল—গান আমি জানি না।

জানেন না? কিন্তু ঐরা কি আগে কখনো আপনার গান শোনেননি? আমিও তো শুনেছি আপনি গাইতে পারেন—ঠোঁটের কাছে একটু বাঁকা করে হাসল পাইপ-ধরা মানুষটি।

আমার গান শোনা বরং সম্ভব, কিন্তু আমি গাইতে পারি একথা শোনা নিশ্চয়ই অসম্ভব—বলে স্বাতী কালো মানুষটির মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল। সরু-মোটা গলায় মেশানো হাসি উঠল ঘরে।

কী অসভ্য রে তুই! ছি-ছি! বোনের সঙ্গে এক হওয়া মাত্র শাস্ত্রী আর সময় নষ্ট করল না।

—অসভ্য কেন?

—ও-রকম করে অপমান করলি শুভবাবুকে!

অপমান?

অপমান না? তোকে ছোট দেখেছে—

তাই বলে এখন তো আর ছোটো না আমি—

স্বাতীর বলমলে শাড়ির দিকে একপলক তাকিয়ে শাস্ত্রী বলল—একবার ‘তুমি’ বলে আবার নাকি ‘আপনি’ বলা যায়!

কেন যায় না? একবার ‘আপনি’ বলে আবার ‘তুমি’ বলা যায় তো?

অসভ্য! শাস্ত্রী লাল হল।

বারবার অসভ্য বোলো না, ছোড়দি।

নিশ্চয়ই বলব। অসভ্য, অভদ্র, উদ্ধত! হারীতবাবুও তোমার ইয়াকিন্দ পাত্র, না?

ও, ঐ কালো-মূর্তিই তোমাদের বিখ্যাত হারীতবাবু? শাস্ত্রী জুলে-জুলে বলল—মনে কোরো না স্বাতী, পঁচিশ-টাকা দামের শাড়ি পরেই মস্ত বড়ো হয়ে গেছে। বড়দের সঙ্গে সমান-সমান চলবার যোগ্য তুমি এখনও হওনি, মনে রেখো। শাস্ত্রীর চোখে-মুখে এ রকম টকটকে রাগ স্বাতী কখনো দ্যাখেনি। ভয় পেয়ে ডাকল—ছোড়দি!

তুমি মনে করেছ পৃথিবীর সব লোকই বাবা। যা করো তা-ই চলবে—না! মনে করেছ তোমার ছেলেমানুষি দিয়েই জিতে যাবে সব জায়গায়—না! ভালো হয়ে, নম্র হয়ে যদি চলতে না পার, কেউ তোমাকে দু-চক্ষে দেখতে পারবে না—কেউ না!

ছোড়দি, আমি কী করলাম—আমি কী করেছি..অমন করে বকছ কেন আমাকে? স্বাতী হাত বাড়িয়ে এগোল, থমকাল, কাঁপল, পেছল... লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে সোনালি-বুটি আঁচল।—এখন আর নেহাৎ ছেলেমানুষ নও তুমি—নিজেই নিজের কথার বিরুদ্ধতা করে শাস্ত্রী আবার

বলল—এখনো যদি তোমার গর্বিত স্বভাব, তোমার দুর্বিনীত ব্যবহার তুমি ছাড়তে না পার—
একসঙ্গে এতগুলি শব্দ-শব্দ কথা শুনে স্বাতী প্রায় কেঁদে ফেলল।

আর বোকো না, আর বোকো না আমাকে—কোনোরকমে এগারো হাত শাড়ি সামলে ছুটে
গেল সে বাবার কাছে। দু-হাতে জড়িয়ে ধরে ডেকে উঠল—বাবা!

কী রে? বাবার শান্ত সুন্দর আশ্বাসে-ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে স্বাতী কান্না গিলে ফেলল—
না কিছু না।

হয়েছে কী?

কিছু না।

ছোড়দি বুঝি বকেছে?

না।

তবে?—বাবার কাঁধে মুখ রেখে চুপ করে রইল স্বাতী। কৌকড়া কালো মাথাটায় হাত বুলিয়ে
রাজেনবাবু বললেন—বাঃ, কী রকম নতুন ফ্যাশনের খোঁপা করে দিয়েছে ছোড়দি!

বাবা—পাঞ্জাবিতে আস্তে আস্তে মুখ ঘষে-ঘষে স্বাতী বলল—বাবা, আমি তোমার কাছেই
থাকব। তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না, কোনোদিন না।

বেশ-তো। খুব ভালো কথা, খুব সুখের কথা! তাই বলে কান্নার কী আছে? এত বড়ো পনেরো
বছরের মেয়ে নাকি কাঁদে!

ও মা! স্বাতী মুখ তুলে জলভরা চকচকে চোখে হাসল—বলো কী বাবা! আজ আমার তেরো
পূর্ণ হল না, চোদ্দতে পড়লাম!

৩

কোথাও যাব না, তোমার কাছেই থাকব। কিন্তু যেতেই হয়। শাস্ত্রতীর পালা এল।

কয়েকমাস আগে রাজেনবাবু এসেছেন নিজের বাড়িতে। টালিগঞ্জে। ব্রিজের কাছাকাছি, রসা
রোড থেকে একটু পশ্চিমে ঢুকে, ছোটো একটু জমি শস্তায় কিনেছিলেন অনেকদিন আগে কোনো
এক ফাঁকে। হঠাৎ স্থির করলেন বাড়ি করবেন। একেবারে হঠাৎ নয়, ছমাস আগে থেকে
মাস্টারের নিয়মিত আনাগোনা সত্ত্বেও রাজেনবাবু মনে মনে যা ভয় করেছিলেন তা-ই হল,
বিজু ফেল করল ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায়। ফেল করে কয়েকদিন খুব মন ব্যস্ত করে থাকল;
তারপরই মেতে গেল গরচা ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন-এর ‘সীতা’ নাটকের ধুমধামে। সোজা কথা নাকি,
তাকে সাজতে হবে তুঙ্গভদ্রা! এ-ছেলের হাতে, রাজেনবাবু ভাবলেন, কাঁচা টাকা না পড়াই
ভাল। অবশ্য টাকা যে তাঁর বলবার মতো কিছু আছে তা নন্দু সরকারি সিঁড়ির ধাপে-ধাপে
উঠে এতদিনে সাতশো টাকার একটি আসনে বসেছেন বসে, কিন্তু জীবন ভরে অনেক দেনা
করতে, অনেক দেনা শুধতে হয়েছে। দশ বছর ধরে স্ত্রীর অসুখ, তিনটি মেয়ের বিয়ে, আর
ছেলেমেয়ের সুখের জন্যে হিসেবহীন খরচ, কী আর থাকে! তবু, প্রতিভেন্ট ফান্ডটা অনেকবার
অনেক মার খেয়েও টায়ে-টুয়ে টিকে আছে, ইনশিওরেন্সের পলিসি দুটোও পেকে এল।
বাংলাদেশের অধিকাংশ চাকুরে ভদ্রলোকের টাকা জমাবার উপায় যে দুটি মাত্র, তারই
প্রথমটিকে প্রায় নিঃশেষ করে রাজেনবাবু বাড়িটি তুললেন।

বড়ো বাড়ি হল না। একতলা, থাকবার ঘর খানচারেক। চেহারাটাও জাহাজ কি এরোপ্লেন কি
লেবং-এর রেসকোর্সের মতো না—নেহাতই সাদাসিধে বাড়ি একটি, যেখানে মানুষ থাকে, খায়,

ঘুমোয়। শাস্ত্রী সুখী হল না মোটেও। আবার রাস্তার নাম বিধু ঘোষ লেন, সেটাও অপছন্দ। বাড়িটা এখানে কেন করলে, বাবা? একদিন সে না বলে পারল না।

এখানে ভাল লাগে না তোর, না রে?

পাড়াটা বড়ো—শাস্ত্রী বলতে যাচ্ছিল গরিব। কিন্তু হারীতবাবুর কথাবার্তা শুনে সে গরিবদের শ্রদ্ধা করতে শিখেছে। সত্যি, তারাই তো সংসার চালাচ্ছে, তারাই সব। একটু থেমে সে কথা শেষ করল—বড়ো পাতিবুর্জোয়া। বি. এ. পড়ুনি মেয়ের কথা শুনে রাজেনবাবু অবাক, পাতি—? কী বলল? পাতিবজরা? পাতিবিজোড়? পাতিবাহুর? বড্ডো—কী?

এই আর কী! বাবার অস্বস্তি সহাস্যে ক্ষমা করল শাস্ত্রী—দেখছ না, কী রকম ঘেঁষাঘেঁষি। আর বাচ্চাগুলো কী রকম নোংরা হয়ে ঘুরে বেড়ায়! জানলার তাকে পা ঝুলিয়ে বসে স্বাতী একটা কাঁচা পেয়ারা চিবিয়ে খাচ্ছিল। হঠাৎ কথাটা কানে যেতেই বলে উঠল—ঘেঁষাঘেঁষি! বলো কী ছোড়দি! এদিকটা কী রকম খোলা মাঠ, গাছপালা, আর কতখানি আকাশ! বাব্বাঃ! যতীন দাস রোডের কথা ভাবতে হাঁপ ধরে এখন! শাস্ত্রী হেসে উঠল তার ভঙ্গি দেখে। বলল—দোতলা করলে না কেন, বাবা?

সবটাই আমি করে ফেলব? বিজুর জন্য কিছু বাকি থাক!

দোতলা দিয়ে হবেই বা কী? এই বেশ। ঠিক যেটুকু দরকার সেটুকু। বেশি-বেশি আমার ভাল লাগে না!—একহাতে জানালার শিক ধরে স্বাতী পা দোলাতে লাগল। তক্ষুনি আবার জুড়ে দিল—একতলাই সবচেয়ে ভালো লাগে আমার। বাইরেটা খুব কাছে হয় একতলা হলে। কেমন সুন্দর বাগান করি দ্যাখো না! ছোটো একতলা বাড়ির মতো সুন্দর নাকি আর কিছু? প্রতিপক্ষকে আর কিছু বলবার সুযোগই দিল না স্বাতী। নিজেই জজ হয়ে নিজের পক্ষে রায় দিল, আর নিশ্চিত হয়ে পেয়ারায় কামড় বসাল তারপর।

কিন্তু প্রতিপক্ষ ছাড়ল না, পরে নিরিবিলা ঘরে আবার তর্ক তুলল—আচ্ছা স্বাতী, তুই কেন ভাবিস যে তোর যা ভাল লাগে, সকলেরই তা-ই?

বা-রে! তাই বলে আমার ভাল লাগাটা বলতেও পারব না আমি?

তোর ভাবখানা এইরকম যেন তোর ইচ্ছেমতোই চলবে জগৎ-সংসার।

জগৎ-সংসার তো না, শুধু দু-একজন—

দুই আর কেন, শাস্ত্রী বাধা দিল কথায়—ওরকম মানুষ একজনের বেশি তো হতে পারে না, আর হলেও বিপদ।

মানে?

ন্যাকা! এদিকে নভেল পড়ে পেকে ঢোল!

স্বাতী সত্যিই বোঝেনি কথাটা, বুঝল ছোড়দির ঠোঁটের বাঁক হাসি দেখে। হাসির উত্তরে একটু বেশি গভীর হয়ে বলল—তা এই বাড়ির কথা নিয়ে ঝগড়া কর কেন, এ বাড়িতে তুমি তো আর থাকবে না বেশিদিন!

তুই-ই যেন থাকবি!

নিশ্চয়ই! কথাটা ঠেলে উঠল ভিতর থেকে, কিন্তু আসতে-আসতে যেন জোর কমে গেল, শেষ পর্যন্ত পৌঁছলই না। একটু চুপ করে থেকে কী একটা অন্য কথা বলতে গেল—ছোড়দি, শোনো—।

চুপ কর এখন—বলে শাস্ত্রী টেবিল থেকে একখানা বই তুলে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

শোনো না—স্বাতীর স্বর ব্যাকুল। না!—শাম্ভতী বই খুলল চোখের সামনে। শোনো একটু! প্রায় কান্নার সুরে স্বাতী প্রার্থনা জানাল—মারকস-এর বই এক্ষুনি না পড়লে চলবে না তোমার? মারকস না রে, মার্ক্স—শাম্ভতী হেসে শুধরে দিল—দেখি একটু পাতা-টাতা উন্টিয়ে, হারীতবাবু আবার তো আসবেন সন্ধ্যাবেলা। অবাক হল স্বাতী। যে কথাটা বলবার জন্য ছটফট করছিল, সেটা ভুলে গেল। তাতে কী?—খুবই ন্যায়সঙ্গত প্রশ্ন তার।

হারীতবাবুই দিয়েছেন কিনা বইটা।

আজই বুঝি ফেরত দিতে হবে? তা আর-কদিন রাখতে দেবে না বললে?

এ-সব তো আর সত্যি পড়বার বই নয়! শাম্ভতী মুখ টিপে হাসল।—দেখে রাখি একটু এলে বলতে হবে তো দু-একটা কথা।

এমন একটা তাজ্জব কথা স্বাতী তার পনেরো বছরের জীবনে শোনেনি। না-পড়েও ভান করতে হবে অন্যের কাছে? কেন? ভাল না লাগে না-পড়লেই হয়, মুশকিল আর কী! চোখ-ভরা প্রশ্ন নিয়ে ছোড়দির দিকে সে তাকাল, কিন্তু ছোড়দির মুখ আড়াল করেছে দুখানা হলদের উপর কালোতে ছাপা মলাট। শাম্ভতী উঠল খনিক পরেই। টেবিলে সারে দাঁড়ানো পাঠ্য-বইয়ের মাথায় অপাঠ্য বইখানাকে সযত্নে শুইয়ে রেখে চলে গেল গা ধুতে। ছোড়দির ব্যস্ত ভাব দেখে ইঠাং মনটা খারাপ হয়ে গেল স্বাতীর। টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে বইখানা তুলে নিয়ে আস্তে-আস্তে পাতা ওন্টাতে লাগল। কেমন ভয় হল তার, বুক টিপটিপ করতে লাগল, কখন কোন পাতার ফাঁক থেকে আবার ঝিলিক দেয় নীল রঙের খাম। কতক্ষণে সব পাতা ওন্টাবে... বইখানা উপুড় করে জোর ঝাঁকানি দিল কয়েকবার। না কিছু নেই। ঠিক জায়গায় আবার শুইয়ে রাখল মার্ক্সকে, কী ভালমানুষের মতোই শুয়ে আছে বইখানা, কিন্তু, কিন্তু...কিন্তু—কী?

মাথায় তোয়ালে চেপে ঘরে আসতে-আসতে শাম্ভতী বলল—তুই যা এবার।

পরে যাব।

এই তোর এক বদভ্যাস, স্বাতী। তোয়ালে নামিয়ে শাম্ভতী চিরুনি হাতে নিল—অন্তত বিকেলে তো একটু ফিটফাট হতে হয়?

আমি সারাদিনই ফিটফাট—স্বাতী ধূপ করে শুয়ে পড়ল খাটে।

গুলি যে?

শুই না!

যত অসময়ে!—কালো চুলে সাদা-সাদা আঙুল দ্রুত ওঠাপড়া করতে লাগল শাম্ভতীর। আচ্ছা ছোড়দি, দু-আঙুলে কপালের চামড়া একটু টেনে ধরে স্বাতী বলল—শুভবাবুর খবর কী? কী অদ্ভুত! আমি কী করে জানব?

আমাদের এ বাড়িতে একদিনও আসেননি—না?

ও বাড়িতেও আর আসত কই শিগগির। খেটে-খেটেই ফুরসৎ নেই? ঐ ফিতেটা দে তো। বড়ো যে দরদ দেখছি তার জন্য। দু-চক্ষে দেখতে পারতিস না তো!

আমার ইচ্ছায় তো জগৎ চলে না—স্বাতী পাশ ফিরে একটি হাত রাখল শালের তলায়।—আমি দেখতে না পারলেই তো মন্দ হয়ে যায় না মানুষ। জবাব না দিয়ে শাম্ভতী হেজেলিন-স্লোর মুখ খুলল। হলদে আর কালো মলাটের সেই শোওয়ানো বইটার উপর আবার চোখ পড়ল স্বাতীর।

ছোড়দি, মার্ক্স কী?

মার্জ—মার্জ একজন মানুষ।

তার লেখা বই?

তার—তার বিষয়ে।

বিষয়ে মানে?

মানে—শাস্ত্রীর পাউডার-প্যাডটা থেমে গেল মুখের উপর, এই আর কী। ইনক্সা আনন-রেণু মুখে বুলোতে-বুলোতে সে কথা শেষ করল—জানতে চাস তো হারীতবাবুকে জিক্সেস করিস।

তিনি জানেন বুঝি এ-সব?

জানেন না! কত বড়ো বিদ্বান! লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের পাশ করা! শাস্ত্রী সরে এসে একখানা শাড়ি পরতে লাগল যার রং ঠিক কালোজামের ভিতরটার মতো।

ওঁর কাছে ইকনমিক্স পড়ো বুঝি তুমি?

যাঃ!

যাঃ কেন? পড়লেই পার, প্রায়ই তো আসেন।

কী অদ্ভুত! প্রায়ই আসেন কখন? শাস্ত্রী কোঁচার মতো করে কোমরে গুঁজল শাড়ি। তারপর পিঠের উপর দিয়ে আঁচলটা ঘুরিয়ে আনতে-আনতে বলল—কী ওঁদের সভা-টভা সব হয়—তারই খবর দিয়ে যান মাঝে-মাঝে। তোকে বলি না কতবার যেতো। যাস না তো কখনো? কী হয় সভায়?

কত রকম হয়! গান, বঙ্কতা, তর্কাতর্কি—

বাজে! স্বাতী ঠোট বাঁকাল।

বাজে কী রে? হারীতবাবু চমৎকার বলেন—কত শিক্ষা হয় ওঁর কথা শুনলে। শাড়িটাকে এখানে কুঁচকে, ওখানে একটু টান করে দিতে-দিতে শাস্ত্রী আর একবার আয়নার সামনে দাঁড়াল। স্বাতী তার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বলল—দিদি, তোমার ঐ চৌকো বাজের পাউডারটা কিন্তু বিস্ত্রী।

বিস্ত্রী? শাস্ত্রী হেসে উঠল।

বড্ডো কটকটে।

ফেস-পাউডার কিনা। স্বাতীর কথা উড়িয়ে দিল শাস্ত্রী। কিন্তু আয়নায় সূক্ষ্ম চোখে একটু তাকিয়েও দেখল। খুব কি উগ্র হয়েছে? না, ঠিকই। তবু আর একবার পাউডার-প্যাড হাতে নিয়ে বলল, কে একজন লেখক না তাঁর ফ্যাশনেবল নায়িকার মুখে কিউটিকুরা পাউডার মাখিয়েছিলেন? কী বুদ্ধি!

কেন? আর একবার তাজ্জব বনল স্বাতী।

কিউটিকুরা বুঝি মুখে মাখে?

মাখে না? প্রতিবাদের বেগে স্বাতী উঠে বসল একেবারে—আমি তো মাখি। তুমিও তো মেখেছ কত। কথাটা যেন শুনতেই পায়নি, এমনিভাবে শাস্ত্রী বলল—সেদিন ঐ লেখককে নিয়ে কী ঠাট্টা অগ্রণী সংঘে! সবশেষে হারীতবাবু তুললেন ঐ পাউডারের কথাটা—।

তাঁর কাছে অনেক রকম শিক্ষাই তো হয় তাহলে—স্বাতী যেন অভিভূত হয়ে পড়ল হারীতবাবুর জ্ঞানের পরিধিতে। বোনকে নরম হতে দেখে শাস্ত্রী সুখী হয়ে বলল—তুই দেখিস এটা মেখে।

কত ভালো, তুলনা হয় না।

তা তুমি যা-ই বল, কিউটিকুরার মতো গন্ধ নয় আর কিছুই—বলতে বলতে স্বাতী উঠে দাঁড়াল।

হারীত যখন এল, তার একটু আগে রাজেনবাবু ফিরেছেন আপিশ থেকে। আর স্বাতী ছোটো পটে করে তাঁর চা নিয়ে এসেছে বসবার ঘরে। বাবার চা ঢেলে দিয়ে স্বাতী হেসে বলল—
আমি একটু চা খাই, বাবা?

রোজ-রোজ আর অনুমতি চাওয়া কেন?

তবে রোজ খাব, কেমন বাবা? এখন তো বড়োই হয়েছি—না? বাবার গলা একটুখানি জড়িয়ে ধরেই স্বাতী সরে এল চায়ের কাছে। তুমি একটু খাবে, ছোড়দি? একটু দূরে জানলার কাছে ইজিচেয়ারে শাশ্বতী সেজে-ওজে বসে ছিল সেই হলদে-কালো মলাটের বইটা চোখের সামনে খুলে। সংক্ষেপে জবাব দিল—না। চামচে দিয়ে চা খেতে-খেতে স্বাতী বলল—ঈশ কী ভালো হয়েছে চা-টা, চমৎকার!

স্বাতী, তোর চামচে দিয়ে চা খাওয়াটা ছাড় তো! ছুটে এল সুশিক্ষিত শাশ্বতীর মন্তব্য।

কেন, কী হয়?

কেউ খায় না।

খায় না আবার! অনেককে আমি দেখেছি—

তারা সব ক্যাবলা!

চামচে দিয়ে যারা খায় না, তারা বুঝি কেউ ক্যাবলা না? মুখে ও-কথা বলে স্বাতী চামচে রেখে দু-আঙুলে পেয়ালা তুলল বয়স্ক ধরনে। তারপরেই—নাঃ, চামচে দিয়েই ভাল! বলে তাকাল ছোড়দির দিকে। কিন্তু শাশ্বতী হঠাৎ কেমন-একটু চঞ্চল হয়ে উঠে গভীরভাবে চোখ ডোবাল বইয়ে। বাইরে জুতোর শব্দ হল, আর মৃদু কিন্তু স্পষ্ট তিনটি বিলিতি টোকা পড়ল দরজায়। রাজেনবাবু বললেন—দ্যাখ-তো কে। কিন্তু স্বাতী বসে-বসেই বলল—আসুন। পরদা ঠেলে হারীত ঘরে এল। টিলেঢালা রকমের একটা পাতলুন পরা, আর গলা-খোলা শাট। ঢুকেই রাজেনবাবুকে দেখে দু-হাত তুলে অভিবাদন জানিয়ে বলল—এই যে, ভাল?

স্বাতী, চা—রাজেনবাবুর ব্যস্ত ভাব।

না না, আমি চা না, এইমাত্র—হারীত একটু ঝুঁকে স্বাতীর দিকে তাকাল—এসে অসুবিধে করলুম কি? ভাবখানা এইরকম যেন ঘরের তিনজনের মধ্যে স্বাতীই প্রধান। স্বাতী হেসে ফিলল। কী-রকম জোর দিয়ে-দিয়ে কথা বলেন ভদ্রলোক, 'চা'-কে বলেন 'চা', 'এসো' কে 'এশ-শে'। অসুবিধে কী, একটু থামল স্বাতী, আবার বলল—বসুন। স্বাতীর অনুরোধ উপেক্ষা করল না হারীত। কয়েক পা হেঁটে গিয়ে শাশ্বতীর পাশের চেয়ারটিতে বসল—কী, পড়লেন?

সবটা হয়নি—চোখ আনত শাশ্বতীর, কণ্ঠ ক্ষীণ।

হাঁটুতে হাঁটু তুলে টিপে-টিপে পাইপে তামাক ভরতে-ভরতে হারীত বলল—বিষয়টা শক্ত। তবে এ ছাড়া তো আর বিষয় নেই আজকাল। আমরা অবশ্য দিব্যি খেয়ে-দেয়ে তাঁদের বিষয়ে পদ্য লিখে দিন কাটাচ্ছি। এদিকে একটা বড়োরকমের লড়াই—পাইপ মুখে তুলে সে কথাটা শেষ করল—বাধল বলে। সেজন্য এখন থেকেই—দেশলাই জ্বালতে গিয়ে হঠাৎ থেমে, পাইপটা মুখ থেকে হাতে নামিয়ে গেঞ্জি-পরা বাবাটির দিকে তাকিয়ে বলল—I am sorry.

না, না, তাতে কী! আমি বরং—রাজেনবাবু উঠতে গেলেন।

আপনি বসুন—দেবতার বরদানের মতো হাতটি উঁচু করল হারীত—এতে অবশ্য কিছু নেই, তবে আমাদের দেশে একটা নিয়ম যখন আছে, আমি বরং বাইরে একটু পাইচারি...। স্বদেশের

প্রথাকে প্রতি পদক্ষেপে সম্মানিত করে হারীত পাইপ হাতে বেরিয়ে গেল।

* * * * *

একটু পরে চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে রাজেনবাবু আঙু-আঙু উঠে ভিতরে এলেন। শাশ্বতী বসে বসে কয়েকটা আঁকাবাঁকা ভঙ্গি করল শরীরের, আর বসেই রইল। স্বাতী এল বাবার সঙ্গে-সঙ্গে—একটু বেড়াতে যাবে, বাবা?

চল। রাজেনবাবু তক্ষুনি রাজী।

চলো, ঐ মাঠটায় হাঁটি একটু।

বেশ। দু-মিনিটে তৈরি হয়ে এল স্বাতী—বাবা। শুয়ে পড়লে? যাবে না—হঠাৎ খেমে বাবার মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে স্বাতী বলল—থাক বাবা, না গেলাম।

কেন রে? চল আমি এমনিই শুয়েছিলাম একটু—

স্বাতী শিয়রে বসে বলল—না বাবা, তুমি শোও, আমি তোমার পাকা চুল বাছি।

আর কি বাছবার সময় আছে?

ইশ, কটাই বা চুল পেকেছে তোমার, তাই নিয়ে এত জাঁক? হাত দিয়ে চুল সরাতে-সরাতে তক্ষুনি আবার বলল—উঃ! কত! সঙ্গে সঙ্গে—পট!

লাগে!—রাজেনবাবু নড়ে উঠলেন।

কী ছেলেমানুষের মতো কর! চুপ করে শোও না! বাবার মাথাটি স্বাতী ঘুরিয়ে নিল নিজের ইচ্ছেমতো। চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে বলল—সুন্দর চুল তোমার, বাবা!

হবেই! স্বাতীর বাবা তো আমি—আবছা শোনাল বাবার গলা। বাবার যখন একটা চুলও পাকেনি, কেমন ছিলেন দেখতে? সে যেন বাবাকে একরকমই দেখেছে বরাবর, মনে হয় এ-রকম ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না কখনো। কিন্তু সত্যি-তো আর তা-ই নয়। পুরোনো দু-একটা ছবি আছে বাবার। এতই অন্যরকম যে, দেখলে হাসি পায়। কিন্তু যখনকার ছবি তখন তো ঠিকই ছিল! বাবা—স্বাতী ডাকল—ও বাবা! ভারি নিশ্বাসের শব্দ শুনল উত্তরে। ও মা! ঘুমিয়ে পড়লে! কেমন অবাক লাগল স্বাতীর, বাবাকে এই সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়তে দেখে। নড়ল না, চুপ করে বসে রইল সেখানেই, আলো কমে-কমে রাত নামল ঘরে...বাইরে থেকে হঠাৎ ভেসে এল হাসির শব্দ, সরু মোটা গলায় মেশানো।

* * * * *

সন্ধ্যার পর স্কুলের পড়া নিয়ে বসে স্বাতী বলে উঠল—ছোড়দি, হারীতবাবুর বইটা!

বইটা—কী?

ফিরিয়ে দিলেই পারতে, পড়বে-তো আর না—

তোর তাতে কী! ঝামটা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে শাশ্বতী ভাবতে লাগল, হারীত যে বলে গেল রোববার বিকেলে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে যেতে, সেটা কেমন করে সম্ভব হবে।

পরের দিনও এই কথাই ভাবছিল সে। দুপুরবেলা বই হাতে পাড়ার দুটি সহপাঠিনীর সঙ্গে কলেজের উল্টোদিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। অগ্রণী সজ্জের যে কটি সভায় সে গিয়েছে, সবই রাসবিহারী এভিনিউর এক বড়োলোকের বাড়িতে। একা যাওয়া-আসা করা গেছে সহজেই। কিন্তু কলেজ স্কোয়ার! এদিকে হারীতের কাছে প্রকাশ করেনি তার এই অসুবিধের কথাটা।

কী ভাববে সে! কত মেয়ে আজকাল একলা টহল দেয় সারা শহর, আর সে বৃষ্টি—।

উঠে পড়ুন—ছোটো ছাইরঙের একটি গাড়ি এসে থামল ঠিক তার সামনে। উঠে পড়ুন—

হাত নেড়ে আবার ডান্স হারীত।

আপনি.

আসুন, হারীত হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিল। শাশ্বতীর চেহারাটা হল মূর্তিমতী দ্বিধা। আমতা-আমতা করে বলল—না, আমি ট্রামেই। পাশের মেয়েটি কানে-কানে বলল—কে রে?

হারীত গলা বাড়িয়ে বলল—ও, বন্ধুদের জন্যে বুঝি? তা সকলকে তুলে নিতে পারলে আমি তো সুখী হতাম খুব। কিন্তু দেখছেন তো একজনের বেশি... অতএব আপনারা অনুমতি করলে—একটু হেসে সে অন্য মেয়ে দুটির দিকে তাকাল। যা—পাশের মেয়েটি আস্তে একটু ঠেলে দিল শাশ্বতীকে—দয়া-মায়াও নেই তোরা?

ঐ যে ট্রাম—বলে এগিয়ে গেল অন্য মেয়েটি। ট্রাম চলে গেল বন্ধু দু-জনকে নিয়ে। কেমন একটা ট্রেন-ফেল-করা চেহারা করে শাশ্বতী দাঁড়িয়ে রইল সাড়ে-দশটা বেলার বড়ো রাস্তার ব্যস্ততার মধ্যে। হারীত বলল—আর ভাবছেন কী? শাশ্বতী গম্ভীর হয়ে বলল—অনেক ধন্যবাদ মিস্টার নন্দী, কিন্তু—।

ও-হ! ডোন্ট বি সিলি! এমন একটা অসহিষ্ণু অথচ সকৌতুক মুখভঙ্গি হল হারীতের, যে শাশ্বতী আর দেরি না করে গাড়িতে উঠে পড়ল। গাড়ি বেকল ডান দিকে হাজরা রোড ধরে।

এ কী! শাশ্বতী দরজা ধরে চেষ্টা করে উঠল—এদিকে না! হারীত কোনো জবাব না দিয়ে গাড়িটিকে আস্তে দাঁড় করাল একটি পেট্রল-পাম্পে। স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল শাশ্বতীর, মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—ও!

পকেট থেকে পাইপ বের করল হারীত। গাড়ির গায়ে ঠুকে ঠুকে পোড়া তামাক ফেলে দিল। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলল—আপনি ভেবেছিলেন আমি আপনাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি? আগুনের রঙ ছড়িয়ে পড়ল শাশ্বতীর কুমারী মুখে। দৃশ্যটা উপভোগ করতে-করতে হারীত আবার বলল—আর সে রকম কোনো দূরভিসন্ধি যদি আমার থাকেই, আপনি ভয় পাবেন কেন? নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন না? শাশ্বতী মুখ ফিরিয়ে দেখতে লাগল কাচের স্তম্ভে ফিকে-সোনালি পেট্রলের বুড়বুড়ি-তোলা নেমে আসা। একটু পরে গাড়ি চলল রসা ষোড়শ ধরে বরাবর দক্ষিণে। জ্বলজ্বলে রোদ, ট্রাম-বাস ভরতি, প্রত্যেকটি বাড়িফেরা ট্রামে তার কলেজের মেয়েরা। কী অস্বস্তি! মনে হচ্ছে অপরাধ করলাম—চিবিয়ে-চিবিয়ে হারীত বলল।

গাড়িটা বেশ তো—এতক্ষণে শাশ্বতী কিছু বলবার কথা খুঁজে পেল।
আমার এক বন্ধুর গাড়ি, আমি ব্যবহার করি। বড্ডো ছোটো, অসুবিধে হচ্ছে?
হলেই বা কী করা!

বইগুলো অন্তত কোল থেকে নামাতে পারেন।

থাক। রাসবিহারী এভিনিউর মোড় পার হতে হতে হারীত বলল—নাঃ, আপনাকে কষ্ট দিলাম, কিন্তু আমি তো আর আপনার সুখের জন্য আপনাকে আসতে বলিনি।

তবে?

আমার সুখের জন্য—নিশ্চয়ই!

শাশ্বতী মুখ নিচু করল।

রোববার আসছেন তো?

দেখি।

দেখি আবার কেন?

এত দূর—

দূর? দূর আবার কী! আসতেই হবে আপনাকে। শাম্ভতী এক হাতে কপালের চুল সবাল। তার ঈষৎ নোওয়ানো আধখানা মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটা নতুন কথা ঝিলিক দিল হারীতের মনে—আচ্ছা ভাববেন না, আমি যাবার সময় তুলে নেব আপনাকে।

না, না!

এতে আঁৎকাবার কী আছে?

মিছিমিছি অসুবিধে—

অন্তত ট্রাম-বাম্প-এর চেয়ে বেশি অসুবিধে না—

সে কথা না—

তবে আবার কী! ছ-টায় তৈরি থাকবেন, আমাকে যেতে হবে একটু আগেই।

না, সত্যি দেখুন—

সত্যি দেখুন! মুখে-মুখে ঠাট্টা করে উঠল হারীত। শাম্ভতী হেসে ফেলল।

বড়ো রাস্তায় গাড়ি থেকে নেমে শাম্ভতী গলিটুকু হেঁটে এল। কেন, বাড়ি পর্যন্ত গাড়িতে এলে কী হত? সত্যি, কী বিস্ত্রী আমার মনের এই—! বাজে সব! মানে হয় না কোনো, রোববার যাব হারীতের সঙ্গে গাড়িতে—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!

* * *

কিন্তু হল না। রাজেনবাবু বললেন—তুই একা ওর সঙ্গে যাবি কী রে?

গেলোঁ কী হয়?

হবে আবার কী—এ রকম যায় না। তুই ওকে ‘না’ বলে আয়।

না! যে-বাবার মুখে কোনোদিন কোনো ‘না’ শোনেনি সে-বাবার মুখে ‘না’! যেখানে গেলে নানা বিষয়ে শিক্ষা হয়, সেখানেও নিজের ইচ্ছেমত যেতে পারবে না, এত পরাধীন সে! আর এতদিন ধরে সে ভেবে এসেছে তার বাবা অন্য বাবাদের মতো নয়—! মাথা ঝেঁকি বলে উঠল—আমি পারব না কিছু বলতে।

আমিই বলে আসি তবে।

না, না!—কিন্তু ততক্ষণে রাজেনবাবু অন্তর্হিত। একটু পরে ঢাকাই জামদানি পরা শাম্ভতী গুনল ছোটো গাড়িটির চলে যাওয়ার শব্দ। ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে রাজেনবাবু বললেন—কী রে, তোর মন খারাপ হল নাকি খুব?

কী বললে তুমি হারীতবাবুকে?

বললাম, শাম্ভতী আজ যাবে না।

এই বললে তুমি! শাম্ভতী আঁত ভঙ্গিতে হাত তুলল।

কী বলব তবে?

বলতে পারলে না অসুখ করেছে?

কেন, অসুখ করেছে নাকি তোর? রাগে শাম্ভতীর ইচ্ছে করল গায়ের জামা-কাপড় টেনে ছিঁড়তে। ছি-ছি, এর পরে কী করে মুখ দেখাবে সে? আর বাবা কী-রকম মানুষ, দিব্যি বলে এলেন সে যাবে না! অপমান করলেন একজন উঁচু দরের মানুষকে! আর কি সে আসবে? না, আসবে তো না-ই, তার উপর কী ভেবে গেল তাকে! কী বিস্ত্রী, কী-রকম একটা জড়ভরত ভূত! যদি

কোনোরকমে আজকের সভাটায় সে যেতে পারত, তাহলে...তাহলে অন্তত বুঝিয়ে বলতে পারত—

তা এতই যদি তোর যাবার ইচ্ছে—ঠিক তার মনের কথাটাই বাবার মুখে শুনতে পেল শাস্বতী—বিজুকে নিয়ে বাস-এ চলে যা। কিন্তু বিজু রাজি হল না। শার্টের কলারটা উঁচু করে তুলে দিয়ে সে তখন বেরোচ্ছে আড্ডা দিতে।—বস্তুত নাকি? সর্বনাশ! আমি ওর মধ্যে নেই। একদিন না-হয় গেলি একটু ছোড়দিকে নিয়ে—রাজেনবাবু অনুরোধ জানালেন।—আমি না!—ভুরিতে নিষ্কাশ্ত হল বিজু। তখন রাজেনবাবু বললেন—তাহলে চল আমিই—। বাবার সঙ্গে? তা হোক, তবু তো যাওয়া হবে। শাস্বতী উঠল তার বিপর্যস্ত প্রসাধনের গেরামত করতে। রাজেনবাবু ডাকলেন—স্বাতী, যাবি নাকি?

কোথায়, বাবা? স্বাতী ছুটে এল পাশের ঘর থেকে।

তোর ছোড়দিকে নিয়ে মিটিং-এ যাচ্ছি—

তুমি কেন?

যাই। একটু বেড়ানোও হবে আমার।

না, তুমি যাবে না।...হাসছ কী? একটাই রোববার। এখন আবার বাস-এর ঝাঁকানি খেতে খেতে কলেজ স্কোয়ার—পাগল?

রোববারটা এমনই বসে-বসে—

বসে-বসে না আরো-কিছু! কেন, দাদা যেতে পারে না?

তার সময় হয় না।

যত সময় বুঝি তোমার? এমন রাগ হয় সত্যি—!

ঘরে এল ব্যাগধারিণী শাস্বতী।

ছোড়দি, বাবা কিন্তু যাবেন না। তাকে দেখামাত্র স্বাতীর ঘোষণা। শাস্বতী থমকে দাঁড়াল ঘরের মধ্যে।

—যাই না! রাজেনবাবু দেখলেন শাস্বতীর মুখে মেঘ আর স্বাতীর চোখে বিদ্যুৎ। অসহায়তাবে বললেন— যাই কেমন? তুইও চল।

ছোড়দি, তুমি কেমন? স্বাতী দাঁড়াল কেনের মুখোমুখি—বাবাকে আবার টেনে নিয়ে যাচ্ছ—।

আহা, ও-তো কিছু বলেনি—

স্বাতী!—শাস্বতী গর্জন করে উঠল—তুই এ বাড়ির কর্তা হলি করে থেকে?

ককখনো না!—স্বাতীও গলা চড়াল—ককখনো তুমি যাবে না বাবা—আমি বারণ করছি! চাইনে, চাইনে যেতে—এ বাড়িতেই আর থাকব না আমি!—স্বাতী ছুটে গিয়ে জানালার শিক ধরে ফৌপাতে লাগল।

*

*

*

মধ্যে হল না মুখের কথা, একটি মাসও কাটল না এরপর, হারীত বিয়ের প্রস্তাব জানাল। সেদিনও রবিবার। বাজার নিয়ে এসে রাজেনবাবু বাইরের ঘরে বসে কাগজ পড়ছেন, হারীত ঢুকল গটগট করে। সেদিন তার পোশাকটা—বোধহয় আইনত শীতঋতু আরম্ভ হয়েছে বলেই—একটু আঁটসাঁট। পাংলুনে কড়া ইন্ট্রি, নেকটাইটি পরিষ্কার। শরীরের একটা কুণ্ঠিত ভঙ্গি দিয়ে রাজেনবাবু অভ্যর্থনা জানালেন।—বসুন। বলে কাগজের পাতাগুলি গুছিয়ে নিয়ে তিনি উঠতে যাচ্ছিলেন, হারীত বলল—আপনি উঠবেন না, আপনার সঙ্গেই আমার কথা। রাজেনবাবু শান্ত

চোখে যুবকের মুখের দিকে তাকালেন।—কথাটা হচ্ছে—হারীত চেয়ারে পিঠ ঝাড়া করে হাতলে দুটো টোকা দিল—আমি শাস্ত্রীকে বিয়ে করতে চাই। আপনি নিশ্চয়ই বুঝেছেন যে শাস্ত্রীরও এ-ই ইচ্ছে, এখন আপনার মত হলেই হয়ে যায়।

‘শাস্ত্রী’—নামটা হারীতের মুখে একটুও মধুর শুনলেন না রাজেনবাবু। কেন—যে এই ছেলেটিকে ভালো লাগে না! খারাপ তো কিছু নয়—ভালো ছেলে! শিক্ষিত, বিলেত-ফেরৎও, উৎসাহী, বুদ্ধিমান। তবু—ওর চাল-চলন, হাব-ভাব, কথা বলার ধরন—সব যেন...। অন্য তিন জামাই এসে দাঁড়াল চোখের সামনে...দিলখোলা ফুটিবাজ জামাই প্রমথেশ, একটু রাগী হেমাস... কিন্তু চাপা ঠোঁটের কম কথায় বেশি বুদ্ধির মানুষ, উশাকোখুশকো চুলে দিশেহারা অরুণ; তাদের পাশে এই—এই—কী? কী জানি! আজকালকার ভালো-ভালো ছেলেরা বুঝি এইরকমই, আমি পুরোনো লোক আমার চোখের দোষ। কন্যাপক্ষকে নীরব দেখে পাণিপ্রার্থী আরো বলল—আমার সম্বন্ধে কিছু খবর আপনাকে জানাবার আছে, চাকরি করি ইনশিওরেন্স আপিশে। এখন পাচ্ছি তিনশো, প্রসপেক্ট আছে। বাবা উকিল—আইনের বই-টাই লেখেন, থাকেন ভবানীপুরে ঠাকুরদার আমলের বাড়িতে, দুই কাকাও সেখানে—আমি সম্প্রতি আলাদা ফ্ল্যাট নিয়েছি রাসবিহারী এভিনিউয়ে।

—কেন? একটুও দেরি না করে—আপনার মেয়েরই সুখের জন্য—জবাব দিল হারীত। চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল—তাহলে আপনি কী বলেন?

—তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলবো।

—নিশ্চয়ই, ও-সব ফর্মালিটি তো আছেই। তবে এবিষয়ে বাবার যখন আলাদা কোনো মত নেই, আপনি আমার সঙ্গে—হারীত উত্তরের জন্য রাজেনবাবুর মুখের দিকে তাকাল, উত্তর না পেয়ে উঠে দাঁড়াল।—আচ্ছা, চলি। কাল আবার আসবো এই সময়ে। দরজার দিকে যেতে যেতে একটু থামলো রাজেনবাবুর সামনে, গলা নিচু করে চোখে কেমন একটা উদাস ভাব এনে বলল—একটা কথা বলি, এ বিয়ে হবেই, আশা করি মিছিমিছি একটা গোলযোগ...। দেখি।

হারীত চলে যাবার পর রাজেনবাবু তেমনি বসে রইলেন চেয়ারটিতে। কী দোষ? হারীতের কী দোষ? কেন মনে হচ্ছে না চমৎকার, কেন সুখী হতে পারছেন না—কেন তার মুখে দেখতে পাচ্ছেন না প্রমথেশের ভালোমানুষি, হেমাসের ধার, অরুণের লাবণ্য? কেন ওদের পাশে বসাতে গিয়েই মন কুঁকড়ে ফিরে আসছে? কিন্তু মেয়ে তাকে পছন্দ করেছে, মেয়ে সুখী হবে, আমি কে? কিছুই কি নই? আমার না ওরা? না। ফল কি গাছের? মুকুল গাছের, ফুল গাছের, ফল পৃথিবীর। যে মুহূর্তে পাকলো সেই মুহূর্তে দিতে হবে পৃথিবীকে, না দিলে ফল পচবে, গাছ মরবে।...যদি পড়ে পোড়া জমিতে, জোলো জমিতে, মরুভূমিতে?... কে জানে, কেউ কি বলতে পারে? কাকে জিগেস করবেন? কার সঙ্গে কথা বলবেন আজ? বিছানায় শুয়ে, অত কষ্ট পেয়ে, রোগে ধুঁকতে-ধুঁকতে, তবু-তো সে ছিল! গেল কোথায়?...তবে কি সত্যি চলে গেল, আর দেখবো না, তার মেয়ের বিয়েতেও দেখতে পাবো না একবার?

বাবা!—এইমাত্র স্নান করেছে স্বাতী, পরেছে লাল পাড়ের সাদা একটি শাড়ি, ভিজ়ে চুল মেলে দিয়েছে পিঠে। তাকিয়ে রাজেনবাবু কথা বলতে পারলেন না। বলবার কিছু নেই, বললেও কেউ শুনবে না। দিতে হবে, আমাকেও দিতে হবে, আমার কাছেও পৃথিবীর পাওনা ছিল তিনটি, চারটি, পাঁচটি কন্যা।

—বাবা, তুমি যেন বড়ো চিন্তিত?

—শোন স্বাতী, তোকে একটা কথা বলি—

—কী, বাবা?

—আচ্ছা, হারীতের সঙ্গে তোর ছোড়ির বিয়ে হলে কেমন হয় রে?

—ভালো-তো!

—ভালো? তোর ভালো লাগে হারীতকে?

—আমার? স্বাতী আর-কিছু বলল না। রাজেনবাবু জিগেস করলেন—শাস্বতী বেশ সুখী হবে, তোর মনে হয়?

—কেন হবে না? বলে স্বাতী ঘুরে দাঁড়ালো, একটু-যেন লাজুক ধরনে। চোখে লাগল লাল পাড়ের ঝলকানি। এরকম তো হয়েছিল! আগে একবার... হঠাৎ মনে হল রাজেনবাবুর, ঠিক এরকম, এমন এক অঘ্রানের সকালে...ঠিক এই মুহূর্তটি, এই ঘর-আলো-করা লাল পাড়, ভিজে চুলের গন্ধ, ঘুরে দাঁড়ানোর চমক—কবে? কবে? সে কি এ জন্মে, সে কি আর-এক জন্মে? সে কি এই জগতে? না আর-এক জগতে? সে কি আমি? সে কি সত্যি আমি? সে আর-একটি পনেরো বছরের মেয়ে, তাকে মনে পড়ে না? আমাকে আর মনে পড়ে না? আমাকে আর মনে পড়ে না তোমার?—ছোড়িকে ডাকব, বাবা? স্বাতী নিচু হয়ে খুতনি রাখলো বাবার কাঁধে। মাথা সরিয়ে নিলেন রাজেনবাবু, দুই চোখ ভরে দেখতে লাগলেন, যেন স্বাতীকে আগে দ্যাখেননি। সেই কোঁকড়া-কালো মাথাটা, যত মুখ জীবনে দেখেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর মুখ। সে-মুখ তো নেই আর! যে-মুখে শুধু আনন্দ ছিল, শুধু অমৃত, সে-মুখে কেন আশঙ্কা, কেন অশান্তি? কী-যেন লুকোনো আছে, সেই লুকোনোকে তার ভয়। চোখ এমন বড়ো-বড়ো ছিল না তার, এমন বাঁকাও ছিল না। কখনো এমন আশ্চর্য লাগেনি তার মুখ, এত আশ্চর্য যে অচেনা...যদিও চারটি মেয়েকে এর আগে বড়ো হতে দেখেছেন, তবু রাজেনবাবু যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না যে এ তাঁরই কন্যা।

—কিছু বলছো না যে? আবার প্রশ্ন স্বাতীর।—আচ্ছা, বলে রাজেনবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, আর সেদিন থেকেই লেগে গেলেন টাকা যোগাড়ের চেষ্টায়। তারিখ পড়ল অঘ্রানেরই পক্ষে। দেখতে-দেখতে পাড়ায় ছড়াল বিয়েবাড়ির শোর।

* * *

যাকে বলে বিয়েবাড়ি! ভিড়, হৈ-চৈ, অফুরন্ত রান্না আর খাওয়া। এক বছরে যদিও তিন মেয়েই যাওয়া-আসা করেছে দু-একবার, আর পূজোর সময় একবার শ্বেতা আর সরস্বতী একসঙ্গেও এসেছিল কিছুদিন—তবু চেষ্টা করেও তিন মেয়েকে একত্র করতে পারেননি রাজেনবাবু। খুব আশা ছিল যে শাস্বতীর বিয়ের সময়...কিন্তু হলো না। হেমাঙ্গ রেনাল-কলিকে ভুগছে, তাকে নিয়ে আসা অসম্ভব, তাকে রেখে আসাও তা-ই। লম্বা একটি চিঠিতে মহাশ্বেতা কাঁদল বাবার কাছে, পাঠাল সেই খামেই পাঁচশো টাকার ড্রাফট, আর পার্সেলে বর্মি স্যাকরার শিল্পকলার কয়েকটি নমুনা।

নতুন বাড়িতে মেয়ে-জামাইরা এই প্রথম এল। সবচেয়ে বড়ো পূব-দক্ষিণ-খোলা ঘরটি, শাস্বতী আর স্বাতী যেটাতে থাকে—মানে থাকতো—সেটি রাজেনবাবু দিলেন শ্বেতাকে—সে বড়ো বলে নয়, তার ছেলেপুলে বেশি বলে। তাঁর ঘর হল সরস্বতীর, আর বিজুর ছোটো ঘরে ছোটো দুই মেয়েকে দিয়ে তিনি এলেন বাইরের ঘরে—এলেন মানে আর কী, রাস্তিরের শোওয়াটা

নিয়েই তো কথা।

—আমি? আমি কোথায় শোব? বিজু গনগন করল। রাজেনবাবু বললেন—কেন? বাইরের ঘরে তো কত জায়গা।

—মেঝেতে?

রাজেনবাবু তক্তাপোশ আনালেন। স্বাতী বললো—তুমি বুঝি মেঝেতে শোবে বাবা, আর দাদা তক্তাপোশে?

—মেঝেতেই আরাম।

—আমি পড়বো কোথায়? আমার পরীক্ষা না?

—পরীক্ষা তো স্বাতীরও, রাজেনবাবু মাথা চুলকোলেন—তা এ-কটা দিন—।

—ঈশ! এমনিই পড়ে ভাসিয়ে দিচ্ছিস! স্বাতী ঠোট বঁকিয়ে বললো—খুব সুবিধেই হলো তোর, চমৎকার ছুতো হলো একটা। বিজু রাগ করে দু-তিন খানা বই আর একটি বালিশ নিয়ে চলে গেল তার এক বন্ধুর বাড়িতে। শ্বেতা থেমে-থেমে বলল—সত্যি, ওকে কেন—আমরা না-হয়—ওর পরীক্ষা—।

—ভালো-তো! রাজেনবাবু বললেন—যদি রাগ করেও একটু পড়ে-টড়ে, তবে-তো ভালোই।

—তা—ওকে ডেকে আনবে না?

—আসবেই।

সারাদিন বাইরে কাটিয়ে সন্ধ্যার একটু আগে বাড়ি এসে বিজু হাঁক দিলো—স্বাতী আমার মশারি দে। শ্বেতা তাড়াতাড়ি কাছে এসে বলল—বেশ ছেলে! কোথায় ছিলি রে সারাদিন? আয়—কী খাবি? বিজু মোট গলায় বললো—আমি চলে যাবো এক্ষুনি।

—যা, ঘরে যা। তোর ঘর ঠিক করে দিয়েছি।

ঘরে এসে বিজু অবাক। পরিষ্কার গুছোনো টেবিল, নতুন সূজনি দিয়ে ঢাকা বিছানা, আর বোন দুটোর চিহ্নমাত্র নেই। হাত-পা ছড়িয়ে তক্ষুনি শুয়ে পড়ল লম্বা হয়ে—উঃ বড্ডো ঘোরাঘুরি হয়েছে সারাদিন। সন্ধ্যার পর শ্বেতা বলল—বাবা, আমি বাইরের ঘরেই বিছানা করতে বললাম, এখানে এক খাটে শাম্বেতী আর স্বাতী, আর-এক খাটে তুমি—

—কেন?

—বিজুকে তার ঘরেই দিয়েছি।

—আর তুই বুঝি ছেলেপুলে নিয়ে এই ঠাণ্ডায়—

—ঠাণ্ডা কোথায়—কলকাতায় আবার শীত! মস্ত বিছানা হবে মেঝেতে, ছেলেপুলে নিয়ে বেশ ছড়িয়ে শোব।

—হ্যাঁ, তাই বেশ। যা গড়ায় ওর এক-একজন! বলে প্রমথেশ এমনভাবে হেসে উঠল যেন এই গড়ানোটা খুব একটা আনন্দের ব্যাপার।

—বিজুকে এ-রকম প্রশ্ন দেয়া ঠিক না—বললো সরস্বতী।

—প্রশ্ন কী রে? শ্বেতা জবাব দিলো—সকলেরই সুবিধে, আর ওর বুঝি অসুবিধে হবে?

—অসুবিধে আবার কী—বোনের জন্য একটু কষ্ট করতে পারে না? দু-দিনেরই তো ব্যাপার।

—আহা—ছেলেমানুষ—ওর আবার—।

—আমি-তো দেখছি ওর ছেলেমানুষি ঘুচবে না কখনোই। তোমাকে বললাম, বাবা, ওকে দিল্লিতে আমার কাছে রাখো, ঠিক মানুষ হয়ে যেতো ওখানে।

—সত্যি নাকি রে? তবে আমার ডালিমটাকে রাখি তোর কাছে—এক্কেবারে পড়তে চায় না হনুমান! ছাইরঙের গরম সুট পরে অরুণ এসে দাঁড়াল—শোনো, একটা রুমাল দিতে পারো?
—সুটকেসেই আছে দ্যাখো না, স্বামীর দিকে না তাকিয়েই উত্তর দিল সরস্বতী।

—খুঁজে পাচ্ছি না তো—

—তুমি আবার কবে কী খুঁজে পাও। যা তো গীতি, বাবার একখানা রুমাল বের করে দে। গীতিও সেজেছিলো বাবার সঙ্গে বেরোবে বলে; পুতুলের মতো মাথা নেড়ে বললো—আমি পারবো না।

—পারবি না! কিছুই পারবি না তোরা! সবই যদি আমাকেই করতে হবে, তা হলে আর ছেলেমেয়ে হয়ে আমার লাভ কী হলো!

—আহা, দে না খুঁজে, রাজেনবাবু নিচু গলায় বললেন। মেয়ের গায়ে ধাক্কা লাগিয়ে মাথায় কাপড় টেনে সরস্বতী উঠে দাঁড়ালো। শ্বেতা বলে উঠলো—তোর শাড়িটা দিসরে আমাকে—পাড় লাগিয়ে দেব।

—এটা? সরস্বতী একটু যেন অবাক হল।—এগুলো তো পাড় ছাড়াই পরে।

—নাকি? পাড়-ছাড়া শাড়ির ফ্যাশন হয়েছে আজকাল? মা-গো, মা-গো! শ্বেতার যেন চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না।

—মনে নেই তোমার, সেই মিসেস দে—জজ-সাহেবের স্ত্রী—ঘর ভরে গেলো প্রমথেশের উচ্চহাসিতে।

* * *

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শাস্বতী বললো স্বাতীকে—বড়দিটা কী-রকম হয়ে গেছে রে!

—কী হয়েছে?

—কেমন বাঙাল-বাঙাল! স্বাতী একটু ভেবে বলল—আমার কিন্তু অন্যরকম লাগে।

—কী-রকম? লেপের তলায় বোনের আরো একটু গা ঘেঁষে স্বাতী চুপি-চুপি বলল—ঠিক মা-র মতো।

—কী গরম রে? শাস্বতী লেপ সরিয়ে দিল পায়ের উপর থেকে।

—ছোড়দি, মাকে তোমার মনে পড়ে?

—বাঃ, পড়ে না?

—আমার কিন্তু মনে হয় ভুলেই গেছি। বড়দি যেদিন এলেন না—আমি কী-রকম চমকেছিলাম প্রথম দেখে—ঠিক যেন...

দূর! মা বুঝি ও-রকম ছিলেন! ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখিস...

কী জানি, আমি-তো বড়দিকে বেশি দেখিনি, তাই বোধহয়—

জামাইবাবুটা ক্যাবলা, একটু পরে শাস্বতী মন্তব্য করলো—সেইজন্মেই বড়দি ওরকম হয়ে গেছে।

যাঃ, জামাইবাবু খুব ভালো—চমৎকার।

ভালো সত্যি অরুণদা। কিন্তু কী-রকম বুড়োটে হয়ে গেছে রে এর মধ্যে! তোর সঙ্গে আজকাল বেশি ভাব দেখি না তার?

দেখাই হয় না।

তোর মনে আছে, স্বাতী— শাস্বতী নড়ে-চড়ে বোনের মুখের কাছে মুখ আনল—সেই যে কেঁদেছিলি অরুণদাকে বিয়ে করবো বলে?

যাঃ!

কৈদে একেবারে গঙ্গা-যমুনা! আর কী মেরেছিলি আমাকে—মনে নেই?

যাঃ!

কাণ্ডই করেছিলি, সত্যি...দিদিরা হেসে খুন! কথাটা মনে করে সেইরকমই হাসল শাম্ভতী, যে-রকম দিদিরা হেসেছিল কথাটা শুনে দশ বছর আগে। কিন্তু ঠিক কি সে-রকম? একটু চুপ করে থেকে স্বাভাবিক যেন আপন মনে বলল—আজ এক শুকুরবার গেল, আবার শুকুরবারেই তো—।

নে, ঘুমো এখন।

ছোড়দি, একটা কথা বলবে?

কী? একটু লজ্জা শাম্ভতীর মুখে।

কেমন লাগছে?

কেমন আবার! শাম্ভতী এক ঝটকায় পাশ ফিরল।

* * *

দুপুরবেলায় সিনেমা দেখে বিকেলের রোদ্দুরে বেরিয়ে আসতে যেমন লাগে, তেমন লাগল হারীতের পরের শুক্রবারের রাত-শেষে শনিবারের সকালবেলায়। লোকজন, চলাফেরা, হাসি, কথা, ব্যস্ততা, রোদ্দুরে মাখা শীতের সকাল, আর সে ঘুম থেকে উঠল একটা অচেনা বাড়ির অচেনা ঘরের মেঝেতে। পাশে আলপনা, হাতে হলদে সুতো, পরনে গরদ। যেন সিনেমা শেষ, সকলে মিশে গেছে রাস্তার ভিড়ে, সে পড়ে আছে সিঁড়িতে একলা। নাঃ, এক পেয়ালা চা খেয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। গায়ের আড়মোড়া ভেঙে হারীত উঠে দাঁড়াল। বাথরুমে হাত-মুখ ধুয়ে, গরদ ছেড়ে সাধারণ কাপড় পরে ঘরে এসে দ্যাখে রীতিমতো ভিড়। মেঝেতে মস্ত রুপোর ট্রেতে চা—শুধু কি চা! রুটি-মাখন, ডিমের পোচ, সোনারঙের মোটা-মোটা মর্তমান কলা, আবার ফুলো-ফুলো লুচি, ঝিরিঝিরি আলুভাজা, সন্দেশ, পাঙ্কড়া, সরভাজা... হারীতের ভিমি লাগল।

সরস্বতী বলল—কী নন্দী-সাহেব, রাস্তার একটু ঘুমিয়েছিলে কি?

খুব ঘুমিয়েছিলাম—হারীত গম্ভীরভাবে বসল এসে মেঝের বিছানাতেই, যেহেতু ঘরে চেয়ার-টেয়ার কিছু নেই।

ও মা, বিয়ের কাপড় ছেড়ে ফেললে! শ্বেতা ব্যস্ত হয়ে উঠল।—বাসি দিয়ে হবে না?

আরো গম্ভীরভাবে হারীত বললো—আমি একটু বেরোবো।

এখন! এখন কোথায় যাবে! আঁৎকে উঠল শ্বেতা।—কতকিছু আছে এখন—

আ—হা। মোটাসোটা প্রমথেশ খাটে এসে জুড়ে বসল—তোমাদের ওসব নিয়ম-টিয়ম ছাড়ো

তো একটু! আজকালকার ছেলেদের কি ভালো লাগে ওসব! দাও, চা দাও ওকে।

স্বাভাবিক, যা তো তোর ছোড়দিকে ডেকে নিয়ে আয়।—এটা বোধহয় আজকালকার ছেলেটির ভালো লাগবে। সরস্বতী কটাক্ষ হানলো হারীতকে।

মিছিমিছি লজ্জায় ফেলা বেচারাকে—মাথার কাপড়টি আরো একটু টেনে দিয়ে শ্বেতা বললো।

কিন্তু না! বেনারসি আর গয়না-পরা শাম্ভতী বেশ হাসিমুখেই ঘরে এসে বড়োজামাইবাবুর কাছে বসল খাটে ঠেসান দিয়ে।—এই ভুল করলে! ওখানে ওর পাশে গিয়েই বোসো না, একটু দেখি আমরা! বলে প্রমথেশ অনুমোদনের জন্য আর সকলের দিকে তাকাতে লাগল।

আর জ্বালিয়ো না তো বাপু! শ্বেতা উব-হাঁটু হয়ে ট্রের কাছে বসে খাবার-সাজানো-সাজানো থালা এগিয়ে দিতে লাগল হারীতের দিকে।

এ-সব দিয়ে কী হবে?

খাও একটু?

একটু?

কাল-তো উপোশ করেছিলে—

না। উপোশ কেন করব? শ্বেতা হেসে ফেলল—আচ্ছা, কাল না-হয় উপোশ করনি। তাই বলে আজ করবে নাকি?

—একটু চা দিন। সরস্বতী এগিয়ে এলো চা ঢালতে। হারীত বলল, আপনারা? হাত নেড়ে জবাব দিল প্রমথেশ—আমাদের হয়ে গেছে অনেক আগে। বুঝছ না, মফস্বলের অভ্যাস, ঘুম ভেঙেই খিদে।

—আপনি? প্রমথের লক্ষ সরস্বতী। মুখ টিপে হেসে সরস্বতী বললো—আগে বললে না—বসে থাকতুম তোমার জন্যে। ঢিলেঢালা ধূতি-পাঞ্জাবি-পরা অরুণ ঘরে ঢুকে সোজা বসে পড়ল মেঝের উপর, কপাল থেকে চুল সরিয়ে বলল—আমাকে একটু চা। সরস্বতী চা ঢেলে প্রথমে দিলো জামাইকে, তারপর স্বামীকে।

খাটের দিকে তাকিয়ে হারীত বললো—শাস্বতী, তুমি?

প্রমথেশ হা-হা করে হেসে উঠল, শ্বেতা হাসি লুকোল আঁচলে, আর সরস্বতী সহজভাবে বলল—চা খাবি, শাস্বতী? শ্বেতা মুখ তুলে হারীতের দিকে তাকাল—ওর জন্য ভাবতে হবে না তোমাকে—তুমি খাও-তো এবার!

একটি ডিম খেল হারীত, তারপর চায়ে চুমুক দিতে লাগল।

তা হবে না, সব খেতে হবে। লুচির থালা এগিয়ে দিল শ্বেতা। হারীত শিউরে সরে এল। খাও!

না।

খা—ও!

না দেখুন, সকালে কিছু খাই না—

রোজ-রোজ কি বিয়ে করো যে রোজকার মতো খেতে হবে? চালাকি, না? খাও শিগগির! অনেকটা আলু-ভাজা একখানা লুচিতে মুড়ে শ্বেতা গুঁজে দিল হারীতের হাতের মধ্যে। হারীত কাতরভাবে লুচিখানা খেয়ে উঠল।—আর কী খাবে? আসরে মমিল সরস্বতী।

আর না।

ও, বড়দির হাতই পছন্দ তোমার? দাও বড়দি, আরো কিছু দাও নন্দীর হাতে। উনি আবার নিজের হাতে নিয়ে খেতে জানেন না।

কিন্তু সন্দেশের বিরুদ্ধে একেবারে উপুড় হয়ে পড়ল হারীত। রীতিমতো সত্যাগ্রহ। শালিরাও ছাড়ল না, হত্যা দিল দু-দিক থেকে দু-জনে। শাস্বতী বলে উঠল খাট থেকে—এ কী একগুঁয়েমি! এত করে বলছে, খাও না!

ও মা! এর মধ্যে এত! শ্বেতা হেসে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে, আর সরস্বতী একটু-যেন শুকনো গলায় বলল—আমরা তো ফেল হনুম রে, এবার তুই আয়, দ্যাখ পারিস যদি! দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রাজেনবাবু বললেন—খাওয়া নিয়ে জ্বরদস্তি কী বিস্ত্রী! যে যে-রকম ভালোবাসে সে-

রকম দিলেই হয়। মৃদুস্বরে বললেন, কিন্তু শুনতে পেলো সকলেই।

তা—তা—ইচ্ছে করলে আর—থাকগে! মুখ ভার হল সরস্বতীর।—সকলের অভ্যাস তো একরকম না—বলে রাজেনবাবু অন্য দিকে চলে গেলেন।

স্বশুরকে দেখে হাতের সিগারেট নামিয়ে রেখেছিলো অরুণ, ত্বরিতে তুলে নিয়ে বলল—স্বী যদি এক মাইল দূরে খাটে বসে থাকে, তাহলে কি আর খেতে ভালো লাগে কারো! শাস্বতী এসো না এখানে? জমিদারি ধরনে পায়ের পাতায় হাত বুলোতে-বুলোতে একটু দুলে-দুলে প্রমথেশ বললো—তুমি তো বেশ লোক হে! বসেছ তো গিয়ে নিজের স্বীটির মুখোমুখি, তার উপর আবার—

বাঃ, তাই বলে অন্যের স্বীর দিকে নজর দেব না একটুও!—কিছু মনে করো না, হারীত। সভাস্থল থেকে একটু দূরে জানালার ধারে বসেছিল স্বাতী, অরুণের কথাটা শুনে চোখ তুলে তাকাল। শালির বিয়েতে খুব-যে রস! উশকোখুশকো চুলের হাসিমুখ মানুষটিকে তীর ছুঁড়ল সরস্বতী। কিছুতেই খেলে না তো!—বলে শ্বেতা আঁচলে মুখ মুছে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু দমল না; দুপুরবেলা নতুন জামাইকে সাজিয়ে দিল মস্ত রুপোর থালায় বাটি-চেপে-গোলকরা ফুলের মতো ভাত, আর থালাটি ঘিরে হারের লহরের মতো ঝকঝকে কাঁসার ছোটো-বড়ো বাটি—যেন সাতাশ-বৌ নিয়ে চাঁদ। হারীত এসে বসতেই শ্বেতা বললো—খেতে হবে না, শুধু দেখবার জন্য দিয়েছি। দেখবার যোগ্যই—হারীতকে স্বীকার করতে হল।—বলে দিন সবচেয়ে ভালো রান্না কোন-কোনটা। শ্বেতা খুশি হয়ে বলল—সবটাই চেখে দ্যাখো একটু-একটু।

চেখে দেখব? বাকিটা ফেলা যাবে তো?

সে তোমাকে ভাবতে হবে না!

কী অপব্যয়! কত খাবার নষ্ট! সারি-সারি বাটির উপর চোখ বুলিয়ে হারীত স্বগতোক্তি করল। তা না-হলে আর বিয়ে কী!—শুস্তোটাকে উপেক্ষা করে ছোলার ডালের ছেঁচকি দিয়ে খাওয়া আরম্ভ করলো প্রমথেশ—সেই সি. আর. দাশের গল্প জানো না—মেয়ের বিয়ের সময় খাজাঞ্চি এস্টিমেট দিল একলাখ টাকার। হেসে বললেন দাশসাহেব—আরে একলাখ টাকা তেঁ চুরিই হবে, লাগবে কত বলো! বলে প্রমথেশ মাথা উঁচু করে হেসে উঠল।

এই করে-করেই তো এই অবস্থা হয়েছে আমাদের! হারীত মাছের চপের কোমল ভেঙে মুখে দিল।—তা দেরি নেই আর, আসছে দিন! এ যাত্রাও কোনোরকমে ঠেকিয়ে রাখল চেম্বারলেন, কিন্তু যুদ্ধ হবেই, তখন দেখা যাবে কোথায় থাকে এসব!

মানুষের আনন্দ-উৎসব বন্ধ হবে ভেবে তুমি যেন বেশ উৎসাহিত হচ্ছ। মুক দিয়ে শুস্তোর ঝোল খেয়ে নিল অরুণ-ডাক্তার। রাজেনবাবু নেবু নিংড়ে নিচ্ছিলেন ডালে, চোখ না তুলেই আস্তে বললেন—তা সত্যিই তো, অপব্যয়টা আমাদের বড়ো বেশি।

অপব্যয় যখন হয়েই গেছে, সদ্ব্যবহার করা যাক! প্রমথেশ পাতে নিল উচ্ছে দিয়ে রাঁধা মৌরলা মাছ। সহজে কি শিক্ষা হবে আমাদের? রাস্তায় না খেয়ে মরবে মানুষ, তবে তো!—হারীত বেছে বেছে হাত দিল সর্ষে-নারকোলের চিংড়িতে।

মানুষের যারা উপকার করে তাদের কী মুশকিল! সাদা-সাদা লাউয়ের তরকারি দিয়ে একটু ভাত মেখে নিয়ে অরুণ বলল—মানুষ ভালো থাকলে ভালোই লাগে না তাদের।

২৭ং বাবার কাঁধে মাথা হেলিয়ে জলের মতো ছলছল শব্দে হেসে উঠল স্বাতী! হারীত চট করে চোখ তুলে তাকাল একবার, তারপর খেতে লাগল নিঃশব্দে, গম্ভীরভাবে। স্বাতী, তুমি

যে বসলে না?—প্রমথেশ কথা বদলাল।

আমি দিদিদের সঙ্গে থাকো।

কেন, ওকে আর বিজুকে বসিয়ে দিলেই হতো নতুন জামাইয়ের সঙ্গে।

বিজু তো সেই কখন খেয়ে বেরিয়ে গেছে—জবাব দিলো শ্বেতা—আর স্বাতী—

না, না—অরুণ বলে উঠল—ও-সব একসঙ্গে খাওয়া-টাওয়া হাইজিনিক নয়।

তোমার মুখে এ কথা? সরস্বতী হাসল।—স্বাতী সঙ্গে না বসলে তোমার তো খাওয়াই হতো না।

তার অবশ্য আলাদা কারণ আছে।—কী স্বাতী, মনে নেই? অরুণ এক বলক তাকাল স্বাতীর দিকে।

তোমাদের এসব সেকেলে ঠাট্টা নন্দীর ভালো লাগছে না, রাশ টানল সরস্বতী। —তা একেলে ঠাট্টা শুনি না দু-একটা! যাকে লক্ষ করে শ্বেতার টিপ্পনি, সে একটু লাল হল, কিন্তু থালা থেকে চোখ তুলল না। স্বাতী উঠে এল সেখান থেকে। আবছা মনে পড়ে, অরুণদাকে তার কী-ভালো লাগত ছেলেবেলায়; অত ভালো কাউকেই যেন আর লাগল না। শুভ্র, শুভ্রর বন্ধুরা, হারীতবাবু—কেউ কি সেই অরুণদার মতো?...কিন্তু সে রকম আর নেই কেন, সে অরুণদার কী হল?...বড়ো হতে হতে ছেলেবেলার ভালোলাগা আর থাকে না বুঝি? ভাগ্যিস সে বড়ো হয়েছে—এখন থেকে ভালোলাগা সম্বন্ধে নিশ্চিত, আর তো বদল হবে না—না কি হবে? সর্বনাশ!—স্বাতীর যেন দম বন্ধ হল মুহূর্তের জন্য। তা-ই যদি হয়, তাহলে ভালোলাগায় বিশ্বাস কী! শাম্বতীর কাছে গিয়ে সে বলল—আচ্ছা ছোড়দি, একবার যাকে আমাদের ভালোলাগে, তাকেই কি ভালোলাগে বরাবর?

কী বোকার মতো কথা! ছোড়দির সিঁদুর-ভরা মাথার দিকে স্বাতী একটু তাকিয়ে রইল চূপ করে। হঠাৎ বলল—ছোড়দি, আজ চলে যাবে?

বিজুটা কই রে?

জানি না তো!

কখন থেকে দেখছি না ওকে?

দাদা তো বাইরে বাইরেই—

দেখে আয় তো, ফিরেছে নাকি। স্বাতী ঘুরে এসে বলল—না ছোড়দি, দাদা বাড়ি নেই।

ট্যান্ডিতে ওঠবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত শাম্বতী বিজুর খোঁজ করল, কিন্তু বিজু ফিরল রোদে-পোড়া চেহারা আর স্যান্ডেল-পরা ধুলো-মাখা পা নিয়ে সন্ধেবেলা। তাকেই বাড়ির থমথমে চূপচাপ ভাবটা তার ভালো লাগল না। এ-ঘরে ও-ঘরে কয়েকবার উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে স্বাতীকে জিজ্ঞেস করল—ছোড়দি কই? স্বাতী ভারি গলায় বলল—চলে গেছে। কথাটা যেন ধাক্কা দিল বিজুকে। সামলে নিয়ে বলল, কখন গেলো?

বিকেলে।

আমাকে আগে বলতে পারিস না? বিজুর গলা চড়ল। —আলাদা করে আবার বলতে হবে নাকি?

কেন বলবি না আমাকে?

চ্যাচাসনে, দাদা!

কত খোঁজ করলো তোর! শ্বেতা নিশ্বাস ছেড়ে বলল।

তা এক কাজ কর না—হাত-পা ধুয়ে একবার ঘুরে আয় ওখান থেকে—কত খুশি হবে! বয়ে গেছে আমার।

ওকে কিছু বোলো না, বড়দি—স্বাতী বললো। —ও কি এ-বাড়ির লোক যে ওর কিছু এসে যায়?

নই-ই তো! এ বাড়ির লোক তো নই-ই আমি! গলা ছেড়ে চীৎকার করল বিজু। —আমি এ-বাড়ির লোক হলে কি আর এটাও জানতে পেতাম না যে ছোড়দি কখন যাবে!

তবে-তো বুঝিসই, জবাব দিল স্বাতী।

বুঝি না! বিজু যেন চোখ দিয়ে পুড়িয়ে ফেলল স্বাতীকে—সবই বুঝি। এ-বাড়ি তোর, এ-বাড়িতে তুই-ই সব, তোর কথায় সবাই ওঠে-বসে—আমার কোনো জায়গা নেই এখানে। এতদিন ছোড়দির জন্য তোর জুলুনি-তো কম ছিল না, এবার সেও বিদায় হল? কেমন! আহ্লাদে নাচ এবার! মুখ লাল করে গলার রং ফুলিয়ে, ঠোটে ফেনা তুলে, বাড়ির বিমর্ষ অবসন্ন প্রত্যেকটি মানুষের কানে বিজু তার মনের কথা সঁধিয়ে দিল। একটি কন্যার সদ্যবিচ্ছেদে যা হয়নি, সেই রকম একটা আঘাত হঠাৎ যেন আকাশ থেকে নামল।—কিন্তু কেন জানিস? আবার শোনা গেল বিজুর গলা—কেন আমি এ-বাড়ির লোক নই, জানিস? তোর জন্য! শুনে রাখ, স্বাতী, আমি-যে বাড়ি থাকি না, আমি-যে ঘুরে-ঘুরে বেড়াই, আমার-যে পড়াশুনা হলো না—সব তোর জন্য! তোর রাজত্বে আমিও থাকব ভেবেছি। আমি আর না—! এই আমি চললাম! বুকে চাপড় মেরে একহাত লাফিয়ে উঠে, পায়ের কাছে ঢনাৎ করে একটা কেটলি উলটিয়ে বিজু বেরিয়ে গেল বন্দুকের গুলির মতো।

কী অসভ্য ছেলে! পাশের ঘরে রাজেনবাবু বললেন চাপা গলায়। আর সবাই যেন স্তম্ভিত হয়ে রইল কয়েক মিনিট। তারপর প্রমথেশ ফিশফিশ করে বলল—দ্যাখো না, সত্যি চলে গেলো নাকি?

কেন-যে যেখানে সেখানে রাখে সব! শ্বেতা কেটলিটি তুলে রেখে বাবার কাছে এলো—বাবা, তুমিও তো ওকে একটু ডাকলে-টাকলে পারো মাঝে-মাঝে। বড়োসড়ো হয়েছে এখন—ওয়াইল্ড! এই একটি ইংরিজি শব্দ ছাড়া আর কোনো কথা সরস্বতীর মনে এল না। —একেবারে ওয়াইল্ড!

মা তো নেই, শ্বেতা তাড়াতাড়ি বললো—আর এ-বয়সে সব ছেলেই একটু না একটু বিগড়ায়। বাবা যদি একটু ওর সঙ্গে...

না—সরস্বতী বাধা দিলো, ওসব কিছু না—শাসন চাই, কড়া শাসন। বাবা অমন অসম্ভব ভালোমানুষ বলেই তো মাথায় চড়েছে। কোনো মেয়ের কথা উল্লেখই রাজেনবাবু কিছু বললেন না। হঠাৎ আবার শোনা গেল দুমদাম পায়ের শব্দ; যেন রাস্তায় মার খেয়েছে এই রকম একটা চেহারা করে বিজু ঘরের মধ্যে এসে সকলের দিকে তাকিয়ে বললো—বলতে পারলে না? আমাকে বলতে পারলে না তোমরা? কেউ বলতে পারলে না? বলেই ছিটকে শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে শাস্ত্রীর খাটে, মুখে বালিশ চেপে বিদ্রী বীভৎস আওয়াজ করে ডেকে উঠলো—ছোড়দি—ঈ। ও-ও ছোড়দি! একেবারেই অসভ্যের মতো হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল। বারান্দার একটি থামে হেলান দিয়ে স্বাতী যেন শীতের ছাইরঙা-সন্ধ্যার মধ্যে মিশেছিল এতক্ষণ, চমকে উঠল দাদার অন্যরকম চীৎকার শুনে। বিজু সহজে থামল না, আর শুনতে শুনতে স্বাতীর গলা আটকে এল, ঠোট কেঁপে উঠল, তার মুখ তাকে অমান্য করে বিকৃত হল নানা-

রকম রেখায়, আর ফোঁটা ফোঁটা গরম শরীর-নিংড়োনো জল গড়িয়ে পড়তে লাগল চোখ বেয়ে গালে।

৪

কান্না!—কান্না এইরকম? মাকে যখন নিয়ে গেল, মাকে রেখে বাবা যখন ফিরে এলেন, তারপর বাড়িতে সেই প্রথম মা-ছাড়া রাত্রি... কেঁদে-কেঁদে মরতে বাকি ছিল তার। কিন্তু এরকম তো লাগেনি। কান্নার জোয়ারে সে ভেসে গিয়েছিল তখন, যেন অথৈ জলে ডুবছে, কিন্তু যতবার দম আটকে এসেছে কে যেন হাত ধরে তাকে তুলে দিয়েছে ঢেউয়ের উপর... আর এ-কান্না যেন বুক ভেঙে দিয়ে ঠেলে-ঠেলে উপরে উঠল, তারপর একটু-একটু করে নেমে এল চোখ জ্বালিয়ে দিয়ে। একে লুকোতে চায়, পারে না। এতে লজ্জা করে কিন্তু লজ্জা মানে কে? মার জন্য কান্নায় শুধু কষ্ট ছিল, যত কষ্ট তত আরাম... আর এ-কান্নায় সবচেয়ে বেশি মনে হল আমি যেন হেরে গেলাম; আর যেন কী বলতে গিয়ে বলতে পারলাম না, আর সেই মুখের কথাকে মুছে দিল চোখের জল...

পরের দিন-কয়েক স্বাতীকে যেন কান্নায় পেল। ছোড়দির কথা মনে করে যখন-তখন সে কাঁদে; আর বড়দি-সেজদি যখন চলে গেলেন তখনো কেঁদে ভাসাল সে; আগের চেয়েও নিরিবিলি বাড়িতে কান্না যেন তাকে ধরবার জন্য ওৎ পেতেই রইল, যেমন সে শুনেছে, স্বদেশীদের পিছন-পিছন ঘোরে পুলিশের গোয়েন্দা। এক-এক সময় কিছুতেই তার হাত ছাড়াতে না-পেরে গল্পের অ্যালিসের মতো নিজেকেই নিজে ধমকে দেয়—চুপ! চুপ করো বলছি, এত বড়ো মেয়ে, কাঁদতে লজ্জা করে না! থামাও এফুনি। আর সত্যিই—এ-রকম করলে চলবে কেন; পরীক্ষা না? বিজুকে সে বলল—দাদা আয়, আমরা একসঙ্গে পড়ি। বিজু জিভ বের করে ঠোটে বুলিয়ে বললো—আমার হয়ে গেছে সব।

দ্যাখ দাদা, জিওমেট্রি তো ঢোকে না আমার মাথায়—

আচ্ছা, দেবোখন এক সময় বুঝিয়ে। আমার পরিষ্কার ধৃতি আছে নাকি রে একটা? ধোপার তো আসার কথা—আঃ ঘাঁটসনে! স্বাতী বই ফেলে উঠে তোরঙ্গের তলা থেকে আস্তে আস্তে টেনে আনল একখানা পাটকরা ধৃতি। বিজু তাকিয়ে বললো—এ তো বাবার... তা হোক না।

যেমন মোটা তেমনি খাটো।

আ-হা। বাবা পরতে পারেন আর তুই পারিস না!

আমি বাবার চেয়ে লম্বা তো! আর বাবার ঠিক হয় নাকি? দ্বিধা স্বভাব, যেন উনি চুয়ান্দিশ ইঞ্চি ধৃতি পরলেই কত আয় হবে সংসারের। এদিকে কতদিন দিয়ে কত খরচ হচ্ছে তাতে কিছু না! কোনো-এক সময়ে কোনো-এক দিদির মুখে শোনা এই কথাটা আওড়াতে পেরে খুব খুশি হল বিজু, খুব হাসল খানিকটা, তারপর বললো—আচ্ছা দে, আর নেই যখন—দাদা, জিওমেট্রি—

দাঁড়া. খেয়ে-দেয়ে—ধৃতি হাতে চলে গেল নাইতে। রাতে যখন বোনের সঙ্গে আবার দেখা হল, বেশ-একটু গুরুজনের মতোই জিগেস করল—পড়াশুনা তোর হচ্ছে তো ঠিকমতো? এই একরকম—স্বাতী জ্যামিতিপ্রসঙ্গ আর তুলল না।

কটা 'এসে' মুখস্ত করেছিস?

‘এসে’ মুখস্ত মানে?

ইংরিজি ‘এসে’ মুখস্ত করিসনি একটাও? এরোপ্লেনটাও না? ওটা নির্ঘাৎ পড়বে এবার, দেখিস! ও মা! স্বাভী খিলখিল করে হেসে উঠল। ‘এসে’ আবার মুখস্ত করে নাকি! ও তো বানিয়ে লিখতে হয়! যেন বোনকে শুনিয়ে-শুনিয়েই বিজু উচ্চস্বরে ইংরিজি পড়তে লাগল রাত জেগে জেগে। রাজেনবাবু চমকে বললেন—বিজু পড়ছে! আশ্চর্য কথা!

দ্যাখো না!—স্বাভী আশ্বাস দিল বাবাকে। কিন্তু বৃথা, বিজু ফেল করল এবারেও। কোনো এক সুযোগে রাজেনবাবু কুণ্ঠিতভাবে ছেলের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করলেন—এখন কী করবি? আর পড়ব না, বাবা—দরাজ গলায় জবাব দিল বিজু।

তাহলে...?

তুমি ভেব না, আমি সব ঠিক করে ফেলেছি। রাজেনবাবু ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। আমি আর্টিস্ট হব, বাবা।

আর্টিস্ট! রাজেনবাবু হাঁ। মানে যারা ছবি আঁকে?

না বাবা, মধুর একটু হেসে বিজু খবর জানাল বাবাকে—গাইয়েদেরও আর্টিস্ট বলে আজকাল, অ্যাক্টরদেরও।

মাথা-খারাপ হলো নাকি রে বিজুর?—পরে, স্বাভীর সঙ্গে একলা হয়ে রাজেনবাবু বললেন। নতুন কিছু হয়নি—স্বাভী হাসলো। একটু পরেই আবার বললো—দাদার খুব মাথা কিন্তু বাবা, একটু যদি মন দিত তাহলে কথা ছিলো না।

রাজেনবাবু জবাব দিলেন না। কোনোরকমে যে-কোনো একটা কাজে এন্ফুনি ওকে ঢোকাতে না পারলে পরে কি আর সামলানো যাবে? তাঁর পেনশনের আর দুবছর মোটে বাকি; যে রাজত্বে তিনি কাজে ঢুকেছিলেন এখন তার কিছুই আর নেই, তবু উপরওলাদের ধরে পড়লে এখনও হয়তো তাঁর ডিপার্টমেন্টে—কিন্তু ম্যাট্রিকটাও...

আর তাছাড়া—স্বাভী সাস্তুনা দিল—পরীক্ষা পাশ করাটাইতো আর সব কথা নয়। আরো কত আছে। কোনটাতে হঠাৎ ওর মন লেগে যাবে কে জানে?

একটা মূর্খ হয়ে থাকল। রাজেনবাবুর দীর্ঘশ্বাস।

মূর্খ আবার কী! কথাবার্তায় চাল-চলনে কার চেয়ে কম! আমাদের সঙ্গে যা করে করে—বাইরের একজন এলে দেখো-তো!

শাস্ত্রীও কেমন বি. এ. পাশ করলো বিয়ের পরে—

পাশ করলেই বিদ্বান হয় বুঝি?

স্বাভী তর্ক করল বটে, কিন্তু মনে-মনে দাদার জন্য তারও দুঃখ কম না। আহা—কলেজে পড়বে না কোনোদিন? সে তো পড়ছে—কী ভালো কলেজ, কী ভালো লাগে—একেবারে অন্যরকম, একেবারে নতুন...কত নতুন কথা, শব্দ-শব্দ কথা! কয়েক মাস আগেও যা ভাবতে পারতো না—সত্যি!

কলেজে ইংরিজির ক্লাশে পিছনের বেঞ্চিতে তার পাশে বসে বলল একদিন ইভা গাসুলি — আর ইংরিজি পড়ে কী হবে—ইংরেজের রাজত্বই থাকবে না!

থাকবে না! স্বাভী অবাক।

দ্যাখ না এই যুদ্ধে কী হয়—।

ওমা! যুদ্ধ! হারীতদার কথাই ঠিক হল!—সত্যি যুদ্ধ!

সত্যি মানে? ইভা হেসে উঠল। এনশেষ্ট ম্যারিনর পড়তে-পড়তে প্রোফেসর একটু থামলেন, চকিতে একবার তাকিয়েই পড়তে লাগলেন আবার। ইভা হাসি চেপে চুপি-চুপি বলল—কাগজও পড়িস না? উত্তর না দিয়ে স্বাতী মন দিল প্রোফেসরের দিকে। বেশ লাগে শুনতে, কিন্তু এমন করে বইখানা ধরেছেন যে মুখ দেখা যাচ্ছে না। নিজের বইয়ে চোখ রেখে স্বাতী অক্ষরের সঙ্গে ধ্বনিকে মিলিয়ে নিতে লাগল। —খুব-যে পড়ায় মন? পেনসিলের খোঁচা লাগল স্বাতীর পিঠে। —আঃ! হঠাৎ পড়া থেমে গেল, স্বাতী চোখ তুলে দেখল বইখানা নেমেছে প্রোফেসরের হাত থেকে টেবিলে, আর তাঁর শাস্ত দৃষ্টি পড়েছে তারই মুখের উপর। —কী হয়েছে? বাংলায় মদুস্বরে তিনি বললেন।

ইভা তাকিয়ে রইল উদাস দৃষ্টিতে অন্যদিকে, আর স্বাতীর মুখে ফুটে উঠল অপরাধের লালরঙা বিজ্ঞাপন। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল সামনের মোটাসোটা মায়া সান্যাল—পড়ায় আমাদের আজ মন লাগছে না স্যর।

কেন?

এই-যে যুদ্ধ লাগল, সে-বিষয়ে কিছু বলুন আমাদের।

সে-আলোচনার এটা-তো জায়গা নয়—বলে অধ্যাপক উঠে দাঁড়িয়ে গভীর গভীর গলায় পড়তে লাগলেন—

'Nor dim, nor red, like God's own head

The glorious sun uprist

Then all averr'd I had killed the bird

That brought the fog and mist.

'Twas right, said they, such birds to slay,

That bring the fog and mist.'

স্বাতী আর তাকাতে পারল না, তার দৃষ্টি লেগে রইল আঠার মতো বইয়ের পাতায়, তার শ্রবণ পান করল প্রতিটি স্বর, তাল, মাত্রা। কবি যে বলেছেন তিন-বছরের শিশুর কথা সেইরকম মুগ্ধ হয়ে সে শুনতে লাগল—

'The fair breeze blew, the white foam flew,

The furrow followed free;

We were the first that ever burst

Into that—'

স্যর 'like God's own head' মানে কী? শব্দের মুখে তাল কাটল হঠাৎ। মেঝেতে বাটি-ঘষার শব্দে যেমন হয় তেমনি শিউরে উঠল স্বাতীর শরীর, সামনে দাঁড়ানো মায়া সান্যালের পিঠের দিকে ক্রুদ্ধ একটা দৃষ্টি হানল সে। —আরো খানিকটা পড়ে নিই—প্রোফেসর ইংরিজিতে জবাব দিলেন—তারপর আলোচনা করব।

'Nor dim, nor red'-টাও বুঝলাম না স্যর, আপত্তি জানাল অলকা নাগ।

এতে আপাতত বোঝবার কিছু নেই—ছাত্রীদের মাথার উপর দিয়ে প্রোফেসর তাকালেন দেয়ালের দিকে—প্রথমে কান দিয়ে শোনো, তারপর মন দিয়ে ভাবো।

কিন্তু সূর্যকে কেন 'God's own head' বলল? মায়ার নাছোড় জিজ্ঞাসা। —বড়ো শক্ত কবিতা

স্বর, বললো আর-একজন—ভালো করে বুঝিয়ে না দিলে ফলো করতে পারছি না। প্রোফেসরের নম্র লাজুক মুখে রক্ত উঠে আসতে দেখল স্বাতী। বিষম হল চোখ, একটু বেকল ঠোঁটের কোণ, মুখে যেন কৌতুকের ভাব নিয়ে আস্তে-আস্তে তিনি ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।—কী দরকার, স্বাতী ভিতরে-ভিতরে জ্বলতে লাগল, এ সবার কী দরকার, পড়ে গেলেই তো হত।—বেশ পড়েন কিন্তু উনি, স্বাতী বলল ইভাকে ক্লাশের পরে। কথা ভুল শুনে, কিংবা ইচ্ছে করে ভুল বুঝে, ইভা জবাব দিল—হ্যাঁ, ও আবার পড়াবে কী, বাচ্চা ছেলে! পাশ করেই তো বেরোল সেদিন!

সত্যি! কী ছেলেমানুষ রে! আর কী লাজুক! কারো দিকে তাকায় না কখনো!—যোগ দিল মোটা মেয়েটি।—এই তো সত্যেন রায়? খুব নামজাদা ছাত্র না? নাম শুনেছি দাদার মুখে—এই প্রথম কথা বললো ছোটোখাটো চশমা-চোখের একটি মেয়ে। ভালো ছাত্র হলেই তো আর ভালো মাস্টার হয় না—ইভা উদ্ধৃত করল তার ভাইস-প্রিন্সিপাল মামার একটি বচন—অনাদিবাবুর অসুখ বলেই তো ওকে পড়াতে দিয়েছে মেয়েদের ক্লাশে। ও তো টিউটোরিয়াল করায় ছেলেদের, মাইনে পায় পাঁচশুর। একসঙ্গে এতগুলো মেয়ে দেখে যা অবস্থা বেচারার! ইভা বয়সে ক্লাশের সব মেয়ের বড়ো, স্মার্ট, তার উপর আছে তার মামার জোর। অনেকেই হাসল তার কথা শুনে। সকলের যে হাসি পেল তা নয়, কিন্তু না-হাসলে মান থাকে না।

এ কী অন্যায়! স্বাতীর তীব্র স্বর হাসি ছাপিয়ে উঠলো—পড়তে তো দিলেই না, এখন আবার ঠাট্টা! কী সুন্দর পড়ছিলেন, আর কী-সুন্দর কবিতাটা! স্বাতীর রং-ধরা মুখের দিকে ইভা একটু তাকিয়ে রইল, তারপর গম্ভীরভাবে বলল—এইজন্যই-তো বাচ্চা মাস্টারদের মেয়েদের ক্লাশে পড়াতে দিতে নেই। বলেই মুখ টিপে হাসল। আবার কলকলানি উঠল মেয়েদের মধ্যে।—কেন, বড়োদের দিয়ে বুঝি বিপদ নেই কিছু? দ্রুত জবাব দিয়ে স্বাতী হনহন করে বেরিয়ে এল। বাজ্ঞে সব!—এইরকম জবাব দিয়েই ঠাণ্ডা করতে হয় ওদের। কী-সুন্দর কী-ভালো লাগছিলো—নষ্ট করে দিল। হিন্দি ক্লাশ থাক আজ, বাড়ি যাই। ছুটি হলেই তো সঙ্গে জুটবে অনুপমা আর চিত্রা আর সুপ্রীতি, বকবক করবে সারাটা পথ—এখন বেশ একা-একা... ‘We were the first,’ ফুটপাতে নেমে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল স্বাতী, গা-ঘেঁষে একটা গাড়ি চলে গেল... ‘we were the first that ever burst into that silent sea’ ঈশ, কী করে বানায় এ-রকম, কারা বানায়?— ‘into that silent—’ পা বাড়িয়েই সরে এল স্বাতী—বাস! কী মস্ত আর কী আওয়াজ! বাস-এর আওয়াজ, ট্রামের আওয়াজ, বড়ো রাস্তায় পঞ্চাশ গোলমাল সব পার হয়ে তার কানে এসে পৌঁছলো সত্যেন রায়ের ভারি, নরম গলা—

Nor dim, nor red, like God's own head

The glorious sun uprist.

Nor dim, nor red, like God's own head— মানে! এর আবার মানে! এ-তো চোখে দেখা যায়।...সমুদ্র, শেষ নেই, শব্দ নেই, শুধু সমুদ্র... একলা একটা জাহাজ, শুধু সমুদ্র... কালো-কালো কুয়াশা, ছায়া-ছায়া আলো, শুধু সমুদ্র। আর এই সমুদ্রে কিনা মাথা তুলল আশ্চর্য সূর্য—আশ্চর্য, এর চেয়ে আশ্চর্য আর কী—ট্রামের তোড়, বাস-এর শোর, বড়ো রাস্তার পঞ্চাশ গোলমাল, ভিড়, রোদ্দুর, উঁচু-উঁচু বাড়ি, আশি-যাওয়া ছোটোছোটো—মুহূর্তের জন্য কিছু দেখল না স্বাতী, কিছু শুনল না...দেখল সমুদ্র, শুধু সমুদ্র, আর সেই আলোছাড়া কালোছায়ার সমুদ্রে সূর্যের আশ্চর্য মাথাতোলা...শুনল শুধু নরম গম্ভীর একটি গলায় সেই আশ্চর্য কথা, যেমন

আশ্চর্য সে জীবনে আর শোনেনি—‘Nor dim nor red...’

কী? রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে চাপা পড়বি নাকি? তার কাঁধে হাত রাখল অনুপমা। তুমি যে? সহপাঠিনীকে সম্ভাষণ করতে একটু দেরি হল স্বাতীর। —তোর পিছন-পিছন এলুম। ইভাটা বড়ো অসভ্য, সত্যি...চল। বাড়ি এসে সেই লম্বা কবিতাটি স্বাতী আগাগোড়া একবার পড়ে ফেলল। ভালো লাগল, কিন্তু তত না। সবটা যদি সত্যেনবাবুর মুখে শুনতে পেত! আবার এক মঙ্গলবার তাঁর ক্লাশ। কিন্তু ক্লাশে তার কতটুকু হয়, আর মেয়েগুলো যা—!

পরের মঙ্গলবারে মেয়েরা আরো চঞ্চল, কেননা পূজোর ছুটি দুদিন পরে। বোধহয় সেটা অনুমান করেই সত্যেনবাবু ক্লাশে এলেন না। আর ছুটির পর ক্লাশ নিতে লাগলেন আবার অনাদিবাবু। ভারি ক্লি চেহারা, প্রচণ্ড গলা, কখন কবিতা পড়ছেন আর কখন বক্তৃতা করছেন বোঝা যায় না; আর কখন বক্তৃতার মধ্যে হঠাৎ এক ফাঁকে ‘Take down’ বলে নোট দিচ্ছেন সেটাও বুদ্ধি করে বুঝে নিতে হয়। চল্লিশ মিনিট টু শব্দ নেই সমস্ত ক্লাশে।

...মুহূর্তের জন্য একটু ফাঁক হয়েই কি বন্ধ হয়ে গেল দরজা? কিন্তু আমি-যে দেখে ফেলেছি ভিতরে কী আশ্চর্য! আর কি খুলবে না? আর কি দেখব না? ভিতরে যেতে পারব না কোনোদিন?... লাল মলাটের মোটা পাঠ্য-বইখানার স্বাতী পাতা উল্টাতে লাগল বার-বার। যে সুর তার কানে লেগেছিল, আর লাগে না। গুমোটের রাতে যেমন অত্যন্ত মৃদু, অস্পষ্ট, অস্পষ্ট একটুখানি হাওয়া হঠাৎ স্বর্গ ছড়িয়ে মিলিয়ে যায়, তেমনি মাঝে-মাঝে একটু ঝিরঝিরানি লাগল তার মনে—কিন্তু তারপরেই চুপ, আবার গুমোট, নিঃসাড় গুমোট। ক্লাশের মেয়েদের কাছে সে কথাটা পাড়লো—আচ্ছা, এনশেন্ট ম্যারিনার যিনি লিখেছেন তিনি আর কিছু লেখেননি? আর-কিছু টেক্সট নেই আমাদের—বলল সেই ছোটোখাটো কালো মেয়েটি, ম্যাট্রিকুলেশনে স্কলারশিপ পাওয়া।

বাবাঃ, এই নিয়েই হয়রান! মানে-জানতে-চাওয়া মায়া সান্যাল মাথা ঝাঁকাল—যা বিতর্কিত ছিরি কবিতা!

যত আজগুবি!—বললো সুপ্রীতি। চিনের জাগরণ বিষয়ে সে প্রবন্ধ লিখেছে কলেজ ম্যাগাজিনে।—পাখি মেরেছে তো হয়েছে কী? আর কি ঠাকুমার বুলির দিন আছে! এর পরে ছোড়দিরা যেদিন বাড়িতে এল, স্বাতী কথায়-কথায় বলল—হারীতদা, আপনার কাছে কবিতার বই আছে?

কবিতা? হারীত ঠোট বোঁকিয়ে হাসল—কবিতা-টবিতা আমি পড়ি না।

কেন? স্বাতী একটু অবাক হল। কলেজের মেয়েগুলো না-হয় বোকা, হারীতদা তো বিদ্বান। কবিতা দিয়ে কী হয়? কবিতা পড়ে কি পেট ভরে মানুষের?

সে আবার কী! স্বাতী খিলখিল করে হেসে উঠল। —কবিতা পড়ে পেট ভরবে কেন? ভাত খেয়ে পেট ভরবে। তরুণী শ্যালিকার এই চপলতা হারীত মার্জনা করল মহতের মতো হেসে, কিন্তু বাড়ি ফিরতে-ফিরতে স্ত্রীকে বললো—স্বাতীর শিক্ষা ঠিকমতো হচ্ছে না।

স্বাতী খুব ব্রিলিয়ান্ট—জবাব দিল শাস্বতী। ও ছেলে হয়ে বিজু যদি মেয়ে হতো—কেন, মেয়েদের ব্রিলিয়ান্ট হতে নেই?

পুরুষ যা পারে মেয়েরা-তো আর তা পারে না?

উঃ! আর্তস্বর বেরল হারীতের। —আর কত, আর কতকাল শুনবো এ-সব! নিজে মেয়ে হয়ে লজ্জা করে না এ-রকম বলতে?

পারে না মানে করতে দেয়া হয় না—শাস্ত্রী তৎক্ষণাৎ নিজেকে শুধরে নিল।
তবে? হারীত খুশি হল এবার। —আর-তো কিছু না, সুযোগ-সুবিধের কথা। সোভিয়েট
ইউনিয়নে মেয়েরা রেলের এঞ্জিন পর্যন্ত চালাচ্ছে! আরামে গাড়িতে বসে যেতে-যেতে (হারীতের
সেই বন্ধুর গাড়ি) শিফন-পরা শাস্ত্রী মুহূর্তের জন্য নিজেকে দাঁড় করাল এঞ্জিনের রাক্ষুসে
চুল্লির সামনে, আর মনে-মনে ঈশ্বরকে (ঈশ্বর!—কিন্তু কেউ তো আর শুনেছে না।) কৃতজ্ঞতা
জানাল সোভিয়েট ইউনিয়নে মেয়ে হয়ে জন্মায়নি বলে।

আমাদের দেশেও হবে ও-রকম। স্টিয়ারিং-হইলে হাত রেখে হারীত একটু হেসে মুখ ফেরাল,
আর মুখে-চোখে জ্বলজ্বলে উৎসাহ নিয়ে স্বামীর দিকে তাকাল শাস্ত্রী।

এদিকে স্বাভী শরণ নিল কলেজের লাইব্রেরির। একটু ভয়ে-ভয়ে জিগেস করল—কোলরিজের
কবিতার বই আছে? বুড়ো লাইব্রেরিয়ান না-তাকিয়েই জবাব দিল—না কোলরিজ নেই।

—একখানাও না?

না।...উৎপলা সরকার...‘গোরা’—

অনেক আকাঙ্ক্ষায়, অনেক হাতের দাগ লাগা, পেনসিলে-কালিতে অনেক বিচিত্র মন্তব্যের
উদ্ধি-আঁকা জীর্ণ মলিন ‘গোরা’ বইখানা হাতে নিয়ে উৎপলা সরকার সরে যাবার পর স্বাভী
আর একবার চেষ্টা করল—আর-কিছু আছে? আর কোনো কবিতার বই?

চশমার ভিতর দিয়ে গোল-গোল নির্জীব চোখে মুখ তুলে তাকাল লাইব্রেরিয়ান। পিছন ফিরে
দাঁড়িয়ে আলমারির বই ঘাঁটতে-ঘাঁটতে অন্য-একজন বলে উঠলেন—প্যালগ্রেভের গোল্ডেন-
ট্রেজারি দিন না।

—প্যালগ্রেভ টেক্সট-বুক, স্টুডেন্টদের ইস্যু করা হয় না। একটু মুখ ফিরিয়েই আবার বই দেখতে
লাগলেন সত্যেন রায়, তারপর দু-খানা বই বের করে নিয়ে টেবিলের ধারে এসে দাঁড়ালেন।
স্বাভী একবার তাকাল, আবার তাকাল, তারপর হঠাৎ সত্যেনবাবুর চোখ পড়ল তার উপর।
লাইব্রেরিয়ানকে তিনি বললেন—দেখুন না মেয়েটি কী চায়। বই দু-খানার নাম প্রচুর পরিশ্রম
করে খাতায় তুলতে-তুলতে লাইব্রেরিয়ান বললো—আজ আর ইস্যু হবে না।

স্বাভী মন-মরা হয়ে ফিরে এল। আস্তে আস্তে হেঁটে লাইব্রেরির দরজা পর্যন্ত এসেছে, এমন
সময় হঠাৎ বুপ করে একটা বই যেন ছিটকে তার পায়ের কাছে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে নিচু
হয়ে বাঁ হাতে সেটি তুলে নিলেন সত্যেন রায়, ডান হাতে এক পাজি বই কোনোরকমে
সামলে।—এত বই! স্বাভীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সলজ্জ একটু হেসে সত্যেনবাবু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বইগুলি দু-ভাগ করে দু-হাতে নিলেন। স্বাভীও
থেমে গেল, চোখ দিয়ে বইগুলি একবার স্পর্শ করে দেখা-বাধা গলায় বললো—
আপনি...আপনি আমাদের ক্লাশ আর নেন না? বইয়ের দুটি স্তুপের উপর প্রোফেসরের দুই
হাতের আঙুল একটু চঞ্চল হয়ে উঠল, মৃদুস্বরে বললেন—কোন ইয়ার তোমার?

ফার্স্ট ইয়ার...এনশেন্ট ম্যারিনার পড়াচ্ছিলেন আমাদের...খুব ভালো লেগেছিলো।

ভালো কবিতা। ভালো লাগাই উচিত—বলেই সত্যেনবাবু যেন এগিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ থেমে,
স্বাভীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি কবিতা ভালোবাসো?

কবিতা? আমি... কী জবাব দেবে, কী-কথা বললে ঠিক হবে স্বাভী ভেবে পেল না।

রবীন্দ্রনাথ পড়েছো?

এ-প্রশ্নেরও কোনো উত্তর দিতে পারল না স্বাভী।—রবীন্দ্রনাথ পড়ো। নিজের বই-খানা হাতের

দিকে তাকিয়ে সত্যেনবাবু আবার বললেন।—আর... এ-কলেজের লাইব্রেরির কোনো আশা রেখো না—বাঁ হাতের স্তূপ থেকে ডান হাতের দু-আঙুল দিয়ে সুকৌশলে ছোটো একটি বই বের করে আনলেন তিনি—এ-বইটা পড়ে দেখো। প্রফেসরের দু-আঙুলের ফাঁক থেকে স্বাতী বইটা নিজের হাতে নিল। মলাটের ভিতরে পাতায় লেখা নামের দিকে তাকিয়েই মুখ তুলে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে আর সময় না দিয়ে দু হাতে দুই বইয়ের বোঝা নিয়ে একটু দুলে-দুলে সত্যেনবাবু বেরিয়ে গেলেন।

গোল্ডেন-ট্রেজারির সবগুলি পাতা ওল্টাতেই স্বাতীর সাত-আট দিন লেগে গেল। যে-পাতাই খোলে, সেখানেই চোখ আটকে যায়...কত!...কত! কোনটা ফেলে কোনটা পড়বে! আট লাইনের ছোটো একটি যদি পড়ল, সেটাই পড়তে ইচ্ছে করে বার-বার, আবার সেই সঙ্গে তার পাশেরটিও তাকে টানে, আর তার পরেরটিও। ‘Spring, the sweet spring is the year’s pleasant king...the spring time, the only pretty ring time... mistress mine... Full fathom five...’ এসব কী? ...কী! ছাপার অক্ষর যদি গান করে, তাহলে কি মানুষ পাগল হয়ে যায় না? কতদিনে সে পড়ে উঠবে এ-বই, কত মাসে, কত বছরে?...একটি লাইনই তো সারা দিনে মাথা থেকে নড়ে না—এ রকম হলে সারা জীবনেই শেষ হবে না তো! কবে ফেরৎ দিতে হবে কিছু বলেননি উনি, তাই বলে অনেক দিন তো আর রাখা যাবে না। স্বাতী মাঝে-মাঝে কলেজে নিয়ে যেতে লাগল ফেরৎ দিতে, কিন্তু কোথায় সত্যেন রায়! তিনি ছেলেদের পড়ান, আর এখানে ছেলেদের আর মেয়েদের ক্লাশ আলাদা ভাগ করা—কেমন করে দেখা হবে? আর উনিও বেশ, বই দিয়ে ভুলেই আছেন একেবারে, চেয়ে পাঠালেও তো পারেন। কিন্তু চাইবেন কার কাছে, উনি তো আমার নাম জানেন না। এ রকম দেয়াই ঠিক না, আমি হলে দিতাম না ককখনো—এখন দরকার হলেই বা পাবেন কী করে, আমারই উচিত ফেরৎ দিয়ে আসা, না-দেয়াটা অন্যায় হচ্ছে। স্বাতী রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল এ নিয়ে, কিন্তু সত্যেন রায়কে আর ধরায় গেল না; একদিন দু-দিন করে-করে শীত কেটে গেল, গরম পড়ল, পরীক্ষা হল কলেজের, গ্রীষ্মের ছুটি এল।

* * * *

ছুটির মধ্যে বাবা একদিন বললেন—স্বাতী, আজকাল যেন তুই একটু মন-মরা না-তো! বকঝকে হেসে জবাব দিলো স্বাতী।

সারাটা দিন তোর তো একাই কাটে। স্বাতী চুপ করে রইলো।

ছোড়দির বাড়ি যাস না?

যাই তো।

দু-চার দিন থাকলেও তো পারিস গিয়ে?

না, বাবা—।

না কেন? শাস্ত্রী আমাকে বলছিলো সেদিন—

বাড়িতে ছাড়া আমার ভালো লাগে না কোথাও।

বেশ তো, বাড়িতেই বন্ধুদের আসতে বল।

বন্ধু পাবো কোথায়?

কেন, কলেজে পড়ছিস আজকাল—আমি ভেবেছিলাম কত রঙিন শাড়ি পরা-পর’ মেয়েরা আসবে বিকেলে—হাসি, গান, গল্প—চমৎকার!

এ-বিষয়ে ওস্তাদ ছোড়দি, না বাবা? কী হৈ-চৈ—আর কী-রকম নিশ্চুপ হয়ে গেছে বাড়িটা।

তোমার নিশ্চয়ই খারাপ লাগে?

তোর লাগে বুঝি?

আমার না।

মেয়ের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে রাজেনবাবু বললেন—দিদিরা তো মস্ত মিশুক এক একজন—তুই এ-রকম কুনো হলি কেন? ছেলেবেলার মতো একটুখানি শরীর বেঁকিয়ে স্বাতী বলল—আছি আছি কুনো। কুনোই ভালো।

কলেজে একটি মেয়ের সঙ্গেও ভাব হয়নি তো?

স্বাতী জবাব দিল না। একটু চুপ করে থেকে রাজেনবাবু বললেন—তোর দাদার খবর-টবর কিছু রাখিস? দাদার দু-একটা কথার সঙ্গে নিজের অনেকখানি ইচ্ছা মিশিয়ে স্বাতী খবর দিল—দাদা বোধহয় কোনো রেডিওর দোকানে কাজ শিখছে।

ভালো। উদাস মস্তব্য রাজেনবাবুর।

তোমার সঙ্গে আজকাল বুঝি দেখাশোনাই হয় না দাদার?

কোথায় আর!

ওর একটা অদ্ভুত ধারণা হয়েছে যে তুমি ওকে ভালোবাসো না।

মুখের অশেষ দোষ।

ঐ তো! ও-রকম যে বলো ও বুঝি আর বোঝে না?

মিথ্যে বলি?

সত্য হলেই বলতে হয় নাকি সব সময়?

বলাবলির আর আছেই বা কী—ঠোটে ঠোটে চেপে রাজেনবাবু চুপ করলেন।

বাবা, শোনো—স্বাতী তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়লো—সেদিন একখানা পুরোনো বই খুঁজে পেলাম—‘গীতাঞ্জলি’—মার নাম লেখা। আগে তো দেখিনি। রাজেনবাবু একটু ভেবে বললেন—কোন জন্মের বই। আছে এখনো? হাতে নিতেই রাজেনবাবুর চোখে পড়ল মলাট-ছেঁড়া বইয়ের প্রথম পাতায় লেখা নামটি। যেন চিনতেই পারলেন না সেই হাতের লেখা, সেই নাম। সাদা কাগজ হলদে হয়েছে, কালো কালি বাদামি—তবু হাতের লেখার সেই ঝড়াল, পাশাপাশি দুটো তালব্য-শ’র হাসি-হাসি মুখ—সেই নাম...নাম। চোখ সরতে গিয়েও আবার চোখ রাখলেন রাজেনবাবু। বাবার চোখের দৃষ্টি লক্ষ করে স্বাতী বলল—মা বুঝি ভালোবাসতেন এ-বই? বইখানা উল্টো করে গুইয়ে রাজেনবাবু বললেন—তখন তো ঘরে ঘরে ‘গীতাঞ্জলি’—কী-কাণ্ড! সকলের মুখে ওসব গান। আমার এক বন্ধু ছিল হরেন—কিদিন কত গান গুনিয়েছে সে—আর তোরা মা— হঠাৎ একটু থেমে, কেমন-একটু আড়ষ্ট হয়ে রাজেনবাবু যেন কোনোরকমে কথাটা শেষ করলেন—তোরা মা খুব খাওয়াতেন-টাওয়াতেন আর কী!

বলো, বাবা, বলো—বাপের গা ঘেঁষে বসল স্বাতী।

আর কী বলবো!

মা খুব গান ভালোবাসতেন, না?

ঐ তো—রান্নামাঝের বসে লুচি ভাজতেন, আর দরজার আড়াল থেকে গানের ফরমাস করতেন মাঝে-মাঝে।

আড়াল থেকে কেন?

তখন কি মেয়েরা বেরোত নাকি রে কারো সামনে—রাজেনবাবু হাসলেন।

কী বিব্রী! সঙ্গে-সঙ্গে স্বাতীর মস্তব্য। —ভাগ্যিশ সে-যুগে জন্মাইনি! তারপর?

তারপর কী রে! গল্প নাকি যে তারপর?

তোমরা তখন কোথায় ছিলে, বাবা?

তখন? শাঁখারিপাড়ায়।

শাঁখারিপাড়া কোথায়, বাবা?

আছে কলকাতাতেই কোথাও।

আমি তখন জন্মেছি?

দু—র! সয়স্বতীই ও-বাড়িতে জন্মাল।

দুটি-তিনটি শিশু নিয়ে মা-বাবার সেই গান-শোনা ঘোমটা-মানা সংসার স্বাতীর মনে হল স্বপ্নের মতো। এতো সুখ... বুকাটা যেন টনটন করে উঠল তার—এ সুখ আমি কি জানবো কোনোদিন? মা বেরোতে পারতেন না কারো সামনে, রান্নাঘরে বসে গান গুনতেন। তবু এত সুখ। আমি তো স্বাধীন, আমি তো কত কিছু পারি, কিন্তু...কিন্তু...এতে কি সুখ বেশি? ছোড়দি কি মা-র চেয়ে বেশি সুখী? সেই শাঁখারিপাড়ার মা-বাবার সঙ্গে তুলনা হয় নাকি ছোড়দি আর হারীতদার?... কেন হবে না? ছোড়দি খুব ভালো আছে, কত নতুন গায়গায় যাচ্ছে, কত নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে, মুখে তার ঝরে পড়ছে খুশি। কিন্তু... বাবা—স্বাতী একটু স্কীপ স্বরে বললো—আমাকে সেই শাঁখারিপাড়ার বাড়িটা দেখাবে একদিন?

কথা না-বলে রাজেনবাবু আর একবার তাকালেন কোন জন্মের পুরনো সেই ‘গীতাঞ্জলি’র দিকে। আর স্বাতী, উপড়-করা বইখানার গায়ে আস্তে হাত বুলিয়ে আস্তে বললো—সুন্দর গানগুলি, না বাবা?

রাজেনবাবু চোখ দিয়ে সায় দিলেন। বাবা—স্বাতীর কথায় লজ্জার ঢেউ উঠল—আমাকে দশটা টাকা দেবে?

কী চাই? তক্ষুনি বদলে গেল রাজেনবাবুর চোখ-মুখ।

রবীন্দ্রনাথের বই আরো কিনলে হয় না?

মোট দশ টাকা তার জন্য?

ও মা! তুমি কি ভাবছো আমি সব বই কিনব? দোকানে বলল যে সব কিনতে দেড়শো-দুশো টাকা লাগবে।

তা এমন কী বেশি! বইও তো বোধহয় দেড়শো-দুশো।

বেশ-তো! আনন্দের আলো জ্বলে উঠল স্বাতীর মুখে—মাসে-মাসে আস্তে-আস্তে—।

ইশ! খুব-যে হিসেবি হয়েছিস—রাজেনবাবু মেয়ের মাথাটি ধরে নেড়ে দিলেন।

* * * * *

‘মানসী’, ‘চিত্রা’, ‘কল্পনা’, ‘কলিকা’, ‘বলাকা’—টাকা নতুন বই ক’খানা বিছানায় ছড়িয়ে স্বাতী চুপ করে শুয়েছিলো দুপুরবেলায়। মেঘ করেছে আকাশে—ধোয়ারঙের... ছায়ারঙের... রাতরঙের মেঘ, উঁচু-উঁচু নারকোল গাছের মাথা কালো করে দিয়ে, কাঁপা-কাঁপা হাওয়ায় সেতারের মীড় তুলে-তুলে আকাশের মেঘ আস্তে-আস্তে স্বাতীর মনে ছড়িয়ে পড়ল। কেন মন ঝরাপ লাগে? কীসের দুঃখ আমার? কোনো দুঃখ তো নেই। তবে? কবিতা পড়ে পড়ে হল নাকি এ রকম? হারীতদার কথাই কি তবে ঠিক—তবে কি ইভা-শোভনা-সুপ্রীতির বোকা নয়—বা কোনো কাজে লাগে না সেটাই বাজে? ঠাসে ইকনমিস্ট পড়ো, মাথা থেকে সব ধোঁয়া বেরিয়ে

যাবে—হারীতদা তাকে বলেছিলেন। ধোঁয়া...মেঘও তো ধোঁয়া, কিন্তু মেঘ কি বাজে? যদি মেঘ না-হত, বৃষ্টি না-হত...

স্বাতী—! দাদাকে দেখে খুশি হয়ে স্বাতী উঠে বসল।

আলমারির চাবিটা দে তো একটু।

আলমারি তো খোলাই, শাড়ি বুঝি? বিজু জবাব না-দিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে শাড়ি বাছতে লাগল।

আর কতকাল তুই মেয়ে সাজবি রে দাদা?

বেশিদিন না—বিজু ঘাড় ফিরিয়ে হাসল—মেয়ে পুরুষে মিলে যে-রকম নাটক লাগিয়েছে আজকাল, যাকে বলে জীবননাট্য। কথাটা অগ্রাহ্য করে স্বাতী বলল—ছেলেবেলায় তবু একরকম, তাই বলে এখন নাকি দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে মেয়ে সাজলে মানায়!

দাড়ি-গোঁফ তো এমনিই সবাই কামায় আজকাল—বিজু জবাব দিল—আর মানাবার কথা কী বলছিস, ঢাকুরেতে ষোড়শী করেছিলাম, তিন দিন পর্যন্ত আর কোনো কথা বলেনি কেউ। স্বাতী হেসে উঠল।

দেখলে আর হাসতিস না ও রকম করে! ভালো শাড়ি কিছু নেই রে তোর, ছোড়দির কত ছিল! এই নীলাম্বরীটা—

ওটা নিস না, দাদা, ওটা মার—চুঁচিয়ে উঠলো স্বাতী।

দেখি না একটু!

না, না, দেখতে হবে না—রেখে দে! লাফিয়ে খাট থেকে নেমে স্বাতী হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল। এক পলক তাকিয়ে বিজু বলল—থাক বাবা, থাক। তোরই মা, তোরই বাবা, আমার তো কেউ নয়।

মার শাড়িখানা যথাস্থানে ফিরিয়ে রেখে স্বাতী বলল—তাই বলে তোদের ঐ গোলমালের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে! না। সেবার হারালি তো আমার অত সুন্দর ঢাকই জামদানিখানা!

ভারি তো! পাঁচ টাকা দাম!

তা যা-ই হোক, কী-সুন্দর কচিপাতা রঙটা ছিলো! আর পাঁচ টাকা এমন কমই... কী!

তোর আবার টাকার অভাব! বাবার কাছে চাইলেই তো পাস—

তুই পাস না? বিজু এ-কথার জবাব দিল না; বিছানার ধারে এসে ছড়ালে বইগুলির দিকে তাকিয়ে বলল—কিনলি? তা আমাকে কেন বললি না, শস্তায় এনে দিতাম।

বইয়ের আবার শস্তা দাম আছে নাকি?

তুই জানিস কী?—জ্ঞানের গৌরবে বিজুর চোখ দুটি চকচকে হয়ে উঠল। —এই-তো ‘শেষ রক্ষা’ করছি আমরা। ছ’কপি বই লাগবে। এক টাকার বই চোন্দো অনায় আনিয়ে দিলেন গ্রন্থ দত্ত।

কে?

নামও শুনিসনি? কী তাহলে কলেজে পড়িস, এত বড়ো কবি একজন! ‘ষোড়শী’ দেখতে ধরে এনেছিলাম ওঁকে। আমার পাট দেখে বললেন—

কবি? কবিতা লেখে?

লেখে মানে? ঠোটে ঠোট চেপে আওয়াজ করে বিজু বলল—কত বই ওঁর। তাই-তো সব বই কম দামে কিনতে পান। জানিস, আমাদের ‘শেষ রক্ষা’তেও আসবেন!

গোফ-কামানো ইন্দুমতীকে দেখতে?

রাখ, রাখ, তোরাই যেন ভাল পারিস এর চেয়ে? পাইচারি করতে-করতে বিজু সগর্বে বলতে লাগল—বিলেতেই অ্যাকট্রেস ছিল নাকি শেক্সপীয়রের সময়? চীনদেশে তো এখনও নেই। স্বয়ং জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর নটী সাজেননি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে? দাদার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে স্বাতী বলল— কার কাছে শুনেছিস, এ-সব?

যার কাছেই শুনি না! বিজু খাটের উপর বসে পড়ে মনে করবার চেষ্টা করল এ বিষয়ে ধ্রুব দত্ত আরো কী বলেছিলেন। একটু পরে চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে বলল—একবার দেখে আয় না কেমন, তারপর বলিস।

না—

তা যাবি কেন? আমি যেখানে আছি সেখানে কি তুই যেতে পারিস! জীবনে কখনো যা করলি না, সে-রকম একটা কাজ তোকে করতে বলাই ভুল হয়েছিল আমার।—বিজু মুখ লাল করে উঠে দাঁড়াল।—কথায়-কথায় তোর রাগ ওঠে কেন রে দাদা?

রাগ আবার কী? অন্যেরা যত ভালই বলুক, আমি যা করি তা-ই তোর কাছে বাজে! স্বাতী হেসে ফেলল।—তোকে ভাল বলতে আমার ভাল লাগে না। কিন্তু অন্যেরা ভাল বললে ভাল লাগে।

শুনিস না তো কী বলে সবাই—বিজু তক্ষুনি নরম হল। আমিও ভাবছি রে—হঠাৎ গলে গিয়ে বোনকে সে মনের কথাটা বলে ফেলল—আর মেয়ে সাজব না। দু-একবার হিরোর পার্টে নামতে পারি যদি, তা হলেই ফিল্মে একটা চান্স পাওয়া যাবে।

ফিল্মে...?

এখন বসিল না কাউকে কিছু—বিজু চোখ টিপল।—দ্যাখ-না একেবারে অবাক করে দেব! দাদা, তুই-যে সেই রেডিওর দোকানে—

হয়েছে, হয়েছে—বিজু ব্যস্ত হয়ে উঠল—পছন্দ করা শাড়ি তিনখানা তাড়াতাড়ি কাগজে জড়িয়ে নিতে নিতে বলল—তাহলে কাল যাবি নাকি?

বাবা যদি যান—

বাবার দরকার কী রে? এই তো এখানে সাদার্ন এভিনিউ আর ল্যান্ডাউন রোডের মোড়ে—তাছাড়া ছোড়দিরাও— কথা শেষ করবার সবুর সইল না বিজুর।

আবার একা ঘরে মেঘলা দুপুরে স্বাতীর মন খারাপ লাগল। চুপচাপ পড়তে বড়ো রাস্তার ট্রামের শব্দ হঠাৎ শোনা গেল। ঠিক যেন কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেলল ঘরের মাঝে। কোথাও তার চলে যেতে ইচ্ছে করে। কিছু তার করতে ইচ্ছে করে, কী-যেন দেখতে, শোতে, জানতে ইচ্ছে করে...না, কপালে হাত বুলিয়ে স্বাতী মনে মনে বলল—কিছু না। জামলা দিয়ে চোখে পড়ল আকাশে মেঘের ফাঁকে নীল, আর গাছের কচি-কচি পাতা-ভরা সবুজ মাথা। আর সেই নীল আর সবুজের মাঝখানে আস্তে উড়ে চলা শান্ত, নিশ্চিন্ত, কুচকুচে কালো একটা কাক। কী সুখী ঐ কাক! দেখেও সুখ। কিন্তু এ কীরকম সুখ যাতে আরো বেশি মন খারাপ হয়ে যায়!

পরের দিন বেশ তোড়জোড় করেই সে দাদার 'শেষরক্ষা' দেখতে গেল ছোড়দি আর হরীতদার সঙ্গে। বইখানা পড়ে কী হেসেছিল একবার! তখন যদি কেউ তাকে বলত, রবীন্দ্রনাথ পড়ো, তাহলে এতদিনে...কী হত? বই পড়ে কী হয়? বই পড়েই কি সুখী হয় মানুষ? কবিতা পড়ে কি পেট ভরে? বিলেত থেকে এই শিখে এলেন হরীতদা! কবিতা পড়ে দুঃখ বাড়ে, তাই তো

কেউ কবিতা পড়ে না...দুঃখ?

* * * * *

সামনের দিকের চেয়ারে সসন্মানে বসে স্বাতী একবার মুখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দর্শকদের দেখে নিল। মনে হল, রাজ্যের বাজে ছোকরা আর মোটা-মোটা গিল্মি আর বিরক্ত চেহারার আধ-বুড়ো পুরুষ জড়ো হয়েছে এক জায়গায়। কিন্তু মানুষ তো তার চেহারা...চেহারাটা কিছুই কি নয় তাই বলে? বাবাকে দেখে কে না বলতে পারে যে অমন ভালমানুষ হয় না! আর সত্যেন রায়ের মুখ দেখেই বোঝা যায় যে তিনি কবিতা-পড়া মানুষ। তাই তো মেয়েগুলো সাহস পায়। 'ঐ ধ্রুব দত্ত এলেন।'—কথাটা কানে যেতেই স্বাতী তাকাল। তিন-চার জন ভলাশ্টিয়র পায়ে-পায়ে বিনয় বরিয়ে তাদের প্রধান অতিথিটিকে এনে বসাল একেবারে সামনে। বাচ্চাদের সতরঞ্চির ধারে একটু আড় করে পাতা একটি স্বতন্ত্র চেয়ারে। বোধহয় তাঁর আসবার জন্যই দেরি হচ্ছিল। একটু পরেই পরদা উঠে পালা আরম্ভ হল।

স্বাতীর চোখ মাঝে-মাঝে সরে আসছিল নাটক থেকে ধ্রুব দত্তর দিকে। কবি! একজন কবি! এই প্রথম একজন জ্যাস্ত কবিকে চোখে দেখল সে। মুখ দেখা যাচ্ছিল আধখানারও কম, চেয়ারের মধ্যে কেমন এলিয়ে, মাথা নামিয়ে, পা দুটোকে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে বসেছেন ভদ্রলোক। অথচ সুস্থির ভাব নেই, ওরই মধ্যে অবিশ্রান্ত নড়াচড়া করছেন, আর সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন ক্রমাগত একটার পর একটা। ইনি কবিতা লেখেন? ঐ-রকম করে সাজাতে জানেন কথা? বোবা অক্ষরকে দিয়ে গান গাওয়ান?...ঐ রকম দেখতে? ছোটো করে ছাঁটা চুল, মোটা ঘাড়, শক্ত-শক্ত হাত—একেবারেই সত্যেন রায়ের মতো নয় তো! কিন্তু হবেই বা কেন, সত্যেন রায় কি কবি? আর হলেই বা কী? দু-জন কবি কি একরকম হয় দেখতে? দু-জন মানুষ কি একরকম হয় কখনো? সে কেন ভাবছিল? সত্যি, কী বোকার মতো...চোখ সরিয়ে নিল, নাটকে মন দিল। প্রথম অঙ্ক শেষ হবার পর হারীত বলল—উঠবে নাকি এবার?

এখনই? শাস্বতী আপত্তি জানাল।—বেশ তো লাগছে, আর বিজুকে সত্যি মেয়ে মনে হচ্ছে। মন্দ কী—দাঁতে পাইপ চেপে হারীত বলল। ক্যাপিট্যালিজম-এর রাজত্বে এর বেশি আর কী হবে! শাস্বতী মিইয়ে গিয়ে বলল—কেন, ভাল না?

কী-রকম ইনিয়-বিনিয়ে কথা বলছে সবাই! হারীত ছোটো করে হাসল—জীবনে যাঁরা কোনো কাজ করে না...

সে-তো ঠিকই—ছোড়দির খোঁপার পিছন দিকে তাকিয়ে স্বাতী বলল—রাজ্যের লোকেরা কি কথা বলে!

অস্তুত ইনিয়-বিনিয়ে বলে না—হারীত জবাব দিল।

চিবিয়-চিবিয় বলে—সঙ্গে সঙ্গে স্বাতীর প্রত্যুত্তর। হারীত গম্ভীর হয়ে চুপ করল। আর দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে একেবারেই উঠে দাঁড়াল—না, আর না, বলে। শাস্বতী উশখুশ করে বলল—কী স্বাতী, যাবি?

যে-উত্তর সে চেয়েছিল তা পেল না। তোমরা গেলেই যাব, বলতে-বলতে স্বাতীর চোখ ফিরল ধ্রুব দত্তর দিকে। স্বামীর মুখের দিকে চকিতে একবার তাকাল শাস্বতী, কোনো আশা পেল না। কী মুশকিল! কে জানত 'শেষ রক্ষা' নাটকও সর্বনেশে ক্যাপিট্যালিজম-এরই একটি বিষফল। বেশ লাগছিল, আর এমন বেশিক্ষণও তো নয়! হঠাৎ হারীত বলল—তোমরা তাহলে থাকো, আমি চললাম। তক্ষুনি উঠে দাঁড়াল শাস্বতী, একটু পরে স্বাতী।

ইচ্ছে হলে থাকো না তোমরা—দু-সারি চেয়ারের ফাঁক দিয়ে একটু এগিয়ে-হারীত থামল। শাশ্বতী কথাটা শুনল, মুখ দেখল না।—থাকব? তার গলার স্বরে খুশি গোপন থাকল না—তুমি কি তাহলে ঘুরে আসবে আবার?

আমার আর আসবার দরকার কী? ফিরতে পারবে না একা? আর না-ই ফিরলে না-হয়, ও বাড়িতে থেকে রাতটা...বলতে-বলতে হারীত তাকাল স্ত্রীর দিকে। শাশ্বতী আর কথা বলল না, মাথা নিচু করে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এল। রাগ? এই নিয়ে এত রাগ? আর স্বাতীর সামনে? এ রকম রাগ করতেও জানে? তা মনের কথাটা প্রথমেই খুলে বললে হত, আমি কি জোর করতাম? রাস্তায় এসে হারীত হাঁটতে লাগল পুরো পুরুষালি কদমে। স্বাতী বলল—একটু আস্তে হারীতদা।

তোমার অসুবিধে হচ্ছে?

আমার না ছোড়দির। মোটা হয়ে পড়েছে কিনা।

তোমাদের সঙ্গে চলতে আমারই অসুবিধে—বলে হারীত দয়া করে একটু ডিল দিল হাঁটায়। কী আর করবেন, অসুবিধেটা নিজেই ঘটিয়েছেন যখন—স্বাতী আড়চোখে তাকাল ছোড়দির দিকে। কিন্তু শাশ্বতী কিছু বলল না, হারীতও চুপ। হনহন হেঁটে কয়েক মিনিটেই তারা দেখতে পেল টালিগঞ্জের ব্রিজ। গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে হারীত বলল—আমরা এখান থেকেই ট্রাম ধরি। যাঃ! কথাটা উড়িয়ে দিল স্বাতী। কিন্তু হারীত শক্ত হয়ে দাঁড়াল ট্রাম-স্টপের কাছে। শাশ্বতীর শরীরে যেন একটা ঢেউ উঠল। ঢেউ মিলিয়ে গেল, গলা পর্যন্ত এসে ফিরে গেল কথা। দুই কণ্ঠার ফাঁকে ছোটো গর্তটুকু যেন কেঁপে-কেঁপে উঠল। ঢোঁক গিলে, নেকলেসে একবার হাত রেখে গায়ে-মাথায় আঁচল টেনে স্থির হল সে।

আসুন, বাঃ! স্বাতী হারীতদাকে ডাকল।—আজ আর থাক। হারীত তাকাল ট্রামের আশায়। রাস্তার ইলেকট্রিক আলোর তলায় মুহূর্তের জন্য চোখাচোখি হল দু-বোনে। শাশ্বতী আগে চোখ নামাল, নিচু করল সিঁদুর-ছোঁওয়ানো মাথা। ফিরিয়ে নিল ঈষৎ রঙ-বোলানো মুখ। বাঁকের নুখে দেখা দিল আলো-জ্বলা ট্রাম। আচ্ছা যাই—কোনোদিকে আর না তাকিয়ে স্বাতী তাদাতাড়ি ঢুকে পড়ল বাড়ির গলিতে।

রাজেনবাবু শুয়েছিলেন চোখ বুজে, কপালে হাত রেখে। শব্দ শুনে উঠে বসে বললেন—ওরা কোথায়?

ওরা বাড়ি গেল, বাবা।

এল না?

একটুও দেরি না করে স্বাতী জবাব দিল—হারীতদার কাছে কম যেন আসবার কথা সাড়ে-নটার সময়। জরুরী কাজ, তাই...

একটু এল না!

আহা, তোমার আবার সবটাকেই বাড়াবাড়ি। এখান থেকে এখানে, কালই হয়তো আসবে আবার।

তুই কার সঙ্গে এলি?

আমি? আমি... মস্ত দল এল পাড়ার। দাদা কী সুন্দর করল, বাবা দাঁড়াও, সব বলছি এসে—এক ছুটে কাপড় বদল এল স্বাতী। পিঠের উপর কোঁকড়া ঘন চুল ছড়িয়ে দিয়ে বসে বসে সবিস্তারে বর্ণনা করতে লাগল নাটকের। প্রত্যেকের গলার আওয়াজ, বলার ধরন এমন করে

নকল করল, যে রাজেনবাবু শব্দ করে হেসে উঠলেন কয়েকবার।

খুব যেন একটা গোলমালে স্বাতীর ঘুম ভেঙে গেল রাস্তিরে। বাইরে শৌ-শৌ ঝড়। ঘরের মধ্যে হাওয়ার হৈ-চৈ, আর জানলার ঠকাশ-ঠকাশ শব্দ। একলা অন্ধকারে ভয় পেয়ে হঠাৎ সে ডেকে উঠল—ছোড়দি! তারপরেই পাশ ফিরে ভাল করে চোখ মেলে তাকাল। ঘরের মধ্যে আর-এক কোণে ছোড়দির খাট পড়ে আছে এখনো। খালি-খালি বিত্ৰী দেখাচ্ছে, আর জায়গাও জুড়ে আছে মিছিমিছি।...কী ছেলেমানুষ ছিলাম! একা শুতে পারতাম না কিছুতেই, কত বড়ো হয়েও বাবার কাছেই শুয়েছি। তারপর মা যখন... তখন থেকেই ছোড়দি আর আমি। বাবা আলাদা করে দিলে কী হবে, আমি ছোড়দির খাটেই বকরবকর করতাম শুয়ে-শুয়ে। ঝগড়া করে নিজের বিছানায় এসে উপুড় হয়ে পড়তাম। তারপরেই আবার ডাকতাম—ছোড়দি! নিজের সেই ঘুমে-ভরা ভাঙা-ভাঙা গলার ডাক স্বাতী যেন কানে শুনতে পেল।... কে ভেবেছিল একা একা ঘরে... কেন, ভাবতে না পারার কী আছে, এ তো জানাই জানা। আর এখনো ছেলেমানুষ আছো নাকি যে রাত্রে ঘুম ভাঙলে ভয় করবে! ওঠো, আলো জ্বালো, জানলা বন্ধ করো! ভাবতে-ভাবতেই আলো জ্বলে উঠল তার চোখে বাড়ি মেরে। আর স্বাতী তক্ষুনি চোখ বুজে ফেলল, কিন্তু দেখতে লাগল মিটিমিটি। কাছের জানলাটা বন্ধ করে দূরের জানলা দুটোয় ছিটকিনি লাগিয়ে খুলে রেখে বাবা এসে দাঁড়ালেন তার বিছানার ধারে। বাবা! চোখ মেলে হেসে উঠল সে। জেগেছিস?

তুমি আবার উঠে এসেছ কেন?

তবু একটু ঠান্ডা হল, বাঁচলাম!

বাবা, দাদা ফিরেছে?

কই, না!

রাত-বিরেতে না-ফেরাই ভাল, কী বল? সে কথার জবাব না দিয়ে রাজেনবাবু আলনা থেকে একখানা খদ্দেরের চাদর এনে মেয়ের গায়ের উপর বিছিয়ে বললেন—ঘুমো এখন।

বাবা, একটু বসবে আমার কাছে? থাক, শোও গিয়ে। রাজেনবাবু বসে বললেন—বৃষ্টি নামল। বৃষ্টিটা বেশ, না রে?

খুব ভাল, বাবা, খু—ব ভাল লাগে—উষ্ণ নিশ্চিন্ত আরামে স্বাতীর কথা জড়িয়ে এল। বাবা, শোনো, ঐ খাটটা তো কোনো কাজে আর লাগে না—

হ্যাঁ, ওটা সরিয়ে দেব। জাজিম-পাতা, বিছানাহীন শূন্য খাটটার দিকে রাজেনবাবু একবার তাকালেন। তারপর দুই চোখ ভরে দেখতে লাগলেন তাঁর সবচেয়ে ছোটো, সবচেয়ে সুন্দর, তাঁর সর্বশেষ, তাঁর একমাত্র কন্যাকে। স্বাতীর চোখে তখন বাসায় বসে থাকা ঘুম, সে দেখছে অনেক ভিড়, লোকজন... নাটক আরম্ভ হবে এখনি, ধ্রুব দত্ত সিগারেট খাচ্ছেন বসে বসে, কিন্তু ছোড়দি নেই, হারীতদাও না, চারদিকে অচেনা মুখ, জায়গাটা অচেনা। কোথায় এল সে, কেমন করে এল? আরে, ঐ-তো বাবা! —বাবা! ঘুমে-ভরা ভাঙা-ভাঙা স্বরে ডাকল একবার। —বাবা এটা তোমার হাত? হাত বাড়িয়ে টেনে নিল বাবার হাতখানা। আঁকড়ে ধরে তক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়ল। বাইরে বৃষ্টি, বৃষ্টি।

কেটেছে স্বাতীর, আগে কখনো এমন দ্যাখেনি। সে যেন চোখে দেখতে পেল ঘাসের ঘন হওয়া, গাছপালার বেড়ে ওঠা, মাটির সুখ, শিকড়ের খুশি। লম্বা, মেঘলা-একলা দুপুর, রঙের আহ্লাদে গলে-যাওয়া বিকেল, আর রিমঝিম রাত্রি। আর মাঝে মাঝে মেঘ-ছেঁড়া ভিজ-ভিজ জোছনা। এত ভাল লাগে, ভাল লাগে বলেই একা লাগে, আবার মানুষের সঙ্গও বেশি ভাল লাগে না। এইরকম একটা আবছায়ার মধ্যে তার যেন দম আটকে এল। কলেজটা খুললে বাঁচে।

সেদিন সকালে শহর স্নান করে সেজে-গুজে ফিটফাট, যেন সে জানে আজ স্বাতীর কলেজ খুলবে। বই হাতে নিয়ে হালকা পায়ে বেরোল বাড়ি থেকে। সবুজ পৃথিবী, ঝকঝকে রোদদূর, তার শরীরে সুখ আর ধরে না। রাস্তায় যদি লোক না থাকত ঘুরপাক খেয়ে নেচে নিত একবার। ট্রামে মেয়েদের সিট ছেড়ে দিয়ে সে বসল একেবারে সামনে এগিয়ে। কী হাওয়া, আর কী সুন্দর সাদার্ন এভিনিউর মোড় পর্যন্ত রাস্তাটি! কত গাছ, কত ঘাস, আর গাছের তলা দিয়ে ছাইরঙের ট্রামগুলি জলের হাঁসের মতো বেঁকে যায়। মিনিটে-মিনিটে যাচ্ছে, কিন্তু কেউ দ্যাখে না, কেউ কি দ্যাখে? ভাল লাগার জন্য কোথায়-না ছুটোছুটি করে মানুষ—সিনেমা, থিয়েটার, খেলার মাঠ। যে-কোনো জায়গায় যে-কোনো রকম একটা মেলা-টেলা কিছু হলে মেয়ে-পুরুষে ঝঁপেই, দোকানে-দোকানে ভিড় ধরে না, রেলগাড়ি চড়ে দূর-দূর দেশে চলে যায়। এদিকে কত ভাললাগা যে ছড়িয়ে আছে চোখের সামনে! নাম নেই, দাম নেই, টিকিট নেই, এত বড়ো শহরে আর কেউ তা জানে না? ভাল লাগার জন্য কোথাও যেতে হয় নাকি, কিছু করতে হয় নাকি! এমন-এমনিই তো ভাল লাগার শেষ নেই, ভাল না লেগে উপায় আছে মানুষের?

প্রথম ঘণ্টায় অনাদিবাবুর ক্লাশ। অনাদিবাবুকে বেশ তো ভাল দেখাচ্ছে আজ। চশমাটা বদলেছেন? না, একরকমই তো, দেখতেই ভাল উনি! কী আশ্চর্য! আশ্চর্য কেন, অনাদিবাবুকে দেখতে ভাল হতে নেই? আর তাঁর পড়ানোই বা এমন মন্দ কী? স্বাতী চোখের সামনে বই খুলল, কিন্তু অনাদিবাবু নাম ডাকা শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে স্বভাবত সুগভীর মুখে আরো গাভীর্য এনে বললেন—তোমাদের ক্লাশের উনিশ রোল-নম্বর মেয়ে, মায়া সান্যাল, ছুটির মধ্যে মারা গেছে—

অ্যা! অর্ধফুট উচ্চারণে চঞ্চল হয়ে উঠল দশ-বারোটি মেয়ে, মায়া সান্যালের বন্ধুস্বামী আর অন্যেরা তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে।

—তার স্মৃতির সম্মানরক্ষার্থে আজ তোমাদের ক্লাশ হবে না। তোমরা বাড়ি যেতে পার।—
কথা শেষ করেই অনাদিবাবু চলে গেলেন।

হাউ শকিং!

কী হয়েছিল?

কবে মরল?

তুই কিছু জানিস, অলকা? তোর বাড়ির কাছেই তো—

মাসখানেক আগেও দেখা হয়েছে আমার সঙ্গে। তারপর মামাবাড়ি গেলুম—অন্যদের চেয়ে চড়া গলায় ইভা বলে উঠল—একটা কন্ডোলেন্স মিটিং করা উচিত আমাদের।

নিশ্চয়ই! অলকার সোৎসাহ সমর্থন।

কবে করবি?—সুপ্রীতির প্রশ্ন।

আজই! এখনই!—ইভা টগবগ করে উঠল। —একটা রেজলিউশন পাস করে ওর বাড়িতে পাঠিয়ে দেব আজই।

কিন্তু অনেকে যে চলে যাচ্ছে—

ইভা লাফিয়ে উঠল প্রোফেসরের তক্তায়। আঙুলের গাঁট দিয়ে টেবিল ঠুকে বক্তৃতার ঢঙে বলল—বন্ধুগণ, আপনারা যাবেন না। মায়া সান্যালের জন্য কনডোলেন্স মিটিং করব আমরা। আপনারা যাবেন না, আপনারা বসুন। স্থির হয়ে বসুন। তবু চলে গেল কেউ-কেউ। অনেকে যেতে-যেতে বসে পড়ল। ইভা তাকিয়ে বলল—আচ্ছা, এতেই হবে। একজন আপত্তি তুলল— সভাপতি কোথায়?

লাগবে না—দ্রুত উত্তর দেয় ইভা। এটা আমাদের নিজেদের সভা, ছাত্রীদের সভা। আর এ-যুগে সভাপতি একটা অ্যানাক্রনিজম। নতুন শেখা ইংরিজি কথাটা ঠিক জায়গায় বসাতে পেরে ইভা বেশ খুশি হল মনে-মনে...একটা মেয়েও মানে জানে না নিশ্চয়ই—আপনারা কেউ কিছু বলুন, আমি রেজলিউশন ড্রাফট করি— ইভা গম্ভীরভাবে বসে পড়ল প্রোফেসরের চেয়ারে। এতই যদি সভাপতির শখ, তাকেই মনে করুক না। একটু ঠেলাঠেলির পর অলকা উঠে কিছু বলল, তারপর সুপ্রীতি, তারপর আরো দুটি মেয়ে। বলতে গিয়ে তারা ঠেকে গেল, ভুল করল, হেসে ফেলল। অন্যেরাও হাসল। মোটেও শোকসভার মতো লাগল না তখন। তারপর ইভা উঠে রেজলিউশন পড়ল, সবাই মিলে দাঁড়িয়ে গ্রহণ করল সেটি। আর সবশেষে ইভা বক্তৃতা করল জমকালো ভাষায় অনর্গল বেগে। মেয়েরা অবাক হল শুনে আর স্বাতীর মনে হতে লাগল যে মায়া মরেছে ইভাকে এই বক্তৃতার সুযোগটা দেবার জন্যই।

তার সামনের বেঞ্চিতে মায়া যেখানে বসত, সেখানে মাঝে-মাঝে তাকাচ্ছিল স্বাতী। সেই মানে জানতে চাওয়া মোটাসোটা মায়া। মরে গেল! মরে যাওয়া এতই সোজা? যে-কোনো মানুষ যে-কোনো দিন মরতে পারে?...আমিও? ভাগ্যিস—কথাটা লাফিয়ে উঠল স্বাতীর মনে, ভাগ্যিস আমি মরিনি! পৃথিবীর কোটি-কোটি মানুষের মধ্যে আমি না থাকলে কী হত? কিছু না, যদি আমি না-ই জন্মাতাম—তাতেই বা কী হত? কিছু না। এই-তো মায়া সান্যাল হঠাৎ 'হ্যাঁ' থেকে 'না' হয়ে গেল—কী হল তাতে? মা মরে গেলেন, তবু-তো আমরা বেঁচে-বর্তে আছি ভাল? হ্যাঁ, ভালই তো আছি।—হঠাৎ হাতুড়ির বাড়ি পড়ল হৃদপিণ্ডে—মার জন্য যে তার আর কষ্ট হয় না, সেই কষ্টে যেন বুক ফেটে গেল। তবে কি কারো জন্যই কিছু এসে যায় না? পৃথিবীকে না হলে এক মুহূর্ত চলে না আমার, কিন্তু আমাকে না হলে পৃথিবী তো চলবে চিরকাল। এই যে বৃষ্টি, হাওয়া, রোদ্দুর—এ কি আমার জন্য? এরা কি আমাকে চায়? কোনওরকমে হঠাৎ জন্মে গেছি পৃথিবীতে। জানি না কেমন করে না-মরে আছি। তবু তো সব পাচ্ছি—এই রোদ, বৃষ্টি, হাওয়া। মনে হয় আমারই জন্য সব। চায়, আমাকেই চায় ওরা। কিন্তু না-ই যদি চায় তাহলে আমি কেমন করেই বা হলাম! আমি না হয়ে অন্য কেউ তো হতে পারত, আমি হলাম কেন? রাস্তায় বেরিয়ে স্বাতী তাকিয়ে দেখতে লাগল আকাশের দিকে, আলোর দিকে, পাতা-কাঁপা গাছের দিকে। শোনো, তোমরা কি আমার কেউ নও? আকাশের উঠানে ছুটোছুটি খেলছে বাচ্চা মেঘেরা। বড়ো রাস্তার চকচকে গায়ের উপর দিয়ে লম্বা ছায়া লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে এল। গাছের চুল ধরে ঝাঁকানি দিয়ে হা-হা করে হেসে উঠল হাওয়া। আমাকে তোমরা চিনতে পারো না? উত্তর নেই, উত্তর নেই! মনে-মনে বানিয়ে নিতে হয় উত্তর, বলিয়ে নিতে হয় ওদের দিয়ে যে কথা শুনতে চায় মন।

কী ভাবছিস? পাশে চলতে-চলতে জিজ্ঞেস করল অনুপমা।

না তো!

মায়ার কথা ভাবছিস?

মায়ার কথা? না। মায়ার কথা কেন ভাবব? মায়ার কথা কে ভাবছে আর?

কিছু-না-কিছু তো ভাবছিসই—বলল সুপ্রীতি—তবে বলবি না, এই আর কি!

কেমন দেখাচ্ছে তোকে! রাস্তা পার হয়ে চিত্রা ঘুরে দাঁড়াল স্বাতীর মুখোমুখি—হয়েছে কী? কী আবার হবে!

প্রেমে পড়িসনি তো? হেসে উঠল সুপ্রীতি আর অনুপমা। আর স্বাতী বলল—হাসছিস কেন, প্রেমে পড়া কি হাসির কথা?

তাহলে সত্যি-ই!—কথাটার রেশ টেনে তিনজনে টেঁচিয়ে হেসে উঠল এবার। সত্যি না?—চাপা হাসির আভা স্বাতীর চোখে-মুখে।

বলবি কে?

আমি কি জানি যে বলব?

ফাজলামি—!

চল, ট্রাম—সুপ্রীতি ঠেলল চিত্রাকে। এমন সুখের চর্চাটায় বাধা পড়ল!—চিত্রা সুখী হল না, কিন্তু ট্রাম তো আর দাঁড়াবে না। লেডিজ সিট সব কটি ভরতি। চারটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রইল অ্যালুমিনিয়ামের হাতল ধরে। তাদের যে খুবই খারাপ লাগছিল তা হয়তো নয়, কিন্তু পুরুষদের এখনও এটা খারাপ লাগে। তাই পিছন দিকের লম্বা সিট থেকে একজন, তারপর দুজন, তারপর অনিচ্ছায় মুখ কালো করে আরো দুজন উঠে দাঁড়িয়ে ছাত্রীদের জায়গা করে দিল। এ ওর পিঠ ধরে ঝাঁকানি সামলে বসে পড়ল তারা। তারপর উদাসভাবে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল, যেন এ-ব্যাপারটা তাদের কিছু না। লজ্জাই করে, সত্যি। একটি মেয়ের বসবার জন্য দুজন পুরুষ সর্বদাই উঠে দাঁড়ায়। মেয়েটি হয়তো লেকে যাচ্ছে হাওয়া খেতে, আর পুরুষরা ফিরছে সারাদিন খেটে-খুটে ক্লান্ত হয়ে। কিন্তু উপায়ই বা কী! স্বাতী কপাল থেকে চুল সরাল—সত্যি-তো আমরা দুর্বল। আর তাছাড়া যতই-না দাপাদাপি করি, আমাদের অসুবিধেও! সমান-সমান বলে চ্যাচালে কী হবে, আমাদের শরীরই মেরে রেখেছে আমাদের। ঘেঁষাঘেঁষি ভিড়ের মধ্যে—বিশ্রী! অথচ আমাদের জন্য অন্যেরা দাঁড়িয়ে থাকে, সেটাও।

এ যে সত্যেন রায়—অনুপমা কানে-কানে বলল।

কে?

সত্যেন রায়, প্রোফেসর—মনে আছে, ইভার সঙ্গে ঝগড়া? ফিরে তাকাতেই চোখে পড়ল সত্যেন রায়কে। দাঁড়িয়ে আছেন এক হাতে চামড়ার স্ট্র্যাপ ধরে। আর-এক হাতে, মোটা-মোটা দুখানা বই বেশ কসরৎ করেই সামলাচ্ছেন। নিশ্চয়ই এখানে বসে ছিলেন তিনি? আমাদের জন্যই—অন্তত বই দুটো যদি নামিয়ে রাখতে পারতেন। আমার কিছু অসুবিধে নেই, কিন্তু বলি কী করে? তাকিয়ে আছেন সোজা সামনের দিকে। স্বাতী দেখতে পেল ঘাড় বেয়ে চুল নেমেছে, এবার ছাঁটা দরকার। পাঞ্জাবির একটা পকেট ছেঁড়া—জানেন তো? না, পয়সা-টয়সা পড়ে যায়?—আর দেখল পায়ের চাপে গোড়ালির উপরের সৰু হাড়টা ফুলে-ফুলে উঠছে। কথা বলার আশাই নেই। ট্রামের মিনিট-দশেক সময় স্বাতীর ভারী অস্বস্তিতে কাটল। সেই বইটার কথা বলতে পারত না এখন! মেয়ে হবার অসুবিধে কত! ছেলে হলে উঠে দাঁড়াতে পারত, কথা বলতে পারত কাছে গিয়ে। আবার কবে দেখা হবে! স্বাতী নামে সকলের আগে। বন্ধুদের কাছে চোখে-চোখে বিদায় নিয়ে উঠেই সে দেখল সত্যেনবাবুও নামছেন সেই স্টপে। কিন্তু

তাতে কী, সে রাস্তায় পৌঁছতে-পৌঁছতে ভদ্রলোক হনহন করে রাস্তা পার হতে লেগেছেন আর সে ট্রাম-লাইন পার হবার আগেই ঢুকে পড়েছেন তাদেরই পাশের গলিতে। যেন জানতে পেরে ইচ্ছে করে এড়িয়ে গেলেন। কিন্তু এখানে কোথায়? চেনাশোনা কেউ আছে বুঝি? আসেন নাকি মাঝে-মাঝে? গলির মধ্যে সাদা পাঞ্জাবির মিলিয়ে যাওয়া দেখতে-দেখতে স্বাতীর মনে কেমন একটা আশাও হল।

এর ঠিক দুদিন পরে আবার দেখতে পেল সত্যেন রায়কে। তাদেরই ট্রাম-স্টপে অপেক্ষা করছেন কাঁধে চাদর বুলিয়ে, একখানা কাগজ-মলাটের বই এক হাতে উল্টিয়ে চোখের সামনে খুলে। স্বাতী তাকাল, এক পা এগিয়ে এল, আবার পেছোল; চোখ নড়ল না বই থেকে। হুশ করে ট্রাম এসে দাঁড়াল। সত্যেনবাবু উঠতে গিয়ে মহিলা দেখে হাতল ছেড়ে দিলেন। স্বাতীও হাত বাড়িয়ে সরে এল প্রোফেসরকে সম্মান জানিয়ে। ইতিমধ্যে ট্রাম দিল ছেড়ে। সত্যেনবাবু চোঁচিয়ে উঠলেন— এই রোক্কো! কিন্তু কেজো ট্রাম কথা শুনল না। মজা হল—বেরিয়ে গেল স্বাতীর মুখ দিয়ে। সত্যেনবাবু এক পলক তাকালেন। মুখের ভাবে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর দোষেই ট্রামটা ধরা গেল না। কিন্তু ভদ্রমহিলার মুখে এই মন্তব্যটাও তিনি আশা করেননি।

আমাকে...আমাকে চিনতে পারছেন না?

আপনি—প্রোফেসরের চোখ পড়ল স্বাতীর হাতের বইয়ের উপর। থমকে গিয়ে, ‘আপনি’ ‘তুমি’ দুটোই এড়িয়ে, অস্পষ্টভাবে বললেন—কলেজে বুঝি?

আপনি আমাকে—স্বাতী কথাটা পাড়তে আর দেরি করল না—আমাকে একখানা বই দিয়েছিলেন অনেকদিন আগে—

নাকি?

মনেই নেই? স্বাতী একটু ব্যথিত হল। বইটা ভুলেছেন, আর সেইসঙ্গে যাকে দিয়েছিলেন তাকেও? ক্ষীণ স্বরে বলল—কলেজের লাইব্রেরিতে একদিন—

লাইব্রেরির বই? একটু উদ্বিগ্ন প্রশ্ন সত্যেনবাবুর।

না, আপনারই। গোস্বেডন ট্রেজরি—

ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ—সত্যেনবাবুর মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। —পড়েছে?

চেষ্টা করেও ফেরৎ দিতে পারিনি এতদিন—

কেন, ভাল লাগল না?

স্বাতী বুঝতে না-পেরে চোখ তুলল মুখের দিকে।

সত্যেনবাবু আবার বললেন—এর মধ্যে হয়ে গেল পড়া?

সাত মাস আট মাস হল—

মাত্র সাত-আট মাসেই পড়ে ফেললে!

একটু লজ্জিত, একটু বিব্রত মুখ তুলে স্বাতী তাকাল এবারেও।

কবিতার বই আমি ধার নিই না কখনো—। স্বাতীর চোখের প্রশ্নের উত্তর দিলেন সত্যেনবাবু—
দিইও না। ও তুমিই রাখো।

না, না, আমি কেন, আপনি—কী আশ্চর্য—

আশ্চর্য কিছু না—সত্যেনবাবু একটু হাসলেন। অন্য বই পড়ে শেষ করলেই শেষ হল। কবিতা তো আর শেষ হয় না কখনো, নিজের না-থাকলে চলে! স্বাতী অবাক হল কথা শুনে। বাধো-বাধো ভাবটা চেষ্টা করে কাটিয়ে উঠে বলল—তাই বলে যে-কোনো লোককে যে-কোনো বই

দিয়ে দেবেন?

না! কিন্তু সত্যি যারা ভালবাসে তাদের তো দিতেই হবে।

তাহলে আপনার নিজের বই আর থাকবে না।

সে-ভয় নেই। সে-রকম মানুষ খুব কমই।

আমি কি সেই খুব-কমদের একজন? স্বাতীর মনে প্রশ্ন উঠল। কী করে বুঝলেন? আমাকে তো চেনেনও না। কথাটা বলা যায় কিনা, কী-রকম করে বললে ঠিক হয়, তা ভাবতে-ভাবতে আবার ট্রাম এল। অন্য দিনের মতো সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লজ্জা করল স্বাতীর, বসে পড়ল মেয়েদের সিটেই। সত্যেনবাবু যে পিছনের দিকে বসে আছেন একটা মুহূর্তের জন্যও ভুলতে না-পেরে এই ট্রামে-যাওয়াটুকু অন্যদিনের মতো উপভোগ করতে পারল না। ঠিক কলেজের সামনেই ট্রাম দাঁড়ায়। নামবার সময় সত্যেনবাবু সরে দাঁড়ালেন স্বাতীর জন্য। তারপর একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতেই ঢুকলেন কলেজে। নানা দিক থেকে মেয়েরা আসছে তখন। কেউ একা, অনেকে ছোটো-ছোটো দলে। গেট পার হয়েই স্বাতী যেন ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল—তাই তো! কোনো কথাই তো হল না! ...কী কথা? ভেবে কোনো কথা পায় না...কত যেন কথা আছে মনে হয়।

আবার দেখা হল একদিন। বৃষ্টির পরে ঝিলমিলিয়ে রোদ উঠেছে সন্দের একটু আগে। পশ্চিমের মাঠে বেড়িয়ে ফিরছিল স্বাতী। এখন অবশ্য ঠিক মাঠ বলা যায় না আর। বাড়ি উঠছে, রাস্তা হচ্ছে, মোষের গাড়ি পিষে দিয়েছে ঘাস, চওড়া-চওড়া টাক পড়েছে সবুজে। তবু এখন মাঠ ছেড়ে গলিতে ঢুকলেই মন খারাপ লাগে। কিন্তু আর ক'দিন পরে সবই তো গলি হয়ে যাবে। মাঠের গা ঘেঁষে পুরোনো একটি দোতলা, পশ্চিম-মুখো, সূর্যাস্তের মুখোমুখি। তারই একতলায় সরু বারান্দায় রেলিঙে হাত রেখে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সত্যেন রায় দেখলেন, বেগনি রঙের শাড়ি পরা একটি কালো চুলের মেয়ে যেন হলদে আলোর নদীতে নেয়ে উঠে এল। কাছে আসতেই চিনতে পারলেন। পাশ দিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ চোখ তুলে থমকে দাঁড়াল স্বাতী। আরে! উনি?—আপনি! কথাটা এমন বেগে তার গলা দিয়ে বেরল যে নিজের কানেই বেখান্না শোনা, চোখ নামিয়ে নিল একটু লাল হয়ে।—কেমন? ভালো? প্রোফেসরের কুশল-প্রশ্ন। আপনি এখানে? এবার খুব মৃদু সুর স্বাতীর।

এখানেই থাকি।—তা-ও তো বটে। নয়তো ট্রামে উঠবেন কেন ঐ স্টপ থেকে? কী বোকা আমি! আগেই ভাবা উচিত ছিল, তাহলেই তো এমন অন্যায়রকম অসুবিধাম না। নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে বলল—এ-বাড়িতে অন্য কারা থাকত যেন?

তারা আছেন।

আত্মীয় আপনার?

না, না, আত্মীয় হক্কে কেন—সত্যেনবাবু হাসলেন। তারা দোতলায় আছেন, আমি একতলাটা ভাড়া নিয়েছি। বেশ জায়গা।

আপনার ভাল লাগে?

এখান থেকে তাকালে কলকাতাই মনে হয় না।—সত্যেন রায় একবার তাকালেন দূরের আকাশে রঙিন মেঘের দিকে, আর একবার কাছের কালো চুলে হলদে-ফিতে আলোর দিকে। যেন বুঝতে পারলেন না কোনটা দেখবেন। স্বাতী বলল—আগে আরো সুন্দর ছিল। কত গাছ কেটে ফেলেছে!

এখনই-বা কম সুন্দর কী—সত্যেনবাবু বললেন, কালো চুলের আলোর দিকে তাকিয়ে। স্বাতী একটু চুপ করে রইল, তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ল, যতীন দাস রোডে তাদের পাশের বাড়িতে নতুন কারা এল একবার। মা রাস্তিরের খাবার পাঠালেন বাড়ি থেকে। কুঁজো ভরতি-ভরতি জল, বাচ্চাদের দুধ, সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে চার-পাঁচবার আনাগোনা বাবার। —আপনার কোনো— তাড়াতাড়ি সে খবর নিল—কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো? যদি কিছু দরকার হয়— দরকার হলে বলব—সত্যেনবাবু বারান্দা থেকে সিঁড়িতে নামলেন। —খুব কাছে থাকো? ঐ মোড়ে সাদা একতলাটা—স্বাতী আঙুল দিয়ে দেখাল। যদি কখনো— কথা শেষ করল না। তোমাকে আসতে বলতে পারলাম না, আমার বাড়িতে তো আর-কেউ নেই—।

কবে আসবেন সব?

আর কেউ নেই। একাই থাকি।

একেবারে একা?

ঠোটের কোণে একটু হাসি ফুটল সত্যেন রায়ের—একেবারে একা। —এই একাই স্বর্গ! কী বিতী ছিল ভবানীপুরের সেই মেসের ভিড়। যেন ট্রাম থেকে নেমে আর-একটা ট্রামে ঢুকলাম।...কপালগুণে হঠাৎ জুটে গেছে এটা। পাড়াটা জাতে নিচু আর বাড়িটা পুরোনো বলে মাত্র আঠারো টাকা ভাড়া। আবার তাকিয়ে দেখলেন দূরের দিকে। গোলাপি মেঘ বাদামি হল, আর নিচু-করা মাথাটির উপর ফুলে-ফুলে ওঠা চুল ছাইরঙা ছায়ায় আরো যেন কালো দেখাল। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—নাম কী তোমার?

স্বাতী মিত্র।

স্বাতী মিত্র? স্বাতী?

স্বাতী।

সুন্দর নাম।

সুন্দর! এর পরে মিনিটখানেক সত্যেনবাবু যখন আর-কিছু বললেন না, স্বাতী একটু চোখ তুলে অস্ফুট একটা 'আচ্ছা—' বলে বিদায় নিল নিচু মাথায় অধ্যাপককে অভিবাদন জানিয়ে। বাড়ি এসে বলল—বাবা, আমাদের এক প্রোফেসর এসেছেন এখানে।

কোথায়?

ঐ-যে মাঠের ধারে বাড়িটা—

ও, রেবতীবাবুর বাড়িতে?

পাড়ার স্কুলকে তুমি চেনো কেমন করে, বাবা?

রাজেনবাবু হেসে বললেন—দেখাশোনা হলেই চেনাশোনা হয়। তা ভাল হল রেবতীবাবুর, প্রোফেসর ভাড়াটে পেলেন।

ভাল কেন?

ভাল না? প্রোফেসররা খুব শাস্ত ভালমানুষ হয় তো।

নাকি?

বিদ্বান কি আর মিছিমিছি হয় রে!

তা তুমি যা-ই বল, তোমার মতো ভালমানুষ হতে বিদ্বানদের ঢের দেরি এখনও।

হয়েছে, হয়েছে। নিজের বাপকে সবাই ভাল বলে!

ঈশ! স্বাতী মাথা ঝাঁকাল। —বললেই হল!

রাজেনবাবু আগের কথায় ফিরে গেলেন—তা, তোর সঙ্গে দেখা হল প্রোফেসরের?
হ্যাঁ, বাবা। একা থাকেন ভদ্রলোক—

একা কেন?

আমি কী জানি!...আর একা কি কেউ থাকে না?

ঐ-তো দ্যাগ! প্রোফেসর না-হলে কি বাড়ি ভাড়া পেতেন?

পেতেন না? স্বাতী অবাক।

জানিস না বুঝি! কলকাতায় একা কোনো পুরুষমানুষকে সহজে কেউ বাড়িভাড়া দিতে চায় না। স্ত্রী থাকা চাই, কি অন্তত মা, বোন-টোন কিছু।

—কেন? রাজেনবাবু একটু ভেবে জবাব দিলেন—কোনো মেয়ে না-থাকলে বাড়ি তো আর বাড়ি হয় না। কথাটা হঠাৎ ধক করে উঠল স্বাতীর বুকের মধ্যে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। রাজেনবাবু বললেন—মাঝে-মাঝে খোঁজ-খবর নিস তোর প্রোফেসরের।

খোঁজ-খবর আমি আর কী নেব? তুমি যদি একদিন—।

বেশ, নিয়ে চলিস আমাকে।

পাড়ার সকলের সঙ্গে তোমার তো আলাপ থাকাই চাই, না বাবা? স্বাতী হাসল। এর পরের রবিবারের সকালে বাজার নিয়ে এসে রাজেনবাবু যথারীতি গায়ের জামা খুলে একটি পান খেলেন বসে। আর তার পরেই উঠে জামা পরলেন আবার। —আবার বেরোচ্ছ? স্বাতীর কথাটা অর্ধেক প্রশ্ন, অর্ধেক প্রতিবাদ।

যাই একটু অনুকূলের বাড়িটা—

রাখো-তো তোমার! স্বাতী গলা চড়াল—রোজ-রোজ দেখতে হবে না অত। ঠিকই আছে, উড়েও যায়নি, চুরিও হয়নি।

আহা, বুঝিস না? দূরে থাকে, যদি কিছু গোলমাল হয়—

হোক গোলমাল, তোমার কী? স্বাতী মাথা ঝাঁকাল। রাগ হয়, সত্যি। এক দূর সম্পর্কের কাকা তার, দিল্লি-শিমলের চাকুরে। ঐ মাঠের একটা প্লটে বাড়ি তুলছেন, আর বাবা সময় পেলেই তার দেখাশোনা করছেন রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে। যতীন দাস রোডের বাড়িতে কুকুরটি এসেছিলেন একবার। কী খাওয়ার ঘটা সে-কদিন, বাবা পারেনও! অথচ একদিন ঐকি একখানা ধূতি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, চাকর ভুল করে বাবার কাপড়ের সঙ্গে রেখেছিল। তাই নিয়ে এমন হলুতুল বাধালেন যে মা-র হার্টফেল হবার যোগাড়।

এস্কুনি আসছি—রাজেনবাবু কাঁচুমাচু মুখে অনুমতি চাইলেন মেয়ের কাছে।

না, যেতে হবে না কোথাও।

তুইও চল না—

বয়ে গেছে আমার!

ফেরবার পথে তোর প্রোফেসরের বাড়িও একবার যাব না-হয়। স্বাতী একটু ভেবে বলল—
সত্যি যাবে নাকি?

বাঃ, কেমন আছে-টাছে একবার দেখতে হয় না? স্বাতী হঠাৎ বলল—না বাবা, আমি যাব না।

কেন?

ননা—স্বাতী চোখ কুঁচকে মাথা নাড়ল।

চল না, একটু বেড়ানোও তো হবে, কেমন সুন্দর সকালবেলাটা। স্বাতী চলে গেল ঘর থেকে। দু-মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে এসে বলল—তোমার ধুতিটা বদলে নাও, বাবা।

এই রে!

তুমি যে কী! স্বাতী পাট-করা জামা-কাপড় বের করে দিল, মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—দাড়িটাও কামিয়ে নিলে পারতে।

থাম তো! দু-দিন-পরা জামার মোলায়েম অন্তরঙ্গতা থেকে টাটকা-জামার কড়কড়ে ভব্যতায় বদলি হয়ে নিয়ে রাজেনবাবু মেয়ের সঙ্গে রাস্তায় নামলেন।

* * * *

ভোরের দিকে বৃষ্টি হয়েছিল সেদিন। রাস্তায় ঘাসের আর বাসি বকুলের একটা আবছা ঠান্ডা মিঠে-মিঠে গন্ধ। প্রোফেসরের বাড়ি পার হয়ে মাঠে নামল তারা। স্বাতী একবার মাত্র তাকাল একতলার ঘরটার দিকে। তারপর হাঁটতে-হাঁটতে বোঝাতে লাগল যে সকলের সব দায় ঘাড়ে করে নেবার এই বদভ্যাস বাবাকে ছাড়তেই হবে। আর কান দিয়ে মেয়ের কথা শুনতে শুনতে মনে-মনে রাজেনবাবু ভাবতে লাগলেন যে অনুকূলের কনট্রাক্টর নিশ্চয়ই তাকে ঠকাচ্ছে। দেখা হলে কথা বলতে হবে। নিশ্চয়ই কনট্রাক্টর আসেই না মোটে। তার একজন ছোকরা-মতো কর্মচারী ধুতির সঙ্গে শোলা-টুপি পরে সাইকেলে চড়ে যাচ্ছিল। রাজেনবাবু তাকে থামিয়ে কয়েকটা কথা বললেন। আর স্বাতী দাঁড়িয়ে রইল একটু দূরে অর্ধেক তৈরি বাড়িটার দিকে তাকিয়ে। একটা বাড়ি যতদিন তৈরি হতে থাকে, কী কুচ্ছিৎই দেখায়! ভাবাই যায় না যে এর মধ্যে একদিন মানুষ থাকবে। হাসবে, হাঁটবে, চা খেতে-খেতে গল্প করবে, গল্প করতে-করতে ঝগড়া বাধাবে। এখন তাকিয়ে শুধু মনে হয়, দূরে-দূরে ছড়ানো এই আট-দশটা ইটের টিপি মাঠের গায়ে বড়ো-বড়ো ফোড়ার মতো লাল হয়ে উঠল। স্বাতীর চোখ গেল দূরে, মাঠের ওপারে সেই পুরোনো বাড়িটিতে চুন-গুরকি ধুলোর মধ্যে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সমস্ত পাড়াটাকেই কেমন শান্ত, ছায়াচ্ছন্ন মনে হল। ফেরবার সময় অর্ধেক মনে হল পথ।

রেবতীবাবুর একতলার বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে রাজেনবাবু বললেন—প্রোফেসর আছে তো বাড়িতে? আবার কী-রকম একটা অনিচ্ছায় স্বাতীর শরীর ভারি হয়ে এল। বাবার জামায় টান দিয়ে ফিশফিশ করে বলল—থাক, চলো।

আয়—রাজেনবাবু নিশ্চিত। বারান্দায় উঠে টোকা দিলেন দরজায়। দরজা খুলে দিল চাকর। বাবু আছেন?

বসুন। হলুদের হাত কাপড়ে মুছে সরে দাঁড়াল লোকটি। ঘরের মাঝখানে বেতের টেবিল ঘিরে খানচারেক চেয়ার। বোস—মেয়েকে এ-কথা বলে রাজেনবাবু বেশ ঘরোয়াভাবে বসে পড়লেন। বসুন, বাবুকে বলি—বলে লোকটি দু-কাঁধের একটা বিনীত ভঙ্গি করে নীল-পরদার ওপারে চলে গেল।

আসামাত্রই যে দেখা হল না তাতে স্বাতী যেন একটু স্বস্তি পেল। তাকিয়ে দেখল, একদিকের দেয়াল ঘেঁষে দুটি শেলফ। একটি বড়ো, আর একটি ছোটো। কিন্তু দুটোই রোগামতো ন্যাড়া-চেহারা, বড়োটায় ইংরেজি বই, আর ছোটোটায় বাংলা। বইগুলি দাঁড়িয়ে, শুয়ে, কাৎ হয়ে, মাথা উলটিয়ে

নানা অবস্থায় আছে। হয়তো গোছাবার সময় হয়নি এখনো, না কি বই যারা পড়ে তাদের বই এর কমই থাকে? দুটি জানালার মাঝখানে ছোটো একটি লেখার টেবিল। নীল-প্যাডের ফাঁকে কুচকুচে কালো কলম গোঁজা—চিঠি! কাকে চিঠি? ও মা, চিঠি লেখার লোকের নাকি অভাব? এখানে একা থাকেন, বাড়ির লোকদের তো লিখতেই হয়। কিন্তু প্যাডটার বেগুনিমতো নীল রঙটা বড্ডো যেন...হঠাৎ কেমন-একটা রাগ চিড়বিড় করে উঠল, মনে হল অনেকক্ষণ বসে আছে এসে, কেন বসে আছে, কী দরকার বসে থাকবার, আর আসবারই-বা দরকার ছিল কী?... বাবা—কিন্তু আর বলা হল না, সত্যেনবাবু ঘরে এলেন। স্বাভাবিক চকিতে দেখল, এইমাত্র স্নান করেছেন ভদ্রলোক, মাথার চুল পরিষ্কার আঁচড়ানো। গায়ে পাতলা-টিলে একটা পাঞ্জাবি, আর তিনি কাছে আসতে সূক্ষ্ম একটু সুগন্ধও স্বাভাবিক মুহূর্তের জন্য উন্মন করল। বাইরে থেকে যা মনে হয় ঠিক তা নয়, বাবুগিরি আছে!

ঘরে পা দিয়েই সত্যেনবাবু একটু-যেন থমকে গেলেন অবাক হয়ে। আর তার পরেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন—কী আশ্চর্য! তুমি!...আপনি! আমি স্নান করছিলাম, তাই...এতক্ষণ বসে-বসে...কী আশ্চর্য! স্বাভাবিক উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আমার বাবা।

বুঝেছি। রাজেনবাবুর দিকে তাকাতেই সত্যেন রায়ের ঠোটে হাসি ফুটল। রাজেনবাবুও হেসে বললেন—আমার মেয়ে, ধরে নিয়ে এল আমাকে।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। মানে, আমারই যাওয়া উচিত ছিল... আপনি কষ্ট করে... তুমি বোসো, দাঁড়িয়েই থাকবে নাকি? কষ্ট করে এই রোদ্দুরে... আর পাখাটাও খুলে দেয়নি, কী কাণ্ড! সত্যেনবাবু ছুটে গেলেন দেয়ালের কোণে। চালিয়ে দিলেন টেবিল-ফ্যানের সুইচ। অতিথির দূ-জনেই হাওয়া পাচ্ছে কিনা তা দেখবার জন্য তাকালেন, কিন্তু হাওয়া কই? প্লাগটা খুলে আবার লাগালেন, সুইচটা এদিক-ওদিক করলেন অনেকক্ষণ। কিন্তু পাখা চলল না। মুখ তুলে, হাতের উল্টো-পিঠটা কপালে একবার বুজিয়ে আবছা একটু হাসলেন। —এই ভাড়াটে পাখাগুলো—

থাক না—রাজেনবাবু বললেন—পাখার কী দরকার? জানালা দিয়েই হাওয়া আসছে খুব! আপনি বসুন।

কালই দিয়ে গেল এটা—করুণ চোখে পাখাটার দিকে শেষবার তাকিয়ে সত্যেনবাবু বসলেন এসে। রাজেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন—বোম্ব কোম্পানি দিয়েছে বুঝি? কী করে জানলেন? প্রফেসর অবাক।

ঐ একটাই তো ইলেকট্রিকের দোকান এ-পাড়ায়। আর সেজন্যই এরকম—কথা শেষ না-করে রাজেনবাবু বললেন—আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?

অসুবিধে? না, অসুবিধে কী।

ওদিকের ঘরটা বুঝি রেবতীবাবু রেখেছেন?

হ্যাঁ, ওঁর জিনিসপত্র আছে ওটাতে। আমার তো লাগেও না, দুটো ঘরই মনে হয় বেশি। রান্নাঘর? রাজেনবাবুর পরের প্রশ্ন।

একটু ভেবে সত্যেন রায় জবাব দিলেন—বোধহয় নেই। বোধহয় মানে...নিজেই একটু হেসে তাড়াতাড়ি আবার বললেন—মানে, নেই আর কি। আর রান্নাই বা কী, তার জন্য আবার—!

চাকর রাঁধতে পারে?

রৌঁধে তো দিচ্ছে। কিন্তু রাঁধতে পারে কিনা, আমি ঠিক বলতে পারব না।

রাজেনবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন এ কথায়। ছাত্রীর দিকে মুখ ফিরিয়ে সত্যেনবাবু বললেন—তুমি যে একেবারে চূপ? বইয়ের শেলফ থেকে চোখ সরিয়ে আনল স্বাতী। বই দেখবে? দ্যাখো না—সত্যেনবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে শেলফের কাছে গেলেন—এসো এখানে। স্বাতী আস্তে উঠে প্রোফেসরের পাশে দাঁড়াল। বই কী সুন্দর! কত রকম রঙ, কত রকম বাঁধানো। আর নাম... কত নাম! আর দুটি মাত্র মলাটের মধ্যে কত কাণ্ড। দু-আঙুলে আলগোছে দু-একটি বই একটু ছুলো সে।

নেবে? নেবে বই?...বলো, কেনটা তোমার ইচ্ছে? ফিকে-ধূসর শোওয়ানো একটি বইয়ের উপর স্বাতী আস্তে আঙুল রাখল। আর—কোনো কারণে নয়, শুধু মলাটের রঙটা আশ্চর্য সুন্দর বলে।—
চেখভ! খুশি গলায় বলে উঠলেন সত্যেন রায়।

চে—? না-বলা প্রশ্নটা বুঝে নিয়ে প্রোফেসর আবার উচ্চারণ করলেন—চেখভ। ‘খ’-টা খুব কড়া শোনাল আর ‘ভ’-টা খুব নরম। আস্তন চেখভ, রুশ। কিন্তু অনুবাদ এত ভাল—আর গল্পগুলি—
ইঠাৎ থেমে জিজ্ঞেস করলেন—ইংরিজিতে গল্পের বই কী পড়েছ? স্বাতী মাথা নাড়ল।

কিছু না?

আবার মাথা নাড়ল স্বাতী। সত্যেন রায় তাকিয়ে দেখলেন তার মেঘ-রঙের চোখ দুটিতে লজ্জার সঙ্গে কৌতূহলের প্রতিযোগিতা, নম্রতার সঙ্গে উৎসাহের লুকোচুরি—কিছু পড়েনি। কত ভাল বই, আর পৃথিবীতে প্রায় সব ভাল বইয়ের চমৎকার অনুবাদ! ইংরেজ রাজত্বের নানা অসুবিধের মধ্যে এই একটা সুবিধেই তো আমরা পেয়েছি।—বলতে-বলতে ফিকে-ধূসর বইটি, আর বেছে-বেছে আরো তিনখানা নামিয়ে দিলেন তার হাতে। বইয়ের, লজ্জার, কৃতজ্ঞতার ভারে স্বাতী যেন নুয়ে পড়ল। অস্ফুটে বলল—একসঙ্গে এতগুলো!

এতগুলো আর কী, বদলে-বদলে তো পড়তে ইচ্ছে করে। প্রথমে ছোটো গল্প দিয়ে অভ্যেস কর, পরে বড়ো উপন্যাস পড়তে পারবে। শেষের কথাটা একেবারেই মাস্টারি। স্বাতী চেষ্টা করল কিছু বলতে। যে-কোনো একটা কথা বলতে চেষ্টা করল, একটা কথাও বলতে পারল না। বাইরে এসে রাজেনবাবু বললেন—তোর খুব লাভ হয়ে গেল রে এসে। যে পাতায় বইয়ের নাম-টাম লেখা থাকে, এক-এক করে সেই পাতাগুলি দেখে নিচ্ছিল স্বাতী। চেষ্টা তুলে বলল—সত্যি! চমৎকার মানুষ।

এর মধ্যেই বুঝে ফেললে!

কী-নরম চেহারা রে! এমন যেন আর দেখিনি।

তোমার সবটাতেই বাড়াবাড়ি! স্বাতীর হাসির শব্দটা যেন কুঁজোর জল ঢালার মতো। —আর কী-রকম ছেলেমানুষি করলেন পাখাটা নিয়ে!

সত্যি! ঘটনাটা মনে করে স্বাতী আবার হেসে উঠল।

—পড়াশুনোর মানুষ, এদের দেখবার কেউ না থাকলে চলে? চুরি করে সর্বনাশ করে চাকর।

—তোমার বুঝি ইচ্ছে করছে রোজ এঁর বাজারটা করে দিতে? রাজেনবাবু মুখ টিপে হাসলেন।
একটু পরে স্বাতী বলে উঠল—আচ্ছা বাবা, তুমি কী-রকম?

কী-রকম বল তো?

বেশ বলে দিলে আমি তোমাকে ধরে এনেছি! এমন রাগ হচ্ছিল আমার তখন!

বাঃ, তোরই প্রোফেসর—

আমার তো প্রোফেসর, কিন্তু গরজটা যেন তোমারই!

আহা, আমারও তো ইচ্ছে করে একটা ভাল লোকের সঙ্গে আলাপ করতে! বললেন রাজেনবাবু বাড়ির সিঁড়িতে পা দিয়ে। —তুমি নিজে কিনা ভাল, তাই সকলকেই ভাল দ্যাখো, লাফিয়ে সিঁড়ি টপকে বাবার আগেই বাড়িতে ঢুকে পড়ল স্বাতী।

নিজের ঘরে গিয়ে বই ক-খানা রাখল তার পড়ার টেবিলে। চেয়ারে বসে একখানা তুলে নিল হাতে। কিন্তু খুলতে গিয়েই থেমে গেল। চোখে ঝিলিক দিল নীল খাম...নীল প্যাডের ফাঁকে কালো কলমটি গাঁজা...বই খুললেই বিষাক্ত একটা পোকা লাফিয়ে উঠবে, কামড়ে দেবে। কী-সব ভাবছে সে বোকার মতো! কোথায় শুভ্র, আর কোথায় সত্যেনবাবু! শুভ্র তো একটা বাজে— কেন, বাজে কেন? শুভ্র যদি বাজে হয় ছোড়দিও তো বাজে!... আর, কী-ই বা আছে এতে? ক্রাশের মেয়েদের যা-সব গল্প করতে শোনে... না, না... বিত্ৰী, বিত্ৰী সব, সব বাজে, পৃথিবীসুদূর লোক বাজে। কিন্তু সেটা কি সত্যেনবাবুর দোষ?...স্বাতী খানিকক্ষণ বসে রইল শক্ত হয়ে। তারপর আস্তে, আস্তে, খুব মন দিয়ে চারখানা বইয়ের প্রত্যেকটির পাতা উল্টাল। পাতাগুলি খসখস করে বলল—এসো, এসো। কালো-কালো ইংরেজি অক্ষরগুলি গুনগুন করল—শোনো, শোনো। একটু আগে তার যেমনই খারাপ লাগছিল, তেমনি একটা সুখের ঢেউ ছলছল করে উঠল বুকের মধ্যে। আঃ, এ-সব বই কি কখনো তার হাতে আসত সত্যেন বাবুর সঙ্গে দেখা না-হলে?

সঙ্গেবেলা সে সেজ্জদির চিঠি পড়ে শোনাচ্ছে বাবাকে, রামের-মা এসে বলল একজন বাবু এসেছেন। বিরক্ত হয়ে স্বাতী জিজ্ঞেস করল—কে?

কে, তা ও জানবে কী করে। আমি দেখে আসছি, বলে রাজেনবাবু উঠে পড়লেন।

পাওনাদার-টার কেউ হবে আর কি! বসে থাক না খানিকক্ষণ।

পাওনাদারদের কী মুশকিল বল তো! ধারে দিতেও হয়, আবার টাকা চাইতে গেলেও লোকে রাগ করে!—যেতে-যেতে হাসলেন রাজেনবাবু। একটু পরেই ফিরে এসে বললেন—তোর প্রোফেসর। শোনামাত্র স্বাতী উঠে দাঁড়াল।

চলে গেছেন।

চলে গেলেন!

কত বললাম বসতে, বসলেন না। টুশনি আছে-টাছে বোধহয় স্বাতী আবার বসে পড়ে একটু নিজীব সুরে বলল—কেন এসেছিলেন? কথা না-বলে মুখটিপে হাসলেন রাজেনবাবু। এসেছিলেন কেন?

কিছু না এই—একটু-একটু অপরাধী ভাবে রাজেনবাবু বললেন—আমাদের সেই টেবিল-ফ্যানটা ওঁকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম কিনা—

পাঠিয়ে দিয়েছিলে?

আমাদের তো কোনো কাজেই লাগে না ওটা। আর সারাটা দিন গরমে কষ্ট পাবেন ভদ্রলোক, ভাল করিনি?

আমি তোমাকে বলেছি না বাবা, আমাকে জিজ্ঞেস না করে কখনো কিছু করবে না!

কেন, এতে দোষ কী?

ভাল করে তো চেনেনও না আমাদের। হঠাৎ এ-রকম, উনি কী মনে করলেন বল তো! এতে আবার মনে করবার কী? কত তো ভাল-ভাল কথা বলে গেলেন। কথা শুনলে প্রাণ জুড়ায়, সত্যি!

তোমার প্রাণ বড়ো সহজেই জুড়ায়—স্বাতী গম্ভীর হল।

পড় দেখি সরস্বতীর চিঠিখানা আর-একবার—মেয়েকে খুশি করবার চেষ্টা করলেন রাজেনবাবু। স্বাতী পড়ল। কিন্তু সে একরকমের দায়-সারা পড়া...চলে গেলেন! একটু বসতে পারলেন না! আবার কবে—

কিন্তু আর দেখা হল না শিগগির। আর তাতে যেন মনে মনে আরাম পেল স্বাতী। ক-দিন ধরে এমন হচ্ছে যে রোজই বিকেলের দিকে বৃষ্টি, বেড়াতে যাওয়া আর হয় না। ঘরে বসে বসে সেই ইংরেজি বইগুলি পড়ে, আর মাঝে-মাঝে চোখ তুলে বাইরের দিকে তাকায়। আকাশে নীল-মেঘ কালো, ছাই রঙ ছড়াল...বৃষ্টি ঝমঝম, ঝমঝম। আলো কম, আরো কমে আসে, মরে যায়। আর পড়া যায় না, দেখা যায় না। বই খোলা, বই কোলে বসে থাকে... ভাবে... আবছা... একলা... চুপ।

BanglaBook.org

করুণ রঙিন পথ

কী ভাবে স্বাভাবিক? বৃষ্টিবিকলে জানলাধারে বসে, ফিকে-নীল শাড়িতে, পিঠে চুল ছড়িয়ে, ঠোটে মুখে জ্বলছিটে নিতে নিতে কী ভাবে সতেরো বছরের স্বাভাবিক? কী?...কী আর ভাববে, সব ভাবনা ভেবে রেখেছে অন্যেরা। যেসব ভাবনা ভাবা যায় বলেও সে ভাবেনি কোনোদিন। প্রথমে বাধো-বাধো ঝাপসা... তারপর যখন খুলে গেল—কিন্তু কোথায় চলেছে পথ, কী-ভীষণ ভয়ের অন্ধকারে, কোন লুকোনো, হাসিমুখের, সব-তলের পাতালে!...এ-রকম গল্পও আছে পৃথিবীতে! ছেলেবেলা থেকে গল্প তো সে কম পড়েনি। মাসিকপত্রের রাশি-রাশি গল্প, শরৎচন্দ্রের সব, রবীন্দ্রনাথের কত, কিন্তু এ-রকম! পড়তে পাগল-পাগল করে আর লিখতে গিয়ে মানুষ পাগল হয়ে যায় না? হয় কি আর না! ঐতো মোপাসাঁ বলে একজন, বইতেই লেখা আছে, সত্যি নাকি পাগল হয়ে গিয়ে নিজের গলা কেটে মরেছিল। আর সেরকম যারা মরেনি, তারাও তা-ই। তবে অনেকেই সেটা লুকোতে পারে বোধহয়, কেউ-কেউ পারেই না!...লুকোবে? আর যেটা দপদপ করে জ্বলছে এই সাদা-কালো পাতাগুলিতে, বইয়ের কাগজ যে পুড়ে যায় না, সেটাই যেন আশ্চর্য লাগে। আশ্চর্য, কী ভীষণ, নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর—আর কী—কী সত্য কথা সব! এরা কী সব জানে, কী করে জানে মানুষের মনের সব কথা, এসব তো মুখ ফুটে কেউ বলে না কখনও। বলবে কি, এসব কথা যে তারই মনের কথা। তাই তো জানে না কোনো মানুষ, জানতে পারে না...যতক্ষণ না এ-সব বই পড়ে। আমি-যে আমি, আমারও মনের কত কথা লিখে গেছে এরা—কত কেন, সব কথাই তো, যার কথাই লিখেছে সেই মানুষই যেন আমি। পড়তে লজ্জাই করে এক-এক সময়। কিন্তু সব মানুষই যদি আমি, তবে আর লজ্জা কার কাছে—আর লজ্জাই তো নয় শুধু, তার উল্টোটাও আছে—সেই উল্টোটাও তেমনি আশ্চর্য। আর, শুনতে যেটাই যেমন হোক না, ঠিক, ঠিকই তো, এইরকমই তো। এতই ঠিক-ঠিক এইরকম যে আমার কথাই আমি জানব না এদের মুখে না-শুনলে। আমি-যে কী, আমি-যে কেমন, আমি-যে কত মন্দ আর কত ভাল, আমি-যে নাকি কোনো জন্মে লিখে রেখেছে কোন দূর-দূর দেশের পাগলরা! আশ্চর্য! কত আশ্চর্য! যেটাও কুলিয়ে ওঠে না সতেরো বছরের স্বাভাবিক মেঘলা-ঘন ভাবায়। সব ভাবনা মুছে যায় ফিকে, ভিজে, আকাশজোড়া ঘোরবিকলে।

এমনি এক বিকলে স্বাভাবিক নিচু হয়ে পড়ছিল টলস্টয়ের নীতি-কথা, রাজেনবাবু আপিশ থেকে

ফিরে ডাকলেন—স্বাভী। স্বাভী শুনতে পেল না। রাজেনবাবু কাছে এসে বললেন—এই বিকেলবেলায় আর বই কেন? স্বাভী চমকে তাকাল, বাবাকে দেখে হাসল, উঠে দাঁড়াল বইয়ের মধ্যে আঙুল দিয়ে।—আজকাল তোকে যখনই দেখি তখনই পড়ছিস। এত পড়া কি ভাল? ভাল না বুঝি?

এসব বই—স্বাভীর টেবিলটার দিকে একবার তাকালেন রাজেনবাবু—বুঝিস তুই? কেন বুঝব না—? একটু লজ্জা-লজ্জা ধরনে স্বাভী জবাব দিল। সব সময় পড়া কিন্তু ভাল না। রাজেনবাবু আবার বললেন।

আর-কী করব, বলো তো?

কেন? —রাজেনবাবুর মুখ-চোখ উজ্জ্বল হল, যেন একেবারে নতুন একটা আবিষ্কার করলেন এফুনি। সংসারের কাজ-টাজ করতে পারিস মাঝে-মাঝে।

ঠিক। ডান হাতের তজনী তুলে স্বাভী দাঁড়াল একটু, তারপরে সে-ও যেন মস্ত একটা আবিষ্কার করে ফেলল হঠাৎ—বাবা, ভিজ়েছ!

কই তেমন—

কী-যে তুমি, রোজ-রোজ তোমার ভেজাই চাই!—নেচে উঠল পিঠের উপর চুল। এক ছুটে নিয়ে এল শুকনো জামাকাপড়। চা আনছি এফুনি—বলে দৌড় দিল আবার। কিন্তু চা খেতে-খেতেও হাতে রাখল বই।

একে-একে চারখানাই শেষ হল। ফেরৎ দিতে হবে, নতুন বইও চাই, কিন্তু যেতে ইচ্ছে করে না। আবার কাউকে দিয়ে পাঠানো ভাল দেখাবে কি? এই দ্বিধা থেকে তাকে উদ্ধার করলেন সত্যেনবাবু নিজেই। হঠাৎ একদিন বেলা তিনটের সময় তিনি টোকা দিলেন রাজেনবাবুর দরজায়। দরজা খুলে দিয়ে স্বাভী যেন তাকাতে পারল না মুহূর্তের জন্য। বৃষ্টির পরে দারুণ রোদ সেদিন। টুকটুকে লাল মুখে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন সত্যেনবাবু। হাতে এক পাজা বই অবশ্য আছেই। আপনি!—স্বাভীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তোমার জন্য বই আনলাম দুখানা—।

আসুন! ঘরে এসে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই স্বাভীর হাতে দু-খানা বই দিলেন সত্যেনবাবু। স্বাভী একবার তাকিয়ে আস্তে-আস্তে বলল—‘শানাই,’ ‘নবজাতক’। নতুন বই? বলতে চেয়েছিল যে নতুন কেনা মনে হচ্ছে, কিন্তু সত্যেনবাবু জবাব দিলেন—রবীন্দ্রনাথের নতুন বই কত ভাগ্য আমাদের, এখনো রবীন্দ্রনাথের নতুন বই পাচ্ছি। কিন্তু যে-রকম শুধি তাঁর শরীরের অবস্থা—।

অসুখ?

সেবারের পর আর সামলে ওঠেননি ঠিক। কবে-যে রবীন্দ্রনাথের কী অসুখ করেছিল স্বাভী তা জানত না, তাই একটু চুপ করে থেকে বলল—বসুন! হাতের বইগুলি পাশে রেখে সত্যেনবাবু এমন একটি শাস্ত্র ভঙ্গিতে সোফায় বসলেন যেন ওখানেই কাটাবেন বাকি জীবন। জিজ্ঞেস করলেন—ও-বইগুলো পড়লে? আবছা হাসল স্বাভী। আবছা মাথা নাড়ল।

হয়নি এখনো?

স্বাভী তাড়াতাড়ি বলল, আপনার কি—

আমার কোনো দরকার নেই এফুনি, কিন্তু তোমাকে তো আরো পড়তে হবে। এই তো সময়। স্বাভী মাথা নিচু করে আঁচলের প্রান্তটা জড়াতে লাগল হাতের কব্জিতে।

কেমন লাগল তোমার? স্বাভী চোখ তুলল একবার, বলল না কিছুই। ভাল লাগল? সত্যেনবাবু

আবার জিগেস করলেন। এ-প্রশ্নের কি কোনো উত্তর আছে? তার মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যেনবাবু বললেন—আচ্ছা, আরো দেব তোমাকে, বলেই দাঁড়ালেন।

যাচ্ছেন?

যাই—

এক্ষুনি?

বাড়ি গিয়ে একটু পরেই বেরোতে হবে আবার। জানালার দিকে তাকিয়ে স্বাতী বলল—কী রোদ!

—ঘরে বসে যতটা মনে হয় বেরিয়ে পড়লে আর ততটা লাগে না...আচ্ছা!

সত্যেনবাবু চলে যাবার পর স্বাতী বাইরের ঘরেই বসে রইল। একটু চা খেতে বলল না, একটু জল পর্যন্ত না! এই রোদদুরে কত যেন ক্লান্ত হয়ে এসেছিলেন। তা আর কী হবে—ওরকম হঠাৎ চলে গেলে মানুষের কি আর মনে থাকে কিছু! তবু নিজের এই ক্রটিটা স্বাতীর মনে খোঁচা দিতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। সেটা ভুলে যাবার জন্য ‘নবজাতক’ খুলে বসল, এখানে ওখানে চোখ বুলিয়ে এলোমেলো পাতা ওল্টাল কয়েকবার। তারপর হঠাৎ অন্য কথা ভুলে গিয়ে পড়তে লাগল কবিতা। একটির পর একটি, শান্তি নামল মনে। যেসব গল্প এ-কদিন ধরে সে পড়ছিল, তার আশ্চর্য পাগলামির পরে এ যেন এক আরো আশ্চর্য শান্তি, ঝড় অন্ধকার আর অসহ্য বিদ্যুৎ থেকে বেরিয়ে সে যেন চলে এল এমন এক দেশে যেখানে সব আলো, সব ভাল, সব সুন্দর। মনের আরামে চোখ বুজে এল তার, নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে মধুর একটি ঘুম মায়ের মতো তাকে কোলে তুলে নিল।

বই ফেরৎ দিতে স্বাতী নিজেই গেল দু-দিন পরে। এক আঙুলে আস্তে টোকা দিতেই দরজা খুলে তার মুখোমুখি দাঁড়ালেন সত্যেন রায়। একটু তাকিয়ে থেকে বললেন—এসো। ঘরে ঢুকে স্বাতী থমকে দাঁড়াল। বেতের টেবিলে পা তুলে দিয়ে চেয়ারে এলিয়ে বসে আছেন একজন। দু-আঙুলে সিগারেট ধরা একটি হাত চেয়ারের বাইরে ঝুলে পড়েছে, চোখ যেন আন্ধেক বোজা। আরে! ঐকে তো চিনি, দেখেছি তো আগে! কে... কোথায়?—এসো! সত্যেন রায় আবার অভ্যর্থনা জানালেন।

এগিয়ে এসে স্বাতী দেখল, টিপয়ে দু-পেয়লা আন্ধেক-খাওয়া চা আর মেঝেতে সিগারেটের টুকরো। এঁরা বেশ গল্প-টল্প করছিলেন, এর মধ্যে আমি... আগে জানলে কি আসতুম এসময়ে! অন্য ভদ্রলোকটি যেন এতক্ষণে জানলেন যে ঘরে আর-একজন এসেছে। কেমন বিমোহিত অনিচ্ছুক চোখে একটু তাকিয়েই হঠাৎ সমস্তটা চোখ খুলে ফেললেন। যেন একটা ধাক্কা খেয়ে স্বাতী কাছেই চেয়ারটায় বসে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল যে ইনি তো সেই বিখ্যাত ধ্রুব দত্ত, যাঁর নাম শুনেছিল দাদার মুখে, আর দাদার নাটক দেখতে গিয়ে যাঁকে দেখে হতাশ হয়েছিল।

স্বাতী মিত্র, আমাদের কলেজের ছাত্রী। আর ইনি ধ্রুব দত্ত, কবি—বলে সত্যেন রায় ছাত্রীর নাকের কাছে তোলা মস্ত দুখানা পায়ের দিকে তাকালেন। ধ্রুব দত্ত পা নামিয়ে নিলেন। কিন্তু ও-রকম এলিয়েই বসে রইলেন চেয়ারে। স্বাতীর নরম নমস্কারের উত্তরে মাথাটা অস্পষ্টভাবে একটুখানি নেড়ে হাত বাড়িয়ে পেয়ালার চা-টুকু শেষ করলেন এক চুমুকে। তোমাকে একটু চা দিতে বলি? —ধ্রুব দত্তের অবহেলার ভঙ্গিটা সত্যেনবাবু ঢেকে দিতে চাইলেন ছাত্রীর দিকে একটু বেশি মন দিয়ে।

না, আমি এক্ষুনি... আমি শুধু এই বইগুলো—

একটু বোসো। একটা কবিতা শোনো ধ্রুববাবুর। টেবিল থেকে রোগা চেহারার একটি পত্রিকা তুলে নিলেন সত্যেন রায়। কবির দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনি পড়ুন।

না, না, আমি পড়তে-টড়তে পারি না—মোট গলায় জবাব দিলেন কবি।

পড়ুন না! এই মেয়েটি... ইনিও খুব কবিতা ভালবাসেন।

নাকি?— পুরো চোখ খুলে ধ্রুব দস্ত আবার তাকালেন স্বাতীর দিকে। স্বাতী তাকিয়ে দেখল, ভদ্রলোকের মুখের চেহারায় একটুও সুখ নেই, মোলায়েম কালো রঙের তলায় একটা অশান্তি যেন ছটফট করছে সবসময়। সেই নাটকের রাস্তিরে ভাল করে দেখতে পারেনি, আজ দেখল, দেখে আরো খারাপ হয়ে গেল মন। এই একজন কবি? কী জানি!

কবিতাটা পড়ুন না—আবার অনুরোধ করলেন সত্যেন রায়। কিন্তু সিগারেট মুখে তুলতে তুলতে হাত নেড়ে কথটা উড়িয়ে দিলেন ধ্রুব দস্ত। তাহলে আমিই পড়ি।—একবার কবির দিকে, একবার ছাত্রীর দিকে তাকিয়ে, আর দেরি না করে সত্যেন রায় পরিষ্কার গলায়, স্পষ্ট উচ্চারণে সেই পত্রিকার কবিতাটি পড়লেন। পড়ার শেষে জুলজুলে মুখে বললেন—খুব ভাল হয়েছে, সত্যি! ধ্রুব দস্ত ঠোট বাঁকালেন একটু, কিন্তু ওতেই বোঝা গেল যে তিনি খুশি হয়েছেন। তোমার কেমন লাগল?—প্রোফেসর ফিরলেন ছাত্রীর দিকে।—ভাল! পড়াটা খুব ভাল লেগেছিল স্বাতীর। কিন্তু কবিতাটার ভাল-মন্দ কিছু বোঝেনি, সেইজন্য কথাতায় খুব বেশি উৎসাহ আনতে পারল না। হঠাৎ ধ্রুব দস্ত সারা মুখ ভরে হেসে ফেললেন। কেমন একটু মজার ধরনে নাক কুঁচকে বললেন—নিজের লেখা সম্বন্ধে ঐ ‘ভাল’ কথটা শুনলেই আমার যেন পায়ের তলায় শুড়শুড়ি লাগে... চলি। লম্বা শরীরটাকে কয়েকটা ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে সোজা করে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বিদায়ের একেবারেই কোনো ঘটনা না করে বেঁকে-বেঁকে হেঁটে বেরিয়ে গেলেন দরজা দিয়ে। ঘরে হঠাৎ যেন একটা শান্তি নামল। অনেকক্ষণ চলবার পর রেডিও বন্ধ হলে যেমন লাগে, ঠিক সেইরকম। স্বাতীর অপ্রস্তুত লাগল। চটে গেলেন ধ্রুব দস্ত? আমি কি খুবই বোকার মতো বলেছিলাম ‘ভাল’-টা? সত্যি, আমি একটা মানুষ, আমার আবার একটা ভাললাগা! কিন্তু আমার কী দোষ, সত্যেনবাবুই তো—

প্রথম দেখলে—সত্যেন রায় এতক্ষণে রোগা চেহারার পত্রিকাটিকে হাত থেকে নামালেন—ধ্রুববাবুকে একটু কেমন-কেমন লাগে, কিন্তু সত্যিকার কবি। স্বাতী আর কখনো বলার উৎসাহ পেল না।

হঠাৎ উঠে দূম্ করে চলে গেলেন? যেন আপন মনেই সত্যেন রায় বললেন আবার— আমার সঙ্গেও আলাপ আজই প্রথম।

আজই প্রথম! স্বাতী অবাক হয়ে তাকাল। যে-রকম করে বসেছিলেন— মনের কথটা আর লুকোতে পারল না সে—আমি ভেবেছিলুম আপনার কতকালের বন্ধু! বসবার প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গিয়ে সত্যেন রায় বললেন—তবে কি ভাবছিলে আমার বন্ধু বলেই প্রশংসা করছিলাম? অবশ্য বন্ধু হলেও প্রশংসা আমাকে করতেই হত, এমনকি শত্রু হলেও। একটু চুপ করে থেকে স্বাতী আবার বলল—যারা ভাল লেখেন তাঁদের সকলের সঙ্গেই বুঝি আপনার আলাপ?

সকলের সঙ্গে আর কোথায়—সত্যেন রায় একটু—যেন লজ্জিত হলেন স্বাতীর প্রশ্নে। তবে ঐর— ঐর বইয়ের একটা সমালোচনা লিখেছিলাম আমি, সেইটে পড়ে—

নিজের প্রশংসা পড়ে আর টিকতে পারলেন না? ছাত্রীর সরল হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে

অধ্যাপকের নিজেরও হাসি পেল। কিন্তু গম্ভীর হয়ে বললেন—প্রশংসা শুনতে যে ভাল লাগে, সেটাই ওঁর ভাল লাগে না। ঠিক শিল্পীর স্বভাব।

যারা বই লেখে তাদের চাইতে যারা বই পড়ে তারাই কিন্তু ভাল—স্বাতী হেসে ফেলল কথাটা বলে।

লেখকের চাইতে লেখকের বই অনেক সময় ভাল হয় বটে—সত্যেন রায় একটু ভেবে বললেন।
কিন্তু ধ্রুব দস্তর চোখ-মুখ কী অসাধারণ!

নাকি? মনে-মনে বর্ণনার সঙ্গে বাস্তবকে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করতে-করতে স্বাতী বলল—
কিন্তু উনি তো বুড়ো! সত্যেন রায় হেসে বললেন—তোমার বয়সে অনেককেই বুড়ো লাগে, আমার বয়সে অনেককেই লাগে না। স্বাতীর মুখে এল—আহা, আপনার আবার বয়স! কিন্তু এ রকম সুরে কি প্রোফেসরের সঙ্গে কথা বলা যায়? তাই সে বলল—আপনার থেকে তো অনেক বড় উনি!

তাই বলে বুড়ো নাকি! একটু পরে আবার বললেন—কবিদের বুড়ো হওয়া বুঝি ভাল লাগে না তোমার?

কারোরই লাগে না—স্বাতী স্বীকার করল।

রবীন্দ্রনাথকে দেখে তোমার কী মনে হয়?

দেখিনি কখনো।

রবীন্দ্রনাথকে দ্যাখোনি! কলকাতায় আছ, এত বড়ো হয়েছ, রবীন্দ্রনাথকে দ্যাখোনি!

স্বাতী মাথা নিচু করে অপরাধ মেনে নিল। সত্যেন রায় হঠাৎ হেসে বললেন—এমন করে বলছি যেন তোমার দোষ। সকলের কি আর সুযোগ হয়? আর মেয়েদের অসুবিধে কত! মাকে বলে শান্তিনিকেতনে যাও না একবার। স্বাতী বলল—আমার মা নেই। মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে সত্যেনবাবু বললেন—মা নেই...তা বাবা তো আছেন। আর এমন চমৎকার বাবা! মনে-মনে একটু চিন্তা করে, অনেকটা সাহস করে স্বাতী এতক্ষণে একটা ঘরোয়া প্রশ্ন করল—আপনার মা-বাবা এখানে থাকেন না?

আমার মা-ও নেই, বাবাও নেই—ক্ষীণ একটু হাসলেন সত্যেনবাবু। স্বাতী অবাক হয়ে কথা শুনে। কিন্তু অবাক কী, এরকম কত লোকই তো আছে পৃথিবীতে। কিন্তু বাবাও নেই! তার বাবাও কি থাকবেন না একদিন? মুহূর্তের জন্য স্বাতী যেন নিশ্বাস নিচ্ছে পারল না। একটু নড়ে-চড়ে একটু সোজা হয়ে যেন নিজের মধ্যে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল—ভাই-বোন? সত্যেনবাবু মাথা নাড়লেন।

তাও নেই...একজনও না... আশ্চর্য!

আশ্চর্য বুঝি?

স্বাতী কথা বলল না। হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেল তার। এ বাড়িতে যদি একজন মা থাকত এখন, কত ভাল লাগত। নিজের রুগ্ন মার স্মৃতিকে মনে-মনে সাজিয়ে দাঁড় করাল এই ঘরে, দেখল তাঁর হাসি, শুনল তাঁর কথা আর ছায়াভরা ঘরে চুপচাপ বসে-বসে তার যেন মনে হতে লাগল যে-মার কথা সে ভাবছে, সে-মা আর কেউ নয়, সে নিজেই।

উঠে ঘরের আলো জ্বলে দিলেন সত্যেনবাবু—এবারে কী-কী বই নেবে বলো। উদ্ভরের অপেক্ষা না করে নিজেই বেছে-বেছে নামালেন কয়েকখানা ইংরেজি বই। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বললেন—ধ্রুব দস্তর কবিতা পড়বে নাকি? নিজের অজান্তেই একটু কঁচকে গেল স্বাতীর কপাল।

ঐ এক পেয়ে বসেছেন! সত্যেনবাবুর মুখে একটু যা চেবেছিল, তাতে দ্রুত দস্তুর কবিতা সম্বন্ধে খুব একটা খিদে চেতিয়ে ওঠেনি তার। তাই কোনো জবাব দিল না। প্রথমেই ভাল লাগবে না হয়তো—সত্যেনবাবু মুখ দেখে মনের কথাটা বুঝে নিলেন—তাই বলে যদি ছেড়ে দাও তাহলে কিন্তু ঠকবে। দ্যাখো পড়ে! স্বাতী উঠে দাঁড়িয়ে বই ক-খানা হাতে নিল—আমি তাহলে যাই?

খুব ভাল লাগল আজ বিকেলবেলাটা—স্বাতীর সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে সত্যেনবাবু বললেন। স্বাতী ভেবেছিল তিনি রাস্তা পর্যন্ত আসবেন। কিন্তু দরজার কাছে থামলেন, একটু দাঁড়িয়ে থেকেই চলে গেলেন ভিতরে। খুব ভাল লাগল বিকেলবেলাটা, স্বাতীর মনের মধ্যে বাজতে লাগল। কেন? বোধহয় দ্রুত দস্তুর জন্য। রান্নাঘরের দিক দিয়ে বাড়ি ঢুকল স্বাতী। ঢুকেই দাদার সঙ্গে দেখা। খাবার টেবিলে বসে চা খাচ্ছে বিজ্ঞান, আর সেই সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা অমলেট।

দাদা! তুই এ-সময়ে বাড়িতে?

কেন, থাকতে নেই একদিনও? টেবিলের উপর বইয়ের বোকা নামিয়ে স্বাতী বসল দাদার মুখোমুখি। হাত দিয়ে কপালের চুল সরিয়ে বলল—সে-কথা আমরাই জিজ্ঞেস করতে পারি তোকে। চামচে দিয়ে অমলেট কেটে নিয়ে মুখে দিল বিজ্ঞান। আর বাঁ হাতে কামড়ে ছিড়ে নিল খানিকটা কাঁচা রুটি। চিবোতে চিবোতে ফোলা-ফোলা গালে একটু হেসে বলল—বাড়ির কী খবর-টবর বল।

তুই আজকাল কী করছিস বল তো সত্যি করে! স্বাতী ভুরু কুঁচকে তাকাল দাদার দিকে। একেবারে সত্যি কথাটাই শুনবি? বিজ্ঞান গলা ভিজিয়ে নিল চায়ের পেয়ালায়।—তোর প্রোফেসর কেমন আছেন?

প্রোফেসর? তখনকার মতো স্বাতী যেন ভুলেই গিয়েছিল যে সত্যেন রায় তার প্রোফেসর। ঐ যে, বাবা যাকে আমার টেবিলফ্যানটা পাঠিয়ে দিলেন।

তোর ঘরে তো সীলিং-ফ্যানই আছে আজকাল।

তবু পাখাটা আমার জন্যই এসেছিল, অন্য কাউকে দেবার আগে আমাকে জিজ্ঞেস অন্তত করা উচিত ছিল একবার। একটা কড়া জবাব এসেছিল স্বাতীর মুখে, কিন্তু সেটা বলতে গেলোই ঝগড়া হবে। আর ঝগড়া হলে দাদার আর কী, বেরিয়ে গেলোই নিশ্চিন্ত, তারই মন-খারাপ হলে থাকবে দু-দিন ধরে। তাই একটু চুপ করে থেকে স্বাতী অন্য কথা পাড়ল—তোর দ্রুত দস্তুর সঙ্গে দেখা হল এইমাত্র।—লেখক দ্রুত দস্ত? ওর নামও আর মুখে আনিস না আমার কাছে।

সে কী! স্বাতীর চোখ কপালে।—এই না তুই দ্রুত দস্ত বলতে শুনল!

তা পাগল প্রায় হয়েইছিলাম ওর পান্নায় পড়ে। বিজ্ঞান হা-হাক্কের হাসল।—আমাকে বলল খিয়েটারের পাশ দেবে, বাড়ি যেতে বলল। তা যেদিনই বাড়ি যাই সেদিনই বাড়ি নেই! বাড়িতে কখনো না-ই যদি থাকবে, তাহলে বাড়ি একটা রাখা কেন বাপু! অভদ্র! দ্রুত দস্তুর টেবিলে-তোলা পা দুটোর কথা মনে করে দাদার শেষ মন্তব্যে সায় দিতে লোভ হল স্বাতীর, কিন্তু পাছে ওতে দাদার বড্ডো আশকারা হয়, তাই একটু হেসে বলল—দ্রুত দস্তুর চেয়ে তোর বুদ্ধি একটু বেশি, দাদা। বাড়িতে কাউকে আসতেই বলিস না কখনো। বিজ্ঞান কথা না-বলে মুখ নিচু করে রুটি-অমলেট শেষ করল। ট্রেন-বদলের আগে লোকেরা যেমন খিদের মুখে রিয়েশমেন্ট-রুমে খেয়ে নেয়, সেই রকম করে খেল সে, দ্রুতবেগে, আত্মক চিবিয়ে, কোনোদিকে না তাকিয়ে। শূন্য প্লেটটা ঠেলে দিয়ে চায়ের পেয়ালা কাছে এনে মুখ মুছল ক্রমালে, তারপর স্বাতীর কথার

জবাব দিলো—আমার সঙ্গে নাকি ধুব দত্তের তুলনা! আমি হলাম দু-বার ম্যাট্রিক-ফেল-করা ভ্যাগাবন্ড, আর উনি একজন বিখ্যাত মানুষ। বিবাহিত ভদ্রলোক, ছেলেপুলে চারটে-পাঁচটা। ওঁর কথার একটা ওজন থাকে চাই তো! বাজে, বাজে সব!

সত্যেন রায় তো বলেন, উনি কবিতা লেখেন খুব ভাল।

তা যত খুশি লিখতে পারেন, তাতে আমার কিছু না।

তোরই বা পাশ চাইতে যাবার কী হয়েছিল?

বাঃ, উনিই তো উৎসাহ করে...যাক, যাক, তুই তোর প্রোফেসর আর সাহিত্যিকদের নিয়ে থাক, স্বাভী। আমি ওসবের মধ্যে নেই। বিদ্যের পিপে তো সব! কিন্তু টাকার মুখ দ্যাখে কখনো! ও-রকম বিদ্যে দিয়ে লাভ কী বল আজকালকার দিনে? পিঠ খাড়া করে বসে টেবিলের উপর দু-কনুই রাখল স্বাভী। আঙুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে বলল—তোর থিয়েটার আবার কবে? জানিস না বুঝি? ঠোটে জিভ বুলিয়ে বিজন একবার চোরা হাসি হাসল। ছেড়ে দিয়েছি ওসব। এত বড়ো একটা খবরে একটুও চঞ্চল না হয়ে দু-হাতের জড়ানো আঙুলের মাঝখানটায় থুতনি রেখে স্বাভী বলল—এখন তাহলে? ফিল্ম?

ফিল্মে তো ঢুকতে পারি ইচ্ছে করলেই, কিন্তু—

আর কিন্তু কেন? নিচু-করা চোখে বোনের দিকে তাকিয়ে বিজন বলল—হেসে নে, হেসে নে, বেশিদিন হাসবি না।

তা বেশ তো, ফিল্মেই ঢুকে পড়—স্বাভী হাসির রেখা মুছে ফেলল মুখ থেকে।

নাঃ, আমি বিজনেস করব।

কী করবি?

বিজনেস।—গম্ভীর সশ্রদ্ধভাবে বিজন উচ্চারণ করল কথাটা।—বিজনেস বিজনেস? স্বাভী আর পারল না, হাত ছড়িয়ে দিয়ে হেসে উঠল খিলখিল করে। বিজনও হাসল সঙ্গে সঙ্গে, একেবারেই অপ্রত্যাশিত সেটা—সব ঠিক করে ফেলেছি। বি-জন নাম হবে কোম্পানির। ইংরিজি B.John, বুঝলি না? কেমন ভেবেছি, বল তো?

আর কন্দূর ভেবেছিস?

দেখবি! শোন স্বাভী, হঠাৎ বোনের দিকে গলা বাড়িয়ে বিজন নিচু গলায় বলল—বাবাকে বল না আমাকে হাজার দু-তিন টাকা দিতে। তাহলেই লেগে যেতে পারি এক্ষুনি।

তোরই বলা উচিত না?

নিশ্চয়ই! কিন্তু উচিতটা কি সব সময় হয় রে? সংসারে বাবাদের যে-রকম হওয়া উচিত... —দাদা! স্বাভীর কণ্ঠে যুদ্ধ ঘোষণা।

থাক, থাক। বিজন বীরদর্পে উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে।—তোর বক্তৃতা শোনার সময় নেই আমার। তোকে বলতে হবে না, যা করবার আমিই করব। দরজার ধার থেকে মুখ ফিরিয়ে আবার বলল—কিন্তু দুঃখের বিষয়, তোদের বাবা তাঁর একমাত্র পুত্রকে মানুষের মধ্যেই গণ্য করেন না। তা তোরা না দিস, যে করে হোক যোগাড় করে নেব। টাকা আমার চাই। শেষের কথাটা চীৎকার করে, বেগে বেরিয়ে গেল বিজন। দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারটা দুলে উঠল ধাক্কা লেগে।

* * * * *

একে একে ক্যালেন্ডার থেকে খসে পড়ল জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বরের পাতা। বেরিয়ে পড়ল

লাল তারিখে ভরা অক্টোবর। ছুটি! কিন্তু তাতে আলাদা করে আনন্দ করবার কী আছে? আনন্দে ভরে গেছে স্বাভাবিক দিন-রাত্রি, তার ঘুমের স্বপ্ন, প্রতিটি জেগে-থাকা মুহূর্ত। নতুন একটা জগৎ পেয়েছে সে। সাহিত্যের জগৎ—দেশ, দৃশ্য, মানুষ। কত হাসির হাওয়া, কান্নার কাঁপন—কত মধুর, নিষ্ঠুর, ভীষণ, সুন্দর বর্ণনা! লজ্জা করে, ভয় করে, বিস্মী লাগে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আনন্দ, শুধু আনন্দ। জীবনে এত আছে? কী ভাগ্য সত্যেন রায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, নয়তো কোথায় পেত এসব, এ-আনন্দ জানত কী করে? এত আনন্দ কি একা একা সহ্য হয়? আর-একজন না হলে চলে? একদিন ছোড়দি এসে তার টেবিলের বইগুলি নেড়ে-চেড়ে দেখছিল, সুযোগ পেয়ে স্বাভাবিক জিজ্ঞেস করল—ছোড়দি তুমি গোগোল পড়েছ?

গোগোল! শাস্ত্রী হেসে উঠল মজার নাম শুনে।—গোগোল কেন, গোল-গোল হলেই পারত! মলাট খুলে বলল—কে রে এই সত্যেন রায়? অনেক বই এনেছিস।

চেনো না তুমি? আমাদের কলেজেরই তো প্রোফেসর।

সত্যেন রায়? শাস্ত্রী ভুরু বাঁকাল। কী জানি—আমাদের সময়ে তো ছিল না, নতুন বোধহয়। অনেক বই বুঝি তাঁর?

অনেক। আর কী ভাল-ভাল সব বই! ছোড়দি তুমি যদি এটা পড়ে দ্যাখো, এই ওভারকোটের গল্পটা—উঃ। পাতা উল্টিয়ে লম্বা-লম্বা ব্যঞ্জনবহুল নাম দেখেই শাস্ত্রী বই বন্ধ করল। নেবে, ছোড়দি? মিনতি করল স্বাভাবিক। কী-যে অদ্ভুত—শাস্ত্রী মাথা নাড়ল—বাংলা বই নেই ভদ্রলোকের?

কত চাও! কবিতার বই সমস্ত—

কবিতা আবার কে পড়ে! গল্পের বই নেই? নভেল? তোর হারীতদা আবার বাংলা বই পড়েন না, আর ইংরেজি যা পড়েন—

তা কিনে নিলেই পারো বাংলা বই।

হ্যাঁ, বই কিনে পয়সা নষ্ট করি আর কি! দামি শাড়ি ঝলমলিয়ে শাস্ত্রী চলে গেল ঘর থেকে।

* * * * *

এর পর স্বাভাবিক একদিন চেষ্টা করল হারীতদাকে। সেদিন সে শেষ করেছে অঙ্কার ওয়াইন্ডের উপন্যাস। লক্ষ টাকা দামের মণিমুক্তার মতো কথাগুলি সাজানো। যেন রঙের ত্রিভুজ লাগে চোখে, যেন এক-একটি কথাকে বইয়ের পাতা থেকে তুলে এনে হাতে ধরা যায়। তীব্র একটা নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিল সে। খুব নিচু গলায়, যেন অত্যন্ত গোপন কিছু বলছে, এইরকম সুরে বলল—হারীতদা, আপনি ‘পিকচার অব ডরিয়ান গ্রে’ পড়েছেন?

ওয়াইন্ড? হা-হা করে হেসে উঠল হারীত। এক্সেসিভ বাদ্যের রোমান্টিসিজম—এর পচা মাল! ওয়াইন্ড পড়ছ! এদিকে সর্বনাশ যে ঘনিয়ে এল! স্বাভাবিক অস্বাভাবিক হল, আঘাত পেল, তাকিয়ে রইল। তবে কি এসব ভাল লাগা উচিত না? কিন্তু ভাল লাগার আবার উচিত-অনুচিত আছে নাকি? কী জানি! অগত্যা দাদার পিছনেই ঘোরাঘুরি করল স্বাভাবিক। বিজন মাঝে-মাঝে দুপুরবেলাটা বাড়িতে কাটায়, খেয়ে-দেয়ে লম্বা ঘুম দিয়ে বেরিয়ে যায় বাবা আপিস থেকে ফেরবার ঠিক আগেই।—বই পড়বি দাদা, গল্পের বই?

কী বই রে?

খুব, খুব—ব ভাল বই, দ্যাখ! সেই ‘ডরিয়ান গ্রে’-র গল্পটাই দাদার হাতে দিল স্বাভাবিক। নিজেকে বড়ো স্বার্থপর লাগে এক-এক সময়... আহা, দাদাও পড়ক। বইটার দিকে তাকিয়ে বিজন

বলল—থাক, পরে পড়ব। সিগারেট ধরিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়, বালিশের তলা থেকে বের করল একটা রঙচঙে বই। মলাটে কালো মুখোশ-পর্যায় দূশমনের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে আছে বুক-খোলা জামায় শ্বেতাসিনী।

এ-সব বাজে বই পড়িস কেন দাদা?

বাজে! ঠাঁই! ঠাঁই! গোল করে সিগারেটের ধোঁয়া বের করল বিজন। জানিস না তো, স্পোকেন ইংলিশ শিখছি। ওং, চোস্তু! কথায়-কথায় ড্যাম। একটু পরে আবার বলল—বিজনেস করতে হলে ইংরেজিটা বলতে পারা চাই, বুঝলি না? স্বাতী বুঝল, আস্তে উঠে গেল তার ভাল-লাগার ভার একলা বহন করে।

দোলের দিনে ছোটো ছেলে যেমন আর-কাউকে বাগাতে না পেরে ঘরে এসে মা-র পিঠেই রঙের শিশি খালি করে, স্বাতীও সেইরকম বাবাকেই ধরে পড়ল একদিন। জান বাবা, সত্যেনবাবু যেসব বই পড়তে দেন না আমাকে, কী-যে ভাল-ভাল বই!

হবেই! যেমন মানুষ, তেমন তো পছন্দ।

তুমি তো বল আমি দিন-রাত কেবল বই পড়ি। কিন্তু তুমি আরম্ভ করলেও আর ছাড়তে পারবে না।

তাহলে আমার তো আরম্ভ না করাই ভাল। আপিস-টাপিস আছে তো আবার! স্বাতী হেসে বলল—আচ্ছা, আমি তোমাকে গল্পগুলো বলব। শুনবে, বাবা?

বেশ! রাজেনবাবু তৎক্ষণাৎ রাজি।

এখন শুনবে?

এখন? রাস্তিয়ে খেয়ে-দেয়েই তো ভাল। আচ্ছা স্বাতী, সত্যেন তো এত বই দেয়। তোমারও তো ওকে কিছু দেওয়া উচিত।

ও মা, আমি আবার কী দেব!

নেমস্তম্ব করে খাওয়াতে পারো মাঝে-মাঝে। ভাল রান্না-টান্না হলে পাঠিয়েও দিতে পারো। আমি ও-সব পারব-টারব না।

পারব না বললেই তো আর হল না। এখন বড়ো হয়েছ, সবই করতে হবে। স্বাতী মুখ তুলে শুধু মাথা নাড়ল উত্তরে। —আচ্ছা, পূজোর সময় আমিই বলে আসব একদিন। শ্বেতাও এসে পড়বে তদ্দিনে। খুশির আভা লাগল রাজেনবাবুর মুখে।

বড়দি সত্যি আসবে?

লিখেছে তো—রাজেনবাবুর মুখ খুশিতে জ্বলজ্বলে হল। কিন্তু ছুটি হক্কর সঙ্গে-সঙ্গে সত্যেনবাবু চলে গেলেন কোথায় যেন বাইরে আর পূজোর কটা দিন দেশের বাড়িতে কাটিয়ে দশমীর দুদিন পরে শ্বেতা এসে পৌঁছল স্বামী, চারটি ছেলে-মেয়ে, একটি ছিকর আর বিস্তর মালপত্র নিয়ে। এসেই হোন্ডলে বাঁধা মস্ত বিছানা নিজেই টোনে-টোনে খুলে ফেলল, বের করে দিল এক বাস্তিল পূজোর কাপড়, আর বিস্কুটের টিনে-টিনে ভরা ক্ষীরের আর নারকোলের রকমারি খাবার। এক প্লেট ভরতি করে সাজিয়ে স্বাতীর সামনে ধরে বলল—খা।

ও মা! এত!

এত কী রে? আমার ওরা তো এ-রকম চার খালা... বাক্সাং, বিছানার মধ্যে যা করে লুকিয়ে এনেছি, রান্ধসরা টের পেলে কি আর রন্ধে ছিল? পথেই সাবাড় করে দিত। আরো দু-প্লেট সাজাতে-সাজাতে বলল—আয় বিজু। বাবা? রাজেনবাবু হেসে বললেন—তুই ইচ্ছিস কী রে

দিন-দিন? এই তো বাড়িতে পা দিলি!

নষ্ট হয়নি তো আবার? উদ্বেগ ফুটল শ্বেতার কণ্ঠে। একটা তুলে নাকের কাছে ধরে দু-তিনবার নিশ্বাস নিয়ে নিশ্চিন্ত হল—না, ঠিক আছে। কী? নিজের বাচ্চাদের সে তাড়া করল এবার—এখানে ঘুরঘুর কেন? আচ্ছা, নে একটা-একটা। আর কিন্তু না, ভাগ! স্বাতী খাচ্ছিস না? —চা হোক।

আচ্ছা আচ্ছা, চায়ের সঙ্গে আবার খাবি, এখন এইটে—। বেছে-বেছে একটা মৎস্যাকৃতি মিষ্টি তুলে শ্বেতা গুঁজে দিলে স্বাতীর মুখে।

আঃ, বড়দি!

কেমন, ভাল না? সমস্ত মুখে এলাচগন্ধী নরম নারকোলের ছড়িয়ে-পড়া অনুভব করতে-করতে স্বাতী হেসে ফেলল।

এই ক্ষীরেরটা...বিজু, তুই আর, এই যে—স্বামীকে দেখতে পেয়ে শ্বেতা আঁচল তুলে দিস মাথায়—তুমিও একটা খাবে নাকি?

তোর পাল্লায় পড়লে কি আর রক্ষা আছে? রাজেনবাবু হাসলেন।

আর বলেন কেন? গালের চর্বির ভাঁজে-ভাঁজে হাসি ফুটিয়ে প্রমথেশ বলল—ব্লাড-প্রেসার বেড়ে যাচ্ছে, তার উপর আপনার মেয়ে...

আহা—স্বামীর আর বাবার মাঝামাঝি তাকিয়ে শ্বেতা বলল—ইচ্ছে না-থাকলে কেউ যেন জোর করে খাওয়াতে পারে। রাজেনবাবু বললেন—সকলে তো খেল, তুই? শ্বেতা যেন শিউরে উঠে বলল—রক্ষা করো! এসব খেতে-খেতে পচে গেছে মুখ! আমার জন্য ডিম-সন্দেশ এনো। আর শোনপাড়ি, আর কলে-ঠান্ডা দই।

বেশ। —রাজেনবাবু উঠে পড়লেন। —বাবা, চা...

চা আর খাব না এখন। আর দেরি না-করে রাজেনবাবু চললেন ট্রামে করে জগুবাবুর বাজারে। একটু পরেই শাম্ভতী আর হারীত এসে পৌঁছল, নতুন করে রোল উঠল আনন্দের। চা হতে-হতে শ্বেতা এল। হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার একটি শাড়ি পরে, কপালে জুলজুলে সিঁদুর, আঁচলে চাবির গোছা। যদিও পাঁচটি সন্তানের মা, একটু ভাঙেনি তার শরীর। একটু মোটা হয়নি, ঈষৎ ম্লান রঙের মুখখানা যেন লাবণ্য দিয়ে বানানো। স্বাতী দেখে মুগ্ধ।

বসন্তের সকালে পাখি যেমন নেচে-নেচে বেড়ায়, চায়ের টেবিলে শ্বেতার ছায়াটা যেন তেমনি। একবার শাম্ভতীকে জড়িয়ে ধরে। একবার হাত রাখে বিজুর টেড়ি-কাটা মাথায়। একবার কোনো একটা সেকলে চিরকেলে ঠাট্টা করে হারীতকে। জনে-জনে চায়ের স্ফালা এগিয়ে দিতে দিতে স্বাতীর কাছে এসে হঠাৎ একটু থেমে বলল—স্বাতী! তুই কত সুন্দর হয়েছিস রে!

আর তুমি! লাজুক হেসে স্বাতী জবাব দিল—তুমি-যে দশদিন আরো সুন্দর হচ্ছে।

শোনো কথা! স্বাতীর প্রকাণ্ড খোঁপাটার উপর দিয়ে শ্বেতার হাত ঘুরে এল একবার—এ-রকম চুলই তো আজকাল দেখি না কোনো মেয়ের। নিজের ছোটোখাটো খোঁপাটা আস্তে একটু চাপড়ে শাম্ভতী বলল—জান বড়দি, লম্বা চুল আজকাল আর ফ্যাশনেবল নয়।

নাকি রে? তাহলে আমার আর দুঃখ কী। আমারও ছিল তো মন্দ না, কিন্তু যেতে-যেতে এখন...এই দ্যাখ, শেয়ালের ল্যাজ। তার কথা শুনে, তার হাসি দেখে, সকলেই হেসে উঠল একসঙ্গে।

মেয়েদের চুল আর ক-দিন! হঠাৎ গম্ভীর গলায় বলে উঠল বিজন—যদিই না বিয়ে হয়।

বিয়ের পরে একটি-দুটি ছেলেপুলে হলেই বাস! কথাটা সে শুনেছিল অনেকদিন আগে ধ্রুব দত্তর মুখে। বাড়ির এতগুলি লোকের সামনে এমন লাগসই জায়গায় বলতে পেরে কী-যে খুশি লাগল! ধ্রুব দত্ত যখন বলেছিলেন, শ্রোতারা অনেকেই হেসেছিল, কিন্তু বিজ্ঞনের শ্রোতারা একটু যেন গম্ভীরই হয়ে গেল, শুধু প্রমথেশ বলে উঠল—ঠিক...ঠিক বলেছ বিজ্ঞু, একেবারে খাঁটি কথা। শাস্ত্রী নড়েচড়ে বলল—ছেলেমানুষের মুখে বুড়ো কথা কী বিশ্রী!

আর কতকাল ছেলেমানুষ করে রাখবি তোরা? মস্ত বাবু হল না? শ্বেতা একটু হাসল ভাইয়ের দিকে। বিজ্ঞু আর চা? বয়স্ক মোটা গলায় বিজ্ঞন জবাব দিল—না, আর না। তোমরা বোসো বড়দি। আর কারো দিকে না তাকিয়ে চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ল তাড়াতাড়ি। তথাকথিত গুরুজনদের মধ্যে বসে থাকা আর সম্ভবও ছিল না তার পক্ষে। সিগারেটের জন্য আইটাই করছিল প্রাণ।

হারীত, তোমাকে আর?

দিন আর একটু—হারীত তার পেয়ালাটি ঠেলে দিল শ্বেতার দিকে। স্বামী বলল—তুমি এবার বোসো তো বড়দি, খাও।

এই বসি—হারীতের পেয়ালা দ্বিতীয়বার ভরে দিয়ে শ্বেতা বসল বিজ্ঞুর পরিত্যক্ত চেয়ারে। শাস্ত্রীর আর হারীতের মাঝখানে—দে তো শাস্ত্রী, আমাকে একটু চা দে। চিনি বেশি কিন্তু। ক-চামচে? খুব পরিচ্ছন্ন, নিপুণ, নিখুঁত ভঙ্গিতে চিনির বাটিতে চামচে ডুবিয়ে শাস্ত্রী চোখ তুলল।

তিন। একটু হেসে শ্বেতা জুড়ে দিল—চারেও আপত্তি নেই... এ কী রে!

হঠাৎ শাস্ত্রীর চামচে-ধরা ডান হাতের কঙ্গিটা দু-আঙুলে চেপে ধরল শ্বেতা।—শাঁখা কই? শাস্ত্রী জবাব দিল না। নিচু মুখে চা ঢেলে দিয়ে বসে পড়ল।

বিয়ের শাঁখা ভেঙে গেছে বুঝি? তা পরতে হয় তো আবার! ঠোঁটের কোণে তীক্ষ্ণ একটু হাসি ফুটিয়ে হারীত বলল—ও সব দাসীত্বের চিহ্ন ধারণ করে আর কী হবে!

দাসীত্ব? আহা রে—শ্বেতা কনুই দিয়ে ঠেলা দিল শাস্ত্রীকে। কী রে? দাসীত্ব নাকি? কিন্তু শাস্ত্রী হাসল না, মুখ তুলল না। এই শাঁখা নিয়ে একটু দুঃখের খোঁচা আছে তার মনে। শাঁখার বিরুদ্ধে হারীতের জেহাদ বিয়ের প্রথম থেকেই। ‘অসত্য’, ‘বর্বর’, ‘মিডিয়াভল’—এ-সব বিশেষণ শেষ করে হারীত বলল—ঐ শাঁখা-সিঁদুর-পরা মূর্তি নিয়ে বেরোতে লজ্জা করে আমার। শাস্ত্রীও রাগ করে জবাব দিল—বেশ তো, বেরিয়ে না!

কী? একেবারে সতীলক্ষ্মী হয়ে অস্ত্রপুরে লুকোবে?

আমি যাই করি না, তোমার তাতে কী?

—নিশ্চয়ই আমার, কেননা তুমি আমার স্ত্রী। আর এ-মুখে আমরা তো শুধু স্ত্রী চাই না, সঙ্গিনীও চাই।

—সঙ্গিনীর অভাব কী তোমার! এই শেষ মস্তব্যটার একটু ইতিহাস ছিল। কদিন আগে একটা পার্টিতে গিয়েছিল তারা। কোনো এক দুঃখী দেশের সাহায্যে চাঁদা তোলা হচ্ছে—শাস্ত্রীর ঠিক মনে নেই সেটা চীন না স্পেন না চেকোস্লোভাকিয়া। সেখানে একটি ঠোঁটে-রং-মাখা পাজামা-পরা পাজ্জাবি মেয়ের সঙ্গে হারীত একটু বেশিক্ষণই কথা বলেছিল। বাড়ি ফেরার পথে শাস্ত্রী একটু গম্ভীর হয়েছিল সেদিন। কিন্তু হারীত স্পেন, চীন কিংবা চেকোস্লোভাকিয়ার দুর্দশার বর্ণনায় এত মগ্ন ছিল যে স্বীর মুখ দেখে কিছুই তার মনে হয়নি তখন। কিন্তু যেই শাস্ত্রী ও কথা

বলল, অমনি ঐ পাঞ্জাবি মেয়েটির কথাই মনে পড়ল তার। সে খুব শ্রদ্ধা করে এমন একজন মানুষের বোন। একটু তাকিয়ে থেকে স্বীকে বলল—তুমি দেখছি একেবারেই অশিক্ষিত। এই রকম কথা-কাটাকাটি হতে-হতে বিয়ের ছ-মাস পরে একদিন শাস্তীর হাত চেপে ধরে মটমট করে দুটো শাঁখা ভেঙে দিল হারীত। রাত্তিরে শুয়ে-শুয়ে খুব কাঁদল শাস্তী—দাম্পত্য জীবনে এই প্রথম কান্না—কিন্তু শাঁখা পরার কথা আর মনেও আনল না, আর আস্তে-আস্তে তার মনে হতে লাগল যে এ-ই ভালো হল, হারীতের বন্ধুদের স্বীরা কেউই শাঁখা পরে না, একটু বেখাপ্পাই লাগে নিজেকে।

শাস্তীর কাছে কোনো জবাব না-পেয়ে শ্বেতা ফিরল হারীতের দিকে—তা দাসীত্ব যদি হয় সে তো তোমারই দোষ বাপু, শাঁখার উপর রাগ কেন? মুহূর্তের জন্য একটু-যেন অস্বস্তি বোধ করল হারীত, তারপর বলল—ও-সব চিহ্ন দূর হলে দাসীত্বও যাবে।

কেন, চিহ্ন ছাড়া দাসীত্ব থাকতে পারে না?

এটা কিন্তু তোমার দিদি ঠিক বলছেন, হারীত। এই ধরো না আমরা, আমরা তো এঁদের দাসত্বই করি। কিন্তু চিহ্ন-টিহ্ন কিছু তো নেই—বলতে-বলতে প্রমথেশের গালে চর্বির ভাঁজে-ভাঁজে যেন হাসির ছোটো-ছোটো ঢল নামল। সেদিকে তাকিয়ে হারীত মনে-মনে বলল—হাফ-উইট! কিন্তু মনের কথা যেহেতু কানে শোনা যায় না, তাই প্রমথেশ আবারও একটা রসিকতার চেষ্টা করল—বিয়ের পরে পুরুষেরও যাতে একটা চিহ্ন থাকে, তুমি বরং তাই নিয়ে একটা আন্দোলন আরম্ভ করতে পার, হারীত।

—তা অনেক পুরুষের থাকে বইকি। হিরের আংটি, সিন্ধের পাঞ্জাবি, সোনার বোতাম, আর হাতে একটা চকচকে নতুন ছাতা। হারীত ঘোঁৎ করে হেসে উঠল, কী রকম শুকনো নিরানন্দ হাসি।—কারো কারো কয়েক মাস, কারো কারো আজীবন। ছাতাটা বাদ দিয়ে বর্ণনাটা মিলে গিয়েছিল প্রমথেশের সঙ্গে, কিন্তু প্রমথেশ সেটা বুঝলই না। মাথা নেড়ে-নেড়ে তারিফ করে বলতে লাগল—ঠিক বলেছ তাই, ঠিক! ঠিক!

যা বলেছ, হারীত! শ্বেতা হেসে উঠে একটা চাপড় বসিয়ে দিল হারীতের পিঠে—হারীত ভেবে পেল না, এত আনন্দ কীসের—একটা কথার মতো কথা বলেছ! ওঁর সেই বিয়ের আংটি আর বোতাম উনি কিছুতেই ছাড়বেন না তো। দ্যাখো তো—শ্বেতা স্বামীর দিকে ফিরল। কী চমৎকার দেখাচ্ছে হারীতকে হাত-কাটা চেনটানা গেঞ্জি-শার্টে। ভাবিসনে শাস্তী, ঐ চেন ধরেই টেনে নিয়ে বেড়াতে পারবি। শ্বেতা গড়িয়ে পড়ল শাস্তীর কাঁধে।

মুখে একটা উঁচু দরের হাসির ভাব রেখে হারীত উঠে দাঁড়াল কাজ-করা খবর-কাগজটা রাজদণ্ডের মতো হাতে ধরে—ঘুরে আসি একটু।

আরে, বসো, বসো—আরো অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে—বলল শ্বেতা।

পরে হবে। একটা-দুটোর আগে তো খাওয়া হবে না। কাজ সেরে আসি।

পুজোর মধ্যেও কাজ? প্রমথেশ চমৎকৃত।

ছুটি-তো আগিশের, আমার ছুটি নেই।—দাঁতের ফাঁকে পাইপ চেপে ধরে লম্বা-লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেল কমবীর। গোল-গোল চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে প্রমথেশ মন্তব্য করল—হারীত আমাদের তুখোড় ছেলে।

তুইও যেমন! শাস্তীর মাথায় একটা টোকা দিয়ে শ্বেতা বলল—পুরুষমানুষের কত সময় কত খেলাই হয়, তা নিয়ে আবার ভাবিস! আজই চল, তোকে শাঁখা কিনে দেব কালিঘাটে।

স্বাতী দেখল, হারীতদা চলে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে ছোড়দির সমস্ত ভাবটাই বদলে গেল যেন। সহজ হল, মুখে পরিষ্কার ফুটে উঠল আরাম। শুধু আজই নয়, হঠাৎ স্বাতীর মনে হল, সবসময়ই এরকম হয় ছোড়দির। হারীতদা যতক্ষণ কাছে থাকেন, তার চলা, বলা, হাসি, সমস্তই যেন আধো-আধো বাধো-বাধো। আর তাকে এ-বাড়িতে রেখে যেই হারীতদা কিছুক্ষণের জন্যও অন্য কোথাও গেলেন, অমনি সে অন্য মানুষ। এ-রকম মনে হওয়া অন্যায, হয়তো এটা আমারই ভুল; কিন্তু যতই যে তাকাতে লাগল ছোড়দির দিকে, যতই শুনতে লাগল বড়দির সঙ্গে তার বকরবকর, স্বাতী ততই অবাক হল এ-কথা ভেবে যে এতদিনের মধ্যে আজই প্রথম তার এটা মনে হল। সত্যি, ছোড়দির হয়েছে কী? মোটাসোটা হয়েছে, শাড়ি-গয়না পরে দেখায়ও জমকালো; কিন্তু...কিন্তু মুখে লাবণ্য কই, চোখের তারা নাচে না কেন, তাজা একটা ফুল যেন রোদ্দুর লেগে শুকিয়ে গেল। হয় নাকি এ-রকম? এ-রকমও হয় নাকি? ছোড়দির মুখের পাশেই বড়দির ছলছলে মুখের দিকে তাকিয়ে কী রকম একটা কষ্ট হল স্বাতীর মনের মধ্যে।

* * * * *

বাবা বাজারসুদু কিনে নিয়ে এলেন। কোমরে আঁচল জড়িয়ে বড়দি ঢুকল রান্নাঘরে। কতবার ডাকলেন রাজেনবাবু, কিন্তু শোনে কে!—ঈশ! কী চমৎকার তেলওলা আড়মাছটা, এ আমি নিজের হাতে না রুঁধে পারবই না। আর মাথাটা দিয়ে মুড়িঘণ্ট... ও মা, বাঁধাকপি! আশ্বিন মাসেই বাঁধাকপি! আর কাঁকড়া কী বড়ো-বড়ো! সত্যি, কলকাতা শহর! এরকম হলে তবে না রুঁধে সুখ!

মেয়েটা যে কী! বিড়বিড় করলেন রাজেনবাবু। আহা—প্রমথেশ বলে উঠল—যে যেটা ভালবাসে, তাকে সেটা করতে দেওয়াই তো ভাল।

আসল কথা—স্বাতী হাসল—বড়দির রান্না ছাড়া রোচে না আর কি আপনার মুখে।

ঠিক বললে না। শালীদের রান্না আরো বেশি রুচবে, কিন্তু তারা তো আর... হা-হা হাসি দিয়ে কথা শেষ করল প্রমথেশ। স্বাতী আস্তে আস্তে রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। গনগন করে জ্বলছে দুটো উনুন, ছাঁকছাঁক করছে কড়াই, বুড়বুড় করছে ডেকচি। কাছে এসেই গন্ধে হেঁচে ফেলল স্বাতী।

স্বাতী, কী রে?

কী আবার, এমনি!

খাবি কিছু? মাছ ভেজে দেব? না একটা আলুসেদ্ধ?

ও-মা, এইমাত্র তো অতগুলো মিষ্টি খেলাম। এক্ষুনি আবার খেজে পারে নাকি মানুষ?

আমার সব ক-টা আলুসেদ্ধর যম। যত রান্নাই হোক আলুসেদ্ধ চাই-ই। বলতে-বলতে ডালের টগবগে ডেকচিটা হাতা দিয়ে ঘুঁটে একবারেই তিনটে আলু ভুলে আনল শ্বেতা। এক আঙুলে একটু ছুঁয়ে-ছুঁয়ে পরীক্ষা করল, তারপর হাতটা নাচিয়ে-নাচিয়ে দুটোকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিল জ্বলন্ত জলে। আর অন্যটিকে নির্ভুলভাবে ফেলল একটা বাটির গর্তে। বাঁ হাতে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে আঙুলে সইয়ে-সইয়ে খোসা ছাড়িয়ে ফেলল নিমেষে। তারপর সুগোল, হলদে, ধোঁয়া-ওঠা, সুগন্ধি একটি আলু চায়ের প্লেটে নুন-গোলমরিচ সুদ্ব সাজিয়ে সামনে রেখে বলল—এই নে। সমস্ত কাণ্ডটি শেষ হতে বোধহয় মিনিটখানেকের বেশি লাগল না। দেখে-দেখে স্বাতীর মনে পড়ে গেল জাপানিদের টেনিস খেলার কথা। ছেলেবেলায় দেখেছিল একবার অরুণদার সঙ্গে, সাউথ ক্লাবে।

বোস না, বসে যা—শ্বেতা ঠেলে দিল ছোটো একটা জল-চৌকি। কই, রামের মা, বাঁধাকপি কোটা হল তোমার? স্বাতী বসে-বসে কামড়ে-কামড়ে আলুটা খেতে লাগল, আর মনে হল যে আলুসেদ্ধর মতো সুখাদ্য পৃথিবীতে আর নেই। কিন্তু আলুটা যতই ছোটো হয়ে এল, ততই খাওয়ার সুখ কমিয়ে দিতে লাগল রান্নাঘরের গরম। কাঁকড়ায় মশলা মাখাতে-মাখাতে শ্বেতা একবার তাকিয়ে বলল—যা এবার এখান থেকে। পালা! আলুটা শেষ করে স্বাতী উঠল। চুপ করে একটু দাঁড়িয়ে থেকে বলল—বড়দি, কী করে পারো উনুনের ধারে এতক্ষণ বসে থাকতে? আঁচলে একবার মুখ মুছে শ্বেতা একটু হাসল বোনের দিকে তাকিয়ে—ভুইও পারবি। পারবে? সেও পারবে? সকালের বাকি সময়টুকু কেমন ঘুরে-ঘুরে উন্মনা হয়ে কটাল স্বাতী। দুপুরে খাওয়া হতে-হতে দুটো বাজল, আর তারপরে স্থা করে বিকেল হয়ে সন্ধ্যা নামল একেবারে। দিন কি এতই ছোটো হয়ে গেল হঠাৎ? চা খেয়েই হারীত বলল—আমরা চলি এবার। ও মা, এখনই? সঙ্গে-সঙ্গে শ্বেতার প্রতিবাদ। রাত্তিরে খেয়ে-দেয়ে...

একবেলাতেই দু-বেলার মতো হয়ে গেছে। একটু বেশিও। শাস্ত্রী, তৈরি হয়ে নাও। এত তাড়া কীসের?

আমার এক বন্ধু আসবেন সাড়ে-সাতটায়—হারীত তার হাত-খড়ির দিকে তাকাল। বন্ধু-বান্ধব তো রোজই আছে তোমার—শ্বেতা নরম সুরে বলল—একদিন না হয়... তা হয় না। অ্যাপয়ন্টমেন্ট করেছি।

তাহলে তো যেতেই হয়, সত্যি—প্রমথেশ মাথা নাড়ল।

তা, শাস্ত্রী থাক না—শেষ চেষ্টা শ্বেতার। বেশ, বেশ!—সঙ্গে-সঙ্গে প্রমথেশ উৎসাহিত।—শাস্ত্রী থাক, খেয়ে-দেয়ে যাবে রাত্তিরে, কেমন? বিজু পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবে'খন। আর বিজু না যায়, আমি তো আছি হে, ভাবনা কী?

বন্ধুটি সস্ত্রীক আসবেন, শাস্ত্রীর তাই যাওয়া দরকার—বলতে বলতে হারীতের ঠোঁটের কোণ বেঁকল একটু—তা, ও যেতে না চায়, থাক। রাত্তিরটাই থাক না এখানে। একটু গা মোড়ামুড়ি দিয়ে শাস্ত্রী ক্ষীণস্বরে বলল—না বড়দি, আমি চলেই যাই। একবার শাস্ত্রীর, একবার হারীতের মুখ-চোখের দিকে পলক ফেলে শ্বেতা বলল—আচ্ছা, আচ্ছা, তা-ই ভাল। সত্যি হ্যাঁ বড়দিতে লোকজন আসবে, গৃহকর্ত্তী না-থাকলে চলে! আবার আসিস। রোজই আসিস। কেমন? আয় তোর চুলটা বেঁধে দিই—বলে হাত রাখল শাস্ত্রীর মাথায়। চুল বেঁধে লাড়ি পরতে-পরতে দেরি হয়ে গেল একটু। সাড়ে সাতটার আগে পৌঁছবার জন্য ট্যান্ডি নিজে হল হারীতকে, আর খামকা এই খরচটা হল বলে মন-মেজাজ আরো বিগড়ে গেল তার শাস্ত্রী ধার ঘেঁষে বসেছিল মুখ ফিরিয়ে। খানিকটা চুপচাপ চলবার পর হঠাৎ হারীত বলল—কী, কাদছ নাকি? শাস্ত্রী কথাও বলল না, মুখও ফেরাল না।

এতই যদি তোমার বাপের বাড়ির টান, তাহলে বিয়ে না করাই তোমার উচিত ছিল। এবারেও কোনো জবাব পেল না হারীত। Fool! এই জোরালো ইংরেজি মনোসিলেবল একবার উচ্চারণ করেই হারীত যেন ট্যান্ডি-ভাড়টা উত্তল করে নিল।

২

শাস্ত্রী কাদছিল না। সোনার দিনটির পরে কালো হয়ে আসা সন্ধ্যাটার কথা ভাবছিল শুধু। এখন গিয়ে ড্রয়িংরুম আলো করতে হবে, হাই চেপে-চেপে হাসতে হবে। আর ভয়ে-ভয়ে থাকতে

হবে, পাছে ভুল জায়গায় হেসে ফেলে। যিনি আসছেন, ইকনমিস্টে তাঁর মতো পরিষ্কার মাথা দেশে আর দ্বিতীয় নেই—মানে, হারীতের তা-ই মত। বন্ধুদের প্রশংসায় সর্বদাই পঞ্চমুখ সে। আর সত্যিও, কত খবর রাখে তারা, কত জানে, কত পড়ে, আর কী-কথাটাই বলতে পারে এক-এক জন! সেসব কথা কিছুই বোঝে না শাম্ভতী। এমনকি তাদের ঠাট্টা-তামাশায় পর্যন্ত তারা নির্দিষ্ট কয়েকজন ছাড়া অন্য কারো হাসি পায় না। আরো মুশকিল এই যে দলে কয়েকজন অবাঙালিও আছে। তারা কেউ এলে কথাবার্তা ইংরেজিতেই চলে, আর শাম্ভতী যদিও সসন্মানে বি.এ. পাশ, তবু ইংরেজিতে কথা বলতে খুবই অসুবিধে হয় তার। দুটো-চারটে বাঁধা বুলির পরেই হাঁপ ধরে। ভদ্রলোকেরা সত্বীক এলেও একরকম, মেয়েদের আলাদা হয়ে গল্প করা নিয়ম হিসেবে নিষিদ্ধ হলেও নিশ্বাস তো ফেলা যায় মাঝে-মাঝে। কিন্তু কত দিন এমন হয় যে প্যান্ট-পরা-পরা পুরুষদের মধ্যে সে একটামাত্র মেয়ে। উঠে এলে স্বামীর মান যায়, আর বসে থাকতে তার নিজের প্রাণ। সে ইংরেজি বলতে পারে না, ফাসিস্ট রাষ্ট্রসরা কোথায় কী-কী মন্দ কাজ করেছে আর করছে, তার লিস্টিটা মুখস্তই হল না মোটে। তারই দোষ এ-সব, লজ্জা করে মনে-মনে, চেষ্টা করে প্রাণপণ, কিন্তু পরীক্ষার পড়া-তৈরির মতো এই পরিশ্রম ভাল লাগে নাকি বারো মাস? হারীত আবার আড্ডা ছাড়া টিকতে পারে না। হয় তাদের কেউ আসছে, নয় তারা কোথাও যাচ্ছে, প্রত্যেকটি সন্ধ্যা এ-রকম। এই দুবছরের মধ্যে, হোক বৃষ্টি, হোক অসুখ, এমন একটা সন্ধ্যা মনে করতে পারে না শাম্ভতী, যে সন্ধ্যা তারা দুজনে নিরিবিলি কাটিয়েছে। প্রথম-প্রথম অভিমান হত তার, রাগ হত, কষ্ট হত। সেসব পালা পার হয়ে এসে এতদিনে ইচ্ছেটাই মরে গেছে তার। এখন শুধু মনে হয় কেউ আসুক, অন্য-কেউ, কোনো মেয়ে, এমন কোনো মেয়ে যার সঙ্গে আর-একজন মেয়ে মন খুলে দুটো কথা বলতে পারে। স্বাভীতার দৌড় তো এখনো নভেল পর্যন্তই, ওর বিয়ে হলে বেশ হয়। কিন্তু বিয়ের পরে আবার কী রকম হবে কে জানে! আজ বড়দির কাছে একটা জীবন পেয়েছিল সে। পরিষ্কার, নিশ্চাণ, বিমর্ষ সিঁড়ি দিয়ে তেতলার ছোট্টো ফ্ল্যাটে উঠতে-উঠতে দুবার তার নিশ্বাস পড়ল।

* * * * *

পরের দিন সকালে হারীত বলল—যাবে নাকি ও-বাড়িতে? শাম্ভতী উদাসভাৱে অন্তরীক্কে তাকিয়ে রইল।

কী-মুশকিল! ‘কী’-টাকে ‘খী’-র মতো উচ্চারণ করে বলে উঠল হারীত। আমিও তো কিছু আশা করতে পারি তোমার কাছে। আফট্রল, তুমি আমার স্বী তো নীও ওঠো।

তোমাকে যেতে হবে না। আমি একাই পারব।

তোমার বড়দি অবশ্য আমাকে যেতে বলেননি, কিন্তু...যাই একটা শাম্ভতী অবাক হল হারীতকে ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে দেখে।

দিনের যে-কোনো সময়ে রোজই আসে শাম্ভতী, আর রাত দশটার আগে যে-কোনো সময়ে হারীত এসে তাকে নিয়ে যায়। বাড়ির দিন-রাত্রির চেহারা বদলে গেল। স্বাভীর মনে হল তার সুখের ছেলেবেলাই বুঝি ফিরে এল আবার। এমন কি দাদা পর্যন্ত অনেক বেশিক্ষণ বাড়ি থাকে। জামাইবাবুর সঙ্গে ঘন-ঘন গোপন পরামর্শ তার, এক-একবার কথা শেষ করেই বেরিয়ে গিয়ে সে নিয়ে আসে কোনো নাটকের কি সিনেমার এক গোছা টিকিট। দুই ট্যান্সি বোঝাই হয়ে বাড়িসুদ্ধ হৈ-হৈ করে শ্যামবাজারে থিয়েটারে যাওয়া। কী কাণ্ড! আস্ত একটা রো ভরে ফেলেছে তারাই! আর সিনেমা? বাংলা আর হিন্দি তো বাকি রইল না একটাও। হারীতের অনারে একদিন

মেট্রোতেও যাওয়া হল, আর তারপর অবশ্য কলকাতার তখন-তাজ্জবতম লাইটহাউসও বাদ গেল না। এরপর যেদিন আলগোছে আবার একটা নাটকের নাম করল বিজু, হারীত শুনে ফেলে চট করে বলল—বিজন, জামাইবাবুকে একবারে ফতুর না করে ছাড়বে না? আহা এটুকুতেই—আর মুখ-চোখের ভঙ্গিতে মনের ভাব ব্যক্ত করল প্রমথেশ। এ-কদিন শুধু আমোদ-প্রমোদে যা খরচ করলেন—হারীত হিসেব করল—তাতে অনেকে এক মাস সংসার চালায়। অনেকে মানে সেই ভাগ্যবান শতকরা চার কি পাঁচজন, যাদের অত বেশি উপার্জন। তা...তা... আমতা আমতা করে প্রমথেশ হঠাৎ একটা যুক্তি খুঁজে পেল—নাটক-সিনেমা যারা করে, তাদেরও তো সংসার চলা চাই।

সে-তো ঠিকই! হারীত বাঁকা ঠোটে হাসল—বড়োলোক তার সুখের জন্য প্রচুর বাজে খরচ করে বলেই না গরিবরা দু-বেলা দু-মুঠো খেতে পায়!

সুখের জন্য হলে আর বাজে খরচ কেন? প্রমথেশের কথাটা শোনাল যেন মাস্টারমশাইয়ের কাছে সুবোধ ছাত্রের প্রশ্ন। —টাকা তো সুখের জন্যই, না?

সুখ ভাল, কিন্তু তার চেয়েও ভাল একটু রাশ টেনে চলা। গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে হারীত বলল কথাটা, আর বলেই এক ঝলক তাকাল স্ত্রীর দিকে। কিন্তু শাম্বতী বিজনের সঙ্গে বসে নিচু মুখে দেখছে পারিবারিক ফোটোগ্রাফের আলবাম। কথাটা তার কানে পৌঁছল না। অন্তত পৌঁছল বলে বোঝা গেল না। একটু রাগ হল হারীতের, কেননা শাম্বতী যেন ঠিক শিক্ষাটা নিতে পারছে না—না পলিটিশ্বে, না ডেমস্টিক ইকনমিতে। এই-তো সেদিন তার কাছে এই অদ্ভুত প্রস্তাব করেছিল যে ও-বাড়ির সবাইকে নিয়ে তারা যদি একদিন কোনো সিনেমা-টিনেমায়...। কথা অবশ্য শেষ করতে পারেনি, হারীত আদ্যেকই কেটে দিয়েছিল ‘পাগল’ বলে, কিন্তু শাম্বতী প্রশ্ন করতেও ছাড়েনি—পাগল কেন?

আমার কি অত টাকা আছে?

কত আর লাগে—তবু তর্ক করেছিল স্ত্রী—আর এত যাচ্ছি জামাইবাবুর সঙ্গে।

তাহলে আমি বলব না-যাওয়াই তোমার উচিত ছিল। নিজের অবস্থা তো জান।

কেন, অবস্থা এমন মন্দ কী আমাদের?

তোমার ইচ্ছেমতো চললেই মন্দ হবে। এর উত্তরে শাম্বতীর আর কথা ফোটেনি। আহত হয়েছিল শাম্বতী। কিন্তু উপায় কী? নিয়মটা ঠিক-ঠিক মেনে নিলেই এসব মনজুলনি আর হয় না। মাইনের সিকি ভাগ নির্ভুল নিয়মে জমিয়ে যাচ্ছে হারীত। মাসের শেষে টানাটানি হলে দশটা টাকা বরং ধার করে, কিন্তু ব্যাঙ্কে হাত দেয় না। পাছে হঠাৎ খামকা কিছু খরচ হয়ে যায়, সে-ভয়ে চেকবই-ই আনে না বাড়িতে। প্রমথেশের খরচের হাত দেখে তার ভিত্তিমি লাগবার দশা।

একটু রাশ টেনে.....না? কথাটা যেন মনে লাগল প্রমথেশের—আমিও তো ভাবি তা-ই, কিন্তু হয়ে ওঠে না হে। দ্যাখো তো ছেলেপুলে—এত বড়ো সংসার...

দুর্দিন আসছে, ঘোর দুর্দিন! —হারীতের মুখ-চোখের চেহারা এমন হল যে দেখে প্রায় ভয় করে।—কেন? উৎকণ্ঠিত হয়ে জানতে চাইল প্রমথেশ। কেন! জিজ্ঞেস করছেন কেন! উঃ, এমন মানুষও আছে এখনো! আর আছে বলেই তো দেশের এ দুর্দশা! সংক্ষেপে উত্তর দিল হারীত—যুদ্ধ।

যুদ্ধ তো কত হাজার মাইল দূরে, তাতে আমাদের কী? হারীত দাঁতে দাঁত চেপে বলল—সেটা আমার মুখে না-শুনে বোমার আওয়াজেই শুনবেন শিগগির।

অ্যা!—প্রমথেশের চোখ কপালে উঠল। বোমা! অত দূর থেকে বোমা ফেলবে হিটলার! তা হবে—হিট আমাদের সব পারে। কী-পিটুনিটাই পেটাচ্ছে আমাদের কর্তাদের—অ্যা! খুশিতে প্রমথেশের পান-খাওয়া রঙ-ধরা দাঁত প্রত্যেকটি বেরিয়ে পড়ল। ফাসিস্ট! পুরো ফাসিস্ট! হারীত আঁৎকে লাফিয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে। কিন্তু প্রমথেশ কিছুই বুঝল না। হাসতে-হাসতেই আবার বলল—তা কথাটা তুমি ঠিক বলেছ হারীত। দিনকাল ভাল না। আপনাদের কী! কী রকম একটা প্রতিহিংসার রঙে হারীতের মুখ লাল হয়ে উঠল—জমিদার মানুষ।

আর জমিদারি! প্রমথেশ নিশ্বাস ছাড়ল—ও এখন গেলেই বাঁচি। কিন্তু কথাটা কী, অভোস ফেরানো তো সোজা না! আর আছে যদি, খরচ-টরচ করেই যাই। ভাল লাগে তাতে তো সন্দেহ নেই।

*

*

না তাতে আর সন্দেহ কী! শুধু কি নাটক-সিনেমা, বাজার নিয়ে শ্বশুরের সঙ্গে রীতিমতো একটা প্রতিযোগিতা লাগিয়ে দিয়েছে প্রমথেশ। রাজেনবাবু বাঁধাকপি এনেছেন, প্রমথেশ আনল বড়বাজার থেকে এক বুড়ি ফুলকপি। এইটুকু-টুকু, ঢাকা-ঢাকা দাম। মুরগি আনলেন রাজেনবাবু, পরের দিনই প্রমথেশের আনা চাই হগসাহেবের বাজারের সব-সেরা মটন। সঙ্গে টাটকা সবুজ মটরগুঁটি আর আপেলের মতো বড়ো-বড়ো টুকটুকে লাল টম্যাটো। রাজেনবাবু কি ঢাকাই অমৃতি এনেছেন? তাহলে আর কথা কী—প্রমথেশ ছুটল শেয়ালদার কাছে কোন-এক খাশ-ঢাকাই ময়রার কাছে পাঁচ সের প্রাণহরার ফরমাশ নিয়ে। কিন্তু কালীপুজোর দিন একেবারে বাজি মাৎ করে দিল সে। যখন বেলা বারোটার সময় ঘামতে-ঘামতে হাঁপাতে-হাঁপাতে বাড়ি ফিরল, আর তার চাকর এনে রান্নাঘরের সামনে নামাল পায়ে-দড়ি-বাঁধা মস্ত একটা চিৎ-হওয়া কচ্ছপ। দেখে স্বাতীর চক্ষুস্থির! ছুটে কাছে গিয়ে, কিন্তু বেশি কাছে না গিয়ে, বলল—ও মা! এটা কী? কচ্ছপ—ঘাড় মুছতে-মুছতে প্রমথেশ বলল।—কচ্ছপ দ্যাখোনি কোনোদিন?

কচ্ছপ! কেন? কী হবে?

কী হবে? প্রমথেশ হাসল একটু—খাব।

খাব! স্বাতী তাজ্জব বনল। —খাওনি বুঝি কোনোদিন? কী করেই বা খাবে! কলকাতায় সব পাওয়া যায়, কিন্তু এ-জিনিস না! মাঝে-মাঝে কাছিম ওঠে, তা-ই নিয়েই হলুদু। আরে কাছিমের মাংস তো বাতের ওষুধ, ও আবার মানুষ খায় নাকি! এ একেবারে আসল কচ্ছপ, কালী-কচ্ছপ, আমরা বলি কাউঠা, নাম শোনেনি কলকাতার বাবুরা। মুরগি-মটন যা-ই বল, এরকম মাংস আর হয় না। কচ্ছপের বিবরণ শেষ করে এঞ্জিনের মতো হাঁপাতে লাগল মস্ত মোটা প্রমথেশ। পেলো কোথায়?—জিজ্ঞাসা করলেন রাজেনবাবু। বিজয়ীর হাসি খেলে গেল প্রমথেশের চোখে-মুখে—তা একটু চেষ্টা না করলে কি হয় এসব! আমার এক প্রজা আছে বৈঠকখানার বাজারে, তার শ্বশুরবাড়ি কুমিল্লার নবিনগরে। তাকে পাঠিয়ে...

অ্যা! কুমিল্লায় লোক পাঠিয়েছ এ জন্য!

ভাল তো! তারও শ্বশুরবাড়ি বেড়ানো হল, আমাদেরও কলকাতায় বসে কার্তিক মাসের নবিনগরি কাউঠা খাওয়া...মন্দ কী!

পারও তুমি, প্রমথেশ! রাজেনবাবু মুখে হাত চেপে হাসতে লাগলেন। শ্বশুরের দিকে মিটিমিটি এঁকো তাকিয়ে প্রমথেশ বলল—আমারও অনেকদিন খাওয়া হয় না, আর আপনিও

ভালবাসেন—।

বেশ... বেশ করেছে— কচ্ছপের পর্যবেক্ষণ শেষ করে শ্বেতা বলল এতক্ষণে। —খুব ভাল... খুব ভাল তেল হবে। অনুকূল, মারতে পারবি তো রে? প্রমথেশের খাস-চাকর অনুকূল হাতে হাত ঘষে জবাব দিল—খুব পারব মা, ঠিক পারব, আপনি ভাববেন না।

ইশ্শশ্শ! স্বাতী শব্দ করে উঠল—ওকে মেরে খাব আমরা! কী বিদ্রী!

আর সব মাছ-মাংস বুঝি না মেরেই খাও? প্রমথেশ হাসল। আহা—শ্বেতা তাড়াতাড়ি বলল— তাই বলে চোখের উপর দেখতে-তো খারাপ লাগে! আর যা করে মারতে হয় এদের—কচ্ছপের সাদা-কালো অসহায় বুকটায় স্নেহে একটু হাত বুলোলো শ্বেতা। অনুকূলের দিকে তাকিয়ে বলল—বাইরে থেকে মেরে আনবি, বুঝলি? হুকুম পেলে অনুকূল তক্ষুনি কাজে লেগে যায়। কিন্তু হারীতের আবার আপিস খুলে গেছে, তাই অপেক্ষা করতে হল পরের রবিবার পর্যন্ত। প্রমথেশ নিজে দাঁড়িয়ে কচ্ছপ-বধের তদারক করতে লাগল; আর শ্বেতা রান্না করল বেশ একটু সমারোহ করেই। কিন্তু খেতে বসে স্পেশাল নিমন্ত্রিতটি হাত ওড়িয়ে নিল।

—খাও!

—না।

—আরে খাও, খাও! প্রমথেশ ওকালতি করল। কাছিম না—কচ্ছপ, কাউঠা। আসল কাউঠা। খেয়েই দ্যাখো।

নাও, খাও! বাটির গায়ে হাতের উল্টো পিঠ ঠেকিয়ে তাপ অনুভব করল শ্বেতা। একটু ঠেলে দিয়ে বাটিটা ঠেকিয়ে দিল হারীতের থালায়।

আঃ, চমৎকার! কী তেল! কী ডিম! আর রান্নাও খুব ভাল হয়েছে! প্রমথেশ উচ্ছ্বসিত।

একটু খেয়ে দেখলে পার, রাজেনবাবুর মৃদু মিনতি।

ঝকঝকে কাঁসার বাটিতে তেলে-ঝোলে টুকটুকে লাল পদার্থটার দিকে তাকিয়ে হারীত আবার সুদৃঢ় সুস্পষ্ট একটি 'না' উচ্চারণ করল।

একটু, একটু মুখে দিয়ে দ্যাখো। যদি ভাল না লাগে আর খেয়ো না—একটু! শ্বেতা উপুড় হয়ে পড়ল পাতের উপর। পারলে আঙুল দিয়ে তুলে মুখে গুঁজে দেয়। দু-তিন মিনিট ধরে একটা বুলোবুলি চলল রীতিমতো। খেলে না তো কিছুতেই! শ্বেতা ফেল হয়ে কেঁদে ফেলল প্রায়।

খুব তো তোমার মনের জোর হে! এত করে বললাম সবাই—তার 'কাউঠা'র এই অভাবনীয় অবমাননায় একটু আঘাত লাগল প্রমথেশের মনে।

সবরকম জানোয়ার কি খাওয়া যায়? বাঁ হাতে প্লেট ধরে টম্যাটোর স্লাটনি একটুখানি ঢেলে নিল হারীত।

সে-তো ঠিকই। প্রমথেশ মাথা নেড়ে তক্ষুনি সায় দিল। —আচ্ছা, বিলেতে নাকি ব্যাং-ট্যাং খায়? সত্যি?

সে আলাদা এক রকমের এডিবল ফ্রগ—উত্তর দিল বিলেত ফেরত। —এটাও তো বেশ এডিবল মনে হচ্ছে আমার। একটু মাংস, একটু ডিম আর খানিকটা চর্বি একসঙ্গে মুখে দিল প্রমথেশ। এ গাল থেকে ও গালে বদলি করে বলল—বুঝলে হারীত, মাংস আমি প্রায় কিছুই বাকি রাখিনি। শুধু ঐ ব্যাংটা চেখে দেখা হল না। এই একটা আপসোস রয়ে গেল হে। ভাল? তুমি খেয়েছ? সে-কথার জবাব না দিয়ে হারীত বলল—আপনার কিন্তু মাছ-মাংস বেশি খাওয়া ঠিক না।

—মাছ-মাংস বাদ দিলে আর রইল কী?

—তা ব্লাড পেশার বাড়লে খাওয়া কমানো ছাড়া আর উপায় কী?

আরে ও-সব ডাক্তারদের বুজরুকি। ওদের কথামতো চলতে হলে না খেয়ে মরতে হয়। তার চেয়ে খেয়ে মরাই ভাল। বাটির বাকি মাংসটুকু প্রমথেশ চেষ্টে-পুষ্টে ঢেলে নিল। —তোমার হয়ে গেল হারীত? সত্যি, তোমার সঙ্গে বসে খেতে লজ্জাই করে আমাদের। শাস্ত্রী, মাংস খেলে? স্বাতী, কেমন লাগল?

খুব ভাল। সোৎসাহে জবাব দিল স্বাতী। হারীতদা যখন কিছুতেই মাংস খাবেন না, তখন বড়দির জন্য কষ্টই লাগছিল তার। জামাইবাবুর জন্যও—তাঁর জন্যই বেশি। বেশ মানুষ, যদিও অবিকল কার্তিকের মতো গৌফ আর মাঝখান দিয়ে সিঁথি করা ঘন কঁকড়া চুল। আর যদিও জামা খুলে হাঁটুর কাছে কাপড় তুলে বসেন, আর খাবার সময় বড্ডো শব্দ করে চিবোন, তবু বেশ, কেমন আপন লাগে, কেমন মমতা হয়। খাবার পর স্বাতী জামাইবাবুর কাছেই বসল। তাঁর ডিবে থেকে পান খেল। কবে একবার দশ বছর আগে তিনি গারো পাহাড়ে শিকারে গিয়েছিলেন, তার গল্প শুনল যতক্ষণ না তিনি নাক ডাকাতে লাগলেন। তারপর উঠে এল বসবার ঘরে। সেখানে মেঝেতে পাটি পেতে বড়দি শুয়েছেন তাঁর কোলেরটিকে নিয়ে, আর বাবা ইজিচেয়ারে ঝিমোচ্ছেন।

সে ঘরে ঢুকতেই বড়দি বললেন—স্বাতী, তোর চিঠি। বালিশের তলা থেকে একটি ঘন-নীল খাম বের করে হাতে দিলেন তার। স্বাতী দেখল খামের উপর সুন্দর হাতের লেখায় জুলজুল করছে তার নাম। এ-লেখা সে কি চেনে? কে লিখল? খাম খুলে স্বাতী আগে দেখে নিল চিঠির তলায় নামটা সত্যেন রায়। একটু লাল হয়ে উঠল মুখ, আর সেটা বুঝতে পেরে কাগজটা মুখের সামনে মেলে চিঠি পড়তে লাগল। পড়া হল না, শুধু উপর-উপর একবার দেখে নিয়ে বলল—বাবা, সত্যেনবাবু চিঠি লিখেছেন।

ঘুম-ঘুম গলায় রাজেনবাবু জবাব দিলেন—কী লিখেছে?

এই যে দ্যাখো—স্বাতী চিঠি-ধরা হাত বাড়িয়ে দিল, কিন্তু রাজেনবাবু বললেন—কী? ভাল আছে তো?

হ্যাঁ। তোমার কথাও লিখেছেন—।

কে রে সত্যেন রায়?—জিজ্ঞেস করল স্বাতী।—আমার এক প্রোফেসর।

প্রোফেসর! প্রোফেসররা চিঠি লেখে তোকে, আর চিঠিও লম্বা! তাদের সমান-সমানই হয়েছিল বুঝি বিদ্যায়? বালিশে কনুই চেপে, হাতের উপর মাথা রেখে, বাচ্চাকে বুকের দুধ দিতে-দিতে, স্নেহে, সগর্বে বোনের দিকে তাকাল স্বাতী। বড়দির কথা! স্বাতী একটু ঐক্য-বেঁকে সেখান থেকে পালাল। এসে বসল বাড়ির ভিতরদিকের বারান্দায় ঝিড়িতে। চুপচাপ। রান্নাঘরের বিকেলের পাট শুরু হয়নি এখনো। ঠান্ডা-ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে কার্তিক মাসের বেলা-চারটের। কপালের চুল সরিয়ে চোখ নিচু করল কাগজে—

স্বাতী,

খুব ঘুরলাম। দশমীতে নৌকো চড়লাম কালীঘাট গঙ্গায়, পূর্ণিমায়ে তাজমহল, দিল্লিতে দেয়ালি। আর ফাঁকে ফাঁকে ফতেপুর-সিক্রিতে একবেলা, জয়পুরে দুদিন, লক্ষ্মী, এলাহাবাদ, পাটনা—সব শেষ করে ফিরতি পথে এসেছি শান্তিনিকেতনে। কাগজে দেখলাম রবীন্দ্রনাথের খবর। সোজা চলে এলাম, না-এসে পারলাম না। কঠিন পীড়া—দেখা হবার আশা নেই। সোনার তরী ভেসে চলেছে আলোর নদী বেয়ে অন্ধকারের

দিকে। কিন্তু সেটাই হয়তো আরো বড়ো আলোর সমুদ্র।

কবি যদিও দেহযন্ত্রণায় বন্দী, তবু তেমনি সুন্দর শরৎকালের শান্তিনিকেতন। একটু নিষ্ঠুর লাগে না? কিন্তু এই-তো ঠিক, এর গানই তো কবি গেয়েছেন জীবন ভরে। শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, সব কবি, পৃথিবীর সব কবি। পৃথিবী সুন্দর, জীবন ভাল। এ ছাড়া আর কী কথা আছে, বলো তো?

নানা দেশ ঘুরে, নানা দৃশ্য দেখে এখানে এসে কীরকম লাগছে, জানো? যেন জন্মকালো নেমস্ত্রন খেয়ে নিজের ছোট্টো ঘরটিতে ফিরে শুয়ে পড়েছি। শান্তিনিকেতনে এলেই বাড়ি-বাড়ি লাগে আমার, এখানে আমি স্কুলে পড়েছি। মাস্টারিও করে গেছি তিন মাস। এখন ছুটির সময় কেউ নেই বলে তুমি কি ভাবছ অভ্যর্থনায় ত্রুটি হয়েছে কোনো? না! আকাশ নীল, কাশবন সাদা, সারাদিন রোদুর, আর সন্ধ্যাবেলা একটু-উঁকি চাঁদ, আর চাঁদের পরে হাজার-তারা হাজির। যত রাত বাড়ে, তত তাদের আলো ছড়িয়ে পড়ে অতি সূক্ষ্ম ধুলোর মতো। এসব আশ্চর্য দৃশ্য দেখবার জন্য রাত কাটাতে হয় না রেলের স্টেশনে, দিন কাটাতে হয় না টাঙ্গায়। শুধু একটুখানি চুপ করে থাকতে হয়। সেই চুপ করে থাকাটা নিজের মধ্যে বানিয়ে নিতে পারলে আর ভাবনা কী? কিন্তু কজন পারে তা! বাইরেটা চুপ না-হলে নিজেরা চুপ হতে পারি না আমরা। তাই মাঝে-মাঝে আমাদের আসতেই হয় এইরকম কোথাও, যেখানে চারদিক খোলা, চারদিক চুপ—আশ্চর্য চুপ। এত শব্দহীন, প্রজাপতি ওড়ার শব্দ শুনতে পাব মনে হয়। তাই বলে কি সবই চুপ? না তো। গাছের তলায় স্টেজ খাটিয়ে এইমাত্র হো-হো করে করে লাফিয়ে পড়ল একজন বাচ্চা তীরন্দাজ—চৌঁচিয়ে উঠল ডালপালা, গাছের ঝুঁটি ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল উত্তরে হাওয়া, শীতের চিঠি এসে পৌঁছল। ঐ দ্যাখো, নিজের ভাললাগার মধ্যেই ডুবে আছি। এই ভাললাগা শিখেছি যাঁর কাছে, তাঁর রোগশয্যায় আমার দিন তো মলিন হল না একটুও। মানুষ ভারী স্বার্থপর—কী বল? বসে থেকে এক-এক সময় ঝিমুনি আসে। তখন মনে করবার চেষ্টা করি যে এ-ই সব নয়। কলকাতা আছে, কাজ আছে, যুদ্ধের খবর আছে, টেস্ট পর্বীকার খাতা দেখা আছে। হঠাৎ একটু খারাপও লাগে মনটা। পৃথিবীর কাছে আমার যা পাওনা, আমি তার বেশি আদায় করে নিচ্ছি না তো? এই যে পাকা ফলের মতো এক-একটি দিন সূর্যের সোনার গাছ থেকে ঝরে-ঝরে পড়ছে, এ কি আমার জন্য? আমি তো কবি নই, আমি তো ফিরিয়ে দিতে পারি না! কিন্তু সে কী? বা কেন? আমার যে ভাল লাগে, তার কি কোনো মূল্য নেই? বলতে পারি না বলে আমার ভালবাসা কি মিথ্যে?

তুমি কেমন আছ, কী করছ? নিশ্চয়ই খুব ভাল আছ, নিশ্চয়ই খুব আনন্দেই কাটালে ছুটিটা? গিয়ে সব শুনব। তার আগে একটা চিঠি লিখতে পার ইচ্ছে করলে—এখানে আছি আরো কটা দিন—আর কি, ছুটি তো হয়ে এল।

তোমার বাবাকে আমার কথা বোলো।

সত্যেন রায়

পড়া শেষ করে চিঠিখানার দিকে তাকিয়ে রইল স্বাতী। একটি বড়ো কাগজের এপিঠ-ওপিঠ লেখা। শেষের দিকে অক্ষরগুলোর ঘেঁষাঘেঁষি। কাগজ যেই ফুরোল, অমনি চিঠিও শেষ। আহা, আর

একটা পাতা যেন আর লেখা যেত না। কাগজটা উন্টিয়ে আবার পড়তে লাগল আস্তে-আস্তে, মনটা যেন কেমন হয়ে গেল তার। এতদিনের মধ্যে একবারও তো আর মনে পড়েনি সত্যেন রায়ের কথা। যাবার আগে যে-বই কখানা উনি রেখে গিয়েছিলেন তাও তেমনই পড়ে আছে। বড়দি আসার আনন্দে আর সবই ভুলে গিয়েছিল। তা উনিও তো মন্দ আনন্দে নেই। খুব তো দিল্লি-হিল্লি করলেন, তারপর শান্তিনিকেতনে এসে চাঁদ-তারার দৃশ্য দেখছেন। ওখানে কিনা লোকজন কেউ নেই, কিছু করবার নেই, তাই নেহাত খানিকটা সময় কাটাবার জন্য চিঠি লিখলেন একখানা! রাগ হল স্বাভাবিক, হিংসে হল সত্যেন রায়কে—কেমন ইচ্ছেমতো যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কী স্বাধীন, কী সুখী। আর নিজের কথা সাত-কাহন লিখে শেষটায় শুকনো একটা ‘ভাল আছ তো’! আছিই তো, খুব ভাল আছি, খুবই আনন্দে আছি। সকলের আনন্দ তো একরকম নয় পৃথিবীতে। একরকম নয়, কিন্তু—আর এটাই স্বাভাবিক খারাপ লাগল সবচেয়ে—সত্যেন রায়ের চিঠিতে সে যেন এ-কথাই পড়ল যে সে যা নিয়ে মেতে আছে, এই সব খাওয়া-দাওয়া, সিনেমা-থিয়েটার, হাসিগল্প, এগুলি ভালই...কিন্তু ছেলেমানুষি ভাল। কেন, ছেলেমানুষি কেন? আর সে কি এখনো ছেলেমানুষ? নীল কাগজটি কোলের উপর ফেলে স্বাভাবিক ভাবে লাগল—আমি কি এখনো ছেলেমানুষ? তাকিয়ে দেখল, দুটো কাক বসেছে রাস্তায় গাছের ডালে। ভারি সুন্দর তো! সবুজের মধ্যে কালো, আর ফাঁকে-ফাঁকে রোদের হলদে—মানিয়েছে। এখানেও তো আকাশ নীল, গাছ সবুজ, রোদের রং সোনার মতো... তাহলে আর অন্য কোথাও যাওয়া কেন? অন্য কোথাও! অন্য কোথাও মানে তো অন্য দেশ নয়, অন্য-এক...কী। কী, তা জানে না, শুধু মনে হয় যে খেয়ে, সেজে, বেড়িয়ে, ফুটি করে সবচেয়ে বেশি যা ভাল লাগতে পারে, তার চেয়েও অনেক বেশি ভাল লাগা আছে সেখানে। সে ভাল লাগার যেন শেষ নেই—কিন্তু সে ছেলেমানুষ, সে তার কী জানে? জানে না? যখন গান শোনে, যখন আশ্চর্য কোনো বই পড়ে, যখন হঠাৎ তাকিয়ে দ্যাখে সবুজের ফাঁকে সোনা, আর সবুজের মধ্যে কালো?

* * *

কী করছিস রে, স্বাভাবিক?

তাকিয়ে দেখল, ছোড়দি। এইমাত্র উঠে এল ঘুম থেকে। মুখ ফোলা-ফোলা, ডিলে-ঢলি, কীপড়, পিঠে লোটানো এলোমেলো চুল সুগন্ধ দিচ্ছে। পাশে বসে পড়ে শাস্ত্রী বলল—চিঠি নাকি? কার? স্বাভাবিক জবাব দিল—আমার।

লিখেছে কে?

তোমাকে বলেছিলাম না সত্যেন রায়ের কথা—স্বাভাবিক চিঠিটা ভরতে লাগল। সেই প্রোফেসর? সে লিখেছে? দেখি!—স্বাভাবিক কোল থেকে খপ করে থামটা তুলে নিল শাস্ত্রী।—স্বাভাবিক, এক কাজ কর না, একটু তেঁতুলের আচার নিয়ে আয় বড়দির ঘর থেকে...বসে আছিস কেন? যা! স্বাভাবিক উঠল, যোগান দিল ছোড়দির ঘুম-ভাঙা জিভ-নাড়ার। ডান হাতের আঙুলে পুরু করে আচার লাগিয়ে যথোচিত শব্দ করে-করে খেতে-খেতে বাঁ হাতে চিঠিটা হাঁটুর উপর চেপে ধরল শাস্ত্রী। স্বাভাবিক উদ্ভিগ্ন চোখে তাকিয়ে থাকল ছোড়দির হাতের দিকে। এই বুঝি এক ফোঁটা আচার পড়ল চিঠির গায়ে! চিঠি ফেরৎ দিয়ে শাস্ত্রী বলল—এ-সব ভাবের কথা তোকে লিখেছে কেন?

তবে আর কাকে লিখবেন—গভীরভাবে জবাব দিল স্বাভাবিক।—কেন রে? শাস্ত্রী হাসল। আর কেউ নেই ওঁর চিঠি লেখার?

আছে হয়তো, কিন্তু এসব ভাবের কথা ভাল লাগবে কি আর কারো? স্বাতী হাসল।—ওরে বাবা! খুব ভালো আচারটা, না রে? বড়দি পারেও! তুই খাচ্ছিস না?

না ছোড়দি। বড্ডো চিটচিটে হয়ে যায় আঙুল।

যা বোকা! স্বাতীর এই বোকামি শাস্বতী যেন হাসিমুখেই মেনে নিল। বিনা সাহায্যেই সবটুকু আচার তুলে দিল কয়েক মিনিটে।

সন্ধের পরে, আবছা অন্ধকার, সেই বারান্দাতে পাটি পেতে বসে শ্বেতা গুনগুন করে কথা বলছিল বাবার সঙ্গে। আর স্বাতী বসে ছিল চুপ করে দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে। শাস্বতী চলে গেছে, প্রমথেশ বেরিয়েছে আতা-তাতা-ছোটনকে নিয়ে টাকায় আটখানা ছবি তোলাতে। অনেক হৈ-চৈ, অনেক ফুটির পর হঠাৎ কেমন-একটা ঘুম-ঘুম ঠান্ডা নেমেছে বাড়িতে। যেন কারোরই কিছু আর করবার নেই। আর সত্যিও তাই। ও বেলা এত রান্না হয়েছিল যে এ বেলা উনুন ধরাতে হল শুধু দুটো ভাত ফোটাবার জন্য। বড়দির নেহাৎ-বাচ্চাটি, যে রোজ এই সময়টাকে টেঁচিয়ে সরগরম রাখে, সে নিজে-নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ ফাঁক পেয়ে রামের-মা এখনই বিছানা করে রেখেছে ঘরে-ঘরে, যেন ঘরে-ঘরে হাতে ধরে এগিয়ে আনছে রান্ধিরটাকে। সন্ধেবেলাটা যেন মন-কেমন-করা—এমনিতেই স্বাতীর মনে হয়—যেন মন-খারাপ-করা; যখন আলো নিবে যায়, আবার অন্ধকারও ফোটে না, সেই ছাইরঙের ছায়া-ঝরা সময়টায় কে যেন কাকে ছেড়ে চলে যায় চিরকালের মতো। একলা থাকলেই কান্না পায় স্বাতীর। তবু ভাগ্যিস ইলেকট্রিক আলো আছে, আকাশ ভরা ছায়ার কান্নাকে ঘর থেকে ঝেঁটিয়ে বের করে দেয় আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ। কিন্তু বারান্দায় আলো জ্বালা হয়নি। পরদার ফাঁক দিয়ে ঘরের আলো একটি-দুটি লাইন টেনে দিয়েছে বাবার পায়ের কাছে। আর স্বাতী যদিকে মুখ করে বসেছে, আকাশের ঠিক সেখানটায়, ঠিক তার চোখের সামনে দপদপ করছে মস্ত সবুজ একলা একটা তারা—এই সন্ধেতারা? পৃথিবীর এত লোকের মধ্যে যেন তারই দিকে তাকিয়ে আছে আকাশের পলক-না-পড়া চোখ। মানুষের চোখ যখন জলে ভরে-ভরে ওঠে, এ তারা যেন সেই রকম, এত পরিষ্কার যে জল দিয়েই বানানো মনে হয়, ঠিক যেন আকাশের গায়ে লেগে নেই, একটু সরে এসেছে, এঁকুনি গলে পড়ে যাবে। যেমন চোখের জল উপচে পড়ে মানুষের চোখ থেকে মুখে।...হঠাৎ, সে বুঝল না কেমন করে, কী হল জানল না, খুব সহজে, একটু কষ্ট না দিয়ে দুফোঁটা জল পড়ল স্বাতীর চোখ থেকে। কী রকম চুপচাপ, আর ঝাপসা কুয়াশা। কেমন একটা ঠান্ডা রং-ছাড়া মন-মরা সন্ধ্যা, ঠিক যেন শীত। তা শীত তো এল, আর শীত এল বলে মন খারাপ করবার কী আছে, কাঁদবার হয়েছে, নিজেই হাসি পেল স্বাতীর—ভাগ্যিস অন্ধকার, কেউ দেখতে পায়নি... আর আকাশের ঐ তারাটা কী মজার দেখাচ্ছে চোখের জলের ভিতর দিয়ে! আঁচলে মুছে চোখ ফিরিয়ে আনল স্বাতী, কান পাতল কথাবার্তায়। বাবা বলছেন—তোরা তাহলে শুকুরবারেই যাবি?

হ্যাঁ বাবা, কোট খুলে গেছে ওঁর, আর অনেক দিন তো থাকা হল। বড়দি চলে যাবে? এই শুকুরবারেই?...বাঃ, যাবে না? যেতে তো হবেই। হবেই? হ্যাঁ, হবেই তো!... কেমন লাগে না-জানি। প্রথম ছেড়ে যেতে কেমন লাগে? আর তারপরে? আরো তারপরে? কী অদ্ভুত মেয়েদের এই দুই জীবন, তারা জন্ম নেয় ছেড়ে যাবার জন্য, আর ঐ ছেড়ে যাওয়াটাই তাদের সব পাওয়া। বড়দির নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগছে যেতে, আরো খারাপ লাগছে বাবার। কিন্তু তাই বলে বড়দি তো বললেন না, আচ্ছা থাক, আরো কদিন থেকে যাই। বড়দি বললেন—পেনশনের আর কত দেরি তোমার?

দেরি আর কোথায়! একটা বছর কোনওরকমে কাটাতে পারলেই হয়ে যায়।

কত কাল চাকরি করলে—আঁ্যা!...কী-রকম একটা গলিতে আমরা ছিলাম না একবার?

মনে আছে তোর শাঁখারিপাড়ার কথা? তখন তো তুই এক-ফোঁটা!

আমার যেন আবছা-আবছা মনে পড়ে তুমি আপিশে যেতে, আর রোজ আমি তোমার সঙ্গে যাবার জন্য কাঁদতাম।... একদিন পড়ে গিয়েছিলাম সিঁড়ি দিয়ে, না?

বাবাঃ! খুব-তো মনে আছে তোর! একটু চূপ করে থেকে বড়দি বললেন—জীবন ভরে কম তো করলে না! এবারে পেনশন নিয়ে কিন্তু একেবারে ছুটি।

নাকি?

নাকি মানে? আর তোমাকে কিছু করতে দেব না আমরা। প্রথমেই আমার কাছে গিয়ে থাকবে কয়েক মাস।

বে—শ।

শুধু বললে হবে না—সত্যি গিয়ে থাকতে হবে। এর মধ্যে বিজুকে কোনো কাজে-কর্মে ঢুকিয়ে দাও একটু চেষ্টা করে।

দেখি।

পড়াশুনো ওর হল না বলে আর যে কিছু হবে না তা কি বলা যায়? বাবাকে উৎসাহ দিলেন বড়দি। হলেই ভাল। বেশি উৎসাহ লাগল না বাবার গলায়।

আর একটা কথা তোমাকে বলি, বাবা—বোনের দিকে এক পলক তাকিয়ে মুখ টিপে একটু হাসলেন বড়দি—স্বাতীর আর দেরি কোরো না।

কীসের? বাবা যেন চকিত হলেন।

ওর এবার বিয়ে হওয়াই তো ভাল। বাবা জবাব দিলেন না। ছায়া পড়ল তাঁর মুখে, স্বাতী অঙ্ককারেও দেখতে পেল।

কী রে? স্বাতী? বড়দি মুখ ফেরালেন তার দিকে। ঠিক না? স্বাতী ঠোট কামড়ে উঠে দাঁড়াল। বড়দি ঠাট্টা করলেন—আরে বোস, বোস। অমন এলোকেশে উদাস চোখে চলে যেতে হবে না। এখন কি আর সে-দিন আছে নাকি যে...। কিন্তু স্বাতী শেষপর্যন্ত শোনবার জমি দাঁড়াল না, ঘরে চলে গেল। কাঁপা-কাঁপা পরদার দিকে তাকিয়ে শ্বেতা বলল—এ-মেয়ে তোমার সুন্দরী হয়েছে...।

আমার সব মেয়েই সুন্দরী—রাজেনবাবু অস্পষ্ট একটু হাসলেন। কী মনে হল তুমি, ওর মতো নাকি আমরা কেউ! শ্বেতা খুশিতে ছলছল করে উঠল, তারপর গভীর হয়ে বলল—সত্যি, আর দেরি না। পেনশনের আগেই এটা করা চাই। তারপর আর আশা রাখনা কী তোমার—একেবারে ঝাড়া হাত-পা।

সে তো ঠিকই—রাজেনবাবু ক্ষীণস্বরে বললেন। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে মনের মধ্যে একটা কষ্ট হল শ্বেতার। তবু... তাই আবার বলল, আর ওদের বিয়ে তো আমাদের মতো না। আর—বাবার মনে ফুটি আনবার চেষ্টা করল শ্বেতা—যদি কলকাতাতেই থাকে, তবে আর কথা কী? কিন্তু রাজেনবাবু চূপ করেই রইলেন, আর শ্বেতাও যেন আর কথা খুঁজে পেল না। হঠাৎ কী রকম একটা চূপচাপ নামল, রাত যেন গভীর, যেন অঙ্ককারে মাঠের মধ্যে একটা ছোট্টো স্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়াল, আর সেই অঙ্ককারে কে যেন কোথায় চলে যাচ্ছে বাড়িঘর ছেড়ে।

* * * * *

ঘরে এসে স্বাতী তার পড়ার টেবিলে বসল। ঠিক চোখের সামনে পড়ে আছে সত্যেনবাবুর চিঠিখানা, হাতে নিয়ে পড়ল আরো একবার। উত্তর দেওয়া উচিত? কিন্তু দেবার কী আছে? ‘একটা চিঠি লিখতে পার ইচ্ছে করলে।’—তার মানে বেশি গরজ নেই। তা ওর গরজ না থাক, আমার তো ভদ্রতা আছে। আচ্ছা, একটা লেখা যাক তাহলে!...এখনই ভাল, চুপচাপ আছে বাড়িটা, কাল নিশ্চয়ই আর সময় হবে না। স্বাতী কাগজ-কলম নিয়ে তৈরি হল। কিন্তু পাঠ লিখবে কী? অস্বীয় নয়, আবার তার সমবয়সী কোনও মেয়েও নয়, এমন কোনও মানুষকে সে আর চিঠি লিখেছে কবে! কী লিখবে? ‘শ্রীচরণেশু’—যাঃ—উনি কি বুড়ো নাকি যে শ্রীচরণেশু? বা রে, বুড়ো না হলে বুঝি আর শ্রীচরণেশু হয় না? বিদ্যা আছে না? আর আমার প্রোফেসর তো... বয়সেও আমার বড়ো... আর... যাকগে, অত আর ভেবে কী হবে—শ্রীচরণেশু দিয়েই লিখে ফেলি—

শ্রীচরণেশু,

আপনার চিঠি খুব ভাল লাগল। কত আপনি বেড়ালেন, কত দেখলেন, আর তারপর কী সুন্দর শান্তিনিকেতন। কিন্তু চিঠিটা ভাল ওসবের জন্য না, নিজে নিজেই ভাল। আপনি শীতের কথা লিখেছেন না—এখানেও ঠিক আজ সন্ধে থেকেই শীত শীত ভাব। খুব সম্ভব কদিন ধরেই হচ্ছে এরকম, কিন্তু আজকের কথা আগে মনে হয়নি। শীতটা বেশ, কিন্তু প্রথম যখন আসে, একটু মন-খারাপ লাগে, না?

মন-খারাপ মানুষের কখন লাগে আর কেন লাগে তার কি কোনও নিয়ম আছে? কিছু মধ্যে কিছু না—সব ঠিক আছে—হঠাৎ শ্রীযুক্ত মনখারাপ এসে হাজির হলেন—আর কথা কী! যেন জীবনে আর নড়বেন না এখান থেকে। তা লোক কিন্তু উনি তত খারাপ নন—মানে, মন-খারাপ হওয়াটাই যে খারাপ তা কিন্তু ঠিক নয়। আমার তো বেশ ভালই লাগে এক-এক সময়।

ভাল লাগে, কিন্তু মন-খারাপ হওয়ার ভালোলাগাটাকে অন্যের কাছে বলা যায় না, ভালোলাগার ভালোলাগাটাই বলা যায়। না, তাও না—ভালোলাগার ভালোলাগাটা বলতেই হয় না, সেটা এমনিই ছড়িয়ে পড়ে। আর মনখারাপের ভালোলাগাটাই বলতে হয়—মানে, বলতে চায় মানুষ, কিন্তু বলতে পারে না। আর পারে না বলেই কি গান বানায়, কবিতা লেখে? কতদিন কত মনখারাপই হয়েছে রবীন্দ্রনাথের, যাতে ঐ রকম সব গান বানিয়েছেন—তা-ই না? জিজ্ঞেস করবেন দেখা হলে।

আমি কেমন আছি? ভাল আছি। কী করছি? কিছুই করছি না। মানে, যা করছি তাকে কিছু করা বলে না। আর যাকে কিছু করা বলে, আমি কি তা পারি নাকি?

স্বাতী

পরের দিন চিঠি ডাকে পাঠাবার সঙ্গে-সঙ্গেই আবার উত্তরের আশা জাগল স্বাতীর মনে। আর কি লিখবেন? আসবারই তো সময় হল। কিন্তু তা-ই যদি, তাহলে আমারই বা লেখবার কী হয়েছিল? কোনো দরকারের জন্য তো আর চিঠি না, কোনো খবর তো দেবার নেই—তবে? কেন? কীসের জন্য?

তারপর পরের দিন সকালে চা খেতে-খেতে স্বাতীর মনে হল—এতক্ষণে আমার চিঠি পৌঁছেছে। কথাটা যেই মনে হল, যেই সে মনের চোখে দেখল সত্যেনবাবু খাম খুলে তার চিঠি পড়ছেন, অমনি তার এমন লজ্জা করল যে মুখ নিচু করে পেয়ালার চায়ের দিকেই তাকিয়ে থাকল

অনেকক্ষণ, পাছে বড়দি জিজ্ঞেস করেন, কী হয়েছে রে! আর তার পরের দিন তার মনে হল—আজ কি উত্তর আসবে চিঠির?

উত্তর এল না, নিজেই এলেন সত্যেন রায়। তখন এগারোটা বেলা। রান্না চুকিয়ে বড়দি তাঁর মেজো দুটিকে স্নানের তাড়া দিচ্ছেন—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তারা ধেই-ধেই লাফাচ্ছে আর গলা ছেড়ে চ্যাচাচ্ছে—সেটাই নাকি নাচ আর গান! বড়দিকে সাহায্য করবার জন্য স্বাতী তাদের ধরতে গেছে, তারা ছুটছে, আর স্বাতীও ছুটছে পিছনে। ছুটতে ছুটতে বসবার ঘরে এসে দ্যাখে, দরজার ধারে হাসিমুখে দাঁড়িয়েছেন সত্যেন রায়।

স্বাতী থমকে গেল। অচেনা মানুষ দেখে বাচ্চা দুটিও থমকাল। আর সত্যেন রায় বললেন—কী, ভাল তো? ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল স্বাতীর মুখ, কানে যেন ভাল শুনছে না, গলা পর্যন্ত নেমে এল মুখের জলুনি। ছুটে পালিয়ে যেত পারলে, এদিকে পা-ও নড়ে না।

ছাত্রীর এ-রকম উশাকোখুশাকো উদ্ভ্রান্ত চেহারা সত্যেনবাবু আগে কখনো দেখেননি। মুখ টুকটুকে লাল, ঠোঁটে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম, ছোটো ছোটো চুল কপালে লোটাচ্ছে। একটু তাকিয়ে থেকে আবার বললেন—কেমন আছ? ভাল? স্বাতী এবার মনস্থির করল। পিঠের উপর দিয়ে আঁচলটা ঘুরিয়ে এনে সোজা হয়ে মুখ তুলে দাঁড়াল। চেষ্টা করে বলল—কবে এলেন আপনি?

—কাল রাত্তিরে। শুনে আর কথা বলতে ইচ্ছে করল না স্বাতীর। সারা রাত ঘুমিয়ে তারপর সারা সকাল গড়িমসি করে পরিপাটি বাবুটি সেজে এতক্ষণে সময় হল আসার! তাতা! ছোটন! ছেলেমেয়েকে নাম ধরে ডাকতে-ডাকতে শ্বেতা এল ও-ঘরে। এই যে, বাবা, হয়রান করে দিলি তোরা আমাকে।—বলতে বলতে হঠাৎ একটু অপ্রস্তুত হয়ে থেমে গেল।

ইনি আমার বড়দি—স্বাতীকে এবার কথা বলতেই হল। আর ইনি—ইনি সত্যেনবাবু, আমাদের কলেজের প্রোফেসর।

প্রোফেসর মাথা নিচু করে নমস্কার জানালেন। একটু বেশিই নিচু করলেন মাথাটা। স্বাতীর গা জ্বলে গেল। তুই তো বেশ, স্বাতী—মাথার কাপড় টেনে দিয়ে শ্বেতা আবছা হাসল—বসতেও বলিসনি ঐকে!

না, না, আমি আর বসব না... বেরোচ্ছিলাম, ভাবলাম একবার... আর আপনাদেরও স্বাগত জানানোর সময় এখন—শ্বেতার দিকে তাকিয়েই সত্যেনবাবু বললেন।

ও বেরোচ্ছেন! তাই ট্রামের পথে একবার! দেড় মাস পরে কলকাতায় ফিরে প্রথমেই আড্ডা দিতে হবে সারা শহর ঘুরে, তবে তো! টেবিলে-পা-তোলা ঐ ধ্রুব দৃষ্টির সঙ্গে দেখা না হলে ভাল লাগবে কেন, আর-তো নেই কথা বলবার যোগ্য মানুষ!

তুই কী রে? ঘরে এসে শ্বেতা বলল—ভদ্রলোক এমনি এমনি চলে গেলেন, কিছু বললি না! এমনি-এমনি মানে? একটু ঝাঁঝ স্বাতীর গলায়।

আহা—পুজোর পরে এলেন—একটু মিষ্টি-টিষ্টি—

হ্যাঁ! স্বাতী মাথা ঝাঁকাল—বয়ে গেছে ওঁর এখন তোমার মিষ্টি শ্বেতে! দিবি ডাত-টাত খেয়ে আড্ডা দিতে বেরোচ্ছেন! শ্বেতা হেসে ফেলল বোনের কথায়, কথা বলার ভঙ্গিতে। একটু পরে বলল—তোর প্রোফেসর তো ছেলেমানুষ রে!

তুমি তবে কী ভেবেছিলে?

ইনিই চিঠি লিখেছিলেন তোকে?

হ্যাঁ—কেমন একটু ছটফট করে স্বাতী চলে গেল নাইতে। স্নান করেও ছটফট ভাবটা কমল

না। উনুনে আঁচ ধরবার আগে যেমন ধোঁয়া হয়, তেমনি একটা অবস্থার মধ্যে কেটে গেল দিন। আমি একটা মানুষ, আমার আবার চিঠি, আর সে-চিঠির কথা আবার মুখে বলতে হবে! উনি লিখেছিলেন, ওঁর তখন ভাব উথলেছিল। ছোড়দি ঠিকই বলেছিল, ওসব ভাবের চিঠি আমাকে কেন? তা সত্যি-তো আর আমাকে না, যেকোনো একজনকে পাঠালেই হত, মাসিকপত্রে ছাপিয়ে দিলেই বা দোষ কী—ওতে চিঠির কী আছে? আমিও বোকা, আবার জবাব লিখতে গিয়েছিলাম। না হয় লিখেছিলাম, ডাকে না-দিলেই হত...না কি পাননি? তা-ই যেন হয়, হে ঈশ্বর, তা-ই যেন হয়। কিন্তু কী করে জানব পেয়েছেন কি পাননি?

* * * * *

সন্ধ্যাবেলা শ্বেতা বলল—বাবা, কাল আমি খাওয়াবো তোমাদের।
এই এক মাস ভরেই তো খাওয়াচ্ছি—হাসতে গিয়ে কেমন করুণ হল রাজেনবাবুর মুখ।
রাম্মার কামাই তো একদিনও দিলি না রে!
একদিনও যখন হয়নি, তখন আর একদিনই বা হয় কেন—প্রমথেশ হা-হা করে হেসে উঠল—আর কালই তো শেষ।

তা, তোমাদের ফেয়ারওয়েল পাটি তো আমারই দেওয়া উচিত—রাজেনবাবু লাজুকভাবে তাকালেন জামাইয়ের দিকে। —না, না, আর...আপনার মেয়ের যখন শখ হয়েছে— প্রমথেশ মুখে-মুখে ভোজ্য-তালিকা তৈরি করতে লেগে গেল, পারলে তক্ষুনি বাজারে ছোট্টে। —সত্যি, প্রমথেশের উৎসাহ! রাজেনবাবু হাসলেন। —শ্বেতা থাকতে-থাকতে তোর প্রোফেসর ফিরল না, স্বাতী, তাহলে তাকে বলতে পারতিস—।

সে তো এসেছিল আজ! বলে উঠল শ্বেতা।

না, বাবা, না! স্বাতী দু-হাত তুলে আপত্তি জানাল।

কেন রে? আমি তো কবে থেকেই ভাবছিলাম...চমৎকার মানুষ— শ্বেতার দিকে তাকিয়ে রাজেনবাবু কথা শেষ করলেন—আর একা-একা থাকে...

একা কেন? শ্বেতার প্রশ্ন।—কেন, তা তো জানি না, তবে একাই তো দেখি—উত্তর দিলেন রাজেনবাবু। বিয়ে করেনি!—শ্বেতা যেন অবাক।—পাশ করেছে, চাকরি পেয়েছে, বিয়ে করেনি! রাজেনবাবু শব্দ করে হেসে উঠলেন তার কথা শুনে। প্রমথেশ চোখ বড় করে বলল—আপনার মেয়ের কথা আর বলব কী...কেউ বিয়ে করেনি শুনলে উনি আর টিকতে পারেন না। ঘটকালিতেও বেশ হাতমশ হয়েছে এর মধ্যে।

হবেই! রাজেনবাবু চোরা হাসি হাসলেন একটু—নিজে সুখী হলে অন্যকেও...

বাবার কথা! —শ্বেতা মুখ ফিরিয়ে নিল।

* * * * *

স্বাতী, চল—পরের দিন সকালে রাজেনবাবু উদ্যোগী হলেন। —চল তোর প্রোফেসরকে বলে আসি।

আমি যাব না।

আহা চল না—

কেন, একা যেতে পার না তুমি?

তুইও চল।

না! ওঁকে বলবারই বা কী হয়েছে আমি তো জানি না।

একটু চুপ করে থেকে রাজেনবাবু বললেন—স্বাভী, তোর হয়েছে কী?

সঙ্গে-সঙ্গে মেয়ের মাথা নিচু হল। জবাব দিল না।

এত বিরক্ত কেন? এবারেও কথা বলল না স্বাভী।

থাক তবে, আমি যাই। জামা পরে রাজেনবাবু আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন। আর রাস্তায় এসেই দেখলেন স্বাভী তাঁর পাশে।

এই শাড়িটা পরেই—

তাতে কী? স্বাভী হাসল—বেশ ভাল তো শাড়িটা।

আমার উপর খুব তো তস্থি, আর নিজে এ রকম থাকিস কেন?

ও মা! কী-রকম আবার থাকি?

সকালে উঠে চুলটাও বুঝি আঁচড়াতে হয় না?

ও ঠিক আছে—স্বাভী হাত দিয়ে কপালের চুল উন্টিয়ে দিল।

ইজি-চেয়ারে আখো গুয়ে খবর-কাগজ পড়ছিলেন সত্যেনবাবু। ভঙ্গিটা এমন আরামের, এমন এলানো অঙ্গস যে দেখামাত্র আবার চিড়বিড় করে উঠল স্বাভীর মাথার মধ্যে। আর তাদের দেখামাত্র সত্যেনবাবু উঠলেন, উঠে দাঁড়িয়ে রইলেন প্রায় হাত-জোড়-করা বিনীত ভঙ্গিতে। তাতে চিড়বিড়ানি কমল না, উন্টে বেড়েই গেল। একটা কথা বলতে এলাম আপনাকে—রাজেনবাবু কোনো ভূমিকা করলেন না—আজ রাত্রে আমাদের ওখানে একবার...মানে, একেবারে খেয়ে-দেয়ে আসবেন আরকি।

খাবা-যে কী! কোনও কথা যদি শুছিয়ে বলতে পারেন।

নিশ্চয়ই...নিশ্চয়ই...নিশ্চয়ই—তিনবার ‘নিশ্চয়ই’ বলার পর হঠাৎ প্রোফেসরের মুখে অন্য কথা যোগাল—তা উপলক্ষটা কী?

কিছু না...এমনি।

কিছুই না? কিছু-একটা শোনবার আশায় মুখের দিকে তাকালেন সত্যেনবাবু। না, উপলক্ষ কিছু না।—রাজেনবাবু কিন্তু একেবারে নিরাশ করলেন।

না...তা—হঠাৎ থেমে, স্বাভীর দিকে তাকিয়ে একেবারে অন্যরকম সুরে সত্যেনবাবু বললেন—ঠিক কথা! তোমার চিঠি—

টিপ করে উঠল বুকুর মধ্যে।—কাল সন্ধ্যাবেলা পেলাম। ওরা পাঠিয়ে দিয়েছিল ঠিকানা কেটে। ভাগ্যিশ—

ভাগ্যিশ? ঈশ! আপনার মেয়ে লেখে বেশ—প্রোফেসর ফিরলেন ব্যস্তির দিকে। বেশ? পরীক্ষার খাতা না কি যে বেশ? স্বাভীর ইচ্ছে হল ঐ অলক্ষী চিঠিটারে কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে এঙ্কুনি ওঁর চোখের সামনেই। চিঠি কি ফেরৎ চাওয়া যায়?

মাঝখান থেকে এই হল যে রাষ্ট্রের কুর্তিটাই মাটি হল স্বাভীর। সে গুয়ে থাকল, এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়াল, একবার বসল ছোড়দির কাছে, তঙ্কুনি আবার উঠে গিয়ে গল্প জুড়ল আতা-তাতার সঙ্গে, কিছুতেই যেন মন নেই। সত্যেন রায় যখন এলেন, রাজেনবাবু তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসালেন। তারপর ভিতরে এসে স্বাভীকে খুঁজে বের করে বললেন—সত্যেন এসেছে রে—

এসেছে তো আমি কী করব?

বাঃ!—বেচারি রাজেনবাবুর এর বেশি কথা যোগাল না। একা বসে আছেন ভদ্রলোক—প্রমথেশ

ব্যস্ত হল—তাহলে তো...আচ্ছা, আমি বরং আলাপ করি গিয়ে—

জামাইবাবু, একটা পাঞ্জাবি—স্বাতী চাপা গলায় চৈঁচিয়ে উঠল। আরে এতেই হবে—হাসতে গিয়ে গেঞ্জির তায় নেচে উঠল প্রমথেশের সুগোল ভুঁড়িটি। না, ককখনো না!—চড়া গলা চাপতে গিয়ে স্বাতীর গলা কাঁদো-কাঁদো শোনাল।

কোথায় আবার এখন জামা-টামা—

থাক তাহলে। কারো দিকে না-তাকিয়ে, দুমদাম পা ফেলে স্বাতী সোজা চলে এল বসবার ঘরে। শান্ত, নিশ্চিন্ত, পরিচ্ছন্ন সত্যেন রায় বসে আছেন জানালার ধারে চেয়ারে। তাকে দেখে একটু হেসে বললেন—কী স্বাতী, এখনও কি তোমার মন খারাপ? স্বাতী মাথা নিচু করে চুপ। তোমার প্রশ্নটা আমি রবীন্দ্রনাথের কাছে পেশ করতে পারিনি, কিন্তু এর উত্তর তিনি হয়তো গানেই দিয়েছেন, দেখো-তো খুঁজে, পাও কিনা—বলে সত্যেন রায় বাড়িয়ে দিলেন ব্রাউন কাগজে জড়ানো একটা প্যাকেট।

কী?

‘গীতবিতান’। রবীন্দ্রনাথের গান তো শুধু কান দিয়ে শোনবার নয়, মন দিয়েও পড়বার। স্বাতী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মোড়ক ছাড়িয়ে বের করল দু-খণ্ড গীতবিতান। ভিতরে লেখা, ‘স্বাতীকে—সত্যেন রায়।’ কেন আনলেন? যেন জবাবদিহি চাচ্ছে, এইরকম শোনাল প্রশ্নটা। কেন আবার, তুমি পড়বে বলে! একটু পরে সত্যেন রায় আবার বললেন—তোমার জন্মদিনের উপহারও মনে করতে পার।

ও মা! জন্মদিন কীসের? স্বাতী হেসে ফেলল। —না বুঝি? তা হতেও তো পারত।

কী আশ্চর্য! আপনি তা-ই ভেবেছেন?

তা না-ই বা হল জন্মদিন। নতুন বই পেতে যে-কোনো দিনই ভালও লাগে। আর এমন বই। এক্কেবারে সোনার বোতামং লা সিল্কের পাঞ্জাবি পরেই প্রমথেশ এল ঘরে। আর সঙ্গে-সঙ্গে বাইরে থেকে এল হারীত, ফিকে-নীল শার্টের উপর টকটকে-লাল নেকটাই। স্বাতী পরিচয় করিয়ে দিল। সত্যেন রায়ের নমস্কারের উত্তরে প্রমথেশ বিগলিত হাসল, আর হারীত সোজা একটি হাত তুলল কপালের কাছে, যেন খাপ থেকে উঠল তলোয়ার। বসে বলল—কদম্বর! প্রমথেশ হাঁটু দোলাতে-দোলাতে বলল—আরে এই তো এলে, আর এসেই—

কী করি...কাজ! উঁচু দরের একটু হাসি ফুটল হারীতের ঠোটে। —খাওয়ানো আর খাওয়ানোতে এত সময় যায় বাঙালীর যে কাজ করবে কখন! হারীত তাকাল সত্যেন রায়ের দিকে। ঠিক বোঝা গেল না সমর্থনের আশায়, না ভালমানুষ চেহারার শিক্ষকটিকে শিক্ষিত করতে।—চীনেদের শুনেছি আরো বেশি—সত্যেন রায় বলল।—সে জন্মদিনেই এই অবস্থা চীনের, জাপান ছিড়ে-ছিড়ে খাচ্ছে। তা মার খেয়ে বুদ্ধি খুলেছে এতদিনে, যুদ্ধ করতেও শিখেছে।

বুদ্ধি মানেই যুদ্ধ করা? জানতে চাইল ক্ষীণবুদ্ধি প্রমথেশ। হারীত একটু নড়ে-চড়ে বসল।—নাঃ, বোকাদের সঙ্গে কথা বলে কিছু হয় না, শুধু সময় পণ্ড, শুধু মেজাজ নষ্ট। এদিকে শ্বশুরবাড়ি, না-এসেও পারা যায় না...মুশকিল!—চীনেরা যখন ছ-ঘণ্টা ধরে রাঁধত আর দু-ঘণ্টা ধরে খেত—সত্যেন মৃদুস্বরে বলল—তখন কিন্তু কবিতা লিখত খুব ভাল।

কবিতা!—সঙ্গে-সঙ্গে হারীত ঘোড়ার মতো টগবগ করে উঠল।—পায়ে পা তুলে বসে একটু-একটু করে চীনে কবিতা চাখতে মন্দ লাগে না। কিন্তু চীনকে, চীনের কোটি-কোটি মানুষকে কি তা বাঁচাতে পারল?

সকলকে বাঁচাতে পারেনি বলেই তো মনে হয়—সত্যেন সায় দিল কথা। চামড়া-কোট-পরা চীনে যুবক মেঝেতে লাথি ঠোকে তাদের পুরোনো ল্যাণ্ডস্কেপকে লক্ষ্য করে, এবার শান্তিনিকেতনে শুনলাম নন্দলালের কাছে।

ঠিক করে। কী হবে আর ওসব দিয়ে! এই তো— হারীত হাত বাড়িয়ে খপ্পু করে ধরল টেবিলে রাখা ‘গীতবিতানে’র একটি খণ্ড। স্বাতীর মনে হল যেন একটা বেড়াল লাফিয়ে পড়ল ইঁদুরের ঘাড়ে— রবীন্দ্রনাথকে দিয়েই বা কী হবে আর?

সে কী! স্বাতীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—রবীন্দ্রনাথ আবার কী-দোষ করলেন?

এই দোষ—তৈরি জবাব হারীতের মুখে। —যে তাঁর লেখা পড়ে, কেউ যোদ্ধা হতে পারে না। নিজেই নিজের ভুল বুঝেছেন এতদিনে। এই-তো লিখেছেন সেদিন—একই সুরে, গড়গড়ে গদ্য করে, কমা-টমা সব উড়িয়ে দিয়ে আউড়িয়ে গেল—শান্তির বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস... বিদায়ের আগে ডাক... দিয়ে যাই দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে। খেতে-খেতে দাঁতে কাঁকর পড়লে যেমন হয়, সেই রকম একটা শিউরানি সহ্য করে নিয়ে সত্যেন বলল—বোধহয় ‘শান্তির ললিত বাণী’ আর বোধহয় ‘বিদায় নেবার আগে তাই’। ও একই কথা... একই কথা। আসল কথাটা এই যে ওসব শান্তি-ফাস্তি দিয়ে এখন আর কিছু হবে না—এখন যুদ্ধ চাই, যুদ্ধ!—বলে হারীত বীরদর্পে পাইপ ঠুকল চেয়ারের হাতলে। হারীতের কথা শুনতে-শুনতে হাঁ হয়ে গিয়েছিল প্রমথেশের মুখ। হুশ করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলে উঠল—তা যুদ্ধ তো হচ্ছেই।

যুদ্ধের এখন কী! ওৎ পেতে আছে না বনবিড়ালি জাপান!—হারীত আরো কিছু হয়তো বলত, কিন্তু হঠাৎ প্রমথেশ স্বাধীনভাবে একটা মন্তব্য করে ফেলল—ওদিকে রাশিয়াও তো...ফিনলন্ড নাকি লণ্ডনও... সত্যি?

আত্মরক্ষার জন্য ওরকম করতেই হয়—ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল হারীত। আপনার বাড়িতে ডাকাত পড়লে আপনি কী করেন? প্রমথেশ ভেবেই পেল না ফিনলন্ড কবে ডাকাতি করতে গিয়েছিল রাশিয়ায়। কী জানি—সে খবরও বেশি রাখে না, বোঝেও না কিছু। আর এসব যুদ্ধ-টুদ্ধ কেনই বা করে মানুষ, মিলেমিশে সুখে থাকলেই তো পারে। মনের কথাটা মুখেই বলে ফেলল—যা-ই বল বাপু, যুদ্ধটা বড়ো বিস্ত্রী। মানুষই তো মানুষকে মারে—এ ‘ত্যাগী’ হারীতের কানে শোনাল ‘ভ্যা’র মত। ভেড়ার পাল সব! প্রোফেসরটিকে তো দিবা ভেড়ু-ভেড়ু লাগছে—দেখা যাক! সত্যেনের দিকে ফিরে তর্ক তুলল—আপনি কী বলেন? আর্ট যদি এখন হাতিয়ার না হয়, তবে আর সে আছে কী করতে?

কীসের? ভীকু প্রশ্ন সত্যেন রায়ের।

কীসের আবার! শিকল ভাঙার হাতিয়ার।

কীসের শিকল?

ক্ষুধার, দুঃখের, দাসত্বের শিকল! এতটা বোঝাতে হল বলে হারীত একটু অবজ্ঞার হাসিতে ঠোট বাঁকাল।

ক্ষুধা, দুঃখ, দাসত্ব—মানে?

মানে—হারীত আশা করেনি প্রশ্নটা, কিন্তু ওস্তাদ খেলোয়াড়ের মতো লুফে নিয়ে তক্ষুনি আবার ফেরৎ পাঠাল—এর মানে কি ঠিক কথায় বোঝানো যাবে? যদি কেউ আপনাকে হাত-পা বেঁধে অন্ধকারে ফেলে রাখে, আর দিনের পর দিন খোঁতে না দেয়, হয়তো তাহলে আস্তে আস্তে

বুঝবেন। হারীত চেষ্টা করল খোশমেজাজি ধরনে হাসতে, তাতে আরো ধার হতো ঠাট্টায়। কিন্তু তা ঠিক হল না, ঘোঁৎ করে খেঁকিয়ে উঠল তার হাসিটা। আর সেই রাগি আওয়াজের সামনে যেন ঘাবড়ে গিয়ে আমতা আমতা করল সত্যেন—ও, খাওয়া-পরার কথা। আমি ভাবছিলাম আপনি আর্টের কথা বলছেন।

হ্যাঁ, খাওয়া-পরার কথা! হারীত গর্জন করল এবার—তা-ই চায় মানুষ—খাওয়া-পরা চায়, চায় কাজ, বিশ্রাম, স্ত্রী। আর ওসব পায় না যারা, তারা দেখছি ভারি বেয়াদব হয়ে উঠেছে আজকাল। বড়োই চ্যাচামেচি করছে পৃথিবী ভরে—ঋষিদের ধ্যানভঙ্গ হয় আর কি! কথাটা শেষ করে হারীত জুলজুলে চোখে তাকাল, যেন বলতে চায়—এইবার? কিন্তু মাস্টারটি আর জবাব দিল না। থাকলে তো দেবে! হারীত চট করে একবার দেখে নিল প্রমথেশের আর স্বাতীর মুখ, দু-জনকেই একটু নিস্তেজ লাগল। তাহলে কাজ হয়েছে তার কথায়। একটু পরে যখন খাবার ডাক এল, সে সকলের আগে উঠে দাঁড়িয়ে বেশ মোলায়েমভাবেই বলল—চলুন, সত্যেনবাবু। অঙ্ককার থেকে আলোর পথে এদের একটুখানিও এগিয়ে আনতে পেরে মনটা বেশ খুশি লাগল তার। গাছাড়া কথাবার্তা বলে খিদেটিও পেয়েছে চনচনে।

হারীত-শাস্ত্রী চলে গেল খাওয়ার পরেই, সত্যেন একটু বসল। যাবার সময় বার-বার বিদায় নিল শ্বেতার কাছ—কালই চলে যাচ্ছেন আপনারা?

যাচ্ছি তো।

আমিও ফিরে এলাম আর আপনারাও চললেন।

তবু-তো দেখা হল—কত ভাল লাগল। একটু চুপ করে থেকে, খুব নরম সুরে সত্যেন বলল—আর বুঝি থাকা যায় না কিছুতেই? শ্বেতা হেসে বলল—আবার আসব।

আসবেন তো?—সত্যেন যেন চোখ ফেরাতে পারল না শ্বেতার মুখ থেকে।

বড়ো ভাল তো ছেলেটি—সত্যেন চলে যাবার পর শ্বেতা বলল তার বাবাকে। তোর হাতে একবার যে খেয়েছে, শ্বেতা—রাজেনবাবু হাসলেন—সে কি আর ভুলতে পারে তোকে?

ছেলেটির কেউ নেই বুঝি? স্বাতীর যেন ভাল লাগল না কথাটা; বাঁকা সুরে বলল—আ—হা, একজন বড়োসড়ো পুরুষমানুষ, তার আবার কে থাকবে!

তবে যে বলেছিলি মা-বাবা-ভাই-বোন নেই?

তার মানেই বুঝি কেউ নেই হল?

আহা—স্বাতীর শেষ কথাটা লক্ষ্য করল না শ্বেতা—এখানে তবু একটা বাড়ির স্বাদ পেল। পুরুষমানুষ... কত যুদ্ধ সারাদিন...কিন্তু সারাদিনের পর একটা বাড়ি তো চাই।

হঠাৎ শ্বেতাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে স্বাতী বলল—বড়দি, তুমি যেয়ো না। শ্বেতা হাত রাখল বোনের মাথায়।

না...যেয়ো না...সত্যি— গলা বুজে এল। কাঁদতে লাগল দিদির কাঁধে মুখ লুকিয়ে।

সে কী! কাঁদছিস নাকি?...এই! বোকা মেয়ে! ঠেলা দিল বোনের মাথায়, তার ঝাপসা চোখের দিকে তাকিয়ে বলল—আচ্ছা বোকা তো! কাঁদবার হয়েছে কী...চল, গুবি চল! উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে স্বাতীকেও কোমর ধরে টেনে তুলে আবার বলল—তোর আর কী...কাঁদলেই হল। এদিকে আমার যে তাতে কষ্ট হয়, সে কথা ভাবিস? থাম এক্ষুণি, নয়তো আমিও কিন্তু কেঁদে ফেলব। এমন মজার মুখভঙ্গি করে বলল যে স্বাতী ভিজ়ে চোখে হেসে ফেলল।

* * * * *

সে-রায়ে সে বড়দির কাছে গুল, ফিশফিশে গলায় একটু-একটু গল্প করতে-করতে ঘুমিয়ে পড়ল। এমন আরামে কতকাল যেন ঘুমোয়নি। উঠতে বেলা হল পরের দিন—বড়দি এর মধ্যেই বাঁধা-ছাঁদা নিয়ে ব্যস্ত। স্বাতীও লেগে গেল কাজে, খুঁজে খুঁজে জড়ো করল সারা বাড়িতে ছড়ানো-ছিটানো বাচ্চাদের জামা-জুতো, শাড়ি ভাঁজ করতে লাগল মেঝেতে হাঁটু ভেঙে বসে। শ্বেতা যা এনেছিল তার চাইতে নিয়ে যাচ্ছে অনেক বেশি। কাপড়চোপড় কত কেনা হল, বুদ্ধি করে বাচ্চাদের শীতের জামাও কিনে ফেলেছে প্রমথেশ। এখন ধরানোই মুশকিল। বড়ো সুটকেসটি এমন আকষ্ট হল যে তালা কিছুতেই বন্ধ হয় না। দু-বোন দুদিক থেকে চাপ দিয়ে-দিয়ে নামিয়ে আনে এক-একবার, কিন্তু যেই আটকাতে যায়, অমনি ছিটকে উঠে যায় কট করে। আর একসঙ্গে হেসে ওঠে দুজনে। শেষটায় স্বাতী চেপে বসল সুটকেসের উপর, তারপর দুজনে একসঙ্গে বসে নিচু হয়ে চেষ্টা করল দু-দিকে—কিন্তু ডালাটা বড়ো অবাধ্য। আর যত অবাধ্যতা করে তত বেড়ে যায় শ্বেতা-স্বাতীর ফুর্তি। এরই মধ্যে রাজেনবাবু এলেন বড়ো একটা গীসবোর্ডের বাস হাতে করে। শ্বেতার সামনে নামিয়ে একটু দূরে আলগোছে বসলেন খাটের উপর। মেঝেতে হাঁটু তুলে বসে, হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে শ্বেতা আস্তে আস্তে বের করল আলতা, সিঁদুর, পাউডার, সেন্ট, মাথার তেল, চুলের কাঁটা, চুলের ফিতে, সাবান, হেজলিন স্নো আর একবাঁক ডিম-সন্দেশ। কিছু বলল না, একটু দেখল তাকিয়ে, তারপর একটি একটি করে প্রত্যেকটির গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আবার তুলে রাখল সেই কাগজের বাস্কে। দোকানেরই সুতো দিয়ে বেঁধে ফেলে এতক্ষণে বাবার দিকে চোখ তুলল। রাজেনবাবু উঠে চলে গেলেন অন্য ঘরে। এর পরে দিনটা কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। বাবা আপিশে গেলেন, আর আপিশ থেকে ফিরলেন—মাঝখানকার সময়টা যেন বোঝাই গেল না। দিনের গাড়ি হুশ করে চলে গেল রওনা থেকে পৌঁছনোয়। শাস্বতী এল, আবার হাসাহাসি গল্প খানিকক্ষণ, আজ যেন হাসিটা কিছু বেশি—ফাঁকে ফাঁকে এরই মধ্যে কত কাজের কথা মনে পড়ল শ্বেতার। অনুকূল কতবার ছুটল দোকানে, ঐ দম বন্ধ-বন্ধ সুটকেস খোলা হল দু-তিন বার। বিছানা বাঁধবার সময় বিজু এগিয়ে এল আস্তিন গুটিয়ে। প্রমথেশ দিবানিদ্রার আশা ছেড়ে দিয়ে কেবলই পান-জরদা খেতে লাগল। হঠাৎ এক সময় দেখা গেল বাঁধাছাঁদা সব শেষ। ভরতি-ভরতি দুটো টিফিনকেরির কাঠের খাপে বসানো কুঁজোর পাশে দাঁড়িয়ে, বাচ্চারা ফিটফাট ঘুরে বেড়াচ্ছে নতুন জুতোয় খটখট শব্দ করে। রাজেনবাবু শ্বেতার কাছে এসে বললেন—এখন আবার পান-সাজতে বসেছিস? ওঠ, সময় হল।

স্বাতী, বাবার ডিবেটা।

অত পান দিয়ে আমার কী হবে— রাজেনবাবু বললেন। প্রমথেশের জন্য বেশি করে নে, পথে ঘাটে—। ওঁরটা নিয়েছি—শ্বেতা উঠে গা ধুয়ে পরে দিল খয়েরি রঙের খদ্দেরের শাড়ি, গাড়িতে ময়লা হবে না। সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিল শাস্বতীকে, নিজেও পরল, তারপর এসে বসল বারান্দার সিঁড়িতে। শাস্বতী বলল—কী একটা স্যান্ডেল পরেছো বড়দি! সেদিন না বাবা তোমাকে নতুন এনে দিলেন?

হ্যাঁ—ঐ লাল টুকটুকে নতুন স্যান্ডেল নষ্ট করি আর কি পথে ঘাটে পরে। এটা খারাপ কী—বেশ তো।

শ্বেতা—রাজেনবাবু মিটিমিটি হাসলেন—এখনো তোর ইচ্ছে করে নাকি রে নতুন জুতো নিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকতে?

ইচ্ছে করলেই পারি নাকি বড়ো মেয়েটার যন্ত্রণায়? আমার জুতোগুলো পরে পরে ছারখার করে দেয় না? প্রমথেশ গলা-খাঁকারি দিল—তাহলে বিজু ভাই, একটা ট্যান্সি...না, দুটো... শাশ্বতীও যাবে স্টেশনে, তুমি ফেরবার সময় পৌঁছিয়ে দিতে পারবে না ওকে?
নিশ্চয়!—বিজু চটপট বেরিয়ে গেল।

হারীত এলো না রে? শ্বেতা জিজ্ঞেস করল। —কথা তো ছিল—ক্ষীণ উচ্চারণ করল শাশ্বতী। সময় পায় না, কত কাজ করে কত দিকে, আর কী কথা বলে, বাঃ!—প্রমথেশ তারিফ করে মাথা নাড়ল। —আমাদের মত তো নয়, গুয়ে বসে আইটাই!

বাবা, সত্যেন তো এল না আজ একবারও—।

সে আর আসে কোথায়—কচিৎ এক-আধদিন।

নাকি? কাছেই থাকে না? তা—যা লাজুক...আমার ওখানে একবার আসে তো বেশ হয়। ওকে বলিস, স্বাতী, কেমন? শাশ্বতী বলল—স্বাতী, তুই যাবি না? স্বাতী চুপ করে বসেছিল গালে হাত রেখে, যেন চমকে উঠে বলল—কোথায়?

স্টেশনে যাবি না আমাদের সঙ্গে?

স্বাতী মাথা নাড়ল।

কেন, চল না।

ননা—

বিজু এসে মোটা গলায় বলল—ট্যান্সি এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল সব কটি মানুষ। আর ঠিক যেন সেই মুহূর্তটিতে পৃথিবীতে সন্ধ্যা নামল। যেদিন সত্যেন রায়ের চিঠি পেয়েছিল, আর বসে বসে দেখেছিল জুলজুলে জল-ভরা সন্ধ্যাতারা, ঠিক সেইরকম লাগল স্বাতীর। আবার সেই বুকভাঙা সন্ধ্যা, ছাইরঙা ছায়াভরা, কুয়াশায় ঝাপসা, আকাশ আর পৃথিবী ভরে সেই অসহ্য বিদায়। নিঃশব্দে মাল তুলল দুজন চাকর, নিঃশব্দে রাজেনবাবু একবার দেখে এলেন সব ঠিকমত উঠল কিনা। একবার ঘুরে এলেন ঘরগুলি, দরকারি কিছু পড়ে রইল না তো? ছায়া ছড়াল, ঘনাল, আর ছায়ার মতোই স্বাতী দেখল বড়দি প্রণাম করলেন বাবাকে। প্রণাম করার পরিশ্রমে জামাইবাবু হাঁপাতে লাগলেন ছড়িতে ভর দিয়ে। তারপর বড়দি এসে হাত রাখলেন তার পিঠে, গাল রাখলেন গালে। আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে সবাই এল রাস্তার ধারে, ট্যান্সিতে ঢুকতে গিয়ে জামাইবাবু সরে এলেন। মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ বললেন—স্বাতী, তাহলে যাই?...এত আনন্দ শিগগির করিনি, আবার কবে... যাই, কেমন? বলে হাসলেন, বড্ডো বোকার মতো সেই হাসিটা। একটু পরে সেই শূন্য, স্তব্ধ, মরে-যাওয়া বাড়িটার মধ্যে রাজেনবাবু এসে স্বাতীর কাছে বসলেন— স্বাতী, কাঁদিস কেন? উপুড় হয়ে বালিশকে কামড়ে ধরে, স্বাতী ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল।

আর কাঁদে না। লক্ষ্মী, সোনা, আমার স্বাতী-সোনা, আর কঁদে না।

কিন্তু কান্না তো থামে না স্বাতীর। কী করে থামবে? কে চলে গেল এই বাড়ি ছেড়ে? বড়দি? না, না আমি—স্বাতী গলা ফাটিয়ে চীৎকার করল মনে মনে—এ তো আমি। রোজ সন্ধ্যাবেলা সমস্ত আকাশ কাঁদিয়ে যে চলে যায়, সে তো আমি। আবছা অন্ধকারে, শূন্য মাঠে, ছোট্টো ইস্টিশনে রেলগাড়ি যাকে নামিয়ে দিয়ে যায়, সেও তো আমি! বাবা, আমি যাব না। বাবা, আমি যাব না! কিন্তু এ-কথা শোনেই-বা কে, আর তেমন করে বলতেই-বা পারে না কেন? আর পারে না বলেই তো আরো কান্না পায়। —স্বাতী...স্বাতী...স্বাতী রে...

স্বাতী চোখ খুলল না, মুখ তুললো না। বাবা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন মেয়ের বালিশ-জড়ানো সুগোল সাদা হাতের দিকে, কালোচুল-ছড়ানো কেঁপে-কেঁপে ওঠা পিঠের দিকে...তাহলে ওর এমন দুঃখও আছে যা আমি বুঝি না। তাহলে ওর এমন কান্নাও হয়েছে যা আমি থামাতে পারি না। চুপ করে পাশে বসলেন। আর ডাকলেন না, নড়লেন না, ছুঁলেন না। বসে বসে কত কথা মনে পড়ল, কত কথা মনে হল। কোনোখানে কোনো শব্দ নেই, চুপচাপ বুক-ফাটা বাড়িটার মধ্যে ঠেলে-ঠেলে উঠতে লাগল স্বাতীর বুকের ভিতর থেকে কান্নার হাওয়া। আর জানলা দিয়ে বিরিবিরি কৌকড়া হাওয়া মাঝে-মাঝে গায়ে তুলে গেল প্রথম শীতের শিউরানি।

৩

শীত পড়ে এল পৃথিবী ভরে মন-খারাপ ছড়িয়ে। কী মন-মরা রঙ-ঝরা সন্ধ্যা, আর বিকেলটা ছোট্টো একটুখানি, যেন রোগা, সরু, ভীরা, কোনওরকমে একবার ঝিলিক দিয়েই অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। এই তো সেদিনও কত রঙ ছিল বিকেলে—বেগুনি আর বাদামি আর সবুজ, হলদে আর সবুজ আর সোনালি। এক-একদিন সন্কেবেলাটাকে মনে হত গোলাপি সমুদ্র। টুকরো মেঘগুলি, সোনালি গাছ, আর সমুদ্রের তলে সোনালি ঘাস, সোনালি গাছ—দেখতে-দেখতে সব মিলিয়ে গেল। সন্ধ্যার সিঁদুর-রঙ হল ইঁদুর-রঙ, আকাশটা যেন বিধবার কপাল। ঝিরঝির, শিরশির করে শীত এল, স্বাতী দেখল একা বসে বসে। রোজ একটু-একটু করে কাছে ঝরে পড়ল মন-খারাপ, গাছের গা থেকে একটি-একটি করে পাতার মতো। ঠান্ডা জল শাস্তি আনল, আর সকালবেলা স্নানের পর নরম নীল রোদ্দুরের দিনটি যেন পৃথিবীর হাতে ধরা এক আশ্চর্য উপহার। আশ্চর্য লাগল স্বাতীর—আশ্চর্য এইজন্য যে শীতও সুন্দর, আকাশ এত শান্ত আর দিন এত নরম তো আর কখনও হয় না—তবে কি যা-কিছু হয় তা-ই ভাল, আর যা কিছু আছে তা-ই সুন্দর? কত সুন্দর, তা কি লোকে জানে? কই তাদের মুখ দেখে মনে হয় না তো! রাস্তায় বেরোলে, কি একটা ট্রামে উঠলে, কীরকম সব মুখ চোখে পড়ে? হোমরা মুখ, গোমড়া মুখ, ছোকরারা ফুটিতে ফাজিল, কেউ চোখা-চোখা, কেউ বোকা-বোকা, কিন্তু কোনো মুখেই একথা লেখা নেই যে... কী? একটু থমকাল স্বাতীর মন, সন্কের পর আলো-ছায়া ঝিলিক লজিকের বইয়ের পাতায় আঙুলের চাপ পড়ল একবার। তারপর মনের মধ্যে সে দেখল সত্যেন রায়ের মুখ—মুখশ্রী। প্রথম যখন দেখেছিল মনে হয়নি মানুষটা সুন্দর, মনে হওয়াটাও...যদি তখন এ নিয়ে ভাবত...সম্ভব মনে হত না। কিন্তু হ্যাঁ, সুন্দরই তো। যা সুন্দর, তা সুন্দর লাগে ওঁর চোখে—আর তাই ওঁর চোখের তাকানো। হাতের চাপ পড়ল কাঁধে। স্বাতী ফিরে তাকাল চমক-লাগা বন্ধু চোখে। শাম্বতী হেসে বলল—বাঃ-বাঃ! অমন আত্মহারা হয়ে ভাবছিলি কী? স্বাতী উল্টো দাঁড়াল—কখন এলে? এফুনি এলাম, আবার এফুনিই যাব। ছোড়দির সাজগোজের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে স্বাতী বলল—নেমস্তন্ন বুঝি কোথাও?

পিরোজপুরের রাজবাড়িতে—একটু থেমে—অনেক লোকজন, খাওয়ার দেরি আছে, তাই অবলাম একবার ঘুরে যাই, কাছেই তো। শাম্বতী নড়ে-চড়ে শাড়ির জেপা তুলল ইলেকট্রিক আলোয়। তারপর স্বাতী কিছু বলল না দেখে আবার বলল—ঐ যে সাদার্ন-এভিনিউতে বিরাট গোলাপি রঙের বাড়িটা। ছোড়দিকে নিরাশ করতে খারাপ লাগল স্বাতীর। মুখে-চোখে ভান করল যেন সে জানে সাদার্ন-এভিনিউতে পিরোজপুরের রাজবাড়ি কোনটা। জিজ্ঞেস করল—

হারীতদা এলেন না?

না, যা আড্ডা জমেছে! রাজার ছেলে বন্ধু কিনা হারীতের—মাত্র একটুখানি চেষ্টা করে খুব সহজেই নামটা উচ্চারণ করে ফেলল শাম্ভতী। —বিলেতে আলাপ ওঁদের। পাঁচ বছর বিলেতে কাটিয়ে আমেরিকা চীন জাপান ঘুরে এই সেদিন ফিরেছেন মকরন্দ মুখুয্যে। তাকে বলব কী—শাম্ভতীর মুখের ভাঁজে-ভাঁজে খুশি ফুটল—অন্ত বড়োলোক, অথচ কী ভদ্র! কথাটা নিয়ে একটু-যেন ভেবে স্বাতী বলল—বড়োলোকেরা ভদ্রলোক বুঝি হয় না? কথাটা গ্রাহ্য না করে, কিংবা লক্ষ্য না করে শাম্ভতী একটা বড়ো খবর দিল—জানিস, জাপান নিশ্চয়ই যুদ্ধে নামবে! নাকি?

তাহলে আর রক্ষে নেই আমাদের—গলা নামিয়ে, প্রায় কানে-কানে শাম্ভতী বলল—ভী-ম-গ বদ জাপানিরা। স্বাতী আবার বলল—নাকি?

কিছুই তো জানতে পারি না আমরা, চীনদেশে যা কাণ্ড—পিরোজপুরের রাজপুত্রের মুখে এইমাত্র যা শুনে এসেছে—সেঙলি গরম-গরম উগরে তুলল শাম্ভতী। আর স্বাতী শুনল যেন হারীতই কথা বলছে, কথার উচ্চারণ পর্যন্ত সে রকম হয়ে যাচ্ছে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল ছোড়দিকে। কত মোটা হয়েছে, ফুটফুটে ফর্সা, টুকটুকে লাল, সুন্দরী বলবে সবাই, কিন্তু সুন্দর...? কী রে? জাপানি জন্তুর বর্ণনার মধ্যে হঠাৎ শাম্ভতী সচেতন হল। —কী দেখছিস? নেকলেসটা? খুশি হয়ে, অথচ একটা লজ্জার ভঙ্গিতে নিজের গলার দিকে চোখ নামাল ঘাড়ের স্পষ্ট দুটো রেখা ফুটিয়ে। কেন, এটা পরে এসেছি তো আগে—আমার শ্বশুর দিয়েছিলেন, বিয়ের সময়। মোহরের মতো গোল-গোল চাকতি বসানো লাল সোনার ফাঁসটিকে শাম্ভতী মোটা-মোটা আঙুল দিয়ে ছুঁল একবার—সুন্দর না? স্বাতী ক্ষীণস্বরে বলল—ছোড়দি, সুন্দর কাকে বলে?

নাঃ! শাম্ভতী হা-হা করে হেসে উঠল যেমন করে পুরুষরা হাসে। —তুই বড্ডো ভাবুক হয়ে উঠছিস দিন-দিন, তা তোর বয়সে ওরকম একটু হয়ে থাকে। কোনো-কোনো মেয়ের, আবার সেরেও যায়—চোখে একটুখানি হাসি চিকচিক করে উঠল, বিস্ময় মেয়েলি হাসি এবার—সময়মতো। বাবার সঙ্গে মিনিটদশেক গল্প করেই শাম্ভতী উঠল। রাজেনবাবু মেয়েকে এগিয়ে দিলেন প্রায় রাজবাড়ির গেট পর্যন্ত, স্বাতীও গেল সঙ্গে। ফেব্রুয়ারি পথে বলল—বাবা, লেকের ধারে একটু বসবে?

—বেশ! কৃষ্ণপঙ্কজের রাত, তার উপর ঠান্ডাও পড়েছে একটু। লেকের ধারে লোক কম, কিন্তু যতটা কম হতে পারত তার চেয়ে বেশি। একেবারে খালি বেঞ্চি একটাও নেই। একটু ঘোরাঘুরি করে স্বাতী বলল—এসো বাবা, ঘাসেই বসি। কদিন একেবারেই ঘর থেকে বেরোয়নি, আজ দৈবাৎ রাস্তায় পা দিয়ে খোলা হাওয়ায় আকাশের তলার ভাঁজ লাগছিল তার। জুতো থেকে পা বের করে, ভিজ়ে ঘাসের গায়ে একবার ঠেকিয়ে রাজেনবাবু বললেন—না রে।

এমন সময় জলের ধারের বেঞ্চি থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আপনারা এখানে বসুন। আপনি!—স্বাতী বলে উঠল একটু জোরেই। বোসো স্বাতী—সত্যেন রায় এমন সুরেই কথা বললেন, যেন এটা তাঁর বাড়ির বসবার ঘর আর স্বাতী নিমন্ত্রিত। স্বাতী বসল ধারে। আর রাজেনবাবু তার পাশে বসতে-বসতে বললেন—তিনজনেই তো বসা যায় এখানে।

আমিও বসছি —বেঞ্চির আর-এক ধার দখল করলেন সত্যেন রায়। হাঁটুতে কনুই আর হাতে থুতনি রেখে সামনের দিকে মুখ বাড়িয়ে স্বাতী বলল—আপনি যে লেকে?

কেন, আসতে নেই?

লেকে তো সবাই আসে।

তাতে কী?

সবাই যায় বলেই আপনার যেতে ইচ্ছে করে না বলছিলেন।

কবে বলেছিলাম?

স্বাতী ঠিক বুঝতে পারল না এ রকম কথা সত্যেন রায় কি সত্যিই বলেছিলেন, না কি সে-ই নিজের মনে ভেবে নিল এইমাত্র। আর এই একটু চূপ-খাকার ফাঁকে—তা এসেছিলাম বলেই তো তোমার সঙ্গে দেখা হল—বলে পিঠ-টান করে বেষ্টিতে হেলান দিলেন তিনি। আহা! দেখা করতে চাইলে আবার...দু-মিনিট দূরে তো থাকেন। অনেক কথা টগবগ করে উঠল স্বাতীর মনের মধ্যে। কিন্তু কোনো কথাই কি বলা যায় ছাই! শুধু বাজে কথা বলেই জীবন কাটাতে হয়। স্বাতী হাত সরাল না খুতনি থেকে, কনুই আরো শক্ত করল হাঁটুর উপর, টনটনে পিঠে তাকিয়ে রইল তারার আলোয় ঝিলিমিলি জলের দিকে। এক-এক জায়গায় ইলেকট্রিকের আলো যেন কালো জলের ছাল ছাড়িয়ে নিচ্ছে, অথচ জল যেন চলে না, আর সেইজন্য সমস্তটা কেমন মরা-মরা। এতখানি জল, জলের মধ্যে ঘন গাছের দ্বীপ, আবার দূরে একটা সাঁকো। তবু সবটাই যেন সাজানো, বানানো, যেন সত্যি নয়—বাঃ, বানানো জিনিস তো বানানোই হবে। যা-কিছু বানানো তা-ই বুঝি এ রকম, আর যা নিজে-নিজে হয় তা-ই সুন্দর? কিন্তু কবিতাও তো বানানো, তবু বানানো যে লাগে না? সোজা হয়ে বসে বাবার পিঠের উপর দিয়ে প্রোফেসরের দিকে তাকিয়ে স্বাতী বলল—আপনি কোনো লেক দেখেছেন?

এই-তো দেখছি।

না—সত্যি লেক, হৃদ?

তাও দেখেছি।

কেমন?

কেমন? সত্যেন রায় মুখ তুললেন সামনের দিকে। মনে হল বেশ বিস্তৃত একটা বর্ণনা দেবেন, কথা ভাবছেন মনে-মনে, কিন্তু মিনিট দুই ধরে মন আর কান এক করে ফেলেও আর কিছু শুনতে না পেয়ে স্বাতীর যখন তেমনি অপ্রস্তুত লাগছে, যেমন লাগে গুরুজনের সভায় বালকের হঠাৎ গভীরভাবে এমন কিছু বলে ফেলে যেটা একটু পরেই সে বুঝতে পারবে বোকামি বলে, তখন, যেন অনেক ভাবনার পরে, সত্যেন রায় আস্তে বললেন—পৃথিবীর সবই সুন্দর। স্বাতী আবার হেলান দিল বেষ্টিতে, কথাটা যেন শুনলই না। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চেষ্টা করল দূরের দ্বীপটাকে প্রকাণ্ড পাহাড় আর ঝোপ-ঝাপ গাছগুলোর ঘোঁষা-কালোকে ভীষণ জঙ্গল বলে কল্পনা করতে। আর হঠাৎ একটা মোটরগাড়ির হেডলাইট আলো ফেলল ঠিক তার মুখের উপর, চোখে হাত চাপা দিল সে, কিন্তু দরকার ছিল না, আলো দূরে সরে গেছে তক্ষুনি। চূপচাপের মধ্যে জোর আওয়াজে হেঁচে উঠলেন রাজেনবাবু। হাতের উন্টো পিঠ ঠোটে ঝুলিয়ে বললেন—যাবে নাকি এখন? বেশ ঠান্ডা।

হ্যাঁ বাবা, চলো।— স্বাতী উঠল, জলের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াল, আর তার পিছনের জল আর আকাশ থেকে সত্যেন রায়ের চোখ আস্তে আস্তে সরে এল তার মুখের উপর। ঠান্ডা হাওয়ায় একটু যেন কেঁপে উঠে স্বাতী হঠাৎ বলল—আচ্ছা, সুন্দর কাকে বলে? একটু চূপ করে থেকে, একটু হাসির সুরে, আর খুব মৃদু স্বরে প্রোফেসর জবাব দিলেন—সে-কথা এখন

ভাবতে হবে না তোমাকে, এখন পরীক্ষা সামনে। তারপর উঠে দাঁড়ালেন রাজেনবাবুর দিকে ফিরে—লেকের ধারের রাস্তায় কেন-যে গাড়ি চলতে দেয়! বাড়ি ফেরার পথে আর একটি কথাও বলল না স্বাতী। হঠাৎ ক্লান্ত লাগল তার, ক্লান্ত, ফাঁকা-ফাঁকা, কাঁপা-কাঁপা।

* * * * *

বেশ-তো; তাহলে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্যই তৈরি হওয়া যাক। জানুয়ারি থেকে কলেজ ছুটি হল। সারাদিন বাড়ি বসে পড়াশুনা ছাড়া করবারও কিছু নেই। কিন্তু পরীক্ষার পড়া কতটুকুই বা। বাকি সময় নানারকম বই পড়ে, দুপুরে খেতে-খেতে ভাবে, খাওয়ার পর রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসবে আরম্ভ-করা কোনো বইটি নিয়ে, বইয়ের তো অভাব নেই সত্যেন রায় থাকতে। পড়তে-পড়তে রোদ সরে আসে তার পিঠ থেকে মাথায়, রোদের বাঁকে বাঁকে বেতের চেয়ারটি ঘুরিয়ে নেয়। তারপর ঘর থেকে রোদ যখন চলে যায়, অথচ ঘরভরা তাতটুকু থাকে, তখন ছাপার অক্ষরগুলো একটার গায়ে আর একটা লাফালাফি করে তার চোখের সামনে। একটুখানি ঘুমিয়েও পড়ে হয়তো—কিন্তু তক্ষুনি টান করে চোখ মেলে কল্পনার জগৎ ছেড়ে বাইরের দিকে তাকায়। সামনের ছোটো রাস্তাটি ফাঁকা, রা নেই পাড়ায়, কর্পোরেশনের বাচ্চা-গাছটার সঙ্গে শীতবিকেলের সোনারোদের একা-একা খেলা।

এইরকম সময়ে বিজু একদিন এসে বলল—স্বাতী, কী করছিস? দাদাকে দেখে স্বাতী খুশি হল। হেসে বলল—কী আর করব?

তুই দেখি নভেল পড়েই দিন কাটাস। পরীক্ষার পড়া?

তাও পড়ি।

নিজের মনে কী পড়িস না-পড়িস তুই ছাড়া কেউ জানে না।

আমি ছাড়া আর কে জানবে—আর জানবার দরকারই বা কী?

আহা, এমনি-এমনি পড়া এক কথা, আর পরীক্ষার জন্য পড়া আর—দু-বার ফেল করার অভিজ্ঞতা নিয়ে বিজ্ঞ বলল। ঠিক হচ্ছে কিনা সেটা জানা তো চাই। আর তোর তো সুবিধেই আছে মস্ত।

কী?

সত্যেনবাবুকে বলতে পারিস মাঝে-মাঝে এসে...

ও মা! স্বাতী বাধা দিল কথায়। এর জন্য নাকি আবার...

কেন? উনি প্রোফেসর, ওঁর কাজই তো পাশ করানো। চাই কি হয়তো কোশেচনও বলে দিতে পারেন।

সে কী? পরীক্ষার কোশেচন নাকি কেউ কাউকে বলে!

বলে না! —বিজ্ঞ হাঃ হাঃ করে হাসল একটু—দিন-রাত বলে! ম্যাট্রিকে তো দু-বারই আমি 'এসে'-টা জেনে গিয়েছিলুম—

—তাতে সুবিধে হয়েছিল কিছু? বিজু গভীর হয়ে বলল—তা, বলতে হলে নিজে তো জানা চাই। সত্যেন রায় বাচ্চা-মাস্টার, উনি আর কোথেকে জানবেন?

বেশ রঙ তোর শার্টটার—স্বাতী কথা বদলাল। ভাল?—বিজ্ঞ চোখ নামিয়ে দেখল একবার। তারপর হেলাফেলার মতো ভাব করে বলল—করালাম কয়েকটা নতুন। কাজ বাগাতে হলে কাপড়চোপড়ের চটকটা চাই সকলের আগে। ফিকে-ছাই রঙের পাংলুন আর শাদা-কালো জুতোর দিকে তাকিয়ে স্বাতী জানতে চাইল—চটক হলেই কাজ বাগানো যায়?

দেখবি, দেখবি—বিজন একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল সিগারেটের। ঘরের মধ্যে ঘুরতে-ঘুরতে বোনের সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বলল—শোন, সত্যেন রায়কে বলবি আমাকে দুটো চিঠি ড্রাফট করে দিতে? বুঝলি না, ইংরিজিটা তো আমার তেমন—

চাকরির অ্যাপ্লিকেশন?

আরে না। চাকরির অ্যাপ্লিকেশন হবে কেন? বিজনেস লেটার। গবর্নমেন্টে লিখতে হবে কি না, তাই একটু ভাল করে—বলবি সত্যেন রায়কে?

আমি কিছু বলতে-টলতে পারব না। এ-উত্তরটাই বিজন আশা করেছিল, আর এতে চটবে না এটাও আগেই স্থির করা ছিল তার। তক্ষুনি বলল—আচ্ছা থাক, থাক, ও আমি চালিয়ে নিতে পারব। আর বিদ্বান উনি হতে পারেন খুব, কিন্তু কমার্শাল করেসপনডেন্সের কী জানেন? কমিশন বানান কী রে? স্বাতী মুখে আঁচল চেপে হেসে উঠল।—হাসবার কী আছে? পাণ্ডুলনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বিজন বুকটাকে চেতিয়ে দিল একটু।—ভীষণ নটখটে ওটা। কত মুখস্থ করেছিলুম কমিশন-অমিশন, তবু লিখতে গেলেই সর্ব্ব ফুল। একটা এম, দুটো এস, না রে? না একটা এস, দুটো এম?

*

তা বানানের জন্য কি আর কাজের লোকের কাজ ঠেকে থাকে? কদিন পরেই দেখা গেল, জমকালো একটি লেটার-বক্স শোভা পাচ্ছে বাড়ির দরজায়। তার গায়ে গোটা-গোটা সাদা অক্ষরে লেখা—B. JOHN & Co. দেখে রাজেনবাবু হকচকালেন। তবে কি তাঁর বাড়ি ভাড়া নিয়ে নিল অন্য কেউ, আর তিনিই জানলেন না? ঘরে এসে স্বাতীকে বললেন—ব্যাপার কী রে! কী?

লেটার-বক্সটা কাদের?

কাদের আবার! আমাদেরই। দাদা লাগিয়েছে সেদিন।

কী কোম্পানি লেখা দেখলাম যে?

ও মা! বুঝলে না তুমি? B. JOHN—মানে বিজন।

ও-হোঃ-হোঃ! হেসে উঠলেন রাজেনবাবু। এমন গলা ছেড়ে, আর এতক্ষণ ধরে হাসিলেন অনেকদিন পরে। তা বুদ্ধিটা মন্দ বের করেনি— স্বাতী দাদার পক্ষ নিল। —হ্যাঁ, খুব বুদ্ধি! আবার কোম্পানিও!

রাজেনবাবু হাসির ধাক্কায় মাথা হেলিয়ে দিলেন পিছন দিকে। স্বাতী বলল—দাদা কিছু-একটা করছে ঠিকই—কী-রকম সুন্দর চিঠির কাগজ ছাপিয়েছে সবুজে জুড়ি কালোতে। আর বিল-টিল কত-কী—

—ওঃ! তাহলে আর কী! স্বাতী চোখ দিয়ে হাসল বাবার সঙ্গে, কিন্তু মুখে বলল—অত ঠাট্টারই বা কী হয়েছে! জানো, মাঝে-মাঝে চিঠিপত্রও আসে বি-জন কোম্পানির নামে, খাকি রঙের খামে। একটা এসেছিল ও. এইচ. এম. এস. ছাপানো—জানো?

ভাল।

স্বাতী একটু ভাবল, তারপর আবার বলল—নিশ্চয়ই দাদা কিছু করছে এবার—টাকাও পাচ্ছে খুব।

বলেছে বুঝি তোকে?

বলতে হবে কেন, দেখে বোঝা যায় না? কত নতুন কাপড়-চোপড় করছে, আর দাড়ি কামাবার

ব্রেড যে কত কিনেছে তোমাকে বলব কী বাবা।

কী বললি? ব্রেড কিনেছে!

ক—সুত! একটা বিস্কুটের টিন ভরতি!

হাসি মিলিয়ে গিয়ে এবার রেখা পড়ল কপালে। শেষটায় কি উন্মাদ হয়ে গেল ছেলেটা? না স্বাতীরই ভুল?—তুই দেখেছিস? রাজেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন। —লুকিয়েই রাখে সুটকেসে কাপড়ের তলায়। সেদিন বের করে গুনছিল, আমি হঠাৎ গিয়ে পড়েছি তখন ওর ঘরে। দেখে বললুম—অত ব্রেড দিয়ে কী হবে রে? বলল, জমাচ্ছি। ক-দিন পরে তো আর পাওয়া যাবে না। বলে হাসতে লাগল খুব। সত্যি নাকি, বাবা, ব্রেড আর পাওয়া যাবে না একেবারেই? দাড়ি রাখতে হবে সবাইকে? মা গো, কী কুচ্ছিৎ!

গভীর হল কপালের রেখা, ফ্যাকাশে হল মুখের রঙ। মিনিটখানেক চুপ করে থেকে আপনমনেই বললেন—টাকা পায় কোথায়?

বাঃ! স্বাতী বাবার দুশ্চিন্তা দূর করল—আমি বললুম না তোমাকে, ও টাকা পাচ্ছে খুব। আমাকে বলল—এখানে কত টাকার ব্রেড বল তো? আমি অনেক ভেবে, অনেক বাড়িয়ে-টাড়িয়ে বললুম—পাঁচিশ। হো-হো করে হেসে উঠল শুনে। —দু-শো টাকার ব্রেড কিনেছি। আরো কিনব। অনেক টাকা না থাকলে কি দু-শো টাকার ব্রেড কিনতে পারে কেউ? তা ভালই করল দাদা। যখন আর পাওয়া যাবে না, আমাদের চেনাশোনা সকলকে দিতে পারব তো— বলতে-বলতে স্বাতীর চোখের সামনে ফুটল সত্যেন রায়ের পরিষ্কার কামানো গালের নীলচে আভা। —ও বাবা, আমার কথা গুনছ না তুমি— বাবার মুখে ঠেলা দিল স্বাতী। —হ্যাঁঃ, মস্ত এক ভাবনা ঘুচল। রাজেনবাবু হাসলেন মেয়ের দিকে তাকিয়ে।

বিজুর সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন মনে-মনে। বাপ যখন বাড়ি থাকেন, ছেলে তখন প্রায়ই থাকে না, সুযোগ ঘটতে তাই দেরি হল। আর দেরি হল বলে রাজেনবাবুর উদ্বেগ যেমন বাড়ল, তেমন আবার কোথায়-যেন একটু আরামও পেলেন। কিছু বলতে গেলেই তো রুখে উঠবে, চ্যাঁচাবে, আর স্বাতী যদি কিছু একটা বলে ফেলে তবে-তো আর রক্ষে নেই, পদ্মা-পার করে ছাড়বে মেয়েটাকে। অথচ না বলেই বা কী করি, কার টাকা নিয়ে কী পেম্পিলামি করছে, সেটা আমাকে জানতে তো হবেই। দেখা হয়ে গেল পরের রবিবার বিকেলবেলা। —দ্যাখ তো আমার নতুন সুটটা কেমন— বলতে বলতে ঘরে এসে বিজন দেখল স্বাতী তার চেয়ারটিতে বসে নেই। বাবা চশমা এঁটে কী যেন হিসেব লিখছেন সেখানে। থমকে দাঁড়াল। পলকের জন্য রাজেনবাবুর মনে হল, এখন থাক। কিন্তু তঁস্কুনি জোয়ার জোর করলেন মনে, হাতের পেম্পিলটা নামিয়ে, খুকখুক কেশে, একটু লাল হয়ে বললেন—বিজু, তোর সঙ্গে একটা কথা—

আমার সঙ্গে? গটগট করে বিজু এগিয়ে এল। এই সপ্রতিভ স্বচ্ছন্দ ভাবটার পিছনে কতখানি চেষ্টা আছে তা বুঝতেই দিল না। ঝকঝকে নাবিক-নীল সুট-পরা ফ্যাশনেবল যুবকটির দিকে নিশ্চিন্ত বুড়ো-চোখ মেলে একটু তাকালেন রাজেনবাবু। তারপর মিনমিন করে বললেন—কথাটা হচ্ছে... মানে... কী করছিস-টরছিস আজকাল—

ওঃ! বিজন অস্ফুট অধৈর্যের আওয়াজ করল... হ্যানো-ত্যানো পঞ্চাশ কথা এখন। তার চেয়ে একেবারেই সব বলে দেওয়া ভাল...মানে, যতটা বলা যায়। মুখে একটু হাসি এনে বেশ স্পষ্ট করে বলল—বিজনেস-এর খুব একটা সুবিধে পেয়েছি বাবা। বি-জন কোম্পানি নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে

যাবে, তুমি দেখো।

আর কাকে নিয়ে কোম্পানি?

আর-তো কেউ না, আমি একাই। পার্টনার হতে অনেকেই চাচ্ছে অবশ্য, বোলচাল দিচ্ছে খুব, কিন্তু আমি ওতে ভুলি না। আমি একাই পারব, একাই পারব।

কী পারবি? কী করবি?

বিজ্ঞান মুচকি হাসল—তুমি কি ভুলে যাচ্ছ বাবা, যে পৃথিবীতে একটা যুদ্ধ চলছে? রাজেনবাবু একটু অবাক হলেন। এ রকম করেও বলতে শিখেছে বিজু? তা হবে, কত কাল তো ওর সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলি না, আর নেহাত ছেলেমানুষ তো নেই আর।—তা...তা—আমতা-আমতা করলেন তিনি—যুদ্ধ বলেই তো আরো ভাবনা। দুর্দিন।

দুর্দিন না সুদিন দেখা যাক। তারপর বাপের চোখের চকিত প্রশ্নের উত্তরে বলল—এ নিয়ে খামকা তুমি ভেব না বাবা, ঠিক আছে সব।

টাকা পেলি কোথায়?

টাকা কিছু পেলাম বলেই তো—

কোথায় পেলি?

আমাকে দিয়েছে একজন।

কে? দু-বার চোখের পলক ফেলে বিজ্ঞান উত্তর দিল—নাম বলতে পারব না।

মুখ-কান গরম হয়ে উঠল রাজেনবাবুর। একটু চুপ করে থেকে বললেন—কত টাকা দিয়েছে? বিজ্ঞান এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না। বড়ো বড়ো নিশ্বাস নিতে লাগলেন রাজেনবাবু, খক করে কেশে উঠলেন একবার। তারপর খুব নিচু গলায় বললেন—এ-সব ছাড়। টাকাটা ফিরিয়ে দে, চাকরি কর।

চাকরি আমি করব না, বাবা। আর টাকাটা ফিরিয়ে দেবার কথা ওঠে না। আমাকে ধার দেয়নি, দিয়েই দিয়েছে। শুনে রাজেনবাবু হাঁপরের মতো হাঁপাতে লাগলেন। ঘরে এল স্বাতী, ধুপ করে খাটের উপর বসে পড়ে বলল—ক-টা গেঞ্জি নিয়ে এলুম বাবা, তোমার জন্য। সব জিনিসপত্র ছিড়ে গেছে। বোনের সওদায় দুটি অভিজ্ঞ আঙুল ন্যস্ত করে বিজু একটু নিচু গলায় বলল—বাজে। আমারও তা-ই মনে হচ্ছিল—স্বাতী তাড়াতাড়ি বলল—এই মনোহর স্টোর্স দোকানটাই বাজে, কিন্তু পাড়ায় তো নেই আর। তুই শহরে নানা জায়গায় যাস, নিয়ে এলেই পারিস।

—আনব। বাবার দিকে আর না তাকিয়ে বিজ্ঞান বেরিয়ে গেল একটু যেন তাড়াহুড়া করেই।

স্বাতী বলল—সুটটায় বেশ মানিয়েছে দাদাকে, না বাবা? রাজেনবাবু চুপ।

গেঞ্জিগুলো কি খুব খারাপ? স্বাতী যেন আপন মনেই বলল—তবে না হয় ফিরিয়ে দিয়ে আসি।

কীসের!—প্রতিবাদটা স্বাতীর মনে হল বাবার পক্ষে বড়োই প্রবল—খুব ভাল! খুব সুন্দর!

এত ভালো গেঞ্জি আমি পরেছি নাকি কোনোদিন!

না বাবা, স্বাতী হাসল—তুমি বড্ডো খুশি-করা কথা বল। রাগ ধরে। তা—একটু থেমে, একটু ভেবে আবার বলল—কথাটা এমন মিথ্যেই বা কী, নিজে কিনলে সবচেয়ে শস্তাটার উপর আর উঠতে নাকি তুমি?

নিজে তো করে-কর্মে ভাসিয়ে দিচ্ছেন—রাজেনবাবু গজর-গজর করলেন—আর অন্যেরটা বাজে।

ও মা! এর জন্য দাদার উপর রাগ করছ তুমি? স্বাতীর ঠোঁটের ফাঁকে ফাঁকে দাঁতের সারি চিকচিক করে উঠল। —যুদ্ধে বড়লোক হবেন! তীব্র একটা নড়াচড়া হল রাজেনবাবুর শরীরে। যত—! তাহলে রাগের অন্য কারণ আছে? বাবার কুঁচকানো কপালের দিকে তাকিয়ে স্বাতী বলল—কী হয়েছে; বাবা?

যুদ্ধে বড়লোক হবেন তোর দাদা। রাজেনবাবু আর মনের ধোঁয়া চাপতে পারলেন না—দেখছিস না প্যান্ট-কোট পরে গটমট।

তাতে কী! বড়লোক হওয়া তো ভাল।

যুদ্ধে বড়লোক হয় কারা? যারা ঠাকায়। বলতে-বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, স্বাতী অবাক হল বাবার উদ্বেজনা দেখে—দেখেছি না আগের বায়ের যুদ্ধ? চোরে-জোচ্চোরে মিলে সোজা লুঠ করেছে গবর্নমেন্টের তহবিল।

হারীতদা তো বলেন সব বড়লোকই চোর কিংবা ডাকাত— স্বাতী বাবাকে জানাল—হয় সে নিজে, নয় তার বাপ-ঠাকুরদা কেউ— আর বলতে-বলতে তার মনে পড়ল ছোড়দির মুখে শোনা মকরন্দ মুখুয্যের কথা—হারীতদার বন্ধু। তা মুখে তো লোকে কতই বলে, তা বলে সত্যি-সত্যি ছেলেটা চোর হবে, চোর?—দম বন্ধ হয়ে গলা আটকাল রাজেনবাবুর। ঘন-নীল সুট-পরা চুল-ওল্টানো দাদাকে স্বাতী কিছুতেই চোর বলে ভাবতে পারল না। চোর! সে-তো নোংরা, বিচ্ছিরি— কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যায় রাস্তা দিয়ে, আর ছোটো ছেলেয়া হাত-তালি দেয় পিছনে। তা ছাড়া আবার চোর হয় নাকি? সত্যি, বাবার বড্ডো বেশি-বেশি সবটা নিয়ে। চোর না আরো কিছু!

টাকা পেল কোথায়? রাজেনবাবু বিড়বিড় করলেন। —কীসের টাকা, বাবা?

ঐ গেঞ্জি একটা দে তো। গেঞ্জির কথায় স্বাতী খুশি হল, কিন্তু তার উপর পাঞ্জাবি পরতে দেখে বলল—বেরোচ্ছ নাকি বাবা?

হ্যাঁ, ঘুরে আসি একটু। আর কথা না বলে রাজেনবাবু বেরিয়ে পড়লেন।

এলেন ভবানীপুর, ভবানীপুর থেকে বালিগঞ্জ। পরের তিন-চার দিন সারলেন অন্য সব পাড়া— কোথায় বেহালা, কোথায় মৌলালি, আর কোথায় মানিকতলা—হাস্তামা কি সোন্দাম! আত্মীয় বলা যায়, বন্ধু মনে করা যায় এমন একজনকেও বাদ দিলেন না। বিজু কি কোনও টাকা নিয়েছে তোমার কাছ থেকে? বিজুকে আপনি কোনও টাকা দিয়েছেন? না! না তো! বিজু কেন টাকা নেবে? কেন, হয়েছে কী? চেনাশোনা কেউ বাদ পড়ল কিনা ভাবতে গিয়ে রাজেনবাবু চমকে উঠলেন। আরে! বিজুর দিদিরা! নিজের মেয়েদের কথাই তাঁর মনে পড়া উচিত ছিল সকলের আগে—তা তো নয়, এদিকে রাজ্য তল্লাশ করে হয়রান! ওকে আর কে টাকা দেবে যদি না তার দিদিরা কেউ দেয়? দিদিদের মধ্যে কে? শাস্ত্রতীকে প্রথমেই সরিয়ে দিলেন মন থেকে— কেননা হারীতের মুঠো একটু আঁটো, আর শাস্ত্রতীর সাধি নেই লুকিয়ে দেয়। আর তিন জনের মধ্যে কোনজন? মহাশ্বেতা? সরস্বতী? একজন রেঙ্গুনে, একজন দিল্লিতে। এত দূর থেকে শুধু চিঠিপত্রে এ রকম একটা ঘট ঘটবে, আর আমি কিছুই জানলাম না?...না, এ শ্বেতারই কাণ্ড। এই যে সেদিন এসেছিল, এর মধ্যেই বিজু মন গলিয়েছে বড়দির—আর মন তো ওর গলেই আছে, ওকে জল করতে কতক্ষণ!...তা-ই! নিশ্চয়ই শ্বেতা। রাজেনবাবু নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন যেন—যাক, তবু-যে বাইরের কারো কাছে নেয়নি কি অচেনা কাউকে ঠকাতে যায়নি। শ্বেতাকে চিঠি লিখলেই জানা যাবে, আর জানতে পারলেই ফিরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন।

তিন মেয়েকেই চিঠি লিখলেন রাজেনবাবু। উত্তর এল সকলের আগে সরস্বতীর।...‘বাবা তোমার চিঠি পেয়ে অবাক হলাম। তোমাকে না জানিয়ে বিজুকে আমি টাকা দেব ব্যবসার নামে নষ্ট করার জন্য, তুমি কি আমাকে এইরকম ভাব? আমি তো তোমাকে কবে থেকেই বলেছি, ওকে শাসন করো, নয়তো বুড়ো বয়সে নাকাল হতে হবে তোমাকেই। দেখলে তো এখন! এখন যদি...’ এর পরে অনেকখানি আক্ষেপ আর উপদেশ। মহাশ্বেতা কত কালের মধ্যে আসে না, ভাইয়ের উপর তার বিশ্বাস তাই বেশি, আর ব্যবসায় তার ভক্তি তো থাকবেই। সে অল্প কথায় জানাল যে টাকা সে দেয়নি, দেবার কথাও হয়নি কোনো, কিন্তু এ নিয়ে এত দুশ্চিন্তারই বা কী আছে, ব্যবসা করা তো ভালই। বিজু যে পারবেই না, সেটা প্রথম থেকেই ধরে নিয়ে লাভ কী—হয়তো পারবে। শ্বেতার চিঠি এল সবশেষে, যদিও তার রাস্তাই সব-কাছেই। ‘চিঠির উত্তর দিতে দেরি হল, ছেলেপুলের তাড়নায় পাঁচটা মিনিট সময় পাই না, বাবা। বিজুকে আমি তো টাকা দিইনি। আমার কি আলাদা টাকা আছে নাকি? দিলে তোমার জামাই-ই দেবেন। তা ওঁকে জিজ্ঞেস করাতে উনি বললেন—পাগল নাকি! কথায়-কথায় আরো বললেন যে এবার বিজু ওঁকে প্রায়ই বলত ব্যবসা করার কথা। ওর মন যখন ঝুঁকেছে ওদিকে, দেখা যাক না। তোমার বাবাকে লিখে দাও—উনি বললেন—এ নিয়ে মিছিমিছি অস্থির হয়ে উনি যেন শরীর খারাপ না করেন। আমি তা-ই ভাল মনে করি বাবা। তোমার এত ভাবনার কী আছে বলো তো আমরা থাকতে?’

* * *

মহাশ্বেতার আশ্বাস, সরস্বতীর উপদেশ, শ্বেতার সান্ত্বনা, কিছুই কোনো কাজে লাগল না। মাঝে একটু উপশম হয়েছিল বলেই দুশ্চিন্তায় দ্বিগুণ কালো হল মন। তবে কোথায় পেল? আর টাকাও তো নেহাৎ অল্পস্বল্প হবে না—যা সাজপোশাকের ঘটা—আর দুশো টাকার ব্রেড! কে সেই পণ্ডিত, যে বিজুকে বিশ্বাস করে টাকা দিল? আবার বলে ফেরৎ দিতে হবে না। আর কিছু না, টাকাটা নিয়ে ও যা ইচ্ছে তা-ই করুক—ওড়াক, পোড়াক, হারাক—যার টাকা, তাকে ফেরৎ দিতে পারলেই বাঁচি। কোনো বিধবাকে ফতুর করেনি তো? তেমন কি কেউ আছে আত্মীয়ের মধ্যে, জানাশোনার মধ্যে? কই, না। ভেবে-ভেবে দিশে পান না, আরো ভীষন। দিনে-রাত্রে কাঁটার মতো বিঁধে রইল কথাটা। পান-চিবোনো অবসরটুকু ফুটো ফুটো গেল, চিড় ধরল রাস্তার গভীর ঘূমে।

বিজু—আবার একদিন সুযোগ পেয়ে তিনি বললেন—শুধু এইটে বল যে কার টাকা আর কত টাকা। আর তোকে কিছু বলব না আমি।

কেন বলো তো এ-নিয়ে এত ভাবছ?—বিজু হাসিমুখে বলল। সত্যি, কেন? শ্বেতাও তা-ই লিখেছে, আর মহাশ্বেতাও। সত্যি তো, আমার কী? নিজের উপরেই রাগ হল রাজেনবাবুর, নিজেকে যখন বলতে শুনলেন—বল না, আমি তাকে ফিরিয়ে দিই টাকাটা।

বলেছি তো, ফেরৎ দিতে হবে না।

না হোক, তবু আমি দেব।

ফেরৎ দিতে হলে আমিই দেব—বিজু গম্ভীর।

বল না, বল—প্রায় হাতে ধরে মিনতি করলেন বাবা। যদি মরে যাই, এই একটা অশান্তি... কী বাজে—! বিজু অশ্রুতে উচ্চারণ করল। তারপর মাথা উঁচু করে সোজা বাপের দিকে তাকিয়ে বলল—আচ্ছা, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি যে তার টাকা আমি ফিরিয়ে দেব—অনেকগুণ দেব।

হল—তো? উঃ! উনি আমাকে কথা দিচ্ছেন! কী কথা—দেবার মানুষটা! রাজেনবাবুর বুকের মধ্যে কেমন যন্ত্রণা হল ছেলের ভাবভঙ্গি দেখে। চোখ নামিয়ে নিলেন, যেন তিনিই অপরাধী। ছেলে তার হাত-সাফাইয়ের হাতে-খড়ি কার উপর করল, সেটা জানবার আশা ছেড়ে দিতে হল। তা ছাড়া আর উপায়ই বা কী!...রাজেনবাবুর সমস্ত ছুটোছুটি, লেখালেখি, পীড়াপীড়িকে টিটকিরি দিয়ে বাড়ির দরজায় বুক ফুলিয়ে রইল বি.জন কোম্পানির লেটর-বক্সটা। একেবারে বেকারও না, চিঠিপত্র সত্যি পড়ে মাঝে মাঝে।

* * *

স্বাতীর ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা যতদিনে শেষ হল, ততদিনে দেখা গেল বিজুর কাছে লোকজনও আসছে, কেউ-কেউ আবার গাড়িতে। তারা বিজুকে বলে মিস্টার মিট্র, জনে-জনে সিগারেটের টিন তাদের হাতে, দরজা-বন্ধ ঘরে নিচু গলায় তাদের পরামর্শ। রাজেনবাবুকে দেখলে তারা যেন দেখতেই পায় না, স্বাতীর সামনে পড়লে অসাধারণ সৌজন্য দেখিয়ে সরে দাঁড়ায় টান-টান বৃকে। ক্লাইভ স্ট্রীটের সিসি-বাঘের পিছন-পিছন এরা ঘুরে বেড়ায়, প্রসাদ পায় গণ্ডার-ভাণ্ডারের, আর মাঝে-মাঝে স্বাধীনভাবে ছোটো শিকার মারে—এক পলকেই ঠিক চিনলেন রাজেনবাবু। একদিন স্বাতীকে বলেই ফেললেন মুখ ফুটে—বিজু আর যা করে করে, ওসব বাজে লোকদের বাড়িতে আনে কেন? বলিস তো ওকে।

বললেই যেন শুনবে।

ব্যবসা করতে হয় তো আপিশ-পাড়ায় বসুক—রাজেনবাবু চোখের চামড়া কুঁচকোলেন—বাড়িতে আবার কোম্পানি লটকায় কে? স্বাতী তখন আর-কিছু বলল না। কিন্তু বিকেলে বাবা আপিশ থেকে ফেরামাত্র ছুটে এসে দুহাতে গলা জড়িয়ে বলে উঠল—বাবা—!

কী রে? কী?

আজ যা অবাক করে দেব তোমাকে! বাবা দম নিয়ে বললেন—পরীক্ষার রেজাল্ট বুঝি বেরিয়েছে?

সে কী! এখনই!

আর তো কিছু ভেবে পাচ্ছি না—আপিশের পোশাকেই খাটে লম্বা হলেন রাজেনবাবু। এই নাও—স্বাতী ছুটে গেল টেবিলের ধারে, ‘হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া’ খুলেই —আরে, কী হল?—বলে টেনে আনল তার তলা থেকে ‘ভানুসিংহের পদাবলী’। আর তার ভিতর থেকে তক্ষুনি বেরোল পাতলা নীলচে-সবুজ একশো টাকার নোটখানা। বাবার কাছে এসে হাত বাড়িয়ে বলল—নাও।

কী রে?

নাও না! দ্যাখো না! —মেয়ের খুশি উপচে-পড়া মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থাকলেন বাবা। তারপর তার হাতের দিকে তাকালেন—টাকা? পেলি কোথায়?

দাদা দিয়েছে তোমাকে—বলে স্বাতী নোটটা বাবার হাতের মধ্যে গুঁজে দিল। —কেমন? তুমি তো ভাবছিলে দাদার সবই বাজে! এখন? নোটটা হাতে ধরে রাজেনবাবু উঠে বসলেন। আশ্চর্য-আশ্চর্য বললেন—কেন? আমাকে দিয়েছে কেন?

বাঃ, তোমাকে দেবে না তো কাকে দেবে? মুখোমুখি তো লজ্জা করে, তাই আমার হাতে দিয়ে বলল, বাবাকে এটা দিস, কেমন?—ও তোমাকে খুব ভালবাসে, বাবা।

ভালবাসার টাকাই বুঝি প্রমাণ?

নাঃ, তুমি যে কী, সত্যি! স্বাতী ভাষা পেল না মনের ভাব বলবার। রাজেনবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন—ওর টাকা দিয়ে আমার কোনো দরকার নেই। ওকে দিয়ে দিস, এই নে। কিন্তু স্বাতী হাত বাড়াল না; অবাক হয়ে বললো—তুমি নেবে না? ফিরিয়ে দেবে? যার কাছে টাকা নিয়েছে তাকেই ফেরৎ দিতে বলিস— বলতে বলতে রাজেনবাবু খাট ছেড়ে উঠে টেবিলের উপর নোটটি রেখে দিলেন বই চাপা দিয়ে।—টাকা আবার কার কাছে নিয়েছে? কথাটা শোনালা প্রশ্নের মতো না, প্রতিবাদের মতো।

তা যদি জানতাম তবে তো— হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন—বলিস ওকে এ-কথা। যার টাকা নিয়েছে তাকে যেন ফিরিয়ে দেয়। স্বাতী সারা দিন ধরে আশা করেছিল। কত খুশি হবেন বাবা! দাদা-যে সত্যি অপদার্থ না, সত্যি যে কাজে-কর্মে মন গেছে এবার—ভেবেছিল বাবা বলবেন—বিজু তাহলে একজন হয়ে উঠল!—আর তার এই মন-বানামো রঙিন ছবির গায়ে কালি ঢেলে দিয়ে বাবা কিনা টাকা ফিরিয়ে দিলেন! কেমন লাগবে দাদার? কত উৎসাহ করে দিয়ে গেছে! দাদার সঙ্গে তুমি এ-রকম কর কেন, বাবা? স্বাতী না-বলে পারল না।

কী করি?

কী আবার, এই-তো টাকাটা নিলে না। আমি যদি দিতাম আর তুমি যদি না-নিতো, জীবনে কি আর তোমার সঙ্গে কথা বলতাম?

তা বিজু যদি বলে বাবার সঙ্গে আর কথা বলব না, তাহলে খুব তফাৎ হবে তোর মনে হয়? না বাবা, না! কোন 'না'-টাকে 'হ্যাঁ' করতে চায়, তা নিজেই ভাল বুঝল মা। শুধু ভিতর থেকে একটা প্রতিবাদ উঠতে লাগল।

তা ছাড়া, রাজেনবাবু সান্ত্বনার সুরে বললেন—আমার তো টাকার দরকার নেই কোনো, যদিই না আছি, আমারটা আমিই চালাতে পারব।

শুধু দরকারের জন্যই বুঝি টাকা?

থাম তো পাকা বুড়ি! —বাবা উড়িয়ে দিলেন মেয়ের কথা।

কী আর করা, একশো টাকার নোটটা ফিরিয়েই দিতে হল দাদাকে। স্বাতী কথাটা বলল ভয়ে-ভয়ে, অনেক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, মোলায়েম করে। কিন্তু কী আশ্চর্য! একটুও মর্মান্বস্ত মিলে হল না দাদাকে, দুঃখিতও না। দিব্য হাসিমুখে চামড়া-বাঁধানো পকেট বইয়ে নোটটি ভরে নিয়ে বলল—থাক, ভালই হল।...তোর চাই কিছু টাকা?

ওমা? আমি টাকা দিয়ে কী করব?—স্বাতী হেসে উঠল।

ভাল! ভাল! যদিই টাকার দরকার না হয় তবুই ভাল— বলে ফাঁতিতে গুনগুন করতে-করতে প্রশ্রয় করল বিজন। স্বাতী অশ্রুতে বলল, দাদাটা কী রে!—সত্যি-তো বাবার আর দোষ কী, দাদাটাই বাজে। ছেলেবেলা থেকেই তা-ই, এখনো পারল না। কী রকম চলে, আর কী যে বলে...সত্যি! বসে-বসে যত ভাবল, ততই রাগল মনে-মনে। কিন্তু পরের দিন রাগ জল হয়ে গেল তার, অনুশোচনায় ভিজে গেল মন, যখন বিজন এসে তার টেবিলে রাখল আটটি-দশটি চকোলেটের পাতা।

নেসলে! স্বাতী চোঁচিয়ে উঠল খুশিতে। ইশ—এই লাল-পাতাগুলি আজকাল আর চোখেই দেখি না! পেলি কোথায়?

আছে! আছে! বিজন মুখ টিপে হাসল—কী চাই তোর বল না।

স্বাতী আর কথা বলল না। একটা পাতা খুলে প্রথমে একটুখানি ভেঙে মুখে দিল। তারপর

সমস্ত মুখে অনেকদিনের ভুলে-যাওয়া সুখের ছড়িয়ে-পড়া অনুভব করতে-করতে একটি পাতা শেষ করেই ফেলল আশ্বে-আশ্বে। হঠাৎ বলল—দাদা খা!

নাঃ, আমার ও-সব ভালো লাগে না।

আমারও আর তত না— স্বাতী তাড়াতাড়ি বলল। সত্যি, ছেলেবেলায় কী ভালই বাসতুম চকোলেট! তুই একটুও খাবি না, দাদা?

তুই আর একটা খা।

মা গো! একটা খেয়েই চিশিচিশি! বলে স্বাতী আর-একটি পাতার কাগজ ছাড়াল দু-আঙুলে। বোনের জন্য এটা-ওটা উপহার বিজন মাঝেমাঝেই আনতে লাগল। ডিমের ছাঁদের নীল-বাস্কে প্যারিসের সেন্ট, সোনালি-বাস্কে চিকরি-চিকরি কাগজে ঢাকা বিলেতি সাবান। স্বাতী ভেবেছিল এসব আর পাওয়াই যায় না, আর দাদা কিনা বলে কত চাস! কাণ্ড! আর কোনোদিন তো হাতে করে কিছু আনেনি আমার জন্য—কারো জন্যই আনেনি...সেই টাকাটা তো নেননি বাবা। মুখে না-বলুক, মনে কি আর না লেগেছে?—তাই আমাকে এসব দিয়েই...স্বাতীর হৃদয় দ্রব হল কথাটা ভেবে। তারপর, পরীক্ষার খবর যখন জানা গেল, ঐ একটা পাশের ছুতোয় দাদা এনে দিল টিয়ে-রঙের শাড়ি। হাতে দু-খানা দশ টাকার নোট দিয়ে বলল—খুব-তো পাশ করলি, এবার একটু খরচ কর স্বাধীনভাবে।

স্বাতী একটু লাল হয়ে বলল—পাশ করেছি তো কী হয়েছে, পাশ আবার কে না করে? কেন, আমি! বিজন খোশমেজাজে হাসল—শাড়িটা কেমন রে?

খু—ব সুন্দর রং।

আমি তো শাড়ি-টাড়ির কিছু বুঝি না—মজুমদার পছন্দ করে দিয়েছে।

সে আবার কে?

আমার কাছে আসে মাঝে-মাঝে—সেই লম্বামতো—

স্বাতী কিছু বলল না।

মজুমদার বলল তোকে খুব মানাবে রঙটায়।

সে কী! আমাকে দেখল কবে?

কেন, তুই কি অসূর্যস্—অসূর্যপ্—ঐ হল আরকি—তুই কি তা-ই?

স্বাতীর ভাল লাগল না কথাটা। মজুমদারকে চিনল মনে-মনে—আগে কখনো দ্যাখেনি ওরকম পালিশ-করা জুতো। এসব বাজে লোকদের ডাকিস কেন বাড়িতে? বাবাও পছন্দ করেন না, জিনিস?—কথাটা উঠে এল ঠোটে, কিন্তু বলতে গিয়ে থেমে গেল। থাক, শখ করে এই একটা জিনিস আনল—এক্ষুনি আবার—এখন থাক—আর একদিন কথা উঠলে ছাড়বে না। কুড়ি টাকায় স্বাতী দুখানা কাঁচি ধুতি কিনে আনল বাবার জন্য কিছু বাঁচল—তা দিয়ে আরকিছু ভেবে না পেয়ে নতুন রবীন্দ্র রচনাবলী কিনল পাড়ার দোকানে। বিকেলে শাড়ি, ধুতি, বই একসঙ্গে বাবার সামনে রাখল।

দ্যাখো, বাবা! তারপর বাবা কিছু বলবার আগেই ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল—ধুতি দুটো তুমি পরবে কিন্তু!

মস্ত বহর—হৌচট খাব রে।

আগেই জানি তুমি এ-কথা বলবে। কিন্তু কী করবে, ছেলে যখন দিয়েছে পরতেই হবে।

বইটা বুঝি সত্যোনের জন্য? এ-প্রশ্নটা স্বাতীর একেবারেই ধারণার বাইরে। যেন ধাক্কা খেয়ে

বলে উঠল—কেন?

তা-ই উচিত না?

হ্যাঁ—? কপালে-পড়া এক গোছা চুল আঙুলে জড়াতে-জড়াতে স্বাতী বলল—এ-বই কিনতে এখনো ওঁর বাকি আছে কিনা!

তাতে তোমার কিছু না, তোমার ভাগ তুমি দেবে। সে-তো কত বই দিয়েছে তোমাকে। পাশ-টাশ করলে, এখন—

আ-হা? যেন আরো কিছু বলতে গিয়ে স্বাতী হঠাৎ থেমে গেল। রাজেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন—সত্যেন আছে কেমন? অনেকদিন দেখা হয় না আমার সঙ্গে।

আমার সঙ্গেই যেন হয়!

আসে না মাঝে-মাঝে?

ক—ই! হাসির মত সুরে স্বাতী বলল—পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর দু-দিন এসেছিলেন—না, তিন দিন।

এবার ওকে একদিন খেতে-টেতে বল।

ঐ তুমি এক জানো, বাবা! কেবল খাওয়া! ওঁর অত সময় নেই নেমস্তন্ন খাবার—ভালও বাসেন না ও-সব।

স্বৈতার খাওয়ার দিন তো মনে হল না। তুই এখন শেখ এসব, লোককে খাওয়ানো, যত্ন-টত্ন করা—

আমি ওসব পারি না।

পারবি, পারবি! রাজেনবাবুর চোখের স্নেহ মেয়েকে স্পর্শ করল।

বড়দিও বলেছিলেন ঠিক এই কথাই। পারব, আমিও পারব? বড়দির মতো, মার মতো?... মার কথা যেন আস্তে-আস্তে আবছা হয়ে আসছে মনে, বাবারও তা-ই? বাবা কখনও বলেন না মার কথা, কিন্তু সেই না-বলাই সবচেয়ে বেশি বলা নয় তো? এটাই কি সত্যি যে মার কথা বাবা কখনো বলেন না, না কি যে-কথাই বলেন সে-কথাই মার কথা? ওকে একদিন খেতে-টেতে বল—মা থাকলে এ-কথা বলতেও তো হত না। ছেলেবেলার ছবি ফিরে এল মনে। কত দিকের কত আত্মীয়, বাবার কত বন্ধুরা সস্ত্রীক, কত রান্না-খাওয়া-হাসি-গল্প-আনন্দ—বড়দি বইয়েছিল ঠিক সেই ছেলেবেলার হাওয়া। বড়দি চলে গেল, বাবা আশঙ্কিত যে একা সেই একা। মা মরবার পরে লোকজনের আসা-যাওয়া অনেক কমে গেছে বাড়িতে। এখন দেখে মনে হয় বাবার আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই, কেউ নেই। তিনি সকালে উঠে বাজার করবেন, আপিশ করবেন সারাদিন, তারপর সন্ধ্যাবেলায় হয় কিছু কিনতে-টিনতে ছুটবেন আবার, নয়তো বসে থাকবেন আলো নিবিয়ে চুপ করে—এ ছাড়া আর-কিছু নেই তাঁর জীবনে।—কেন, আমি আছি... আমি? প্রশ্নের তীক্ষ্ণ চিহ্নটা বুকে বিঁধল স্বাতীর, যেন দম নিতে পারল না মুহূর্তের জন্য। এই সেদিন পর্যন্ত ছোড়দিও তো ছিল। আর এখন? বড়দি চলে যাবার পর কদিন এসেছে ছোড়দি?

স্বাতী উঠে এল বাবার কাছ থেকে। হঠাৎ তার মনে হল যে বাবা তার সমস্ত ইচ্ছার অফুরন্ত পূরণ করে চলেন, সে তো বাবার ইচ্ছেমতো কিছুই করে না। বাবার ইচ্ছা সত্যেন রায়ের খোঁজ-খবর নেন মাঝে মাঝে। মা থাকলে সবই হত—কিন্তু মা থাকলে যা হত এখন কি তা কিছুতেই হবে?... তা আমিও তো ওঁকে আসতে বলি না, এলেও বেশিক্ষণ বসতে বলি না।

বাঃ, আমি কেন বলব—আমি ছাড়া আর বলবেই বা কে—আমার চেনাতেই তো বাবা ওঁকে চেনেন, বাবার তো উনি কিছু না। সত্যি-তো, আমাকে উনি যেরকম—যেরকম—মানে, আমার সঙ্গে ভদ্রতা যেরকম করেন, আমি তো তার তুলনায়—যাঃ, ওরকম হিসেব করে কেউ বুঝি কিছু করে? স্বাতী চুপ করে বসে ভাল একটু। মনে হল, এখনই একবার যায় সত্যেন রায়ের কাছে, ঐ রচনাবলীটা দিয়ে আসে। কথাটা মনে হতেই একটু সুখের ছলছলানি বয়ে গেল তার বুকের মধ্যে। দিতে যত ভাল লাগে নিতে কি তত?...কিন্তু রাত হয়ে গেছে—রাত কোথায়, ভাল করে তো সন্ধেও হয়নি এখন—গিয়ে হয়তো পাবে না, কি হয়তো দেখবে আড্ডা দিচ্ছেন বন্ধুদের নিয়ে। কিন্তু যদি থাকেন, যদি ধর, একলাই বসে থাকেন ঘরের মধ্যে? আবার খোঁচা লাগল প্রশ্নের। এত প্রশ্ন কখনো ছিল না স্বাতীর মনে, এত কাঁটা ছিল না মনে-মনে ভাবায়। অবোধ ছিল সে। কে কেড়ে নিল তার স্বাধীনতা! সহজ ছিল, কে তাকে নিয়ে এল এই আঁকাবাঁকায়! এপ্রিলের রেশমি-সন্ধ্যা মখমলের রাত হল আস্তে আস্তে। আর স্বাতীর মনও সেই অনুপাতেই ভারি হয়ে উঠল।

*

এর দু-এক দিন পরে সত্যেন রায়ই এলেন। স্বাতী ঘরে এসে দাঁড়াতেই বললেন—কেমন আছ, স্বাতী? এর মধ্যে যে কদিনই দেখা হয়েছে, প্রথম কথাই এই—কেমন আছ, স্বাতী? আর স্বাতীও ঠিক-ঠিক জবাব দিয়েছে—ভাল আছি। কিন্তু আজ আর না বলে পারল না—রোজই এ কথা জিজ্ঞেস করেন কেন?

রোজ? রোজ দেখা হয় নাকি তোমার সঙ্গে?

স্বাতী জবাব দিল—আপনার ইচ্ছে!

তাছাড়া, এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে স্বাতীর কথাটাকে টপকে পার হলেন সত্যেন রায়—

আমি সত্যি জানতে চাই তুমি কেমন আছ?

তা বুঝি এক কথায় বলা যায়?

অনেক কথাতেই বলো।

অত কথা শোনবার সময় হবে না আপনার।

এতই কথা?

স্বাতী জবাব দিল না।

শুনি না!

স্বাতী একটু পরে বলল—এবার যাচ্ছেন না কোথাও ছুটিতে?

যাচ্ছি।

যাচ্ছেন! বলেই লজ্জা পেল স্বাতী কেননা তার নিজের কানেই ধরা পড়ল যে সে উল্টো উত্তরটা আশা করেছিল।

কেন, যেতে নেই? একটু-যেন ঠাট্টার সুর সত্যেন রায়ের কথায়। যেন ছুটিতে বাইরে যাওয়ার পরামর্শ চাচ্ছেন স্বাতীর কাছে। আর স্বাতী যদি 'না' বলে তাহলেই তিনি আর নড়েন না।

মনে-মনে স্বাতীর কেমন মাথা নিচু হল, গলা বুজে এল, কিন্তু সেই সঙ্গে তার আঠারো বছর তাকে ঠেলে এগিয়ে দিল সাহসের সীমান্তে। যেন ঠাট্টার উত্তরে ঠাট্টা করেই বলে ফেলল—

ছুটি হলেই বাইরে বুঝি যেতেই হবে?

যেতে হবে না এমন কোনো কারণ কি আমার আছে? সত্যেন রায়ও প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করলেন,

কিন্তু প্রথমটা স্বাতীকে নিশ্চয়ই নয়, যেন নিজেকেই, যেন জানালার পরদা-ফাঁকে দেখা চিলতে-
রোদুটুর কাছে জেনে নিচ্ছেন নিজের অদৃষ্ট। তখন চোখ সরে এল, চোখ পড়ল স্বাতীর
চোখে, যেন একটা দম-আটকানো মিনিটকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে খুব ভালমানুষের মতো
বললেন—তুমিও তো কোথাও ঘুরে এলে পার একবার।

আমি আর কোথায় যাব, স্বাতীও স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল।

কেন, তোমার বড়দির কাছে— সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিলেন সত্যেন রায়।

বড়দি আপনাকে একবার যেতে বলেছিলেন।

তোমাকে বলেননি?

আমাকেই তো বলে গিয়েছেন আপনাকে বলতে।

তোমাকে যেতে বলেননি?

আমাকে আবার আলাদা করে বলতে হবে নাকি? স্বাতী হাসল।

তাহলে—

বাবার তো ছুটি নেই, তাই—

নিতে পারেন না ছুটি?

কী জানি!

তোমার বড়দি তো আসতে পারেন আবার?

তঁারও আসা কি সোজা! আপনার মতো স্বাধীন তো নয় সবাই।

স্বাধীন মানে?

স্বাধীন মানে স্বাধীন।

স্বাধীন হওয়া খুব ভাল বুঝি? মনে-মনে নিজের স্বাধীনতা উপভোগ করে সত্যেন বলল।
আমি কী করে বলব! সত্যেন রায় আবার তাকালেন জানলা-ফাঁকের চিলতে-রোদের দিকে,
আর সেদিকে চোখ রেখেই উঠে পড়লেন। খাপছাড়া লাগল, বড্ডো হঠাৎ মনে হল উঠে-
পড়াটা। যাচ্ছেন? এখনই যাবেন? একটু বসুন না?—কোনটা বললে ভাল হয়, কী রকম করে
বলল ভাল শোনায়, না কিছু না বলাই ভাল—এই দুর্ভাবনার হাত থেকে স্বাতীকে উদ্ধার করলেন
আপিশ-ফেরৎ রাজেনবাবু তারি পায়ে ঘরে ঢুকে। সত্যেনকে দেখে তাঁর ক্রান্ত মুখে হাসি ফুটল—
এই যে, কতক্ষণ? স্বাতী বলল—উনি এইমাত্রই এলেন, এইমাত্রই চলে যাচ্ছেন।

কেন? একটু বোসো—আমি আসছি।

একটু বসছেন তাহলে? বাবা ভিতরে যাবার পর স্বাতী বলল। এত সহজে রাজি হওয়াটা ভাল
লাগল না তার। একটু পরে আবার বলল—আজ আপনার মতমন তাড়া নেই মনে হচ্ছে?
কীসের তাড়া?

বলুন তো কীসের?

আমি কি তাড়াছড়ো করি সব সময়?

সব সময়ের কথা জানি না।

তবে?

আমি যতটুকু দেখি, তা-ই তো দেখি।...যা-ই হোক, অন্তত বাবার কথাটা যে রাখলেন—

কথা রাখতে খুব ভাল লাগে আমার।

সকলের কথাই?

কারো-কারো কথা।

কার-কার?

তোমার বাবার কথা তো নিশ্চয়ই। স্বাতী একটু চুপ করে থাকল; তারপর বলল—তাহলে মুখের কথাই আপনার কাছে কথা?

ঠিক মুখের কথাই নয়।

কিন্তু মুখ ফুটে না-বললেও তো হয় না।

সেটাই তো ভাল।

সেটাই সাধারণ।

তুমি বুঝি সাধারণ ভালবাস না?

আপনি কি বাসেন?

সাধারণ হতে বেশ ভাল লাগে।— স্বাতী আবার একটু ভাবল—আমার মনে হয়—। একটু অপেক্ষা করে সত্যেন রায় বললেন—কী মনে হয় তোমার? স্বাতী অন্য দিকে তাকিয়ে বলল—
আমি চা নিয়ে আসি, বাবা?

ধুতি-গেঞ্জি-পরা রাজেনবাবুকে দেখে সত্যেনের মুখের ভাবটা যেন সহজ হল, যেন আরো আরাম করে বসল চেয়ারে। রাজেনবাবু বললেন—কেমন আছ? ভাল? সত্যেন জবাব দিল মৃদু হেসে।

কোনো...কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?

অসুবিধে? কেন?

খোঁজখবর নিতে পারিনি অনেকদিন। তা—ভাল আছ বেশ?

ভাল আছি। দুজন দূর-বয়সী লাজুক মানুষের কথাবার্তা এখানেই থেকে গেল। এর পরে দুজনে বসে রইল দুদিকে তাকিয়ে, যতক্ষণ না চা এল, আর চা শেষ করেই রাজেনবাবু পালালেন। প্রায় সন্ধ্যা ততক্ষণে, কিন্তু রাত নামতে দেরি তখনো, বৈশাখের সবচেয়ে সুখের সময়টি শহর ভরে ছড়িয়ে পড়ছে।

সত্যেন রায় বললেন—বল, স্বাতী, কী মনে হয় তোমার? চায়ের বাসনগুলি ট্রের উপর সাজিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল স্বাতী। তার পিছনের নীল রঙের পরদায় আর ঘরের আবহা আলোয় তাকে অসাধারণ ফর্সা লাগল সত্যেনের চোখে। অনেকটা লম্বাও, আর কায়দার চেয়ে বড়ো।
কী, বলো।

কী?

কী মনে হয় তোমার, বল।

কী আবার মনে হয়।

কী বলতে-বলতে থেমে গেলে তখন—

নাকি?

স্বাতী দেখল, সত্যেন রায় মুখে হাত বুলোলেন একবার। রুমাল বের করলেন পকেট থেকে, কিন্তু রুমালের কোনো ব্যবহার না করে আবার ফিরিয়ে রাখলেন। তারপর আস্তে আস্তে উঠলেন, দু-পা কাছে এসে আস্তে বললেন—স্বাতী, চলি। স্বাতী সঙ্গে-সঙ্গে এল দরজা পর্যন্ত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল সত্যেন রায় সিঁড়ি তিনটে নামলেন, ছোট্টো জমিটুকু আস্তে পার হলেন, ঘুরে দাঁড়িয়ে নিচু ফটকটায় হড়কো লাগালেন, তারপর হাঁটতে লাগলেন তাড়াতাড়ি, মিলিয়ে

গেলেন মোড় নিয়ে। আর সেই সন্ধ্যার ছায়া আনন্দ হয়ে নামল স্বাতীর মনে। বৈশাখের সমস্ত হাওয়া আনন্দ হয়ে তার বুকের মধ্যে বয়ে গেল।

* * * *

চিঠি এল কদিন পরে সিলেট থেকে। ছোট্টো চিঠি—উঠেছি এক বন্ধুর বাড়িতে...সুন্দর শহর... কিন্তু এ শুধু খিদে-জাগানো শুক্কো, ভোজ আরম্ভ হবে যখন রওনা হব শিলং।— পড়তে-পড়তেই জবাব জন্মান মনে, কিন্তু লিখবে কী করে, চিঠি আর চিঠির খাম উল্টে-পাল্টে ঠিকানা মিলল না কোথাও। ফোঁশ করে উঠলো রাগ, কিন্তু তক্ষুনি তাকে পোষ মানাল—রাগ কার উপর? —মানে, রাগ জানাতে না পারলে রাগ করে লাভ? আবার যখন চিঠি এল তিন দিন পরে, খাম দেখেই স্বাতী বলল—না, লিখব না। কিন্তু মুখ গম্ভীর করে, এমনকি খামটা দু-তিন মিনিট না খুলে ফেলে রেখেও, নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারল না যে চিঠি না পেলেও ক্রমাগত লিখতেই থাকবেন সত্যেন রায়। আর খাম খুলে পড়বার আগেই শুধু কৌকড়া কালো হাতের লেখায় ভরা চওড়া কাগজটা চোখে দেখেই তার এত ভাল লাগল যে প্রথম বারে সব কথা পড়াই হল না। শুধু এটুকু বুঝল যে শিলং পৌঁছেছেন, আর সিলেট থেকে শিলঙের রাস্তায় দৃশ্য দেখতে-দেখতে দম বন্ধ হয়।...চিঠি রেখে দিয়ে ঘুরিয়ে পরে নিল শাড়ি, খামকা খানিকটা ঘুরে এল বাইরে। রাস্তায় দেখা কলেজ-বন্ধু চিত্রার সঙ্গে, তত বোকা আর লাগল না—বেশ ভালই তো! ফিরে এসে আবার পড়ল, বিকেলে আরো একবার, আর যতক্ষণ পড়ল না, ততক্ষণ চিঠির কথাই ভাবল, আবার যখনই নিজের কাছে তা ধরা পড়ল তখনই ধমক দিল নিজেকে। অন্য-কোনো ভাবনাকে ধাওয়া করল—বড়দি, হারীতদা, কদিন পরে বি এ ক্লাসে ভরতি হওয়া—কিন্তু মন পেছিয়ে পড়ল একটু পরেই, ফিরে এল ঠিক সেখানেই আর তারপর যেন হাসি পেল এই খেলায়, মেনে নিল মনের বায়না। যেমন প্রথমে বিরক্ত হলেও খানিক পরে আমাদের ভালই লাগে দুটু কোনো মিষ্টি ছেলের আবদার।...রাত জেগে-জেগে জবাব লিখল, আবার চিঠি, আবার জবাব। লম্বা জ্বলজ্বলে গ্রীষ্মের গুনগুন-দিনগুলির অনেকখানি ভরে গেল চিঠি পাওয়ায় আর চিঠি লেখায় আর চিঠি ভাবায়।

সে দিন দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। জেগে উঠে দ্যাখে ঘড়িতে চারটে; তবু দুপুর, দুপুর, মস্ত দিন রাজার মতো জুড়ে আছে, উজাড় করে দিয়েও ফুরোয় না। একা বাড়িতে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরল একটু, জানলা-বন্ধ বসবার ঘরটায় তাত যেন হাতে ছোঁয়া যায়—স্বাতী পাখা খুলতে গিয়ে সরে এল, খুলে দিল সামনের দরজা, সঙ্গে-সঙ্গে হেঁ-হেঁ হাওয়া পরদা উড়িয়ে ঝলসে দিল চোখ-মুখ—ভাল লাগল, ভাল লাগল ঝাঁ-ঝাঁ রোদ, ঝাপসা ধুলো, কাঁকরের চরকি, ভাজা-ভাজা সিঁড়ির আঙুন-গরমে পা কঁকড়ে গেল, তবু চেপে ধরল ইচ্ছে করে, জোর করে—পা থেকে মেরুদণ্ডে, মেরুদণ্ড থেকে মগজে তাপের পিন ফুটল ঝিমঝিম—সেটাও ভাল লাগল। বাইরের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে পা সরাল, ফিরল ঘরের দিকে, ফিরতেই চোখ ঠেকল বি-জন কোম্পানির চিঠি-বাক্সটায়, চোখে পড়ল কাচের খোপে চিঠি, রোদ-রঙের সাদা একটি খাম স্বাতীর নাম দেখিয়ে শুয়ে আছে নিশ্চিন্তে। দাদার আজকাল নতুন এক ফ্যাশন হয়েছে, চিঠি-বাক্সে তালা, সুটকেসে তালা, এমনকি বেরিয়ে যায় ঘরে তালা দিয়ে চাবি পকেটে নিয়ে।...উপায়? কিছু উপায় নেই, চূপ করে বসে থাকতে হবে যতক্ষণ না দাদা দয়া করে বাড়ি ফেরে, হোক সন্ধ্যাবেলায় কি রাত দুপুরে, কি কাল সকালে। সাদার উপর কালোতে ঝাঁকা খামটিকে অনেকক্ষণ ধরে দেখল স্বাতী। একবার এদিক থেকে, একবার ওদিক থেকে—

কিন্তু মিছিমিছি রোদে পুড়ে কী হবে, চিঠি কি পাখি যে উড়ে আসবে, আর পাখি হলেও কি ঐ খাঁচা থেকে বেরোতে পারতো?...ঘরে এসে জানালাগুলি খুলে দিল, বসল চুপ করে, বসে-বসে শুনল দূরে রাস্তায় জল-দেবার শব্দ, দূর থেকে আস্তে-আস্তে কাছে আর তারপর—কতক্ষণ পর সে ঠিক বুঝল না—দাদাকে ঘরে ঢুকতে দেখে, সব দিনের চাইতে অনেক আগে বাড়ি ফিরতে দেখে, সে একটুও অবাক হল না। বরং তার মনে হল, সে-ই দাদাকে ধরে এনেছে তার ইচ্ছার অসীম লম্বা দড়ি দিয়ে টেনে।

কী রে? উশকো-খুশকো হয়ে বসে আছিস এখানে?

স্বাতী বলল—চিঠির বাস্তবের চাবিটা দে। বিজন চাবি দিল না, বাস্তব খুলে চিঠি নিয়ে এল। স্বাতীর হাতে দেবার আগে একটু তাকিয়ে বলল—কে লিখেছে রে? যেন প্রশ্ন করার কারণ দেখিয়ে আবার বলল—বেশ ভারি। চিঠি হাতে নিয়ে স্বাতী বলল—সত্যেন রায় লিখেছেন। ও! তোর সেই বাচ্চা-প্রোফেসর! চাকরি গেছে বুঝি?

মানে?

তবে-যে কলকাতার বাইরে!

গ্রীষ্মের ছুটি না এখন? শিলং গেছেন বেড়াতে— স্বাতীকে বোঝাতে হল।

ও, ছুটি! বিজন ঠোঁট বাঁকাল। ওসব ছুটি-ফুটির কথা মনেই থাকে না আমাদের! তা এই কলেজের মাস্টাররা আছে মন্দ না—মাইনেতে ছুকা হলেও ছুটিতে টেকা। যদিও এত ছুটি কী করে কটায় আমি সত্যি-বলতে ভাবতেই পারি না।

কী করেই বা পারবি—দাদাকে যেন সান্ত্বনা দিয়ে স্বাতী চলে এল তার ঘরে। খানিক পরে বিজনও এল—হল চিঠি পড়া? বোনের সঙ্গে আলাপ জুড়ল ঠোঁটে একটু হাসি টেনে। চিঠিটা খামে ভরে রেখে স্বাতী বলল—বাড়ির চিঠিও তোর কোম্পানির বাস্তব দিয়ে যায়—চাবিটা আমার কাছে রাখিস। পিয়নকে বলে দিলেই হয়।

তা বলে দেব, তবু চাবিটা আমার কাছেই থাকা ভাল— স্বাতী চোখ তুলল দাদার দিকে। বিজন পাতলুনের পকেট থেকে চাবির রিং বের করল, উঁচু করে চোখের সামনে ধরে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখল একটু, দু-আঙুলে টিপে-টিপে একটা ছোট্টো চাবি খুলে নিয়ে—ডুপ্লিকেটটা রাখ তবু— বলে এমনভাবে স্বাতীর হাতে দিল যেন বোনের মন যোগাতে গিয়ে নিজের একটা মহামূল্য সম্পত্তি হাতছাড়া করল। তারপর, এদিক-ওদিক তাকিয়ে, যেন বেছে-বেছে ভেবেচিন্তেই বসল কুশন-আঁটা বেতের চেয়ারটিতে। পিঠ এলিয়ে, সিগারেট ধরিয়ে, জ্যাকসি ধরনে বলল—মজুমদারকে একদিন চা-এ বলব ভাবছি। স্বাতী কথা বললো না সিগারেটের মাথার ছোট্টো ছাইটুকুতে চোখ রেখে বিজন আবার বলল—বিজনেসে যদি ঝুঁকিয়ে যাই তো মজুমদারেরই জন্ম। ওকে মাঝে-মাঝে খাওয়ানো-টাওয়ানো উচিত।

বেশ তো। হোটেল নেমস্ত্র কর।

হোটেল? ওঃ, হোটেল পচে গেছে! আর তাছাড়া— বিজন একটু থামল, যেন ভাবল—তাছাড়া বাড়িতে বললে খুশি হয়।

কে খুশি হয়?

কে আবার! আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছিস না ভুই?

তা—বাবাকে বলিস, বাবা যদি মত করেন—

হোঃ! এর জন্য আবার বাবাকে বলতে হবে?

উচিত তো।

উচিত কেন? আমার একজন বন্ধুকে খাওয়াতে পারি না ইচ্ছে করলে?

বন্ধু! স্বাতী হেসে ফেলল।

হাসলি যে?

ঐ চল্লিশ বছরের টেকিটা তোর বন্ধু!

চল্লিশ? এবার হাসল বিজন।—চল্লিশ কী রে, এই... তিরিশ-বত্রিশ হবে। চমৎকার মানুষ, আর পয়সাও করেছে খুব।

সেজন্যই চমৎকার?

তা যা-ই বলিস, বিজন কবুল করল—পয়সা করতে হলে মাথা চাই, আঠা চাই কাজে। কিছু ছিল না মজুমদারের, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়েছে। একেবারে সেলফ-মেইড ম্যান! বিয়ে করেনি, বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই, দিনরাত কাজ, কাজ, আর কাজ! বন্ধুগৌরবে প্রদীপ্ত হল বিজন।

বাঃ! তাহলে ইনিই তোর আদর্শ পুরুষ এখন?

মন্দ আদর্শটা?

তুই-ই জানিস।

আমার জন্য কেন-যে মজুমদার এত করে তা ভেবেই পাই না—বিজন যেন আপনমনেই কথাটা বলল। ওর কাছে কত লোক এসে ধন্য দেয় রোজ, কিন্তু আমাকে বলতেও হয়নি কিছু, শুধু দেখেই—

দেখেই লোক চিনেছে—দাদার কথা শেষ করল স্বাতী।

তা-ই বোধহয়—বিজন আড়মোড়া ভেঙে উদাসভাবে উঠে দাঁড়াল। বোনের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল—তুই এত শ্যাবি থাকিস কেন রে?

আজ বড্ডো ইংরিজি বলছিস, দাদা!

এ আর কী, যা ইংরিজি বলে বিজনেস সার্কল-এ—Blast your bile ! Oh my left foot!— শুনেছিস কখনো? ঘরে বসে-বসে বই গিললে কী আর...তা এরকম বিচ্ছিরি থাকিস কেন বল তো? ভাল শাড়ি-টাড়ি নেই?

ও মা! স্বাতী তার আঁচলের বাড়তি অংশটা দু-হাতে টান করে সামনে ধরল। এ শাড়িটা নাকি মন্দ! কী সুন্দর ধনেখালি শাড়ি। একটু ময়লা হয়েছে, তা একটু-ময়লাই তো পরে আরাম। রটন! যা সব বস্ত্রে-প্রিন্ট উঠেছে আজকাল— আরো কী বলতে গিয়ে হঠাৎ যেন থেমে গেল বিজন। পাতলুনের পকেটে হাত দিয়ে চাবি আর খুচরোয় ঝিনঝিন আওয়াজ করে বলল— তাহলে শনিবার বলব মজুমদারকে—খাবার-টাবার কিছু তিরী রাখিস।

আমি পারব না।

কেন? পারবি না কেন?

কেন আবার কী—পারব না জেনে রাখ।

বিজন চোখ সুরু করে একটু তাকিয়ে রইল বোনের দিকে। যেন মনস্থির করতে পারছে না, এরপর কী বলবে। তার চোখের চকচকানির দিকে তাকিয়ে স্বাতীর মনে লাফিয়ে উঠল বাবার কথাটা। ফশ করে বলে ফেলল—তোর ব্যবসার দলবল বাড়িতে আনিস কেন?

ও, এই কথা! এতক্ষণের চেপে-রাখা রাগ এবার ফেটে পড়ল। —এই কথা!

বাবা পছন্দ করেন না, জানিস? ও-সব বাজে লোক—

বাজে! বিজন এক লাফে এগিয়ে এল কাছে। স্বাতীর মুখের সামনে হাতের মুঠি নেড়ে-নেড়ে বলতে লাগল—এত আত্মপক্ষা তোর! এত অসভ্য হয়েছিস তুই! তা বাপ যে রকম, মেয়ে তো সেইরকমই হবে—!

ছেলে সেরকম হলে তো বাঁচা যেত— বিজনের তোড়ের মধ্যেই বলে উঠল স্বাতী।

হ্যাঁ, পুরুষরা সব ভেড়া বনলে তাদের খুব সুবিধে, না?

যত খুশি তুই চ্যাঁচাতে পারিস, কিন্তু তোর ও-সব আড্ডা চলবে না বাড়িতে।

চলবে না? কার কথায় চলবে না, শুনি?

যার বাড়ি তার কথায়।

বাড়ি কি তোমার?

তোমারও নয়।

নিশ্চয়ই আমার।

ঈশ!

শোন, স্বাতী, তোর সঙ্গে আর তর্ক করব না, শুনে রাখ এ বাড়ি আমার। এখানে আমি যা ইচ্ছে তাই করব, পছন্দ না হয় আমাকে বলুক না এসে রাজেন মিস্ত্রি, তোর কাছে গুজগুজ করে কেন?

করে এইজন্য যে তুই একটা ষাঁড়, আর তোর সঙ্গে কোনও ভদ্রলোক কথা বলতে পারে না। ভদ্রমহিলা তো খুব পারে!

পারতেই হয়। আমি যদি বাবার দিকে না দেখি, তাহলে তুই তো বাড়ি থেকে তাড়াবি বাবাকে! চূপ! বিজন সত্যিই ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাল এবার—আর একটা কথা বলবি তো তোকে তাড়াব বাড়ি থেকে—এই এমনি করে—ঘাড়ে ধরে। হাতের আঙুলগুলিকে সাপের ফনার মতো ছড়িয়ে স্বাতীর ঘাড়ের কাছে নিয়ে এল—এমনি করে, বুঝলি? ঘাড় ধরে রাস্তায় বের করে দেব—হাঁ করে তাকিয়ে দেখবে রাজেন মিস্ত্রি। আমার বন্ধুদের নিয়ে এত তাঁর জ্বলুনি, আর হস্তদণ্ড হয়ে পঞ্চাশবার নেমস্তম্ভ করতে ছোটেন তোর ঐ মিনমিনে মেয়েলি মিরকুটে সত্যের স্বাক্ষরকে! ছাইয়ের মতো হল স্বাতীর মুখ, তারপর গনগনে কয়লার উনুনের মতো হল। কথা বলতে গিয়ে বেধে গেল গলায়, বড়ো-বড়ো চোখে তাকিয়ে দেখল, দাদার মুখটা বদমাগি বেড়ালের মতো হয়ে গেছে, আর...একটু পরে বিজন যখন আবার কথা বলল, তখন তার গলার আওয়াজটাও শোনা গেল ফ্যাশফেশে, ছেঁড়া-ছেঁড়া, বেড়াল-মতো—বাকি একটা হাবা, কিন্তু আমি তোমার অসভ্যতা টিট করে ছাড়ব! বিজনের লিকলিকে আঙুলটা স্বাতীর নাকের একেবারে কাছে এসে কৈপে-কৈপে সরে গেল, স্বাতীও পিছনে সরল একটু, আরো একটু, কিন্তু চোখ সরাল না দাদার মুখ থেকে। আর বিজন দাঁতে দাঁত ঘষে বলতে লাগল—টিট করে ছাড়ব!—শুধু তোকে না—ঐ পুঁচকে প্রোফেসরটাকেও। চিঠি লেখার আর লোক পান না! রাঙ্কেল! আসুক এবার, মেরে তাড়াব এই পাড়া থেকে। সরতে-সরতে স্বাতী দাঁড়িয়েছিল তার পড়ার টেবিলে ঠেস দিয়ে। চোখের কোণ দুটি লাল, চোখের তলায় একটি শিরা উঁচু, একটু-খোলা ঠোঁটে আর একটু-খোলা নাকে নিশ্বাস নিচ্ছে জোরে-জোরে। বিজনের কথা শেষ হবার পরেও চূপ করেই থাকল, কিন্তু বিজন আবার যেই মুখ খুলল আরো কিছু বলবে বলে, তখনই লম্বা সাদা হাতে ছুঁড়ে মারল ঠিক তার মুখের উপর শব্দ একটা মোটা বই। শব্দ হল বেশ জোরেই, আর বইটা

যখন পাতা-খোলা কাৎ হয়ে মেঝের উপর পড়ে গেল, তখন স্বাতী বলল—বেরো! বিজন ডান হাতটি একবার গোল করে ঘুরিয়ে আনুল মুখের উপর, চুল উল্টিয়ে দিল বাঁ হাতে। বইটার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে জুতো-পরা পায়ের এক লাথিতে পাঠিয়ে দিল একেবারে ঘরের বাইরে। তারপর বুক টান করে উঁচু মাথায় বেরিয়ে গেল নিজে। যাবার সময় বলে গেল—
তোরও একদিন ঐ-দশা হবে।

৪

কী দশা হবে? ঐ বইয়ের মতো? কিন্তু ও-বই তো বিশ্বজয়ী। ঘর ছাড়িয়ে, বারান্দা পেরিয়ে, উঠানের সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপে আটকে গেছে কীটসের কবিতা। মলাটের দুই ডানা ছড়িয়ে, মুখ খুবড়ে, শিকার-করা পাখির মতো; বিকেলের বাঁকা রোদুরে চিকচিক করছে কবির নাম, সোনালি অক্ষর... সোনালি স্বাক্ষর। স্বাতী তুলে নিল তাকে, কোলে তুলে আঁচলে মুছল, মলাট খুলে একবার দেখল যেখানটায় সত্যেন রায়ের নাম লেখা, তারপর কান-দুমড়োনো পাতা-কটিতে আঙুলের চাপ দিতে-দিতে ভাবল যে কখনোই, কোনো কারণেই এতখানি রাগা উচিত না, যাতে কোনো বই ছুঁতে গিয়ে লেখকের নাম চোখে পড়ে হাত থেমে না যায়।...দাদাটা একটা চাঁড়াল। তবু ভাগ্যিশ বাবা বাড়ি ছিলেন না, জানবেনও না কিছু! পাছে বাবা এক্ষুনি এসে পড়েন, এসে তাকে দেখেই জিপ্সেস করেন—কী রে? কী হয়েছে? আর সেও ঝোঁকের মুখে সব বলে ফ্যালে, স্বাতী তাড়াতাড়ি তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢুকল, স্নানের জলে ধুয়ে ফেলবার চেষ্টা করল সব ঝাল, ঝাঁঝ, জ্বালা। নিজেকে দোষ দিল বার বার, দাদার পক্ষ নিয়ে অনেক কথা বলল মনে-মনে। সে-সব কথায় বাঁধুনি এত সুন্দর, যুক্তি এত নিখুঁত যে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে তার নিজেরই বিশ্বাস জন্মাল তাতে। সে দেখতে পেল যে দাদার উপর একটা অন্যায় আছে এই বাড়ির, অবহেলার অন্যায়। ছেলেবেলা থেকে সকলের অবহেলার চিমটি খেয়ে-খেয়ে দাদা এইরকম খ্যাপা-মতো হয়ে গেছে। এখন উঠে-পড়ে লেগেছে টাকায় টেক্কা দিতে—বেচার! স্বাতী দেখল—সাপের মতো লিকলিকে আঙুল আর দেখল না—কোঁড়াল-মতো দাঁতে-নখে ছিঁড়ে-খাওয়া রগ-ফাটা রাগ আর দেখল না—দেখল, দাদা হাত পেতেছে তার কাছে। বাড়িতে আর-কারো কাছে, বোধহয় বাইরেও কারো কাছে যে-পাশ্চাত্য সে পায় না, তারই জন্য হাত পেতেছে বাড়ির সেই একমাত্র মানুষের কাছে, যে তার বয়সে আর সম্পর্কে-ছোটো। গায়ে-পড়ে যেমন ঝগড়া করে, গায়ে-পড়ে কথাও বলে—এই আবার; নানা ছুতোয় এই কথাই যেন বলতে চায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে—আমাকে মানো, দাদা বলে না হোক, মানুষ বলে মানো, বয়স্ক বলে, ভদ্রলোক বলে, পুরুষ বলে মানো।

স্বাতীর অনুশোচনা হল। সত্যি-তো, দাদার উপর তারও তচ্ছিল্যের শেষ নেই, যখন-তখন যাচ্ছেতাই বলে, কোনো কথায় আমলেই আনে না ওকে। হয়তো সে যদি ওর সঙ্গে আড়ে চলতে পারত; যদি, ধরো সে বড়দির মতো হত, ঐ রকম ঠাণ্ডানরম ঝিরিঝিরি, তাহলে দাদা হয়তো ভালই হত—মানে সুখী হত, আর বাবাও সুখী হতেন তাতে, বাড়িতে এই অশান্তিটাই থাকত না। দাদার সুখী হওয়ার—মানে, ভাল হওয়ার দায়িত্ব ছিল তারই উপর—হয়তো এখনো আছে, হয়তো সময় আছে এখনো। কথাটা ভেবে, নিজেকে হঠাৎ এ রকম একটা বড়ো পার্টে জুলজুলে দেখে স্বাতী অবাক হল, মনে-মনে একটু রোমাঞ্চিতও। বাথরুম থেকে বেরোবার আগেই, ফোঁটা ফোঁটা জল গায়ের ওপর চিকচিক থাকতে-থাকতেই প্রতিজ্ঞা করল যে এবার,

জীবনে এই প্রথমবার দাদার কাছে সে হার মানবে। প্রতিজ্ঞা করল, কিন্তু স্নান করে বেরিয়ে, পাট-ভাঙা ফিকে নীল শাড়ি পরে, পাউডার-কৌটো খুলে নিশ্বাস নিতে-নিতে, তবু যেন ঝগড়ার দুর্গন্ধ তার নাক থেকে গেল না, বচসার বিশ্বাদ মুখে লেগে রইল। কিন্তু এই ভাল-না-লাগাকে আমল দিলে চলবে না, নিজে কষ্ট করেও দাদাকে ভাল করতে হবে—মুখে পাউডার দিতে-দিতে স্বাতী তার বড়ো পাটের জন্য তৈরি হল।

বারান্দায় পাটি পেতে বসে বিকেলের চা খেতে-খেতে স্বাতী বাবার কাছে কথাটা পাড়ল। বাবা বললেন—বেশ। স্বাতী হেসে বলল—কাউকে খাওয়ানো হবে, এর চাইতে সুখের কথা তোমার কাছে আর কী, আমি কিন্তু ভাবছিলাম এসব ব্যবসার বন্ধুদের— কথা শেষ না-করে বাবার মুখের দিকে তাকাল। তা হোক, বিজুর যখন ইচ্ছে হয়েছে— বাবা এত সহজে বললেন যে স্বাতীর মনে হলো বাবার পক্ষ নিয়ে দাদার সঙ্গে তার লড়াইটা বড্ডো বেশি হয়ে যায়নি তো? চোখ নামিয়ে বলল—দাদাকে আমি বলেছিলাম বাবা।

কী?

এই-যে... বাড়িতে ওসব লোকের যাওয়া-আসা পছন্দ কর না তুমি—

আমার পছন্দ-অপছন্দে ভারি-তো এসে যায় বিজনচন্দ্রের!

না বাবা, স্বাতী গম্ভীর হল—আমি ও-কথা বলাতে দাদা কেমন কিন্তু-কিন্তু হয়ে গেল। মাথা চুলকে বলল—তাহলে থাক। আমি তখন বললাম—আচ্ছা বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখি। ব্যাপার কী? রাজেনবাবু হাসলেন—হঠাৎ সুপুত্র! কী চায়? বাবার কথার সুরে আবার স্বাতীর খটকা লাগল। তবে কি সে ভুল বুঝেছে, ভুল ভেবেছে? দাদাকে শাসন করতে গিয়ে যেমন বেশি-বেশি করেছিল তখন, তার এখনকার ভালমানুষিটাও তেমনি ছেলেমানুষি?...কিন্তু এখন তো আর পেছোনো যাবে না, দাদার কাছে ভাল হতেই হবে, দাদা তাতে ভাল হোক আর না-ই হোক।

পরের দিন সকাল নটা পর্যন্ত দাদাকে দেখতে না-পেয়ে স্বাতীই অগত্যা পা বাড়াল তার ঘরের দিকে। দরজার কাছে আসতেই শুনল ভিতর থেকে ঠুকঠুক শব্দ। আর ভিতরে তাকিয়ে দেখল, দাদা টাইপ করছে বসে-বসে। আর সেই টাইপ করার সাংঘাতিক চেষ্টায় তার চোখ গোল হয়েছে, ঠোঁট বেঁকে আছে, আর তিনটে মোটা-মোটা লাইন স্পষ্ট ফুটেছে কপালে। স্বাতীর হাসি পেল, কিন্তু না, হাসবে না তো! মুখে মন-খারাপের হালকা ছায়া এনে ডাকল—দাদা!

বিজন চোখ তুলল লাল-কালো ফিতে পর্যন্ত, তক্ষুনি নামালো চার্জিত। স্বাতী আবার ডাকল, আরো নরম করে—দাদা, শোন! এবার চোখ না-তুলে বিজন চোখটা গলায় জবাব দিল—কী? স্বাতী এগিয়ে এল ঘরের মধ্যে। একটু দাঁড়িয়ে থেকে আঙ্গুড়ি আঙুলের অসহায় আঁকুপাঁকু লক্ষ করল, তারপর পাখির মতো গলায় বলে উঠল—কী সুন্দর ছোট্টো টাইপরাইটার! বিজন হাত সরিয়ে তার নতুন সম্পত্তির দিকে তাকাল—ঈশৎ গর্বিতভাবেই।

কিনলি?

হ্যাঁ।

তা নিজেই টাইপ করিস—কত সময় নষ্ট হয়!

বিজনের চোখ কোণাকুণি একবার ঝলসাল বোনের উপর—দু-দিনেই অভ্যেস হয়ে যাবে, বলেই ভুরু কঁচকে ঝকঝকে কালো-সাদার সারির মধ্যে ‘S’ অক্ষরটা খুঁজতে লাগল। তা নিশ্চয় হবে—

স্বাতী আস্তে-আস্তে বলল—কিন্তু এ-সবের জন্য তো কেরানি থাকে মানুষের।

এ কথায় বিজ্ঞান খুশি না-হয়ে পারল না, মানে, খুশি না-দেখিয়ে পারল না। কেননা খুশি হয়েছিল সে আগেই, হয়ে ছিল আগে থেকেই। স্বাতীর ক্ষমা-চাওয়া-চাওয়া মন-মরা চেহারার চাইতে বেশি খুশি তাকে করতে পারে, এমন কিছুই পৃথিবীতে ছিল না আজ সকালে। চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে আলগোছে বলল—আমারও থাকবে। স্বাতী একটু চুপ করে থেকে বলল—আমি পারি মাঝে-মাঝে তোর চিঠিপত্র টাইপ করে দিতে।...দেখে এক্ষুনি ইচ্ছে করছে রে।

করবি? বিজ্ঞান খুবই চেষ্টা করল মনের গলে-যাওয়া ভাবটা মুখে না ফোটাতে, কিন্তু বৃথা! এক-পা এগিয়ে, এক-পা পেছিয়ে স্বাতী বলল—না—থাক—ভুল হবে।

ভুল তো আমারও হয়!—বিজ্ঞান আর পারল না, হেসে ফেলল—এই দ্যাখ না, 'এসটাকে খুঁজতে-খুঁজতে চোখের ডিম বেরিয়ে এল। স্বাতী হাসিতে যোগ না-দিয়ে বলল—অভ্যাস হয়ে যাবে।

এই প্রথম স্বাতীর মুখে বিজ্ঞান তার নিজের মুখের কোনো কথার পুনরুক্তি শুনল, যাতে ঠাট্টা কি অবিশ্বাস নেই, উড়িয়ে দেওয়া কি এড়িয়ে যাওয়াও না। এক ঠেলায় চেয়ার সরিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণে পুরোপুরি, মুখোমুখি চোখ বোনের মুখে ফেলে বলল—এখনই একটু করে দ্যাখ না।

নাঃ! দুপুরবেলা যদি রেখে যাস আমার কাছে, একটু-একটু প্র্যাকটিস করে রাখব।—হঠাৎ থেমে, টাইপরাইটারের গোল-করা ধারটিতে আঙুল রেখে বলল—কবে কিন্নি রে? বলিসনি তো কিছু।

এ আর বলব কী। গালের মধ্যে জিভটাকে একবার ঘুরিয়ে এনে বলল—আমি কিনিনি, অন্য একজনের।

মতুন তো!

মতুনই তো। যে কিনেছে সে-ই আমাকে দিয়েছে ব্যবহার করতে।

সে-ই দিয়েছে? লোক ভাল, বলতে হয়। সেই ঠাট্টার সুর আবার যেন লাগল স্বাতীর গলায়। কিন্তু এত ক্ষীণ যে বিজ্ঞান তা বুঝল না—না কি বুঝল? আর তাই মুখের হাসি মুছে ফেলে গম্ভীর হল। হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল—হ্যাঁ, লোক সে খুবই ভাল। দাদার ভদ্রীর বদলটা স্বাতী যেন লক্ষ্যই করল না। সহজভাবে বলল—তার নিজের লাগে না? তার?...তার আপিশেই কত মেশিন চলছে সারাদিন! স্বাতী ভেবে দেখল, মজুমদারের নামটা দাদার মুখ দিয়ে বের করাই ভাল। তাই একটু হেসে বলল—তোর বন্ধুভাগ্য খুব, দাদা। তা কোনো-একটা ভাগ্য থাকা চাই তো! বিজ্ঞান এমনভাবে কথাটা বলল যেন প্রতিপক্ষের কোনো একটা আক্রমণের আভাস পেয়েই সে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত। কিন্তু তখনই যেন স্থির করল যে আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। চড়া গলায়, কড়া আওয়াজে বলল—অনেক ভাগ্যে মজুমদারের মতো বন্ধু হয়, আমি এ-কথা বলবই।

মনে-মনে নিশ্বাস ছাড়ল স্বাতী, একটু দেরি করল, দাদা যদি আরো কিছু বলে, তাকে আরো কম বলতে হবে। আর হলও তা-ই; একটু পরে বিজ্ঞানই আবার বলল—আর এই মজুমদারকে তোরা কিনা অপমান করিস।

ও মা? এবার কথা বলার চমৎকার সুযোগ পেল স্বাতী—অপমান আবার কে করল, আর কখনই বা করল!

অপমান না! ফৌস করে নিশ্বাস ফেলল বিজন। তুই এক কাজ কর, দাদা— স্বাতী মোলায়েম গলায় বলল—তোর বন্ধুকে বল একদিন চা খেতে।

নাঃ!

না কেন? বাবাকে বলেছিলাম—তাঁর কোনো আপত্তি নেই। আর বাবার আপত্তি না-থাকলে আর আমার কী?

তার মানে—বিজন ঠোটের ফাঁকে একটা সিগারেট রেখে, যেন তারই সাহায্য নিয়ে কথাটা শেষ করল—তোর আপত্তি আছে এখনো?

থাকলে তোর কিছু এসে যায় না তো? মুখে-মুখে জবাব দিতে গিয়ে ইঠাৎ থেমে গেল বিজন। সিগারেট ধরিয়ে, ঠোটের ফাঁক থেকে আঙুলের ফাঁকে এনে বলল—কিন্তু আপত্তি কেন? —তোর বাড়িতে তোর বন্ধুকে তুই নেমস্তন্ন করবি, আমার তাতে আপত্তি হবে কেন? আমি বললাম তো, এখন তোর যা ইচ্ছে কর।

আচ্ছা তা-ই করব—বলে বিজন সিগারেট নামিয়ে রাখল অ্যাশট্রেতে। ঠোটে ঠোট চেপে আবার টাইপ করতে বসে গেল। স্বাতী দাঁড়িয়ে রইল আরো মিনিটখানেক, আর সেই এক মিনিট বিজনের কেটে গেল 'S'-এর পর 'e' খুঁজতে-খুঁজতেই। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা নিজেই এসে স্বাতীকে খবর দিল—মজুমদারকে বললাম। শনিবার সুবিধে হল না, শুক্রবারে।

বেশ তো।

তা তুই... তুই একটু ভদ্রতা অস্বত করিস—

আমি কি ভদ্রতা জানি তোর মনে হয়?

না-জানলেও শিখতে হবে, বাড়িতে তুই ছাড়া কেউ নেই যখন।—কথাটা ভাল লাগল স্বাতীর, আর সেইজন্যই মুখে কিছু বলল না।

শুক্রবার হল পরশু—মনে রাখিস তাহলে, বিজন হাত নেড়ে বিদায় নিল।

শুক্রবারে ভদ্রতার পার্টে স্বাতী ফেল তো হলই না, ভালই উৎসাহ। চা ঢেলে দিল, স্পষ্ট বুঝতে দিল যে নিমন্ত্রিতেরা আরো একটু টিড়েভাজা, আরো একটা সিঙাড়া খেলে তার সুখের আর সীমা থাকবে না। নিজেও খেল, কিন্তু তার খাওয়াটা যেন বোঝাই গেল না। কম্পক্ষে বেশি বলল তা নয়, কিন্তু যখনই কথাবার্তা মিইয়ে এসেছে, আস্তে ফুঁ দিয়ে জিইয়ে তুলেছে আবার। কী কথায়, কী চোখে-মুখে, নড়াচড়ায় একবারও যেন বোঝা গেল না যে সে কয়সে এত ছোটো আর অভিজ্ঞতায় এত কাঁচা—কিন্তু কাঁচাই বা কেন, এত সে পড়েছে, সেটাও একটা অভিজ্ঞতা তো?

বিজন আশাই করতে পারেনি তার শুক্রবারের এতখানি জৌলুস স্বাতীকে বিশ্বাস কী—নিশ্চিত হবার জন্য সে বলে এসেছিল ছোড়দি-হারীতদাকেও। ভেবেছিল, হয়তো আশাই করেছিল যে হারীতদা আসতে পারবেন না। কিন্তু অনেকদিনের পাওনা এবং অনেকদিনের না-পাওয়া একটা ইনক্রিমেন্টের খবরে তার মন-মেজাজ একটু বিশেষ খোশ ছিল সেদিন। তাছাড়া শহরে তেমন উদ্বেজক সভা-টভাও ছিল না, তাই শ্যালকের প্রথম পার্টিতে স্বশুরবাড়িতেই সে এল। তা পার্টি এমন মন্দই বা কী, তিনজন ভদ্রলোক আর দুজন মহিলায় বেশ ভরা-ভরাই দেখাচ্ছিল। আর বন্ধুমহলের তুলনায় এখানকার কথাবার্তা যদিও ফ্যাকাশে, তবু নতুন একজন মানুষ পেয়ে তাকে দলে ভরতির চেষ্টা তো করা যাবে।

হারীত প্রথম গুলি ছুঁড়ল তার পুরোনো টার্গেটেই—স্বাতী, এ কী করেছে! এত খাবে কে?

স্বাতী বলল—আমরা।

কিন্তু এটা তো ঠিক হল না—চায়ের সঙ্গে চিংড়ি-কটলেট!

চায়ের সঙ্গে কটলেট খায় না বুঝি? স্বাতী লজ্জা পেল —আমার কিন্তু বেশ ভালোই লাগে।
প্রবীর মজুমদার হেসে উঠল এ-কথায়।

এই এক খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে কত সময় আর কত খাটুনি যে নষ্ট হয় আমাদের দেশে—
হারীত বিশেষভাবে মজুমদারকেই বিধল চোখ দিয়ে—আর খাবার যা নষ্ট হয় তার তো কথাই
নেই।

সত্যি! মজুমদার সোৎসাহে বলল—আর, সবই বাড়ির তৈরি। কখন যে এতসব করেছেন!
বলে তাকাল স্বাতীর দিকে। আবার লজ্জা পেল স্বাতী। সে অবশ্য কিছুই করেনি। বাজার করে
দিয়েছেন বাবা, বানিয়েছে সারা দুপুর বসে-বসে মার আমলের পুরোনো চাকর হরি, সাজিয়েও
এনে দিয়েছে আলাদা-আলাদা থালায়, সে শুধু সেজেগুজে এসে হাতে-হাতে তুলে দিয়েছে—
আর নাম কিনা তারই হল! অথচ ওরকম একটা ধরা-বাঁধা ভদ্রবুলির উত্তরে এ-কথা কি বলা
যায় —না, দেখুন, আমি কিন্তু কিছু করিনি! অথচ ও ছাড়া আর কী বলা যায় তাও ভেবে
পেল না স্বাতী। একটু লাল হয়ে মাথা নিচু করল তাই, আর দেখতে তাকে ঠিক সেইরকম
হল, যে রকম হত প্রশংসাটা তার পাওনা বলে মেনে নিলে। শাম্বতী বাঁকা হেসে বলল—
কোনটা তুই করেছিস বল তো স্বাতী, সেইটে খাই।

আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, মিসেস নন্দী—মজুমদার এবারেও কথা তুল বুঝল—আমি ঐ
কটলেটটাই রেকমেন্ড করব। কলকাতায় প্রন-কটলেট খেতে হলে চাং-আনেই যেতে হয়, এ
কিন্তু তাকেও হারিয়েছে। স্বাতী মুখ তুলল এবার। আর তুলতেই ছোড়দির সঙ্গে চোখাচোখি
হল। হেসে ফেলে বলল—আমি কিন্তু করিনি।

ঐ হল! মজুমদার ব্যস্ত হল কটলেটের গুণ কার্যত প্রমাণ করতে। বিজু বলল—কলকাতার
কোথায় কী ভাল খাবার পাওয়া যায়, সে বিষয়ে মিস্টর মজুমদার একজন বিশারদ।

নাকি? ঈশৎ প্রেষ ফুটল হারীতের ভুরু তোলায়। —কোনটা পুটিরামের সন্দেশ আর কোনটা
জলযোগের, তা ইনি চোখ বুজে চেখেই বলে দিতে পারেন। আর তাছাড়া—
আঃ, মিস্টর মিট্র! মজুমদার বাঁ হাত তুলে নিজের গুণপনার বিজ্ঞাপনে বাধ্য দিল। তারপর
সকলের দিকে তাকিয়ে বলল—বুঝছেন না, বাড়িতে বসে বাঁধা সময়ে খাওয়া আমার কপালে
তো লেখেনি, সারাদিন সাত রাজি ঘুরে বেড়াচ্ছি, তাই বাধ্য হয়েই—কথা শেষ না-করে
মজুমদার হাসল ঝকঝকে বড়ো বড়ো দাঁত বের করে।

এঁর কারখানা দমদমে, আপিশ ক্যানিং স্ট্রীটে— বিজন সূক্ষ্ম পেল বন্ধুর পরিচয় বিশদ
করার—আর কাজ ছড়ানো ব্যারাকপুর থেকে ডায়মণ্ড হারবার।

তার মানে আপনি একজন ক্যাপিটালিস্ট!—হারীত নাকের বাঁশি কূচকোলো।

ইহিনি এখনো, হবার চেষ্টায় আছি। অভিজ্ঞতা থেকে শাম্বতী বুঝল যে হারীতের যুদ্ধের বিউগল
বেজে গেছে। তাই তাড়াতাড়ি কথা ঘোরাবার চেষ্টা করল—কীসের কারখানা আপনার?
বাজে-বাজে জিনিস সব! মজুমদার অমায়িক হাসল—পাট, নারকোলের ছিবড়ে—। সত্যি
নিরাশ হল শাম্বতী। ভদ্রলোকের কারখানায় শাড়ি-টাড়ি তৈরি হলে বেশ হত, দেখতে যাওয়া
যেত একদিন। আড়চোখে ছোড়দির দিকে তাকিয়ে স্বাতী বলল—বাজে আর এমন-কী!
নারকোলের ছিবড়ে দিয়ে কত কিছু তো তৈরি হয়। পা-পোশ—

পা-পোশ! বিজন হোঃ করে হেসে উঠল। ঠিক কথা! ঠিক বলেছেন আপনি! মজুমদার গম্ভীরভাবে স্বাতীর দিকে তাকাল। আপনারা পা মুছবেন বলেই তো আমরা খাটছি সারাদিন। তারপর একই রকম সূরে হারীতের দিকে ফিরে বলল—আপনার কী মনে হয়? যুদ্ধটা বেশ জমে উঠেছে, না কি ফেঁশে যাবে হঠাৎ?

Wage-slave-driver! হারীত মনে-মনে আওড়াল। তারপর লোকটাকে বাগে পাবার জন্য বাঁকা চোখে পাণ্টা প্রশ্ন করল—আপনার কী মনে হয়?

কী জানি—যে রকম চটপট কাৎ হয়ে পড়ছে সব—প্যারিসও গেল—এখন হিটলার ইংলন্ডটিকে জলযোগ করে ফেললেই না গোলযোগ মিটে যায়। লোকটার হাসিমাখা বোকামিতে হারীতের পিস্তি জ্বলে গেল, ধৈর্য ধরে বলল—তা হলেই মিটে যায়?

আর লড়বে কে?

কেন, রাশিয়া? হারীত সিংহনাদ ছাড়ল। —রাশিয়া? মজুমদার আরো কিছু বলত বোধহয়। কিন্তু হারীতের আর তর সইল না, ঝপ করে কোপ বসাল—রাশিয়াই তো পৃথিবীর আশা। এ-কথা শুনে মজুমদার স্পষ্ট চমকাল, চায়ের পেয়ালা মুখে তুলতে গিয়ে থেমে গেল, আর তার মস্ত, লালচে, ঠোট-মোটা মুখের দিকে তাকিয়ে হারীত বুঝল যে আজকের দিনে পৃথিবী ভরে প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষ যা বিশ্বাস করে, সে-কথাটাই জীবনে এই প্রথম শুনল বাংলাদেশের এই গবুচন্দ্র হবু-ক্যাপিটালিস্ট। —রাশিয়াই তো পৃথিবীর আশা। কথাটা আবার আওড়াতে খুবই ভাল লাগল তার।

ভাগ্যিশ আপনার মুখে শুনলুম কথাটা, নয়তো আর-সবার মতো আমিও ভাবতুম যে আদ্যে পৃথিবী যদিইনো ছারখার হল, তদ্দিন স্টালিন-সাহেব দিব্যি গোঁফে তা দিলেন বসে বসে—বলে চায়ে চুমুক দিল মজুমদার।

হোক ছারখার— হারীত মুখ লাল করে বলল—রাশিয়া যদি বাঁচে, তবে পৃথিবী বাঁচবে।

—ও, বুঝলাম। পৃথিবী মানেই রাশিয়া, আর সেইজন্যই রাশিয়া পৃথিবীর আশা?

লাল রং কালো হল হারীতের মুখে। ইচ্ছে হল, ঐ মাংসপিণ্ডটাকে সাফ দু-কথা গুনিয়ে দিয়ে এক্ষুনি উঠে পড়ে—কিন্তু তক্ষুনি মনে পড়ল দলের পাণ্ডাদের উপদেশ—ধৈর্য চাই, মৈজাজ যেন খারাপ না হয় কখনো... শেখাতে হবে, বোঝাতে হবে, বশ করতে হবে মানুষকে... জায়গা বুঝে সূক্ষ্ম একটু চাটুকারিতাও চাই—দেখেওছে এক-একজনকে, ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁরা তর্ক করেন জাত-বুর্জোয়া, পাতি-বুর্জোয়া, পচা-বুর্জোয়ার সঙ্গে। যদি তাদের কোনো-একজনকে টানতে পারলে কিছুমাত্র সুবিধে হয় দলের! আর তাই হারীত মুখ ফিরিয়ে চুপ করে থাকল, আর অন্যমনস্কভাবে একটু-একটু করে খেয়ে ফেলল সেই চিড়ে কটলেটেরই সমস্তটা, চায়ের সঙ্গে যার আয়দানি দেখে প্রথমে সে শিউরেছিল। তার চেহারায় দেখে মজুমদার অপ্রস্তুত, শাস্ত্রীর মাথা নিচু, শুধু বিজন বুক চেতিয়ে চকচকে চোখে তাকিয়ে রইল। এমন যে বিদ্বান আর বাক্যবাগীশ তার হারীতদা, তার সঙ্গেও সমানে-সমানে কথা চালাতে পারে তার বন্ধু, সে কি ফ্যালনা!

সেই চুপচাপের মধ্যে ছলছল করে উঠল স্বাতীর গলা —রাশিয়া আমি খুব ভালবাসি। লোকেরা কেমন সারাদিন ধরে চা খায় আর তর্ক করে, আর স্টেশন-মাস্টাররা সব সময় ঘুমোয়, আর মেয়েরা রাত জেগে-জেগে—

পাও কোথায় এসব খবর? হারীত নাকের ভিতর দিয়ে আওয়াজ করে উঠল।

কেন, টুর্গেনিভের—

টুর্গেনিভ! স্বাতীর ভিত্তি-ভিত্তি কথা কচ করে কেটে দিল হারীত—বাবুগিরি করে বিদেশেই তো জীবন কাটিয়েছে, রাশিয়ার সে কী জানে? কী করেছে সে তার দুঃখী দেশের জন্য? আর তাই তো রাশিয়ায় এখন টুর্গেনিভ কেউ পড়ে না।

পড়ে না!—আহা, অমন বই, অমন ভাল বই পড়ে না? রাশিয়ার লোকেদের জন্য বড়ো কষ্ট হল স্বাতীর। বলল, বলে ফেলল—তবে তো রাশিয়ার লোকেরা এখনো খুব দুঃখী!

হারীত বলবার জন্য এমন টগবগ করছিল যে স্বাতীর কথা তার কানেই গেল না, শুধু ঐ 'দুঃখী' কথাটা শুনতে পেয়ে তক্ষুনি গর্জে উঠল—না, রাশিয়ার লোকেরা এখন আর দুঃখী না। এখন আর সেখানে স্টেশন-মাস্টাররা ঘুমোয় না, মেয়েরা রাত জেগে-জেগে দীর্ঘশ্বাস ফেলে না, এখন সেখানে— একটানা পাঁচ মিনিট ধরে হারীত বর্ণনা করল ভূষর্গ রাশিয়ার, বলতে বলতে মোটাসোটা মাংসলো মজুমদারকে ঘাড় কাৎ করে নেতিয়ে পড়তে দেখে বুঝল যে তার কথায় কাজ হয়েছে। আর তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রী বলে উঠল—সত্যি, আশ্চর্য দেশ!

আশ্চর্য! মজুমদারের প্রতিধ্বনি। হারীতের কথা, সত্যি বলতে, শেব হয়নি, শুধু দম নিতে থেমেছিল একটু। কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে সকলের মুখেই এমন একটা হার-মানা ভক্তির ভাব দেখতে পেল যে খুশি হয়ে বলে ফেলল—স্বাতী, আর একটু চা।

চা শেষ হল, বাসন সরানো হল, মজুমদার তার সিগারেটের টিন হারীতের সামনে ধরে সন্ধির প্রস্তাব করল, আসুন—

থ্যাক্সিউ, আমি পাইপ—বলেই হারীতের চোখে পড়ল টিনটা স্টেট-এক্সপ্রেসের। উদারভাবে একটু হেসে বলল—আচ্ছা, নিই একটা।

এর পরে মজুমদার টিন ধরল বিজনের সামনে। বিজন মুচকি হেসে চোর-চোর তাকাল হারীতের দিকে, শাস্ত্রীর দিকেও।

অনুমতিটা দিয়ে দিন না আপনারা— মজুমদার চোখ টিপল, মিছিমিছি আর—

নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! পাঁচ মিনিটে রাশিয়াকে জিতিয়ে দিয়ে হারীতের মেজাজ এখন আগের চেয়েও খোশ। দরাজ হেসে বলল—আরে বিজন, তুমি আবার এ-সব—
বাড়িতে বসে, বড়োবরসির সামনে, প্রকাশ্যে, সসম্মানে এই প্রথম সিগারেট খাচ্ছে বিজন। আর তাতে এতই গৌরব লাগল যে ভাল করে টানতেই পারল না। শাস্ত্রী মনে-মনে বলল—কী অসভ্যতা! ঐটুকু ছেলে! কিন্তু মুখে কিছু বলল না, পাছে হারীতের আবার মেজাজ বিগড়েয়। দেশলাই ধরিয়ে হারীতের মুখের কাছে এনে মজুমদার বলল—কিছু মনে করবেন না, মিস্টার নন্দী। বোকার মতো তর্ক করেছি আপনার সঙ্গে। হারীত হী-হা করে হেসে উঠল, তারপর কেশে উঠল সিগারেট ধরাতে গিয়ে। হাত নেড়ে চোখের সামনে থেকে ধোঁয়া সরিয়ে বলল—না, না, কিছু না—

আপনাদের মত মানুষের কাছে কত শেখবার আছে আমাদের। কিন্তু সময় কই?

একদিন আসুন না আমাদের মিটিঙে।

মিটিং! মজুমদার হাত জোড় করল—মিটিং জিনিসটাকে বড়ো ডরাই।

সে-রকম না—এই কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব মিলে—

পণ্ডিতের মেলায় আমি মূর্খ গিয়ে কী করব, বলুন তো? মজুমদারের কথাটা নিশ্চিন্তে মেনে

নিয়ে হারীত বলল—গান শুনতে তো আসতে পারেন।

গান? কী গান?

গণ-সংগীত।

রণ-সংগীত?

ঠিকই বলেছেন—গণ-সংগীতই রণ-সংগীত হবে একদিন। চাষিদের মুখের গান—ওঃ সে যে কী!

কী রকম বলুন তো? মজুমদার জানতে চাইল।

শুনলেই বুঝবেন—এক ভদ্রলোক শিখে এসেছেন নানা জেলায় ঘুরে—চমৎকার গলা—
আঃ! আধো চোখ বুজে মজুমদার যেন মনে আনল কোনও মনে পড়ার সুখ—শশাঙ্ক দাসের
মতো গলা আর শুনলাম না!

কোন শশাঙ্ক দাস বুঝলে তো, ছোড়দি? বিজন নড়ে চড়ে উঠল।

যার গাড়ির নম্বর মুখস্ত ছিল তোর—সে-ই তো? শাস্বতী ভাইকে ঠাট্টা করল। কিন্তু নিজেও
সচকিত হল মনে মনে। কী ভালই লেগেছিল ভদ্রলোকের গান—সেই ‘প্রতিশোধ’ ফিল্মে—
সেই একবারই বাবা নিয়ে গিয়েছিলেন সিনেমায়—অমন যেন আর লাগল না। আর তারই
কদিন পরে স্বাতীর জন্মদিনে হারীতের সঙ্গে প্রথম দেখা!... একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল
শাস্বতী। আবার যখন কথা কানে গেল, শুনল মজুমদার বলছে—দুর্ভাগ্য আমাদের, দুর্ভাগ্য
এই দেশের, যে শশাঙ্ক দাসকে ফিল্মের গান গাইতে হয় টাকার জন্য!

আজকাল তো ফিল্মেও শুনি না ওঁর গান? শাস্বতী এমনভাবে কথা বলল যে দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে
মজুমদারের সঙ্গে তাকে একমত মনে হল না।

বসেতে আছে এখন—ফিল্ম ছাড়া যদি উপায়ই নেই, তবে টাকা যেখানে বেশি সেখানেই ভাল!
কিন্তু আমি চেষ্টা করছি ওকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনতে।

আপনি ওঁকে চেনেন! শাস্বতী শিহরিত।

চিনি? আমার ওন্ড ফ্রেন্ড শশাঙ্ক।

‘ওন্ড ফ্রেন্ড’ কথাটা শুনে হাসি পেল স্বাতীর—মানে, হেসেই ফেলল, আর সেই হাসির যে-
কোনো একটা কারণ দেখাবার জন্য তাড়াতাড়ি বলল—ছোড়দি কিন্তু খুব ফিল্মের ভক্ত।
আমিও! সঙ্গে-সঙ্গে বলল মজুমদার। ফিল্ম ভাল না তা তো না, তবে শশাঙ্ক যা দিতে পারে,
ফিল্ম তা নিতে পারে না।

তা ভাল-ভাল লোকেরা না-এলে— বিজনের বিচক্ষণ মন্তব্য—ফিল্মই বা ভাল হবে কী করে?
তাও সত্যি—

বসের কোন ফিল্মে উনি গেয়েছেন? জিজ্ঞেস করল শাস্বতী। ফিল্মের কথাই চলল এর পর।
বলল মজুমদারই মোটামুটি, বিজন মাঝে-মাঝে মতামত না দিয়ে ছাড়ল না। আর মুখে মৃদু
একটু হাসি রেখে হারীত সহিষ্ণুতার একটা রেকর্ড রাখল প্রায় দশ মিনিট ধরে, তারপর টুঁ
মারল রুশ ফিল্মের কথা উঁচিয়ে, আইজেনস্টাইনের নিশেন ওড়াল দু-একবার। কিন্তু কথা
গড়িয়ে-গড়িয়ে আবার ফিরে এল দিশি ছবির সমতলেই। কথায় কথায় জানা গেল যে মজুমদার
অনেক অভিনেতাকেই চেনে—শুনে শাস্বতী মুগ্ধ। অভিনেত্রীদের কাউকে চেনে কিনা জানতে
বীষণ ইচ্ছে করল, কিন্তু থেমে গেল জিজ্ঞেস করতে গিয়ে—না, সেটা—সেটা ঠিক হবে না।
হয়েছে কী, শাস্বতীর ইচ্ছে যত, ফিল্ম দেখতে পায় না তার আক্ষেপও। মাসে দুটোর বেশিতে

হারীত নিয়ে যায় না, সে দুটেই আবার ইংরেজি। স্বশুরবাড়ির জা-ননদের দলে ভিড়তে না পারলে বাংলা-ছবি দেখা হয়েই ওঠে না তার। মজুমদারের কথা শুনে শুনে সে তাই রুদ্ধ ইচ্ছা মেটাতে লাগল যতটা সম্ভব। আরো খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর হারীতের আর সহ্য হল না। কজ্জি-ঘড়িতে তাকিয়ে বলল—আমি উঠি এবার।

আমাকেও যেতে হবে। কথা থামিয়ে একেবারে উঠেই দাঁড়াল মজুমদার।

আমি—আমি থাকি একটু, ঈষৎ স্নানভাবে শাস্বতী বলল।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—আমি তো বাড়িও যাচ্ছি না এখন।

কোনদিকে যাবেন? শহরের দিকে হলে আমার সঙ্গেই।

চলুন।

মিস্টর মিট্র, কাল তাহলে সকাল নটায় দেখা হচ্ছে আপনার সঙ্গে?

নিশ্চয়ই।

অনেক ধন্যবাদ, মিসেস নন্দী... অনেক ধন্যবাদ, মিস মিট্র... অনেক ধন্যবাদ—মজুমদার জনে-জনে বিদায় নিতে লাগল—আশা করি আবার দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে। বিজন আবার ‘নিশ্চয়ই’ বলল। হ্যাঁ, একটা কথা—মজুমদারের হঠাৎ যেন মনে পড়ল—পল মুনির নতুন ফিল্ম আসছে মেট্রোতে, যাবেন আপনারা কালকের পরের শনিবার? মানে—কথাটা স্পষ্ট করল তক্ষুনি—আমি খুবই সুখী হব আপনারা যদি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

তা—গেলে হয়, সকলের আগে জবাব দিল হারীত। সে নিজেই ভাবছিল এটাতে যাবে—ভালই হল। ঐর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়ে ক-টাকা বাঁচল, তার একটা হিশেব চটপট খেলে গেল তার মনে।

আপনি যাবেন তো? মজুমদার দাঁড়াল স্বাতীর সামনে।

দেখি—

দেখি কেন? স্বাতীর দিকে মাথা নোয়ালো মজুমদার। স্বাতী উঠে দাঁড়িয়েছিল বিদায় দিতে, কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ভাল করে তাকাল একবার। মাঝখান দিয়ে সিঁথি করা চুল দুদিকে ঢেউ তোলা, ছোটো ছোটো চোখ দূরে-দূরে বসানো, মস্ত মুখ, মোটা লাল ঠোঁট, চিকচিকি পিঙ্কের পাঞ্জাবি প্রায় হাঁটুতে ঠেকেছে, কুঁচোনো ধূতির জরি-পাড় লুটিয়ে পড়েছে শ্যাওলায় লপেটায়। হঠাৎ যেন উল্টোদিকে ধাক্কা খেল স্বাতী। একটা বিদ্রী লাগার কাঁপুনি উঠল মনের মধ্যে তার। এতক্ষণকার ভদ্রতা, ভাব্যতা, দাদার মনঃস্ফার চেষ্টা, সব ভেসে গিয়ে আবার নাক-মুখ ভরে গেল সেই বিদ্রী... বিস্বাদ... বদগন্ধে।

এত দিন আপনাকে দেখেছি—মজুমদারকে সে বলতে শুনল—কিন্তু দেখা পাইনি। আজ যদি দয়া করে দেখাই দিলেন, তাহলে আরো একটু দয়া কি করতে পারেন না? শাস্বতী মনে-মনে হাসল কথাটা শুনে। আর ভাবল যে সব মেয়েরই দিন আসে জীবনে, কিন্তু সেদিন আর কদিন! ঈশ্বর যদি মেয়েদের আস্ত এক-একটি বোকা করে না বানাতেন তাহলে তারা ভুলত না কোনো কথাতেই, আবার ভুলত না কোনো কথাই। চুপ করে সব শুনত, আর উশুল করে নিত মাশুল। স্বাতীর পাশে এসে বলল—কী, স্বাতী বুঝি যেতে চাচ্ছে না? ঐ গুর স্বভাব! ...তা যাবি না কেন, আমরা সবাই মাঝে, আর তুই যাবি না তা কি হয়?

আর মজুমদার যখন হারীতকে পাশে বসিয়ে গাড়ি রওনা করল, তখন ভিতরে এসে স্বাতীকে প্রথম কথা বলল—কী রে? ঐ মজুমদারের অবস্থা তো কাহিল।

দেখেছি তো, স্বাভী হাসল উত্তরে—ছোড়দি সাবধান।

আমার আর সাবধানের কী—

বাঃ! সাবধান হবার তো তোমারই আছে।

অসভ্য! শাস্তী এক কিল বসাল স্বাভীর পিঠে—একটু লালও হল।

* * * * *

একটু লাল হল স্বাভী, লাল হল বলে রাগ হল নিজের উপর, আর সেই রাগের রঙে আরো লাল হল—তবু ভাগ্যিণী ছায়া, আবছায়া, অন্ধকার। নল-ডোবানো গ্লাস হাতে নিয়ে মজুমদারকে সামনে দাঁড়ানো দেখে একটু চমকেছিল সে, কেননা তেঁটা তার সত্যি পেয়েছিল, অথচ বলেনি। যেহেতু সিনেমায় এসে তেঁটা পায় শুধু বাচ্চাদের আর অনভ্যস্ত মেয়েদের। ও-দুয়েরই এক দলে কি ইনি মনে-মনে ঠাওরালেন তাকে, নয়তো কী করে জানলেন...?

নিন! মজুমদার নিচু-মাথায় হাত বাড়িয়ে দিল।

আর কেউ...? ছোড়দির দিকে তাকাতে গিয়ে স্বাভী দেখল, ছোড়দি এক চেয়ার সরে গিয়েছে, গল্প করছে দাদার সঙ্গে।

সকলেরই আছে—আপনি নিন। তখন স্বাভীর চোখ পড়ল মজুমদারের পিছনে দাঁড়ানো পাগড়ি বাঁধার হাতে ধরা ট্রে—ছি, কী করে সে ভাবতে পারল তার একার জন্য, তারই তেঁটার কথা বুঝে নিয়ে—ছি! কিন্তু এই লজ্জাটা জানতে দেওয়া তো আরো লজ্জা, তাই সাহস করে চোখ সরিয়ে আনল জগৎ-বিখ্যাত ঘড়ির বিজ্ঞাপন থেকে। একটু চড়া গলায়, ইংরিজি শব্দ ব্যবহার না করার কৃতিত্বে একটু সচেতনভাবেই বলল—ঠান্ডা পানীয়?

আপনার ভাল লাগে না?

পানীয়ের মধ্যে সবচেয়ে ভাল জল— যদিও একটু সাজানো ধরনে, তবু তার সত্যিকার মতটাই বলল স্বাভী। আর মজুমদারের মুখে হাসি লক্ষ করে আবার বলল—আর সিনেমার মধ্যে সবচেয়ে ভাল মেট্রো, কেননা একমাত্র এখানেই খাবার জলের ব্যবস্থা আছে।

এখন আর নেই। কাগজের গ্লাস এমন চুরি হতে লাগল—

চুরি কেন? শাস্তীর কানে গেল কথাটা। —ও তো আর কিনতে হত না— সেইজন্যই তো! কথা লুফে নিল হারীত। বিনিপয়সায় কিছু পাওয়া গেলে কি আর কথা আছে এ-দেশে? মাখনের দাম নেয় না বলে বাঙালি ছেলেরা চেটেপুটে সবটুকু মাখন খেয়ে নেয় লন্ডনের রেস্তোরাঁয়। হারীত হেসে উঠল পিছনে মাথা হেলিয়ে।

তা জল যখন নেই-ই, আপাতত এইটে—এতক্ষণে সহজ হতে পেরে স্বাভী ঠাণ্ডা গ্লাসটি হাতে নিল। আর মজুমদার এগিয়ে গেল শাস্তীর দিকে—না, দেখুন, আমি না। শাস্তী কাঁচুমাচু। —তাহলে অন্য-কিছু...

না, কিছু না, দেখুন— শাস্তীর আবার ঐ ঠান্ডাই-যন্ত্রটা অপছন্দ। এমনিতেই এত ঠান্ডা যে তার উপর আর কোনো ঠান্ডার কথা ভাবতেই যেন শীত-শীত করে।

কেন, খাও না! বিজনের পিঠ পেরিয়ে হারীত গলা বাড়াল স্বীর দিকে। শাস্তীর চোখে মিনতি ফুটল, কাতর মিনতি। কিন্তু অন্ধকারে হারীতের বোধহয় তা চোখে পড়ল না, আর পড়লেই বা কী? কেনা হয়ে গেছে, তুমি না-খেলে ফেলা যাবে, এই চরম যুক্তির মায়া কটাতে কি পারত সে?

আপনি, মিস্টার নন্দী? মজুমদার হাত বাড়াল হারীতের দিকে। এমনিতে কোন্ড-ড্রিঙ্কসের কথা

উঠলেই হারীত পুরুষোচিত ঠাট্টা করে। কিন্তু পুরুষের পয়সা-খসানো মেয়ে-মজানো এই বস্তুটার উপর আজ তার দয়া হল—কেননা ভদ্রতার উত্তরে ভদ্রতা তো করতে হবে। গ্লাস নিয়ে নলে ঠোট ঠেকাল একবার, তারপর শাশ্বতীর দিকে মুখ তুলে একটু জোর দিয়েই বলল—বেশ ভাল তো!

শাশ্বতী অবাক হল কথা শুনে। স্বামীর সঙ্গে রাস্তায় ঘুরতে-ঘুরতে কখনো তার হয়তো ইচ্ছে হয়েছে একটা ঠান্ডা কিছু খেতে, কিন্তু হারীত তক্ষুনি বলেছে—ও-সব আবার ভদ্রলোক খায়! যত বাজে—! শুনতে-শুনতে শাশ্বতীর বিশ্বাস জন্মেছিল যে ওগুলো সত্যিই জাতে বড়ো নিচু। সে এখনো একেবারেই অপছন্দ করতে পারছে না বলে একটু লজ্জিতও ছিল মনে-মনে। আর আজ কিনা হারীতের মুখেই তারিফ! হয়তো অসাধারণ কিছু—হয়তো এক-এক গ্লাস এক-এক টাকা দাম—না-খেলে অনায়াস হয়, সত্যি!—আচ্ছা দিন, শাশ্বতী হাত বাড়াল। মজুমদার হেসে বলল—ইচ্ছে না করলে থাক।

নষ্ট করে লাভ কী— হারীত আড়চোখে তাকাল—দাম তো দিতেই হবে।

দাম দিতে হবে বলেই খেতে হবে? মজুমদার যেন জানতে চাইল হারীতের কাছে। টাকা দেখাচ্ছে। বড়লোকি ফলাচ্ছে। হারীত মনে-মনে বলল। মুখে বলল—অপব্যয় ভালবাসি না।

স্বামীর মুখ গভীর হতে দেখে শাশ্বতী আর দেরি করল না। গ্লাস আর ভিতরে-ভিতরে কেঁপে-কেঁপে সেই বরফ-মতো ঠান্ডাকে ভিতরেও নিতে লাগল আস্তে আস্তে। তার ভাগ্যে ইন্টর্ভল শেষ হল তক্ষুনি, আর আসল ছবি আরম্ভ হতে সব চোখ যখন পরদায় আঁটা, প্রায় তেমনি-ভরা গ্লাসটিকে নামিয়ে রাখল চেয়ারের তলায়। ভুলেই গেল স্বাতীর পাশে সরে আসতে। অগত্যা মজুমদারকে বসে পড়তে হল দু-বোনের মাঝখানে। আর ওখানে বসে সিনেমা ছাড়াও আরো কিছু না দেখে সে পারল না। ঘাড়টি একবার ডানদিকে, একবার বাঁ দিকে হেলিয়ে, দুজনের একজনেরও চোখে না পড়ে দু-বোনের রূপের তুলনা করল সে, চুল-চেরা বিচার করল। সেকেন্দরের মতো, প্রসাধনের অংশ মনে মনে বাদ দিল না। সে আধুনিক মানুষ, সে জানে যে পৃথিবীর চোখ যাকে দেখবে সে এই সাজগোজ করা মানুষই, অতএব সেটাই আসল, সেটাই সব। তবু প্রসাধন পেরিয়েও দেখতে পেল তার বিচক্ষণ চোখ। দিদিকে যে বেশি ফর্সা দেখাচ্ছে তার কারণ এই অন্ধকার আর পাউডারের উঁচু জাত; কনুইয়ের উপর থেকে যে-অংশটুকু ব্লাউজের হাতা ঢেকে দেয়নি, সেটুকু লক্ষ করে সত্য আবিষ্কার করতে তার দেরি হল না। দিদির মুখখানা গোলগাল, নাকটি বড্ডো সোজা, হাঁ বড্ডো ছোটো। মজুমদারের জজিয়তি ছোটোটির পক্ষে রায় দিতে দিতে থমকাল—ছোটো হওয়াটাই ছোটোটির সুবিধে, এখন পর্যন্তও তা-ই, এখন পর্যন্ত সে-বয়স সে ছাড়াইনি, যখন দু-চার বছরের বয়সেও চামড়া একটু চিকচিক করে বেশি...কিন্তু বিয়ের পরে স্বামীর ঘরের অবিরাম বিশ্রাম আর অফুরন্ত আরামে কয়েক বছর কাটাবার পর ঐ ডিম-হাঁদের মুখ আর একটু-বাঁকা চোখ অত সহজে কি আর প্রাইজ পাবে? দিদির মতো মোটার দিকে ঝোঁকে যদি? থুতনিতে যদি ভাঁজ পড়ে?...শাশ্বতীর মধ্যে মজুমদার দেখতে চেষ্টা করল ভবিষ্যতের স্বাতীকে। আজকের টাটকা তাজা বয়সটা কোন-কোন খুঁত লুকিয়ে রেখেছে, তার ফর্দ বানাল সাবধানে। কিন্তু সমস্ত হিসেব শেষ করে আরো একবার যেই তাকাল, তক্ষুনি চিনতে পারল মুখের সেই গুণকে, আর কোনো বর্ণনা না পেয়ে যার আমরা নাম দিয়েছি— নুন, মানে লাভণ্য; সমস্ত হিসেব যেন ফেল পড়ল তার, মনের মধ্যে নিশ্চিত জানল যে এই নুনের গুণ ঝরে যাবে না বছরের পর বছরের আছাড়েও।

মজুমদার প্রায় মনস্থির করে ফেলল।...জীবনে এখন তার সেই অবস্থা, যখন একজন স্ত্রী দরকার। দরকার মানে দেহের নয়, মনেরও নয়— সংসারের ঘরকন্নারও না। স্ত্রীকে দিয়ে ওসব দরকার তারাই মেটায়, যারা বেচারাজাতীয় জীব, কিংবা গরিব। পৃথিবীর অধিকাংশ পুরুষ যে একবারে একটিমাত্র স্ত্রীকে নিয়ে জীবন কাটাতে রাজী, তার কারণ তো এই যে স্ত্রী সবচেয়ে শস্তা, তার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সে তো শস্তা খোঁজে না, হাঙ্গামাও ডরায় না। তবে? আর কিছু না, এখন একজন স্ত্রী হলে মানায় বেশ, দেখায় ভাল, আর এ-কথা তো মানতেই হয় যে দু-একটা সুবিধে এমন আছে যা আজকালকার সভ্য সমাজে স্ত্রীর কাছেই শুধু পাওয়া সম্ভব। দেয়ালের সঙ্গে মানিয়ে যেমন ছবি, আবার ছবির সঙ্গে মানিয়ে ফ্রেম, তেমনি টাকার সঙ্গে মানিয়ে রীতিমতো স্ত্রী চাই একটি, না হলে যেন ঠিক হয় না, একটু ফাঁকা ঠেকে। টাকা খাটে ব্যবসায়, নড়ে-চড়ে ব্যাঙ্কে, অটিকে থাকে মাটির টুকরোয়; তার মতো ব্যস্ত মানুষ কত আর ওড়াতে পারে! স্ত্রী হলে টাকার একটা কাজ হয় বেশ, ঝকঝকে শো-কেসটি সাজানো যায় ইচ্ছেমতো, দেখানো যায় সকলকে। টাকা-যে তার খুব হয়েছে তা নয়...আরে না!—কিন্তু হবার বাধাও আর নেই। আর এর পরে যাই হোক আর না-ই হোক, প্রথম পনেরো বছরের পরিশ্রমেই সাধারণ ভদ্ররকম একটা ব্যবস্থা তো করতে পেরেছে, অন্তত গরিব হবার ভয় আর নেই তার—। কথাটা নিজের মনেও নিশ্চিন্তে বলতে পেরে তার গায়ে যেন কাঁটা দিল। একবার ঘাড় ফেরাল পিছনে—যেন সত্যি সে ভাবছে যে পিছনে তাকালেই দারিদ্র্যের বিকট বীভৎস মূর্তিটার ছায়া দেখবে এখনো—কিন্তু তার বদলে আবছা চোখে পড়লো সারি-সারি এমন-সব মানুষ, কলকাতার কত লক্ষ লোকের মধ্যে সবচেয়ে ভালো যারা খায়-পরে, অতএব যারা সবচেয়ে সুখী। খুব বেঁচে গেছে সে, ওঃ! কী ভয়ই সে পেয়েছে, কী ভয়ে-ভয়েই সে কাটিয়েছে...এই সেদিন পর্যন্ত। দারিদ্র্য তাকে দাঁত দেবিয়েছে রোজ দু-বেলা ভাত-পাহাড়ের ফাঁকে-ফাঁকে পাতলা-ডালের গঙ্গাজলে, ছোটো হয়ে-হয়ে দম-আটকানো ছিটের কোটে, ঘিনঘিনে-স্যাৎসেঁতে কলতলার পচা-পচা আঁশটে দুর্গন্ধে। ছেলেবেলার সেই সিঁধু মিস্ত্রির গলি হঠাৎ মনে পড়ল তার—সাত শরিকের জন্য একটা মাত্র... ভোর হতেই লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে গেছে আপিশের বাবুরা—স্ত্রীলোকরা সেরে নেয় রাত থাকতেই—বাবা একদিন কী আরই মেরেছিলেন হাফ-প্যান্ট নষ্ট হয়েছিল বলে। সিনেমার ছবিতে জমকালো ভোজ, আশে-পাশে কলকাতার সবচেয়ে সুখীরা—একবার চোখ ঘুরিয়ে এনে যেন নিশ্চিত জেনে নিল যে সেই কুস্ত্রীতার কয়েদ থেকে সে পালাতে পেরেছে বাকি জন্মের মতো। পারল কেমন করে, নিজেরই অবাধ লাগে মাঝে মাঝে। এরকম কষ্ট ছিল? সে, জন মরিসন কোম্পানির গোডাউন-ক্লার্কের চার ছেলের বড়ো ছেলে। পোট্টোফটিয়ে ভাত-ডাল খেয়ে-খেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করবে ঘষে ঘষে, তারপর যে কোনো কাজে, যে কোনো মাইনেতে, যে কোনো রকমে একবার 'বেরোতে' পারলে আর কথা কী! এর বেশি আর কী আছে জীবনে—মালকোঁচার উপর ওপেন-ব্রেস্ট কোট লটকিয়ে বুক ফুলিয়ে ট্রাম ধরবে ন-টার সময়। হুওয়া উচিত ছিল তাই, এছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারাই তার উচিত ছিল না। কিন্তু দৈব-প্রেরণা ছিল তার, বৃকে স্বর্গীয় আগুন; অতৃপ্তি ছিল... ভীষণ অতৃপ্তি। ঘৃণা ছিল সেই জীবনের উপর, যে জীবন তার জন্মদোষে পাওয়া। মাসের প্রথম রবিবারে যখন একসের আলুর সঙ্গে মিশিয়ে দেড় সের পাঁঠার মাংস রান্না হত, আর ভাইয়েরা চ্যাচামেচি-নাচানাচি করত সকাল থেকে, তেজপাতাটি চেটে না নিয়ে পাত থেকে ফেলত না, তার তখন ঘেন্না করত, ঘেন্নায় যেন ভাত

ঠেকে যেত গলায়। টাকা... টাকা চাই, তখনই মনে-মনে আউড়েছে—সকলের আগে টাকা, সকলের উপরে টাকা... যেমন করে হোক টাকা। যেহেতু টাকা হলেই সব হয়, আর টাকা না হলে কিছুই হয় না। এ প্রতিজ্ঞা সে রাখতে পেরেছে। লোকে বলবে এটা আশ্চর্য, কিন্তু সে জানে তার মনে যে এ-প্রতিজ্ঞা বাসা বেঁধেছিল, সত্যি আশ্চর্য সেইটাই। এত বড়ো আশা সে কি কখনো করতে পারত দৈবের বিশেষ দয়া তার উপর না থাকলে? ...আর এখন, এখন চাই একটি স্ত্রী। টাকার জন্য অনেক ভেবেছে, অনেক খেটেছে। এ-ব্যাপারেও খাটতে হবে, ভাবতে হবে। ততটা না হোক, তেমনি। কেননা বেঁচে থাকতে হলে যেমন টাকা, বিয়ে করতে হলে তেমনি দরকার যে, স্ত্রী হবে সুন্দরী। সস্ত্রীক কোথাও যাবে যখন, সেটা বেশ দেখার মতো হওয়া চাই তো। এর অবশ্য চটক নেই তেমন, চমক লাগে না চোখে—কিন্তু ওসব তো সাজগোজের ব্যাপার। রূপের যে অংশটা কিছুতেই কিনতে পাওয়া যায় না, সেই মুখখানা—মুহূর্তের জন্য প্রায় বিগলিত হল মজুমদার—মুখখানা সত্যিই ভাল। ঠিক মতো মেক-আপ করলে রুখু চুল ফাঁপিয়ে দিলে, সকলেরই চোখে পড়ছে অথচ কাউকেই ঠিক চোখে দেখছে না, এই ভাবটি ফোটাতে শিখলে এও হবে সেই দেমাকওয়ালিদেরই মতো, মজুমদার যাদের দেখতে পায় রোস্টার'য়, রেসকোর্সে। যাদের সে তারিফ করে মনে মনে, মনেপ্রাণে, কিন্তু আজ পর্যন্ত যাদের চোখে পড়তে পারেনি বলে বাধ্য হয়েছে বিয়ের হিসেব থেকে তাদের বাদ দিতে। অগত্যা চোখ রেখেছে নিচুতেই—মাঝারিগোছের বাঙালি ঘরে, আর সেই মাঝারিঘরের পক্ষে এটি অবশ্য উঁচু-দরের, এতই উঁচু যে বলনে-চলনে পাকা হলে এ-ই পারবে সেই সবচেয়ে উঁচুতে তাকে চড়িয়ে দিতে। এই হাত দুখানাই ঠেলে নিয়ে যাবে তার সৌভাগ্যের গাড়ি এমনকি লেডি গান্ধুলির ড্রয়িংরুম, রানি রুস্তমী'র জল-পাটি পর্যন্ত... আর বিজনও কাজে লাগবে মন্দ না। ভাইগুলো জাত-ক্যাংলা, দু-আনার মায়া কাটাতে পারেনি, কেরানি করে রেখেছে এক-একটাকে, কেরানিই থাকবে সারা জীবন। বাবাকে করেছে ক্যাশিয়ার—বাবা যা ভালই পারবেন, তার জন্য আর বাইরের লোককে মাইনে গোনা কেন? কিন্তু এসব ছাড়া আর একজনকে সে খুঁজছিল মনে মনে, যাকে একটু বললেই বাকিটা বুঝতে পারে, আর একটু পেলেই যে বড়ো খুশি হয় না। বিজনের, আর যা-ই হোক, নাকটা উঁচু, টাকা দেখলে খাবি খায় না। বড়ো বড়ো অঙ্ক বেশ সহজেই মুখে আনতে পারে। ...চেয়ারে একটু নড়ে সিগারেট বের কবিল, ঘাড় বাড়িয়ে নিচু গলায় বলল—আপনার কি অসুবিধে হবে ধোঁয়ায়?

স্বাতীর মন ছিল ছবিত্তে, শুনতে পেল না। মজুমদার একটু গলা চড়িয়ে দ্বিতীয় বারে পৌঁছিয়ে দিল তার অনুরোধ।

না, না, অসুবিধে কী—পলকের জন্য তাকিয়েই স্বাতী স্বামীর ছবি দেখতে লাগল দু-দিকের হাতলে কনুই রেখে, হাতের উল্টো পিঠ গালে ঠেকিয়ে। এতক্ষণে ভাল লাগছিল স্বাতীর। এসেছে সে অনিচ্ছায়, এসেও অস্বস্তিতে কাটিয়েছে ইন্টার্ল পর্যন্ত। মন তার স্থিরই ছিল, কিন্তু সকালবেলা হঠাৎ এল ছোড়দি, এসে প্রথম কথা বলল—তৈরি হয়ে থাকিস, আমরা তুলে নেব তোকে।

মানে?

আ-হা! স্বাতীর গম্ভীর ভাবটা গায়েই মাখল না শাম্ভতী।

আমি তো বলে দিয়েছি দাদাকে যে যাব না।

ওঃ! কী আমার বলে দেনেওয়ালি!

দাদা বুঝি গিয়েছিল আবার তোমার কাছে?

গিয়েছিল এই কথা বলতে যে প্রবীর মজুমদার সিনেমার পরে চিনে রেস্টোরঁয় নেমস্তন্ন করেছে আমাদের। বেশ উৎসাহ ফুটল শাস্ত্রীর গলায়। কিন্তু স্বাতী আবারও বলল—আমি যাব না। কী বোকার মতো কথা! ভদ্রলোক সব ব্যবস্থা করেছেন—আমরা রাজী হয়েছি—এখন না-যাওয়াটা মারাত্মক অভদ্রতা হবে।

তোমরা রাজী হয়েছ, আমি না।

তাহলে যাবি না? মনে-মনে রাগল শাস্ত্রী।

না।

কেন? স্বাতী জবাব দিল না।

কিছু হয়েছে?

না—কী হবে।

ঝগড়া করেছে বিজু?

না তো।

তোকে কেন্ন বিষয় দেখছি?

নাকি?

বল না ব্যাপারটা কী?

কিছু না। স্বাতী মৃদু হাসল। শাস্ত্রী আর রাগ চাপতে পারল না। ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল—আমরা সবাই যেতে পারি আর তুমি পার না, না? মস্ত ইম্পর্ট্যান্ট লোক হয়েছ একজন!

হয়েছি বোধহয়, নয়তো এত করে বলছ কেন? দাম্ভিক জবাব দিল স্বাতী।

বলছি এই জন্য যে তোকে ফেলে যেতে খারাপ লাগছে আমার। না, তার জন্যও না—তোর ভাল লাগবে বলেই বলছি! বলে শাস্ত্রী দুমদাম পা ফেলে বেরিয়ে গেল। স্বাতীর আশা হল যে ছোড়দি রাগ করে ওকথা আর পাড়বেই না, কিন্তু হল উল্টো। তার গলা শোনা গেল বাবার কাছে, আর একটু পরেই ফিরে এল বাবাকে নিয়ে।

বলো, বাবা, বলো ওকে! জুলজুল করল শাস্ত্রীর চোখ।

রাজেনবাবুর মনে পড়ল এই দু-বোনের ছেলেবেলার ঝগড়া, চ্যাচামেচি, মারামারি... ভাগ্য এদের, এখনো তা ফুরোয়নি আর আমারও ভাগ্য, এখনো দেখছি। হেসে ফেললেন, কী রে? হয়েছে কী? স্বাতী মুখ খোলবার আগেই শাস্ত্রী গলা চড়াল—ওকে তুমি এমন অমিশুক বানিয়েছো, বাবা! কিন্তু ভদ্র সমাজে চলতে-ফিরতে হবে তো একদিন!

আমি বানিয়েছি বুঝি?

তা ছাড়া আর কী! কোথাও যেতে দেবে না বাড়ির বাইরে—

বাবা কেন যেতে দেবেন না! স্বাতী বলে উঠল—আমারই ইচ্ছে করে না কোথাও যেতে।

ঐ তো! নিজের ইচ্ছেটাকেই চরম বলে ভাবতে শিখেছে!

আচ্ছা, আচ্ছা— রাজেনবাবু শালিশি করলেন। আজ ছোড়দির ইচ্ছা চরম হোক। তা আমার বুঝি নেমস্তন্ন না? শাস্ত্রী স্বাধীনভাবে একটু খরচ করেছে এতদিনে, মনে-মনে তিনি খুশি।

বাবা— কী বলতে গিয়ে স্বাতী থেমে গেল। আর তার থেমে যাওয়াটাকে চাপা দিয়ে শাস্ত্রী তাড়াতাড়ি বলে উঠল—বলিনি বুঝি তোমাকে? বিজুর সেই বন্ধু নেমস্তন্ন করেছে আমাদের।

বিজুর বন্ধু?

মজুমদার—সেদিন খাওয়াল যাকে।

ও।

যদিও বিজুর বন্ধু, শাস্বতী হাসল, ভদ্রলোক বেশ ভালই...আমরা যাচ্ছি, স্বাতীও চলুক না, বাবা।
কথাটা শোনাল যেন স্বাতী যেতে চাচ্ছে না বাবার অমত হবার ভয়ে, আর তার হয়ে বাবার
মত করাতে এসেছে ছোড়দি। স্বাতী তক্ষুনি বলল—না বাবা, আমি যাব না।

এ-কথাতেও রাজেনবাবু শুনলেন স্বাতীর যাবার ইচ্ছা। সত্যি তো ওর আরো বেরোনো উচিত,
বেড়ানো উচিত। কত রকম ফুটি করে আজকাল এ-বয়সের মেয়েরা। একটু জোর দিয়ে
বললেন—যাবি না কেন, নিশ্চয়ই যাবি। গেলে ভাল লাগবে।

কেমন যেন নিরুপায় হয়ে স্বাতীকে দলে ভিড়তে হল। নিজেকে অসহায় লাগল মজুমদারের
গাড়িতে বসে। মনের মধ্যে গুমরে ফিরল এই সন্দেহ যে বাইরে বোঝা না গেলেও মনে-
মনে তার দিকেই মজুমদার মন দিচ্ছে বেশি, তারই জন্য আজকের এই আয়োজন। আবার
সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ধমক দিল—দেমাকে টাপুটুপু না হলে এ-রকম কি ভাবতে পারে কেউ?
স্বাতী চেষ্টা করল সহজ হতে, অন্যদের ফুটির সুরে সুর মেলাতে, দাদা-ছোড়দির হাসাহাসিতে
যোগ দিতে। কিন্তু গাড়ি চালাতে-চালাতে মজুমদার হারীতদাকে কি বলছে সেইটে শুনতেই তার
কানের যেন আগ্রহ, তার চোখ বার-বার ঠেকে যাচ্ছে ফিকে-নীল কলারের উপরে মজুমদারের
টটকা-ছাঁটা ঘাড়ে। খানিক পরে রাগই হল নিজের উপর ঐ ভদ্রলোকের কথা অত ভাবছে
বলে। সিনেমায় এসেও তার অস্বস্তি গেল না, আর ঐ কোন্ড ড্রিঙ্ক নেবার সময় তো প্রায়
ধরা পড়েই গিয়েছিল, প্রায় ঢাকনা খুলেই দিয়েছিল তার দেমাকের, তার বোকামির। সে ভাবছে
যে মজুমদার তার কথাই ভাবছে, মজুমদার এ-কথা ভাবল তো!...নিজেকে ধরে মারতে ইচ্ছা
করল তার। কিন্তু আসল ফিল্মটি আরম্ভ হবার দু-তিন মিনিটের মধ্যেই এ-সব তার মন থেকে
মুছে গেল। হয়তো ছবিটি সাধারণের উপরে বলে, কিংবা সে কালে-ভদ্রে সিনেমা দ্যাখে বলে,
কিংবা হয়তো তার নভেল-পড়া মনে বানানো ঘটনার সাজানো সুখমা প্রবল নাড়া দেয় বলে,
প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে তাকে টেনে নিল দ্রুত, জীবন্ত-উজ্জ্বল ছবিগুলি। যা দেখেছে তা তো ভালই,
যেখানে বসে দেখছে তাও ভাল লাগল। মেট্রোর দোতলায় আগে আর আসেনি সে, এক্ষণে
বুঝল চেয়ারটা কত আরামের, পিঠে কত নরম, হাঁটু রাখার জায়গা কত বেশি। ক্রপেট মোড়া
গদি, সোনালি সিলিং, দেয়ালে ছবি—লোকে ছবি দেখবে অন্ধকারে বসে তো হবে আর ওসব
কেন—কিন্তু ওসবের জন্য, স্বাতীকে মানতেই হল, ছবিটা ভাল লাগে আরো। তখনকার মতো
অন্য সব কথা ভুলিয়ে দিতে চারদিককার এই সুন্দর ষড়যন্ত্র মুগ্ধ করল স্বাতীকে। শরীরের
আরামে ডুবে গেল সে, মনের বিশ্রামে—কেননা সিনেমা ভাঙার সময় দেয় না। তার পক্ষে
নতুন এই বিলাসিতার চেতনায় পাশের চেয়ারের মজুমদার ছিল গেল হাজার মাইল দূরে, তাকে
ভুলতে পেরে স্বাতীর সুখ সম্পূর্ণ হল। আর সেই সুখের তাপ জুড়িয়ে গেল না ছবি শেষ
হবার সঙ্গে-সঙ্গেই। সিনেমা দেখায় অভ্যস্ত অভিজ্ঞদের মতো বাইরে এসেই তার ফাঁকা-ফাঁকা
লাগল না। আবার জমকালো সিঁড়ির জমকালো ভিড়ের মধ্যে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে নামতে-
নামতে একথা ভাবতেও তার ভালই লাগল যে এখন বাড়ি না-ফিরে আবার যাবে অন্য এক
নতুন জায়গায়।

*

চাং-আন রেস্তোরাঁয় স্বাতী যেন অন্য মানুষ। স্বচ্ছন্দে কথা বলল, আনন্দে হাসল, একটু যেন

উদ্ভেজনাই ধরা পড়ল তার ঝলকানো চোখে আর রং-লাগা গালে। এই সে প্রথম চোখে দেখল কলকাতার চীনে পাড়া। সরু, প্যাচানো, কম-আলোর গলি—গলির মোড়ে আর ঘরের দরজায় গুলিয়ে যায়। চ্যাপ্টা মুখের ট্যারচা চোখের চীনেদের মাছ-পাতুরি-ঘেঁষাঘেঁষি পুরুষ, মেয়ে, ছেলেপুলেও; ভাত ঝাচ্ছে কাঠি দিয়ে, তাস খেলছে একমনে, বাচ্চা-কোলে মা দাঁড়িয়েছে রাস্তায়। ঘর থেকে পা বাড়ালেই তো রাস্তা, একটা সিঁড়িও পেরোতে হয় না—তাই সমস্ত গলিটা, মানে, সবগুলি গলির সমস্তটাই মনে হয় ওদের বাড়ি-ঘর, গাড়িটাকে বড্ডো বেটপ লাগে, একটু অভদ্র। বার দশেক মোড় নেবার পর স্বাতী অবাক হল, মজুমদার একবারও পথ ভুল করল না! ফটকওয়ালা যে দোতলার সামনে গাড়ি দাঁড়াল, সমস্ত পাড়ার মধ্যে সেটিই সবচেয়ে ভাল বাড়ি আর এতই বাড়ির মতো দেখতে যে স্বাতী প্রথমে বোঝেইনি যে এটাই চাং-আন। বাইরে ঝলমলে আলো নেই, নাম লেখা নেই। আর ভিতরেও চুপচাপ একটি টেবিলে দুজন বুড়োমতো সাহেব বসে আছে সামনে গেলাশ নিয়ে। কিন্তু তাদের দিকে তাকাবারও সময় পেল না, তারা উপরওয়ালা! ভাবছিল দুই জানালার ফাঁকে ঐ কোণের টেবিলটায় বসলে হয়। কিন্তু না—তাদের জন্য চার নম্বর কেবিন। তা মন্দ কী, এখানেও জানালা আছে—কালো অন্ধকার ঝুলে আছে মখমলের পরদার মতো, আবার একটু পরেই অন্ধকার ছাড়িয়ে আকাশ চিনতে পারল তিনটি তারার মিটমিটে চোখে...আর, এক চামচে সুপ মুখে দিতেই ধারাল একটি খিদে যেন চেতিয়ে উঠল তার মধ্যে। শুধু খাবার খিদে নয়, কথা বলার, হাসির, বন্ধুতার খিদে। বইয়ের বাইরে জীবন্ত মানুষের যে জগৎ সেই জগতের জন্য খিদে। সে-ই কথা আরম্ভ করল এই বলে—ফিল্মটা কেমন লাগল, ছোড়দি?

ভাল। শাস্ত্রী কথায় যা বলল তার আওয়াজ তা বলল না। সব ফিল্মই তার প্রায় একই রকম লাগে মোটামুটি। তখন-তখন সবই ভাল লাগে, পরে আর কিছুই মনে করতে পারে না। ফিল্মটা খুবই ভালো—হতে পারত—শেষটা যদি—

হলিউডের বুদ্ধি! হারীত দাঁত দেখিয়ে হাসল মজুমদারের দিকে, কেননা উপস্থিত ক-জনের মধ্যে মজুমদারই যাহোক কথা বলার যোগ্য।—শেষ পর্যন্ত বড়োলোকও হল ছেলেটা—হাঃ! আমাকে এ বিষয়ে কিছু বলবেন না—মজুমদার আরো চওড়া করে হাসল। কিন্তু শব্দ না করে—আমি ভাল করে দেখিইনি। সিনেমায় গিয়ে সিনেমাই যদি দেখলাম তবে আর যাওয়া কেন? এই পুরুষালি রসিকতায় হারীত হেসে উঠল অন্যরকম সুরে। আর স্বাতী মানে বুঝতে না পেরে অবাক হল—কেন, দ্যাখেননি কেন?

আদ্যেকটা একেবারেই দেখিনি। মজুমদার সত্য কথা বলল। কিন্তু কেন? স্বাতী প্রশ্ন ছাড়ল না। মুখ গম্ভীর করে মজুমদার জবাব দিল—ভাবছিলাম। এতটাই যখন বলতে পারলেন তখন কী ভাবছিলেন সেটাও বলে ফেলুন।—হারীত দয়া করল মজুমদারকে, দোস্তালির সুর লাগল কথায়। আপনাদের নিয়ে এই সন্ধ্যাটা যে কাটাতে পারছি, আমার সেই সৌভাগ্যের কথা ভাবছিলাম—কথাটা শেষ করতে-করতে মজুমদার স্বাতীর মুখে একটু... একটুখানি চোখ রেখেই সরিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু স্বাতীর চোখ আটকে ফেলল তাকে। ফিল্মের মস্ত অসুবিধে আমার এই মনে হয়, স্বাতী বলল—যে মানুষ কী ভাবছে সেটা বলা যায় না। স্বাতীর চোখ আশায় কাঁপিয়েছিল মজুমদারকে, কথা শুনে চুপসাল। তবু চেষ্টা করল

সেই কথার সুতো ধরেই তার ইচ্ছায় পৌঁছতে—মানুষ কী ভাবছে তা জানতে আপনার ইচ্ছে করে বুঝি খুব?

ও কিছু না! হারীত মত দিল তক্ষুনি—বুর্জোয়া কলচরের বিষফোঁড়া! আমি তো ফিকশন পড়তেই পারি না গোয়েন্দাগল্প ছাড়া।

সত্যি! এতক্ষণে বিজন একটা প্রমাণ দিল যে কথাবার্তা তার কানে যাচ্ছে। —যা এক-একখানা ডিটেকটিভ নভেল—ওঃ! বলেই চোখ নামালো মিঠে-টক পর্কের থালায়। তাই হারীতের চোখের অবজ্ঞার হলকা তাকে ছুঁয়েও ছুঁলো না। মজুমদার মুখের ভাবে হারীতের কথায় সায় দিল, আর স্বাতীকে লক্ষ্য করে কথাটা জীইয়ে রাখল—আপনার কীরকম বই ভাল লাগে?

যে বই সত্যি কথা বলে সে বই ভাল লাগে আমার।

বানানো গল্প আবার সত্যি হয় নাকি? শাস্ত্রী হাসল। —হয় তো! বিজু খবর দিল। টু-স্টোরি ম্যাগাজিন দ্যাখোনি?

ঠিক তা নয়, আমি বলছিলাম কী—স্বাতীর একটু লজ্জা করল প্রথমে। কিন্তু বলতে-বলতে বেশ স্বচ্ছন্দেই বলে ফেলল—বলছিলাম যে মানুষ তো ভাবে মনে-মনে, আর যা ভাবে তা মুখে বলে না। মনের কথা জানা যায় শুধু পড়লে, আর গল্প পড়ার মজাই তো এ!

কেমন একটা চমক লাগল কথাটায়। যা ভাবে তা বলে না বুঝি কেউ?—বলে মজুমদার যতটা হাসল ততটা হাসির কথা ওটা নয়, আর হারীত থেমে গেল মাংসের টুকরো কাঁটায় ফুঁড়তে গিয়ে। একটু তাকিয়ে থেকে, স্বাতীর দিকে কাঁটা উঁচিয়ে বলল—স্বাতী, তোমার নক্ষি আছে, কথা বলতে শিখেছ, কিন্তু মর্বিড হয়ে যাচ্ছে। তোমার এখন উচিত—বলতেও যাচ্ছিল তোমার এখন উচিত বিয়ে করা। কেননা সেই মুহূর্তে স্বাতীকে তার ভাল লাগছিল বেশ, আর তার পাশে বড্ডো ফ্যাকাশে লাগছিল নিজের স্ত্রীকে। কিন্তু একজন অল্প-চেনা মাদুষের সামনে এই নরম মনের জানান দিতে চাইল না, ঠিক সময়ে ব্রেক কষে দিল। হারীতদার গলার আর তাকানোর উষ্ণতা স্বাতী অনুভব ফরল মনে-মনে, উপভোগ করল নিঃশব্দে।

শাস্ত্রী বলল—কী-উচিত জেনে নিলি না, স্বাতী?

কী উচিত? হারীতদার মনঃপুত হতে হলে তোমার মতো হওয়া উচিত। স্বাতীর এক-কথায় মজুমদার আর হারীত হেসে উঠল একসঙ্গে। বিজুও হাসল—শাস্ত্রীও—কিন্তু শাস্ত্রীর হাসিটা কেমন জোর-করা, সুর-ছাড়া। এই তো দেখুন—ছোড়দিকে লক্ষ্য করল না স্বাতী, আলাদা করে মজুমদারের দিকে তাকাল এবার—হারীতদা কেমন বলতে-বলতে থেমে গেলেন। মনের কথা কি মুখে বলে কেউ?

আগেরবার শাস্ত্রী যেমন, এবারে তেমনি জোর-করা হাসি মজুমদারের আর হারীতের। থেমেও গেল তক্ষুনি, দুজনেই একটু যেন আড়ষ্ট। এ-মুখ থেকে ও-মুখ তাকিয়ে স্বাতীর আরো সাহসী লাগল নিজেকে, আরো স্বাধীন। আবার বলল—ফিল্মের ঐ ছেলেটা মুখে ঘোমা করছে বড়োলোকদের, কিন্তু মনের কথা ঠিক উল্টো।

ঠিক—উৎসাহে প্রায় চৌঁচিয়ে উঠল মজুমদার। একে তো কথাবদলের আরাম, তার উপর এমন মনের মতো কথা! পাছে অত্যন্ত বেশি উৎসাহ ধরা পড়ে, গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বলল—এত যে রোখা-চোখা কথা চারদিকে, সে তো বড়োলোকদের সবাই হিংসে করে বলেই।

—বড়োলোক হবার এই একটা সুবিধে তো আছেই যে সবাই হিংসে করছে ভেবে সুখী হওয়া যায়।

মজুমদারের মুখ অন্য-ধরনের গম্ভীর হল, আর হারীত গলা ছেড়ে হেসে বলল—তা বড়োলোকদের তোয়াজ করার চাইতে হিংসে করা ঢের ভাল, আমি তো বলি মহৎ গুণ সেটা। হিংসেটাই তো সবচেয়ে বড়ো তোয়াজ— চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে মজুমদার হেসে উঠল হো-হো করে, আর হারীতের চোখ তার দিকে তাকিয়ে হিংস্র হয়ে উঠল প্রায়। কিন্তু সেই চোখই স্বাতীর মুখে সরে নরম হল; একটু তাকিয়ে থেকে ছেলেমানুষের এই বেয়াদবি ক্ষমা করল সে।

স্বাতী দেখল যে কথাবার্তায় সেই কর্তা। দেখল, সে যা বলে তা-ই বেঁধে, নয় হাসায়; সাজগোজ করা প্রকাশ মজুমদার, বিদ্বান ঠোটবঁকা হারীতদা—তার কথা উড়িয়ে দেয় না একজনও, বরং আরো শুনতেই চায়। আর দাদা আর ছোড়দি মুছেই গেছে। একা সে-ই কথা বলছে বয়স্ক দুজন পুরুষের সঙ্গে, সমকক্ষের মতো। শুধু সমকক্ষ? নিজের সম্বন্ধে স্বাতীর ধারণা বদলে গেল, কেননা এর আগে এমন সমানে-সমানে কখনো কথা বলেনি হারীতদার সঙ্গে, সামনেও না। নিজেকে এতদিন যেখানে বসিয়েছিল তার অনেক, অনেক উঁচুতে উঠে গেল এক লাফে। আরো কথা এল মনে, মুখে... আগে জানতও না এত কথা সে জানে। সাত রাজ্যের বই পড়ে পড়ে যত কথা তার মনের তলায় এলোমেলো পেঁচিয়ে পড়ে ছিল, সব যেন দাঁড়িয়ে গেল সার বেঁধে, পর-পর বেরিয়ে আসতে লাগল এমন ঠিক-ঠিক সময়ে যে স্বাতী নিজে তো অবাক হলই, এও বুঝল যে অন্যেরাও অবাক হচ্ছে। যত বুঝল যে আজ তার জিতের হাত, তত সে বলল, আর যত বলল তত জিতল সে। যে এক ঘণ্টা ধরে ঝাওয়া হল—তার, আর অন্যদের মধ্যে অস্তুত দুজনের—মনে হল যেন পাঁচ মিনিট।

হারীত বসেছিল টেবিলের মাথায়, তাই বিল ধরা হল তার সামনেই। তাকিয়ে বলল—আজ আপনার অনেক খরচ হল মিস্টর মজুমদার। মন থেকেই বলল কথাটা। নিজে যে খরচ ভালবাসে না অন্যের খরচও তার খারাপ লাগে, তার ভোগে নিজের ভাগ থাকলেও। বাঁ হাতে এক তাড়া নতুন নোট বের করল মজুমদার। ডান হাতে গুনে ক-খানা দিল, বোয় বেরিয়ে যাবার আগেই বলল—রোজ পঞ্চাশ টাকা তো এমনি-এমনিই গলে যায়।

হারীত তাকাতে চাইল ঠাট্টার চোখে, কিন্তু একটু হকচকানিও ফুটল। রাজার ছেলে মর্করন্দ, সেও তো কোনো পার্টি দিতে হলে সস্তা রোঁজে? কিন্তু তার-যে বাপ বেঁচে এলেনো। বরাদ্দ মাসোহারায় চালাতে হয়। আর এ-লোকটার টাকা তার নিজের, নিজের স্নেহগার, জবাবদিহি নেই কারো কাছে। তাই বলে বাজে খরচই রোজ পঞ্চাশ টাকা? কী মর্কর! অত পারে নাকি কেউ? কেন পারবে না? একটু বদ হলেই পারে। লোকটা হয় বদ নয় মিথ্যুক, এ-কথা ভেবে হারীত তার আত্মসম্মান ফিরে পেল। মজুমদারকে বাঁকা চোখে ঝিঁঝি ভারি গলায় আন্তে-আন্তে বলল—প্রচুর, প্রভূত, অফুরন্ত টাকা থাকার মতো সুখ জীবনে আর কিছু নেই—কী বলেন? মজুমদার বুঝল না হারীত যা ভাবছে তা-ই বলছে, তাই লজ্জা পেল। নেই-ই তো! ফশ করে বলে উঠল বিজন—সকলেরই সে-জন্য চেষ্টা করা উচিত।

কিন্তু সকলের তা হতে পারে না, অতএব কারোরই হওয়া উচিত না!—ঘোষণা করল হারীত। টাকার বেলায় না-হয় আইন করলেন, উঠে দাঁড়ানো স্বাতীর দিকে তাকিয়ে একটা উত্তর যোগাল মজুমদারের—কিন্তু মেয়েদের রূপ, পুরুষের বুদ্ধি, এ-সবের কী হবে?

মেয়েদের শুধু রূপ আর পুরুষের শুধু বুদ্ধি? স্বাতী চোখ তুলল, ভুরু বাঁকাল। মুগ্ধ হল মজুমদার। কী সুন্দর মানাবে হিরের কণ্ঠি? তার চোখের প্রশংসা ঝরে পড়ল স্বাতীর গলায়, গলার তলায়,

কথা বলতে ভুলে গেল। আর তার হয়ে জবাব দিল শাস্তী, তার মানে মজুমদারের মনের কথাই বলল, শুধু ভিন্ন সুরে—তোর মত মেয়ে তো কমই জন্মায় যার যেমন রূপ তেমন বুদ্ধি!

অনেকক্ষণ ধরে চেপে-রাখা একটা নিশ্বাস কথাটার সঙ্গে ছাড়া পেল। মজুমদার তা লক্ষ্য করল, আর তক্ষুনি দোষ দিল নিজেকে। দুজন মহিলা যেখানে উপস্থিত সেখানে একজনকে লক্ষ্য না করার কারণ যদি এ-ও হয় যে অন্যজনের রূপও যত বুদ্ধিও তত, তবু বেয়াকুবির তো মাফ নেই। আর যে-কোনো অবস্থায় মাথা ঠিক রাখতে পারাকেই বলে বুদ্ধি। নিজের বুদ্ধি সম্বন্ধে ধারণা নেমে গেল তার। মিস্টার নন্দী যদি মিসেস নন্দীকে লক্ষ্য না করেন সেটাকে ভদ্রতা বলে চালানো যায়, কিন্তু আমার ব্যবহার আগাগোড়াই অন্যরকম হবার কথা, লক্ষ্য সামনে রেখে উপায়ের দিকে মন দিলে তবে তো লক্ষ্যভেদ! কী করে আমি ভুললাম যে ইনি আমার পক্ষ নিয়েছেন নিজে থেকেই, প্রথম থেকেই, আর কাজের সময় ইনিই দাঁড়াবেন আমার প্রধান সহায়—বিজ্ঞানের চেয়েও বড়ো সহায়। কেননা এটাই-তো স্বাভাবিক যে বিয়ে-হওয়া মেয়ের কথাতেই বিপত্তীক বুড়ো বাপ কান দেবেন। কিন্তু আমি যদি এরকম ভুল করি, তাহলে আর কী করে কী হবে! মজুমদার সংশোধনের চেষ্টা করল তক্ষুনি। বেরোবার দরজার ধারে, প্রায় দরজা আগলে দাঁড়িয়ে বলল আপনার কাছে আমার একটি ক্ষমা চাইবার আছে, মিসেস নন্দী। কীসের জন্য বলুন তো?

আপনি নিশ্চয়ই এখন বাড়ি ফিরতে ব্যস্ত—

কেন?

বাড়ি থাকলেই ফিরতে ব্যস্ত হয় মানুষ—মজুমদার একচোখে তাকাল হারীতের দিকে, একবার নিশ্বাস ফেলল যেন দম্পতীর আনন্দকে ঈর্ষা করে, তারপর কথা শেষ করল—কিন্তু আর একটু সময় যদি দেন আমাকে, একটুখানি সময়, একটু কফি খেয়ে নেব ফিরতি পথে। চীনেদের খাবার-টাবার ভাল, কিন্তু কফির জন্যে কাউফমান। হিটলার ইহুদি খেদিয়ে আমাদের এই একটা সুবিধে করে দিয়েছে যে সত্যিকার কফি আমরা চিনতে পেরেছি এতদিনে। মজুমদারের সমস্তটা বক্তৃতা শাস্তীকে লক্ষ্য করল, শাস্তীকেই কতী বানাল তার গলার আওয়াজ। সে দেখতে পেল তার কথায় কাজ হচ্ছে, আর তক্ষুনি হারীতের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল—মাফ করবেন, মিস্টার নন্দী। হিটলারের কথাটা হয়তো ভুল বলেছি, কিন্তু কফির বিষয়ে বলিনি, আশা করি তা প্রমাণ করতে পারব।

তখনকার মতো শহুরে সভ্য না-হয়ে হারীত পারল না। আপনার আতিথেয়তার—

প্রতিদান দেবেন? নিশ্চয়—যেদিন আদেশ করবেন সেদিনই আমি হাজির হতে রাজী।

হারীত সে-কথা বলতে চায়নি, কোনোটো ভদ্রতার বাধা বুলি আওড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু এর পরে মজুমদারের কথাই মেনে নেবার ভাব দেখিয়ে বলতেই হল—সে-তো খুব সুখের কথা, কিন্তু আপনি যা ব্যস্ত, কোথায় ধরব আপনাকে?

আমাকে? কেন, আমাকে ধরার জন্যে ভাবনা কী—বিজ্ঞানের কাছে আমাকে যেতেই হয় মাঝে মাঝে—যেতেই হবে, ওখানেই তো সবচেয়ে ভাল, কী বলো ভাই বিজ্ঞান? বলে দেলোয়ারি ধরনে বিজ্ঞানের কাঁধে হাত রাখল মজুমদার। 'মিস্টার মিট্র'র মহিমা থেকে হঠাৎ এই ঘরোয়া ঘনিষ্ঠতায় বদলি হওয়াটা তার পক্ষে সুখের হল কিনা ঠাওরাতে না-পেরে বিজ্ঞান হেঁ-হেঁ করে হাসতে লাগল। তাহলে আর দেরি না, কেননা তার প্রস্তাব পেশ করে, পাশ করিয়ে মজুমদার

সরে দাঁড়াল টান হয়ে, কাটা দরজার একটি পাট হাতে ধরে—ফ্রাউ কাউফমান খন্দের যত ভালবাসেন, তার চেয়েও খারাপ বাসেন রাত জাগতে।

কফিতেই শেষ হল না। আবার লেকে দু-চার চক্করও। অতিথিদের যার-যার দরজায় নামিয়ে দিয়ে মজুমদার একা হল এগারোটা রাত্তিরে। আর যে-মুহুর্তে একা হল, তার টগবগে ঝকঝকে ভাবটা খসে পড়ল মুখ থেকে, নাকের পাশের রেখা মোটা হল, নিচের ঠোঁট উপরেরটিকে ঢেকে দিল, খুতনি ঝুলে গলার চামড়া ঢিলে হল, বেরিয়ে এল ক্লান্ত একজন মানুষ, বড়ো ক্লান্ত, প্রায় বুড়ো। সোজা সে এল গীতালির বাড়িতে—হ্যাঁ, ফিল্মেরই গীতালি। তার জন্য বসে থেকে-থেকে মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়েছিল প্রায়। চোখ রগড়ে বলল—এত দেরি? কোনো আগ্রহ ফুটল না কথাটায়, কৌতূহলও না, যেন এ-ই বলতে চাইল যে এত যেদিন দেরি হয় সেদিন আর না এলেই তো পারো। মজুমদার জবাব দিল না। জুতো-টুতো সুদ্ধ এলিয়ে পড়ল তার নিজের পছন্দ করে কেনা কাউচটিতে।

খাবে নাকি?

না। মেয়েটি পরদা-ঢাকা দরজার দিকে তাকিয়ে ডাকল—লক্ষ্মী! আর সেই ডাকে তার গলার আওয়াজ প্রাণ পেল—লক্ষ্মী, আমার খাবার দে। খাবার এলো, গীতালি একটুও দেরি করল না।

তার খাওয়া, আর-কিছু করবার নেই বলে, মজুমদার দেখল তাকিয়ে-তাকিয়ে। গাল দুটো ফুলছে আর ডুবছে, বর্গমণি কাঁপছে, মুখের ভিতরটা দেখা যাচ্ছে মাঝে-মাঝে, জিভ বার-বার চেটে নিচ্ছে ঠোঁট। একটি কথা বলছে না, একবার চোখ তুলছে না। হাতে ছিঁড়ছে... দাঁতে চিবোচ্ছে... গলায় গিলছে... খাওয়ার একটা যন্ত্র হয়ে উঠেছে তার শরীর। আমার জন্য বসেছিল এতক্ষণ, খিদে পেয়েছে—বেচারি! এ-কথা মনে হতে পারত মজুমদারের, কিন্তু হল না। নিজের পেট ভরা বলে, আর মেয়েটির কাছে ছ-মাস ধরে আসছে বলে সে দেখল শুধু কুশ্রীতা। অসহ্য কুশ্রীতা। শুধু ঐ মেয়েটির নয়, সমস্ত স্ত্রীজাতির কুশ্রীতা। হঠাৎ বুঝল, সারাদিনের ক্লান্তির চেয়েও বড়ো ক্লান্তি সারাদিনের পরে কোনো-একটা স্ত্রীলোকের কাছে আসা, আর সেই ক্লান্তিকে কিনা ডাকতে হচ্ছে জীবনের মতো, সারা জীবনের মতো, আর-কোনো কারণে না, সুদ্ধ জীবন মেটাতে, তাক লাগাতে! কী যন্ত্রণা টাকার!

৫

গাড়ির দরজা খোলার একটুখানি আওয়াজে আলো জ্বলে উঠল ভিতরের ঘরে, বাইরের ঘরে। আর দরজা খুলে রাজেনবাবু যেই দাঁড়ালেন, ঠিক তখনই গাড়ির মোড়ে মিলিয়ে গেল গাড়ির পিছনের জ্বলজ্বলে লাল পাথর-চোখ। বিজু চলে গেল ভিতরে। স্বাভাবিক বসে পড়ল বাইরের ঘরেই, পাখাটা খুলে দিল বসবার আগে। ঘরটা গরম—আর বড্ডো ছোটো না?

মেয়ের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে দেখলেন রাজেনবাবু। তারপর বললেন—যেতে তো চাননি, বেশ ভালই লাগল তো? স্বাভাবিক কথা বলল না। তার চামড়ায় তখনো বয়ে যাচ্ছিল লেকপাড়ের গাড়িচলার বেশিরাতের হাওয়া। রাজেনবাবু আবার বললেন—স্বাভাবিক এল না?

কই, না তো! চলে তো গেল।

ভালই করেছে।

এলেই আরো দেরি হত, এগারোটা বেজে গেছে এমনিতেই—।

এত বেজেছে? রাজেনবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন—যা এখন, শুয়ে পড়। বলতে বলতে একটা হাই তুললেন নিজে। তাই তো, এখন শুয়ে পড়া ছাড়া আর কী করবার আছে? কিছু নেই, কিছুই নেই। রোজ রাতে একটা নির্দিষ্ট সময়ে শুয়ে পড়তেই হবে, ঘুমোতেই হবে প্রতি রাতে প্রত্যেক মানুষকে। বিশ্ববিধাতার এই ব্যবস্থার উপর একটু রাগ করেই মাথা ঝেঁকে উঠে দাঁড়াল স্বামী, আর দাঁড়িয়েই দেখতে পেল বাবাকে। শুধু-যে বাড়ি ফেরার পর এই প্রথম দেখতে পেল তা নয়, যেন অনেকদিন পর চোখে দেখল। যেন অনেকদিনের মধ্যেও বাবা এমন করে তার চোখে পড়েননি। সাদা, ছাইরঙা আর কালোয় মেশানো অল্প চুল মাথার, চোখের কোলে ছোটো-ছোটো আর নাকের পাশে মোটা-মোটা রেখা, গলার চামড়া ঢিলে, খোলা গায়ে থলথলে একটু ভুঁড়ি। কোঁচটা উল্টিয়ে কোমরে গোঁজা বলে সত্যিকার চাইতে বড়ো দেখাচ্ছে, ধুতি পরার কালো দাগের আভাস দেখা যাচ্ছে কোমরে। একজন বুড়োমানুষকে দেখল স্বামী—বুড়ো, ক্লান্ত, সঙ্গীহীন, আপাতত ঘুম-পাওয়া। চমক লাগল, অবাক হল, যেন বিশ্বাস হল না। কেননা এর আগে কোনোদিন স্বামীর চোখ বাবাকে বুড়ো দ্যাখেনি। কেমন লাগে বুড়ো হতে? কেমন লাগে বুড়ো হয়েও বেঁচে থাকতে? অন্য যত বুড়ো, আধ-বুড়ো মানুষ, রাস্তায় বেরোলেই যাদের দেখা যায়—তাদের কি মানুষের মধ্যে গণ্য করে স্বামী, কি তার বয়সের অন্য কেউ? না—নিজের ঘরে আসতে-আসতে কথটা ভেবে দেখল মনে-মনে—মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না তাদের, মনে হয় ওরা আছে কেন? না-থাকলে কী এসে যায়! মনে হয় পৃথিবীটা তাদেরই, তাদেরই জন্য, যারা বয়সে তার সমান কিস্বা কাছাকাছি বয়সের। সকলেরই তা-ই মনে হয়। অন্য সব বিষয়ে যত ঘোরতর অমিলই থাক মতের আর মনের, এই একটি বিষয়ে তারা সকলেই একমত একমন, যাদের বয়স পনেরো-ষোলো থেকে আরম্ভ করে চব্বিশ-পঁচিশ। এমন একমন যে এ বিষয়ে তারা কথা বলে না কখনো, এ-ওর চোখে তাকিয়েই বুঝে নেয়। তাদের সমস্ত হাসি, ঠাট্টা, ফুর্তি, আড্ডা আর সমস্ত ঝগড়াঝাটি, কান্নাকাটির মস্ত মোটা বইটার প্রথম পাতাতেই এই কথা ছাপানো আছে নিচে-লাইন-টানা মোটা-মোটা অক্ষরে। পঁচিশের পরেই একটু ঝাপসা—হারীতদাকেই মনে হয় আলাদা জাত, আর ঐ প্রকাণ্ড মজুমদারকে তো নিশ্চয়ই। তবু সত্যি বলতে, হারীতদার সাতাশে, এমনকি মজুমদারের বত্রিশেও আজ কি তার ভিন্নি লাগল? ঘরে এসে আলো জ্বালল। শাড়ি না-ছেড়েই বসে পড়ল চেয়ারে। ভাবতে চেষ্টা করল কতবছর বয়সে মানুষ বুড়ো হয়, কিংবা কত বছর পর্যন্ত হয় না। চল্লিশ? চল্লিশ সেরা কাকে চেনে? ঠিক! বড়ো জামাইবাবু। কত বয়স? তা চল্লিশ-টল্লিশ হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু বুড়ো? বাবার মতো?...হঠাৎ কেমন-একটা কষ্ট হল, বাবাকে মনে-মনেও বুড়ো ভাবল বলে। পৃথিবীর সেই-সব বুড়ো, প্রায়-বুড়ো মানুষ, পৃথিবীর যারা কেউ না, যারা বেঁচে আছে শুধু ট্রামের ভিড় বাড়াতে, বাবাও কি তাদেরই একজন? তার বাবা!

বুড়ো, ক্লান্ত, সঙ্গীহীন, ঘুম-পাওয়া, ঘুমোতে-না-পারা। বাবা ওঠেন খুব ভোরে—শীতে, গ্রীষ্মে সূর্য ওঠার আগে—ঘুমিয়েও পড়েন দশটার মধ্যে অঘোরে। আজ ঘুমোতে পারেননি—তার জন্যই। টেবিলের টাইমপিসে—বাবা এটা এনে দিয়েছিলেন ম্যাট্রিক-পাশের পরে—এগারোটা বেজে দশ, প্রায় ছ-ঘণ্টা পর বাড়ি ফিরল। এতক্ষণ বাড়ির বাইরে কবে থেকেছে? শিগগির তো মনে পড়ে না। কলেজেও এতক্ষণ কাটে না—আর কলেজ তো দিনের বেলা, সকলেরই

কাজ থাকে তখন, কিন্তু রাশিরে? জামাইবাবুর সঙ্গে দল বেঁধে গিয়েছে সবাই শ্যামবাজারে থিয়েটারে—সবাই। বাবা ছাড়া—কেন? যাঃ, বাবা আবার থিয়েটারে যাবেন কী—আর তাই বড়দিও প্রায়ই যাননি। যত উৎসাহে অন্যেরা গিয়েছে, তত উৎসাহেই বড়দি বাড়ি থেকেছেন। কেননা ‘নিরিবিলিতে দুটো কথা বলা যাবে বাবার সঙ্গে।’ আর সে? বাঃ, সে কি যেতে চেয়েছিল নাকি আজ? বাবাই তো বললেন, আর ছোড়দি এমন জোর করল—! কিন্তু যেতে চায়নি, তা কি বাবার জন্য?... না। নিজের কাছে জবাব দেবার আগে একটু থামল স্বাতী, যেতে চায়নি প্রবীরচন্দ্র মজুমদারের জন্য। মজুমদারের জন্য যেতে না চাইবার কারণ? ভাল লাগে না লোকটাকে—লাগে না? খুব স্বাধীন কাটল এই ছ-ঘণ্টা সময়?

স্বাতী নিজেকে দেখতে পেল মেট্রো সিনেমার মখমল কুশনে, কাপেটিমোড়া বলমলে সিঁড়িতে, চাং-আন-এর জমট কামরায়, লেক-পাড়ের হাওয়াগাড়িতে। আর ততক্ষণ বাবা? একলা বাড়িতে আলো-না-জ্বালা বারান্দার পাটিতে, একটা-দুটো পান, চুপচাপ-বাড়িতে চুপচাপ। বইপড়ারও অভ্যাস নেই বাবার—কী ভাবেন? তারপর কোনওরকমে না-টা বাজিয়ে একলা বসে খেয়ে নিয়ে আবার দুটো পান। আর তারপর শুয়ে পড়লেই ঘুম, কিন্তু তাও আজ হল না, একা—অন্ধকারে চুপচাপ জেগে থাকলেন তার জন্য, সাড়ে-দশটা, এগারোটা পর্যন্ত। হয়তো দেরি দেখে দুশ্চিন্তাও হল, কিন্তু সে কথা বলবার কেউ নেই। তাকেও কিছু বলবেন না, কোনো কথা বলবার কেউ নেই। তার সঙ্গে, সত্যি বলতে, কতটুকুই বা কথা আছে বাবার, আর তারই বা কী কথা বাবার সঙ্গে? বড়দি, তার পনেরো বছরের বড়ো, বাবার কাছে বসলে ঘর-সংসারের কথা তাঁর ফুরোয় না। কিন্তু তার মনের মধ্যে যত কথার আকুলিবিকুলি ছটফটানি, তার কতটুকু বলা যায় বাবাকে? এই তো এখন, সিনেমা দেখে চীনে রেস্টোরঁয় খেয়ে, কাউফমানের কফি পান করে, লেক-চক্কর দিয়ে, তারপর কি ইচ্ছে করে বাড়ি এসেই শুয়ে পড়তে, ঘুমোতে—ইচ্ছে কি করে না বাড়ি এসেও খানিকক্ষণ কথা বলতে, গল্প করতে, হাসতে? কথা বলতে-বলতে ঘুমিয়ে পড়তে, ঘুম-ঘুম গলায় কথা বলতে?...কিন্তু বাবা ঘুমোতে পারলে বাঁচেন, দাদাও এতক্ষণে বিছানায়। শুধু সে—তার যেন ঘুম নেই, তৃপ্তি নেই। কেন?

ঘরের চারিদিকে তাকাল স্বাতী। ঠিক-ঠিক গোছানো, ফিটফাট। বেতের চেয়ার, নিচু-মোড়ো, নিচু আলনায় ঝুঁটোনা শাড়ি পৌঁচিয়ে রাখা। ছোটো শেলফে বই, মশারি-ফেলা তৈরি বিছানা, টেবিলে রেকাবি-ঢাকা জল ভরা গ্লাস, ঠিক যেখানকারটি যেখানে, ঠিক যেমনটি চাই। আর একটু ভাল করে তাকাল, খোবারবাড়ির টাটকা পরদা জানলায়, টেবিলের ছড়ানো বইগুলি গায়ে-গায়ে দাঁড় করানো, দেয়ালে মার ঝাপসা হয়ে আসা ছবিটা একটু কম ঝাপসা। নতুন কিছু নয়, রোজই এ রকম। সে যেমন খুশি থাকে, চলে, ছড়ায়—আর রামের সঙ্গে দু-বেলা গুছোয়, আর বাবা বলে দেন। বেশ তো আছে সে, খুব আরামে, একলা একটা ঘরে তার দিদির কেউ থাকেনি, তার কলেজ-বন্ধুরাও বোধহয় থাকে না, ভাবতে গেলে সারা দেশে কজন মানুষের কপালে জোটে একলা একটা ঘর! তার কপালেও জুটেছে নেহাতই দৈবাৎ, নেহাতই সে বাবার সবছোটো মেয়ে বলে। তা কারণ যা-ই হোক, আছে তো ভাল, নিরিবিলি, স্বাধীন, আপনমনে। তবে কেন ঘুম নেই, সুখ নেই, কী-যেন নেই... কী? কী?

স্বাতী হাত বাড়াল জলের গ্লাসে। আর গ্লাসটা হাতে তুলতেই চোখে পড়ল—একটা চিঠি। না-খেয়েই নামিয়ে রাখল গ্লাস, তুলে নিল শক্ত সাদা খামটা। কিন্তু তক্ষুনি খুলল না। একটু তাকাল খামের উপর নামের দিকে—তারই নাম, কুচকুচে কালিতে ঢেউ-বাঁকা অক্ষরে লেখা, কখন

এসেছে... কখন থেকে অপেক্ষা করছে তার জন্য? যদি সে এসেই শুয়ে পড়ত তাহলে আজ হয়তো চোখেই পড়ত না। কী অন্যায়! কিন্তু কার অন্যায়? এতক্ষণ কোথায় ছিল সত্যেন রায়? আজকের বিকেল থেকে আরম্ভ করে এই মুহূর্তের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত একবারও তার মনে পড়েনি সত্যেন রায়কে, যেমন বাড়ি ফেরার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত একবারও মনে পড়েনি বাবাকে। বাড়িতে পা দিয়েই বাবাকে যেমন অন্যরকম লেগেছিল, তেমনি এই চিঠিটা—

স্বাতীর নিশ্বাস ভারি হল। কপালের চুল সরিয়ে আঁতে খুলল খাম, ভিতরে ভাঁজ-করা কড়কড়ে সাদা কাগজটা আঁতে খুলল চোখের সামনে। ঢেউ বয়ে গেল তার মনের উপর দিয়ে, কালো-কালো অক্ষরের কথা বলা ঢেউ। হাওয়া বয়ে গেল তার মনের উপর দিয়ে, পাহাড়ি হাওয়া, ঠান্ডা হাওয়া, শান্তির, অশান্তির হাওয়া। মনে পড়ল, আর সেই একটি মুহূর্তেই যেন মনে-মনে পড়ল অন্য সব চিঠি; যত চিঠি সে পেয়েছে, যত চিঠি সে লিখেছে, সেই শান্তিনিকেতনের প্রথম চিঠি থেকে—ফিরে এল তারা, উড়ে এল এক ঝাঁক পাখির মতো। কেউ-কেউ সাদা, অন্যেরা হলকা-নীল, কিন্তু সাদারা আর নীলেরা উড়ে চলেছে একই দিকে... দূর দূরের দিকে, তারপর আর বোঝা যায় না কে সাদা কে নীল।

চিঠি পড়া শেষ করে স্বাতী হাতে নিল গ্লাস। একটু-একটু করে খেয়ে নিল সমস্তটা জল। নামল জল স্রোতের মতো তার ভিতরে, নামল তার মনে পাহাড়ি ঝরনা, ঠান্ডা, কত দূর থেকে ঠান্ডা, যত নামছে তত অশান্ত, নামছে সাদা আর নীল দুটি রেখার ঝরনা, নামছে অশান্তি দূর...দূরের সমুদ্রের দিকে। তারপর আর বোঝা যায় না কোনটা সাদা-আর কোনটা নীল। চিঠিখানায় একটি হাত রেখে স্বাতী মাথা হেলিয়ে চোখ বুজল।

* * *

স্বাতী!

ডাক শুনে এমন চমকাল যে চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিল প্রায়। সামলে উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে প্রথম কথা মনে হল কোনো-একটা বই-টাই দিয়ে চিঠিটা চাপা দেয়। কিন্তু না—লুকোবে কেন, লুকোবার কী আছে? একটু তাকিয়ে, একটু হেসে বলল—তুমি ঘুমোওনি, বাবা? তুমি এখনো ঘুমোসনি যে?

ঘুম পায়নি।

ঘুম পায়নি বলেই বসে-বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলি?

ঘুমোচ্ছিলাম না, স্বাতী বলল—ভাবছিলাম।

ও আমার রাতজাগুনি ভাবুনি রে! রাজেনবাবু গলা ছেড়েই হাসলেন মেয়ের গভীর কথা শুনে আর আরো গভীর মুখ দেখে—শুয়ে পড় এঙ্কুনি, আর এক মিনিট দেরি না।

হ্যাঁ বাবা, শুই। মেয়ের মুখে একটা কিন্তু-কিন্তু ভাব দেখে স্বাতী বললেন—কিছু চাই? রামের-মাকে ডেকে দেব?

না—না—তুমি শুয়ে পড়ো, বাবা—আমি এঙ্কুনি— বলতে-বলতে স্বাতী টেবিলে পড়ে থাকা চিঠিটা দু-আঙুলে নাড়ল একটু। তারপর আঁতে-আঁতে খামে ঢুকিয়ে রাখল, যাতে বাবার চোখে পড়ে। রাজেনবাবু এক পলক তাকিয়ে বললেন—কী লিখেছে সত্যেন?

কী করে বুঝলে, কার চিঠি?

এত সুন্দর হাতের-লেখা আমাদের জানাশোনার মধ্যে আর কার?

স্বাতী বলল—লেখেনও খুব সুন্দর। তামুপাহাড়ের কথা এমন করে লিখেছেন—একটু পড়ব,

বাবা, শুনবে?

দুই! খালি ছুতো করে-করে জেগে থাকার চেষ্টা! আর কথা না—ঘুম!

রাজেনবাবু ফিরে এলেন নিজের ঘরে, শুয়ে পড়লেন অন্ধকারে। আর, একটু পরে দু-ঘরের মাঝখানকার পরদা-ঢাকা দরজাটাও অন্ধকারে মিশে গেল। আর, আরো একটু পরে রাজেনবাবুর কানে ভেসে এল নরম, খুব নরম গলার গুনগুনানি। প্রথমে বড্ডো লাজুক, একটু কাঁপা, ভিত্ত গুনগুন। একটু চড়া, আরো, কিন্তু গুনগুন, তারপর আবার নামল মৃদু, মোছা-মোছা, গুনগুন। আহা—পাগল করা বেহাগ—গানটা ছেড়ে দিল স্বাতী! রাখলে তো ভালই হত—ভাল করে শিখলই না, সেই যতীন দাস রোডে থাকতে একটু-একটু। আজকাল আর হাঁ-ও করে না বুঝি... কতকাল পরে গানকে আজ মনে পড়ল ওর, কতকাল পরে মনের মধ্যে গানকে ফিরে পেলেন রাজেনবাবু। কান পেতে শুনলেন, মন ভরে শুনলেন—দুটো-একটা কথাও কানে এল, বোধহয় রবিবাবুর কোনো—তাই এত মিষ্টি! তক্ষুনি কথা ডুবে গেল, শুধু গুনগুন। আহা—থামে না যেন! থামল না... সেই রাত্রে, চুপচাপ অন্ধকারে, ঘুম-জড়ানো বিছানায় শুয়ে-শুয়ে রাজেনবাবু আশ্বে-আশ্বে ভেসে গেলেন সেই দুঃখে, যে দুঃখ তিনি কখনো পাননি, আর সেই সুখে, যে সুখ শুধু কল্পনা। সমস্ত জীবনের ক্লাস্তি মুছে গেল, সমস্ত পৃথিবী শান্তিতে ছেয়ে গেল আর তবু, রাজেনবাবু ঘুমিয়ে পড়ার পরেও আরো চলল গুনগুন, নরম, আরো নরম, আবছা-মোছা গলায়... একটু থেমে-থেমে... গুনগুন মনের গুনগুন-কথা, ব্যাকুলতা, ভয়, প্রার্থনা, প্রশ্ন।

* * * * *

সেই যে ছেলেবেলায় একবার ছোড়দি তার হাতে বই পাঠিয়েছিল শুভ্রকে, আর সেই বই খুলেই নীল খামের বিলিক দেখে কেমন-একরকম হেসেছিল শুভ্র, তারপর থেকে চিঠির নীল রং দেখলেই একটা যেন ত্রাস হত স্বাতীর। মানে এ-কথা ভাবতেই ত্রাস হত পাছে কোনোদিন তাকেও কেউ লেখে ও-রকম। কিন্তু সত্যেন রায়ের ঘরে গিয়ে দেখেছিল টেবিলের ঘন-নীল প্যাডের ফাঁকে ফাউন্টেন পেন গোঁজা, আর সেই কাগজেই প্রথম চিঠি এল শান্তিনিকেতন থেকে। ভয় ভাঙল, এমনকি ভাল লাগল, খুব ভাল লাগল ঐ ঘন-নীল বেগুনিমতো রংটা। কদিন পরে সে-ও কিনেছিল নীল রঙের কাগজ-খাম। অত ভাল রং পাড়ার দোকানে মিলছিল না, এমন খসখসে কাপড়-মতো কাগজও না। সবচেয়ে ভালো যা পেল, তা-ই এনেছিল, আর তারপর বসে-বসে ভেবেছিল কাকে চিঠি লেখা যায় তার এই নতুন নীল কাগজে।

কিন্তু চিঠি লেখার কোনো লোকই নেই স্বাতীর। বাবার হয়ে মাঝে-মাঝে মৈমনসিং-এ বড়দিকে, রেশ্মুনে মেজদিকে আর দিল্লিতে সেজদিকে চিঠি লিখতে হয় তাকে। তাতা হামের পর কেমন আছে, ইরু এবার কোন ক্লাসে উঠল, দীপুর একটা ছবি পাঠিও, আমি ভালো আছি, বাবা ভালো আছেন, তোমরা কেমন। ছোটো-ছোটো খবর-চিঠি, মোটামুটি একই খবর, একই রকম, টুকরো-টুকরো শুকনো হাড়—একে কি আর চিঠি বলে? ওরই মধ্যে একটু রক্তমাংস লাগিয়ে ফেলে সে। বড়দিকে জানায়—এক-একদিন সকালবেলা আমার এমন ইচ্ছে করে আলুসেদ খেতে—কিন্তু আলু সেদ্ধ হলেই তো হল না—লিখতে-লিখতে একটা পাতাই ভরে যায়। মেজদিকে জিজ্ঞেস করে—মেমিও গিয়েছিলে বেড়াতে, সে-কথা কেন কিছু লেখোনি?—কী সুন্দর নাম মেমিও—আচ্ছা, তোমরা স্টিমারে করে ভামো গিয়েছ কখনো—সেদিন একটা বইয়ে পড়েছিলাম... মনে-মনে ভামোতে চলে যায়; ভামো, মেমিও, ম্যান্ডালে, ‘ম’ আওয়াজটাই মিষ্টি;

সমস্ত বর্মটি যেন মস্ত একটা ভ্রমর! আর সেজদিকে খবর দেয় যে সেদিন পুরোনো একটা ট্রাক থেকে তোমার নাম লেখা একখানা বই বেরোল হঠাৎ—কী-বই বলো তো?—তোমার আর কী করে মনে থাকবে—সত্যেন্দ্র দত্তের ‘বেলাশেষের গান’—সেজদি, তুমি কবিতা পড়তে তখন?—বইখানা কিন্তু আমার হয়ে গেল—আর তোমার হাতের লেখা কিন্তু একরকমই আছে—শেষের ক-টা পাতা নেই, কাগজও হলদে হয়ে গেছে—আরো বেশি ভালো লাগল সেই জন্য... এমনি চলল ড্যাশ দিয়ে-দিয়ে খানিকক্ষণ। কিন্তু অনেক দেরি করে করে এসব চিঠির জবাব যেই আসে, তক্ষুনি স্বাতী বুঝতে পারে তার ভুল। মেজদির সর্বদাই এত শরীর খারাপ যে চিঠিপত্র কয়েক লাইনের বেশি এগোয় না। সেজদির প্রত্যেক চিঠিতেই দারুণ তাড়াহুড়োর লক্ষণ—ভুল কথা, কথা ফেলে যাওয়া, এক কথা দু-বার—শেষ করে একবার পড়ারও সময় নেই। আর বড়দি তো নিজের হাতে চিঠি লেখা ছেড়েই দিয়েছেন, নয়তো আর মেয়ে বড়ো হয় কেন মায়েদের! তিন দিদি বাইরে, তবু চিঠি লেখার কেউ নেই! অথচ লেখার ইচ্ছে ভীষণ—লোকে যাকে দুঃখ বলে, এ-দুঃখ কি তার কোনোটার চেয়ে কম? একবার চেষ্টা করেছিল কলেজের অনুপমার সঙ্গে চিঠি জগাতে, অনুপমা যেবার বেড়াতে গিয়েছিল তার কাকার কাছে বরিশালে। চিরাচরিত নিয়ম উল্টিয়ে স্বাতীই লিখেছিল আগে। জবাবও এসেছিল চটপট; উৎসাহ পেয়ে দুই নম্বর চিঠিতে অনেক কথাই বিনিয়েছিল, কিন্তু অনুপমার দুই নম্বর আর এলই না। কলেজ খুলতে স্বাতী যখন জিজ্ঞেস করল—আমার চিঠির জবাব দিসনি যে? অনুপমা দিব্যি হেসে বলল—কী আবার লিখব, আর সময়ই-বা কোথায়? বলে কী! সময় নেই! সময় তবে আছে কীসের জন্য? কথা নেই লেখার? মনের মধ্যে দিনরাত তবে তা-তা-থৈ কীসের?

*

ছোড়দি, আমাকে চিঠি লিখবে তুমি? ভয়ে-ভয়ে, আড়চোখে, আধোগলায় শাস্বতীর কাছেই প্রস্তাব করেছিল একদিন।

চিঠি? প্রশ্নচিহ্নটা সুতীক্ষ্ম হল শাস্বতীর গলায়।

আমি লিখব আর তুমি জবাব দেবে।

সে কী রে! শাস্বতী হাসল।—হাসছ কেন? স্বাতী দেখাতে চাইল দমেনি। শাস্বতী জবাব দিল না, চোখের দিকে তাকিয়ে আরো হাসল।

চিঠি লিখতে ভাল লাগে না তোমার?

তোর বয়সে লাগত, কিন্তু—কথা শেষ না করে শাস্বতী ঘর থেকে দৌঁড়িয়ে গেল দুই কানের মুকুটাদুল ঝিলমিলিয়ে।

এর পর একদিন দুপুরবেলা বসে-বসে স্বাতী নিজেই নিজেকে লিখা লিপি চিত্রাল, আর তারপর নিজেই দু-জন সেজে আরো লম্বা জবাব বুনল পরের দিন। আর তারপর অবশ্য দুটোই ছিঁড়ে ফেলে দিল, কেননা এ-খেলা আর ভাল লাগল না, আর গোর্কির সেই ‘টেরেসা’ গল্প মনে পড়ে আরো বেশি খারাপ লাগল। অতএব নীল কাগজের প্যাডটি খুব বেশী রোগা হয়ে যায়নি এই ছ-মাসে। কিংবা পাঁচ মাসে যেটুকু রোগা হয়েছিল, আবার প্রায় ততটাই হল তার পরের এক মাসে, সত্যেন রায় শিলং যাবার পর। স্বাতী আশা করেনি চিঠি—কিংবা করেছিল, আশা মানুষ কী না করে? কিন্তু সত্যি ভাবেনি... কিন্তু চিঠির ধরনটা এমন, যেন এ আগে থেকেই জানা, যেন এ-বাড়ি থেকেই গেছেন আর পাহাড়-বেড়ানোর চিঠি-পাঠানোর আর লোক নেই স্বাতী ছাড়া। স্বাতীর চিঠি পাবার, চিঠি লেখার কল্পনা এতদিনে একটা শরীর পেল। বিনা কাজের

লম্বা ছুটি, লম্বা মে মাস, ভরা গ্রীষ্মের বড়ো-বড়ো দিনগুলির অনেকখানি নীল-সাদা লেখার ঝাঁকে উড়িয়ে দিতে-দিতে জুলজুলে জুন এসে দরজায় দাঁড়াল।

কিন্তু হঠাৎ কেন শক্ত হয়ে গেল চিঠি লেখা? যে-কোনো সময়ে মন থেকে কলমে আর কলম থেকে কাগজে বরবর করে যার কথা ঝরে পড়ে, সে কেন আজ কলম হাতে নিয়ে চুপ? ভরেছিল চার পৃষ্ঠায় এক-কাহন, কিন্তু শেষ করে পড়ল যখন সমস্তটা—ছি-ছি, কী বাজে, ছেলেমানুষি, কী লিখেছে এসব! —একটানে লম্বা করে দিল মাঝখান দিয়ে, কুচি-কুচি ছড়িয়ে দিল টেবিলতলায়, আবার আরম্ভ করল নতুন করে, কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে ভাল করে আরম্ভই করতে পারল না। কথা নেই বলে মুশকিল নয়, মুশকিল এই যে এত কথা আছে যে তার মধ্যে কোনটা লিখবে আর কোনটা লিখবে না, সেই হল মুশকিল। যেটা মনে আসে সেটাই মনে হয়—বাজে! অথচ এইরকমই সব পাঠিয়েছে আগে—এই সেদিনও—কেন পাঠিয়েছে? কেন? একটা সহজ, অত্যন্ত সহজ, কিন্তু অদ্ভুত, অত্যন্ত অদ্ভুত প্রশ্ন দেখতে-দেখতে স্বাতীর মনে গজিয়ে উঠল, ভেলকিওয়ালার গাছের মতো ছোট্টো চারা থেকে মস্ত বাঁকা-বাঁকা ডালপালা পর্যন্ত—কেন সত্যেন রায় চিঠি লেখেন তাকে, আর সে-ই বা কেন পাওয়া মাত্র জবাব দেয়? কতটুকুই বা চেনা, আর চেনাই বা কী রকম, চিঠির কোনো কথাই ওঠে না সত্যি বলতে, অথচ এই সহজ কথাটা এতদিনে একবারও মনে হয়নি, কেন হয়নি? দিনটা, সিনেমা-সন্ধ্যার পরের সেই রবিবারটা বৃথাই কাটল স্বাতীর, জবাব লেখা হলই না। পরের দিন দুপুরবেলা সে যখন প্রায় শেষ করে এনেছে চিঠি, যেন একটা ভার নামাতে পেরে মনটা বেশ ভাল লাগছে, রামের-মা এসে খবর দিল বাইরের ঘরে একজন ভদ্রলোক এসেছেন। ধক্ করে উঠল বুকের মধ্যে। সত্যেন রায়? ফিরে এলেন হঠাৎ? কিন্তু চিঠিতে তো—থাক তাহলে চিঠি। উঠে দাঁড়িয়ে, আঁচলে একবার মুখ মুছে জিজ্ঞেস করল—বসতে বলেছ?

বসেছেন।

পাখা খুলে দিয়েছ?

না তো!—

রাগ হল রামের মা-র উপর—এতদিনেও বোঝানো গেল না যে কেউ এলেই পাখাটা—রাগ বাড়ল বসবার ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকেই। কী বোকা রামের-মা, সত্যি! বলে দিলেই হত দাদাবাবু বাড়ি নেই।

কুঁচোনো কৌচা মেঝেতে লুটিয়ে মজুমদার উঠে দাঁড়াল। খিরিঝিরি দিল্লের খিরিঝিরানি তুলে দুহাত জোড় করল, চোখে চিকচিকোলো, ঠোটে হাসল, একটু পরে বসল, তারপর বলল —কিজন বোধহয় বাড়ি নেই?

না। এ-সময়ে তো থাকে না কখনো।

আমিও তাই ভেবেছিলাম— বলে মজুমদার আরো একটু আরাম করে হেলান দিল চেয়ারে। কোনো কথা ছিল? এলে কিছু বলতে হবে?

না, বলতে হবে না কিছু। আর, দিনের মধ্যে দেখা হবেই একবার। একটু চুপ করে থেকে স্বাতী বলল—আজ আপনার আপিশ নেই বুঝি?

আপিশ? আপিশ আমার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘোরে। যারা চাকরি করে তারা বেশ আছে, দশটা-পাঁচটা কাজ, বাকি সময় নিশ্চিন্ত। কিন্তু আমার এমন একটা অবস্থা হচ্ছে দিন-দিন, এমন জড়িয়ে যাচ্ছি পঞ্চাশ ব্যাপারে... সবাই যেন আমাকে খুঁজে খুঁজে বের করছে, ইচ্ছে করলেও আর

রেহাই নেই। এ-রকম কদিন চলবে, আর কোথায় এর শেষ হবে— হঠাৎ থেমে, একটু হেসে বলল—কিন্তু আপনাকে এ-সব কথা বলছি কেন? স্বাতী কথা বলল না, যেন মেনেই নিল মজুমদারের শেষ কথাটা। একটু পরে মজুমদার নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিল—তা বললামই না হয়... শুনতে আপনার ভালো লাগছে না, কিন্তু বলতে তো আমার ভাল লাগছে! তার প্রায়-শেষ-করা, শেষ-না-করা চিঠির কথা ভেবে স্বাতী এবারেও কিছু বলতে পারল না। মজুমদার বলল—আপনি কি বিরক্ত হয়েছেন আমি এরকম অসময়ে হঠাৎ এসেছি বলে? না—না—কী আশ্চর্য—আমি কেন—

কেমন অন্যমনস্ক দেখছি আপনাকে?

কই!

কী করছিলেন?

কী আর—

ঘুমোচ্ছিলেন?

ঘুমোবো কেন?... ইনি আমাকে দুপুর-ঘুমোনি ভাবলেন!

আমি বুঝেছি আপনার অবস্থাটা— মজুমদার গম্ভীরমুখে বলল—আমি উঠলে বাঁচেন, কিন্তু ভদ্রতা করে বসেও থাকতে হচ্ছে, তা-ই না? স্বাতী লজ্জা পেল। এই তার দোষ, আর এই তার মস্ত অসুবিধে যে মনের ভাব লুকোতে সে জানে না... তা বলে এরকম করে বলাটাও সত্যি—! সে চোখ তুলল, চোখ নামাল, আবছা হাসল, কিছু বলতে গেল, আর এই অপ্রস্তুত অপ্রতিভতা থেকে মজুমদারই তাকে উদ্ধার করল মুখে ভালোমানুষি হাসি আর কথায় ভালোমানুষি ঠাট্টা-সুর টেনে—কিন্তু ভয় নেই আপনার—আমি এক্ষুনি উঠব—সারাদিন তো চরকিঘোরা আছেই—বেশ লাগছে এই ঘরটিতে বসতে।

একটু ছলছলে হল স্বাতীর মন। মনে পড়ল এমনি এক দুপুরবেলার কথা, যেদিন সত্যেন রায় এসেছিলেন ক-মিনিটের জন্য 'নবজাতক' বইখানা দিতে। কী-কষ্ট সত্যি পুরুষদের—না কষ্ট কী, কেমন স্বাধীন, যখন যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারে, এই তো কেমন বেড়াচ্ছে শিলং পাহাড়ে—চিঠিটা পারবে তো আজ ডাকে পাঠাতে?...মনকে ফিরিয়ে আনল চিঠি থেকে মুক্তি হয়ে বলল—বাঃ! আপনি বসুন না যতক্ষণ ইচ্ছে।

ইচ্ছে! যদিও ছুটির দিনেও সে দুপুরবেলা বাড়ি থাকে না—ভাবতেই হাঁপ ধরে—তবু স্থান-কাল-পাত্রী বুঝে কথা সাজাল—কার না ইচ্ছে করে বলুন, জানলা-ভেজানো ঘরে পাখার তলায় বসে দুপুরবেলাটা গল্প করে কাটাতে? কিন্তু—একটু আগে পুরুষের যে সুবিধের কথা স্বাতী ভাবছিল, তার ঠিক উল্টোটা এবার শুনল—যা ইচ্ছা করে তাই কি আর করা যায়? তাহলে আর কাজ বলে বস্তুটা জন্মাবে কেন জগতে?

তা কাজে তো আপনার অনিচ্ছা নেই! কিছু একটা বলতে পেরে স্বাতী যেন হাঁপ ছাড়ল। কথাটা শুনে স্পষ্ট খুশি হল মজুমদার, কেননা তার ভাষায় সবচেয়ে বড়ো প্রশংসাই এইটা। যারা তার চাকরি করে, আর যারা কোনওরকম সুবিধের জন্য তার কাছে হাত পাতে, তাদের সকলের কাছে যে কথাটি সে জাঁকিয়ে বলে, সে-কথাই এখানে একটু নরম করে বলল—কিন্তু সে অনিচ্ছা অন্যদের এত বেশি যে আমাকে মিছিমিছি চারগুণ খাটতে হয়। বেকারের এত কান্নাকাটি তো শোনেন, কিন্তু আমি তো দেখি পৃথিবী ভরে কাজ আছে বিস্তর, কিন্তু কাজের লোক নেই। সে চেষ্টা করল কিছু না বলে মুখে-চোখে সমর্থন জানাতে, কেননা সেটাই ভদ্রতা। তাতেই

উৎসাহিত হয়ে মজুমদার আরো বলল—এই তো এক্ষুনি ছুটতে হবে বারো মাইল দূরে ফ্যাক্টরিতে। দু-বেলা নিজে না-দেখলে চলে না, ছোটোখাটো ব্যাপারও আটকে যায়—যদিও মাইনে দিয়ে লোক পুষছি অনেকগুলো। ভাষাটা ভালো লাগল না স্বাতীর, মনের মধ্যে কামড় দিল নিজের দাদার কথা। একটু হঠাৎ করেই বলল—আচ্ছা, একটা কথা। দাদা সত্যি-সত্যি কী করছে আপনি কি জানেন?

কেন, আপনারা জানেন না?

আমাদের কাছে কিছু বলে-টলে না।

তক্ষুনি মজুমদারের মুখে নামল আপিশ-বস-এর গাভীর্য। নিচু গলায় ধেমে ধেমে বলল—বিজ্ঞান ভালই করছে...ভালই করবে...ওর পার্টস আছে মনে হয়।

পার্টস? প্রশ্ন ফুটল স্বাতীর চোখে। কাজের লোক—সংক্ষেপে রায় দিলেন কাজের কর্তা। যে দাদাকে ছেলেবেলা থেকে বাড়িসুদ্ধ সবাই জেনেছে অকর্মণ্যের চরম নমুনা বলে, তার সম্বন্ধে এমন কথা তারই মুখ থেকে যে কিনা সারা রাজ্যে কাজের লোক দেখতে পায় না! স্বাতী যেন বুঝতে পারল না বিশ্বাস করবে কি করবে না। তার এর পরের কথাটাও তাই প্রশ্নের সুরেই বেরোল—তাহলে ভালই?

মনে তো হয়... হওয়া তো উচিত—বস-গভীর মজুমদার বিচক্ষণ জবাব দিল। তারপরেই সহজ করল ভঙ্গি—বড্ডো দুশ্চিন্তা বুঝি ওকে নিয়ে আপনার বাবার?

দাদা একে কী বলেছে আর কতখানি বলেছে, মজুমদারের মুখের চেহারা থেকে তা বুঝে নেবার চেষ্টা করতে করতে স্বাতী বলল—হওয়া কি অন্যায়?

নিশ্চয়ই না—আর ম্যাট্রিকটাও যখন পাশ করতে পারেনি—কিন্তু আমিও তো—মজুমদার বড়ো বড়ো দাঁত দেখিয়ে হাসল—মাত্রই ম্যাট্রিক-পাশ। তার দাদা আর একজন মজুমদার হলে তার কেমন লাগবে, স্বাতী মনে-মনে তা চিন্তা করল।

স্কুল-কলেজের পাশ-ফেল আর জীবনযুদ্ধের পাশ-ফেল এক জিনিস নয়—মজুমদার তার অভিজ্ঞতার অংশ দিল স্বাতীকে, আর সেই সঙ্গে আশ্বাসও—আপনার বাবাকে বলবেন দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আমি ওকে সাব-কন্ট্রাক্ট দিতেই থাকব নিয়মিত। আর অমনি করে-করে নিজের দাঁড়িয়ে যাবে একদিন। এখন যুদ্ধটা কয়েক বছর টিকলেই হয়।

মজুমদার তাহলে কন্ট্রাক্টের? আর দাদাও সেই কাজে ঢুকেছে? মনটা খারাপ হয়ে গেল স্বাতীর। আশ্বে আশ্বে বলল—কিন্তু বাড়ি বানাবার কাজে দাদা কী করবে? মজুমদারের মোটা গালে ভাঁজে-ভাঁজে হাসি ছড়াল, আবার মনে-মনে উপভোগও করল মেয়েটির এই প্রায় পাড়াগাঁয়ে অজ্ঞতা। প্রায় সন্নেহ সুরে বলল—বাড়ি বানাবার কন্ট্রাক্ট নমু, যুদ্ধের সাপ্লাইয়ের কন্ট্রাক্ট। মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝল যে স্বাতী বুঝল না কথাটা। কিন্তু আর বোঝাবার চেষ্টা না করে বলল—বিজ্ঞানের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল নিশ্চয়ই কোনো শুভকালে।

কেন? সরল প্রশ্ন স্বাতীর।

সেইজন্যই তো আপনা—মুখে এসেছিল ‘আপনার’, কিন্তু ঠিক সময়ে কথাটা বদলে নিল—আপনাদের সঙ্গে তো আর আলাপ হত না তা না হলে। আপনার ছোড়দি চমৎকার মানুষ, হারীতবাবুও। কবে আবার আসবেন ওঁরা এখানে?

ঠিক কী?—

আগে একটা খবর পেলে চেষ্টা করতে পারি হাজির হতে—অবশ্য আপনাদের যদি আপত্তি না

থাকে। স্বাভী চেপ্টা করল এমন করে হাসতে, যাতে বোকা যায় আপত্তির কোনো কথাই ওঠে না। হঠাৎ কজ্জিঘড়িতে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠল মজুমদার। চলতে-চলতে বিদায় নিল, একবারও পিছনে না-তাকিয়ে উঠে বসল গাড়িতে। কিন্তু হঠাৎ নয়, আগে থেকেই আড়চোখে ঘড়ি দেখছিল, আর ঠিক সময়মতোই উঠেছে। যে জন্যে এসেছিল তা হয়েছে তার। সোমবারের দামি সময় থেকে খানিকটা খাবলে নিয়ে যে জন্যে সে এসেছিল হালকা-হাওয়ায় খামকা-চলার উজ্জান বেয়ে ক্যানিং স্ট্রিট থেকে টালিগঞ্জ, তা হয়েছে। ভালমতোই হয়েছে, বেশ খুশি লাগছে নিজের উপর। সে এসেছিল তার মনোনীতাকে একা পেতে ততটা নয়—তাতে আর তেমন লাভ কী, আর সেটা তো একটু বেশি পরিমাণেই সহ্য করতে হবে পরে—যতটা বাড়িতে, অসময়ে, অতর্কিতে দেখতে, যতটা সম্ভব অপ্রস্তুত অবস্থায়। কিন্তু বাস্তব তার আশাকে ছাড়িয়ে গেছে, কেননা সে ভাবতেই পারেনি যে সত্যি দেখতে পাবে এমন করেই, এতটাই অসাজা, অমাজা, যেমন-তেমন। একবার একটি নাচিয়ে মেয়ের সঙ্গে আলাপের একটু সুত্রপাত হয়েছিল তার, পার্টি আলো করে আছে ফুটফুটে পরীটি। কিন্তু সেই মেয়েকেই একদিন সকালবেলা বাড়িতে দেখে প্রায় চিনতে পারেনি, মনে হয়েছিল অন্য মানুষ। শুধু যে গায়ের রং কালো তা নয়, নাক-চোখ পর্যন্ত আলাদা যেন। আবার, আরো একটু উঁচু-ঘরের এমন মহিলাও সে দেখেছে, যাঁদের বাইরের চেহারা আর বাড়ির চেহারা প্রায় একই রকম। সত্যি তাঁরা দেখতে কেমন—যদি সত্যি বলে কিছু থাকে— তা বোধহয় ঈশ্বর ছাড়া—যদি ঈশ্বর বলে কিছু থাকে—কেউ জানে না। মজুমদার অবশ্য আগেই জেনেছিল যে বিজ্ঞানের বোন এই দু-দলের কোনো দলেই পড়ে না। কিন্তু এটা জানত না, এটা সে ধারণাও করতে পারেনি যে আজকালকার কোনো ভদ্রমহিলা একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করবার আগে চুলে একবার চিকুনিও চালায় না, মুখে একবার পাউডারও বুলোয় না, যেমন ছিল তেমনি বেরিয়ে আসে কঁচকোনো আধ-ময়লা শাড়িতে। কথার ফাঁকে-ফাঁকে ভাল করে তাকিয়ে দেখছিল ছোটো-ছোটো কৌকড়া চুল পাখার হাওয়ায় উড়ে-উড়ে পড়ছে কপালে, মুখখানা একটু লালচে-কাশো, ঘামলে যেরকম হয়। ভিতরের ঘরে পাখা নেই নাকি? আঙুলে কালির দাগ—লিখছিল? ফাউন্টেন পেন নেই? শাড়িটা নেহাত বেচারি গোছের, আর ব্লাউজটা আঁচল-ঢাকা হলেও কড়া চোখে ধরা পড়ল, ব্লাউজটা সম্ভ্রা—পপলিনের, তাও ফিট করেনি ঠিক, বোধহয় স্বহস্তেই বস্ত্রত। সাধারণ, একেবারেই সাধারণ। এ-রকম দু-চার লক্ষ পাওয়া যাবে এই মুহূর্তে এক কলকাতাতেই— তা-ই কি? কপালে-ওড়া কৌকড়া ছোটো চুল, মুখ, চোখ, হাসি—অনিচ্ছার ঐ আবছা একটু হাসি—আর খালি, সাদা, পাতলা পা-দুটি বেশ-তো মানিয়েছিল মেঝের উপর। ঐ বাজ্রে মেঝেতেই ও রকম, আর সাদা আর ছাইরঙা মার্বেল-মেঝে হলে? বড্ডো ঘরোয়া আজকালকার হিসেবে, এক-এক সময় ছেলেমানুষ, কোনো ববর রাখে না পৃথিবীর, বাইরের ব্যাপারে কিছুই বোঝে না— তা ভালোই তো। মজুমদারের এতক্ষণে সন্দেহ হল যে আবছা-আলোর ঐ ঘরটিতে এই ঘোরদুপুরের সময়টুকু তার ভালই কেটেছে, ভাল লেগেছে তার, যেমন ভাল লাগছে এই আগুন-তাতা দুপুর-গাড়ি থেকে জল-সবুজ কৌকড়া পুকুরটাকে পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে। এই ভাল লাগাটা ভাল লাগল না মজুমদারের। নিজের সম্বন্ধে তার ধারণার সঙ্গে মেলে না এটা, একটু যেন শ্রদ্ধা কমে গেল নিজের উপর। তবু, কমলা আলো সবুজ হবার সঙ্গে-সঙ্গে মেয়ো রোড ধরে ডালহৌসি স্কয়ারের দিকে এগোতে এগোতে আবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠল মেঝেতে পাতা পাতলা সাদা পা-দুটি। আর ঠিক তখনই সেই পা-দুটি চুকল স্যান্ডেলে, বেরোল রাস্তায়, চলল তাড়াতাড়ি, পেরোল গলি, খামল গলিমোড়ের চিঠিবাগের সামনে। লাজুক কথা অন্ধকারে লুক্কোল,

আকাশে উড়ল ছোট্ট লাজুক হালকা-নীল পাখি।

সে চিঠি যখন পৌঁছল, সত্যেন রায় ব্যস্ত ছিলেন হিলভিউ হোটেলের আফটারনুন টি-র প্রতি যথাসাধ্য সুবিচারের চেষ্টায়। চেষ্টায়? তবে কি পাহাড়-পাড়ার নামডাক মিথ্যে, না কি সত্যেন রায়েরই স্বাস্থ্য তেমন ভাল যাচ্ছে না? না। সে-বছরের সেই গ্রীষ্মে, বর্ষা নামার আগের মাসটিতে, পৃথিবীর মধ্যেই স্বাস্থ্যকরতার একটা প্রাইজ নিতে পারত শিলং; আর সত্যেন রায়, যৌবনের চূড়ায়, শান্ত, সমতল, উচ্চাশাহীন জীবনের স্বাধীনতায়, শিলঙের গুণপনাকে এমন করেই আত্মসাৎ করতে পেরেছিলেন, যেমন বোধহয় আর একজনও পারেনি সে-বছরের হাজার দেড়েক গ্রীষ্ম-প্রবাসীর মধ্যে। জীবনে কখনও এর চেয়ে ভাল ছিলেন না তিনি। এতই ভাল যে, হিলভিউ হোটেলের আফটারনুন টি-টাও প্রায় পুরো পাওনাই আদায় করে নিচ্ছিল তাঁর কাছে। আর নেবেই-বা না কেন, টি যখন, চা নিশ্চয়ই আছে, আর তৈরি পেয়ালার বদলে টি-পটের সুবিধেটাও তিনি জুটিয়েছিলেন। অবশ্য বিনামূল্যে নয়—আর যদিও রান্নাঘর থেকে তাঁর ঘরে পৌঁছতে পৌঁছতে টি পটসুদ্ধ তাপ হারাত, আর যদিও দেশটাই চায়ের কিংবা সেইজন্য চা-পাতাটাও ঠিক পয়লানস্বরূপ নয়—তবু চা তো। আর নাম যখন বিকেল-চা, শুধু চা-ই নয়—সঙ্গে লুচি, আলুভাজা আর ফল-টল। লুচি অবশ্য চামড়ামতো, আলুভাজা ন্যাতার মতো, আর ফল মানে হচ্ছে শনিপূজার সিমির মতো কুচি-কুচি কলা; আর শশা, কি বড়ো জোর চাক-চাক টক-টক বুনো আপেল। তা যা-ই হোক, এ নিয়ে খুব বেশি নালিশ ছিল না সত্যেন রায়ের। নালিশের বাধা ছিল তাঁর স্বভাবে, আর প্রতিকার ছিল যকৃৎের সক্রিয়তায়। ঐ টি-পটটার জন্যই তিনি কৃতজ্ঞ, আরো কৃতজ্ঞ একটা ঘর পেয়েছেন বলে। ঘর মানে অবশ্য—তা এর বেশি লাগবেই বা কীসে, আর প্রায় সারাদিন তো বাইরে-বাইরেই—উঠতে হয় কাঠের সিঁড়ি বেয়ে, একমাত্র জানলাটিকে বন্ধ করলে ফাঁপর আর খুলে রাখলে বরফ। হোটেলের আসল বাড়ি থেকে আলাদা বলে ইলেকট্রিক আলোও নেই। কিন্তু এর কোনোটাই তেমন অসুবিধে লাগে না তার এখনকার বাসিন্দার, সুবিধেই বরং, আর অসুবিধেও যদি লাগত, যে-কোনো অসুবিধেই কি সুবিধে নয় তিন-চারজন জবড়জঙের সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটানোর তুলনায়? বেশ প্রীত-চিন্তেই অনতিতপ্ত চায়ে চুমুক দিচ্ছিলেন সত্যেন রায়। তাঁর এখনকার অসুবিধেটিকেই কল্পনা করে নিচ্ছিলেন কুইন্স হোটেলের উচ্চচূড়-চা বলে (হাঁটতে হাঁটতে মাঝে পড়েছিল একদিন)। আর সত্যি-তো কুইন্স হোটেল হলেও সুখ কি আর বেশি হত এর চেয়ে? একা আছি, আরামে আছি, মন খেলাবার ভাল-ভাল ভাবনার অভাব নেই, আর কী চাই? আর কিছু চাই না। কিন্তু আরো কিছু হলে আরো বেশি সুখী হইত ওয়া যায়, সেটা প্রমাণ হল একটু পরেই। খাসিয়া চাকর চিঠি এনে তাঁর সামনে রাখল, রেখেই চলে গেল। আর ওটুকু সময়ের মধ্যেই একটুমাত্র তাকিয়ে স্পষ্ট জানাল যে ঝর-বার কাঠসিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে এই খুচরো অথচ বিশেষ কাগজগুলোর সঙ্গে সমান মাপেই যেন বখশিস ওঠে বাবুর হাতে, এখান থেকে চলে যাবার সময়।

* * *

টটকা-গরম তোস-কুটি বলো, ভাঁজ-না-ভাঙা খবর-কাগজ বলো, নতুন-কেনা পাতা-না-কাটা বই বলো, চায়ের সঙ্গে চিঠির মতো কিছু না। হোক সকালে, হোক বিকেলে, হোক যে-কোনোরকম চা আর যে-কোনো লোকের চিঠি—বই-দোকানের বিল হলেও আপত্তি নেই—শুধু পোস্টকার্ড না হলেই হল। আর যদি হয় এমন কারো চিঠি, যাকে ভাল লাগে, এমন-কোনো চিঠি, যা ভাবতেই

ভালো লাগে...চা-পেয়ালা নামিয়ে চিঠিটা হাতে নিলেন সত্যেন রায়। একবার উন্টিয়ে দেখলেন, আর একবার আলোর দিকে তুলে দেখলেন, যেন নেড়েচেড়েই ভিতরটাকে চেখে নেবেন একটু। তারপর খাম খুলে এক-নিশ্বাসে পড়ে নিয়ে চিঠিটা হাতে রেখেই আর এক পেয়ালা তুলে একটু লম্বা মাপেই চুমুক দিলেন চায়ে। আর সঙ্গে সঙ্গেই মুখ-চোখ বিকৃত হল—ছি! একদম জল! জল-চায়ের টোকটাকে খুক করে গিলে ফেলে মন থেকে চা-চিন্তা সরিয়ে দিলেন তখনকার মতো। আবার আস্তে আস্তে থেমে থেমে পড়লেন চিঠি, চিঠি শেষের নামের উপর চোখ রাখলেন একটুক্ষণ—স্বাভী...স্বাভী মিত্র। নামটি ঝংকার দিল প্রোফেসরের মনের মধ্যে, সেই হলদে-লাল সূর্যাস্তে প্রথম যেমন শুনেছিলেন। সুন্দর নাম। ছোটো-ছোটো দুটি কথা, সমান ওজনের, নরম একটু অনুপ্রাস। সবসুদ্ধ হালকা, আবার সেই সঙ্গে গভীরও। লিখলে ভাল দেখায়, বললে ভাল শোনায়...তাই-তো, তবে কি আমি এই নাম নিয়ে এতই ভেবেছি? এই বিষয়টাকে যত রকম করে ভাবা যায়, কিছুই তো বাকী রাখিনি মনে হচ্ছে...কিন্তু—হঠাৎ যেন একটু ঝাঁকুনি লাগল শরীরে—অবাক লাগল যে এত ভেবেও এই আসল কথাটাই এখনও ভাবেননি যে এ-নামটা কাঁচা... অস্থায়ী... বলতে গেলে মিথ্যে। ঐ ছন্দে বসানো ছিপছিপে ‘মিত্র’কে সরিয়ে দিয়ে অন্য কেউ কায়ম হবে একদিন—একদিন কেন, শিগগিরই—খুব যে তার দেরি নেই সেটা নিশ্চিতই।

* * *

এই নাম বদলের ব্যাপারটা সত্যেন রায় ঠিক পছন্দ করলেন না। চিঠিটা খামে, আর খামটা পকেটে ঢুকিয়ে একটু ক্ষিপ্রভাবেই উঠে পড়লেন। চায়ের বাসনগুলো সরিয়ে রাখলেন তত্ত্বাপোশের তলায়। সেই তলা থেকে টেনে আনলেন স্যুটকেস, তালা খুলে বের করলেন একটা পরিষ্কার রুমাল, বন্ধ করে আবার ঠেলে দিলেন ভিতরে। উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারের পিঠ থেকে তুলে কালো রঙের আলোয়ানটি গায়ে জড়ালেন, হঠাৎ একটু থেমে মনিব্যাগের ভিতরটাতেও উঁকি দিয়ে নিলেন একবার। এই কাজগুলির প্রত্যেকটিতেই প্রকাশ পেল তাঁর পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস, জীবনযাপনের ধীর লয়ের সমতা। কিন্তু কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তাঁর নিজেরই মনে হল যেন একটু তাড়াহড়ো করছেন, বিরক্ত হলে মানুষ যেমন করে, কিংবা যেন কারো সঙ্গে দেখা হবে—কিন্তু কারো সঙ্গেই তো না। বেশি দূর হাঁটলেন না প্রথম যে জায়গাটা মনে হল সহনীয় রকম নিরিবিলি, সেখানেই পাইনতলায় বসে পড়লেন। সুন্দর... যে কোনো জায়গাই সুন্দর এখানে। কিন্তু এই প্রথম, বোধহয় জীবনেই প্রথম—প্রকৃতির লীলাখেলা তেমন-যেন রুচল না। পার্বত্য-দৃশ্য ছাড়াও অন্যরকম লীলাখেলা আছে প্রকৃতির, সেইটা কেড়ে নিল মন। সেদিন বসে বসে জীবনের কোনো তত্ত্ব জীবলেন না, জীবনটাকেই ভাবলেন। নিজের জীবন—যেটা, তাঁরই বিবেচনায়, নিতান্তই অসংযোজ্য বিষয়। কেননা নিজের কথা বড়ো বেশি ভাবে তারাই, যাদের মন অন্য কোথাও পৌঁছতে পারে না। অর্থাৎ যারা বোকা, মুর্থ, কিংবা অসুখী। প্রথম দুই শ্রেণীর কোনো একটির অন্তর্গত বলে নিজেকে ভাবতে চাইল না সত্যেন, মন দিল তৃতীয়টিতে।

কিন্তু নিজেকে অসুখী বলে কখনোই তো সে ভাবেনি এ পর্যন্ত। বরং উন্টো, জীবনের প্রথম পঁচিশ বছর এ ধারণাই তাকে উপহার দিয়েছে যে ভাগ্যের বিশেষ একটু পক্ষপাত আছে তার উপর। মা যখন মরেছিলেন—জীবনের এই পরিচ্ছেদটায় ছাত্রীর সঙ্গে বেশ মিল আছে তার—তখন সে এতটা বড়ো যাতে মা না-থাকলেও বেঁচে থাকতে খুব বেশি অসুবিধে হয় না, আর এতটা ছোটো যাতে আঘাতটা আস্তেই লাগে। বাবা আর বিয়ে করলেন না, উল্লেখযোগ্য অন্য কিছুও করলেন না

জীবন ভরে। কম খরচে, কম রোজগারে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ালেন ছেলেকে নিয়ে। তারপর শান্তিনিকেতনে দিলেন, আর ছেলে যখন ম্যাট্রিকুলেশনে স্কলারশিপ পেয়ে কলকাতায় পড়তে এল, তখন থেকে বাসা নিলেন ধলেশ্বরীর ধারে দেশের বাড়িতে। প্রচুর পরিশ্রম করে গ্রামে এক লাইব্রেরি বসালেন, তারপর সেই লাইব্রেরিতে রোজ দু-খানা খবর-কাগজ পড়ে আর যে-কোনো ইচ্ছুক কিংবা অনিচ্ছুক শ্রোতার কাছে বিবিধ রাষ্ট্রিক, সামাজিক, আন্তর্জাতিক সমস্যার উত্তর বিশ্লেষণ করে দিন কাটাতে লাগলেন। মোটের উপর মন্দ কী! সবচেয়ে ইচ্ছুক, সবচেয়ে সোস্তর শ্রোতা অবশ্য তাঁর ছেলেই। আর আশ্বে আশ্বে নিতান্তই শ্রোতার পর্যায়ে সে আর রইল না, নিজেরও দু-একটা কথা বলবার হুঁ। বাবা তাই ব্যগ্রভাবেই তাকাতলাগলেন ছেলের ছুটি-হওয়া বাড়ি-আসার দিকে। খুব ইচ্ছা করেছিলেন ছেলে হবে ইতিহাসের পণ্ডিত, কিন্তু সত্যেন পছন্দ করল ইংরেজি-সাহিত্য। তবু তাঁর ইচ্ছাটাকেও সম্মান জানাল তার অনার্সের একশো টাকার প্রাইজ থেকে কয়েকটি বাছা-বাছা মোগল ইতিহাসের বই বাবাকে পাঠিয়ে, যেহেতু মোগল আমলটাতেই তাঁর আগ্রহ বেশি। এই যে প্রথম সে বাড়িতে কিছু পাঠাল তাও নয়। আই. এ. পড়তে পড়তেই সে টুশনি ধরেছে, স্কলারশিপ তো আগাগোড়াই আছে, এমন দিনের নাগাল পেতে তাই খুব দেরি তার হুঁ না, যখন কলকাতায় নিজের খরচ নিজে চালিয়ে বাবাকে ছোটোখাটো মনিঅর্ডারও সে পাঠাতে পারল। সংক্ষেপে থাকতে শিখেছিল বাবার কাছে, কলকাতায় ছাত্রজীবনে যে-সব অভ্যাস সংগ্রহ করে অনেকেই উপস্থিত সুখের অনুপাতে ভবিষ্যতের দুঃখ জমায়, তার একটাও টানতে পারল না তাকে, সিগারেট পর্যন্ত ধরল না। আর সেইজন্য সহপাঠী আর সমবয়সী অনেকেরই তুলনায় গরিব হয়েও অর্থাভাবের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটল অনেকেরই তুলনায় নামমাত্র। একমাত্র বাজে খরচ ছিল বই কেনা। বাজে নয় অবশ্য, খুব বেশি রকমই কাজের। কিন্তু কোনো একটা বই নিজে কিনতে না পারলেও খুব দুঃখ নেই, কলেজের লাইব্রেরিতে, কিংবা অন্য কোথাও পাওয়া যাবেই—আর জীবনের অধিকাংশ বই তো ধার করেই পড়তে হয় মানুষকে। না, টাকার কষ্ট সে পায়নি। এমন একটা দিনের কথাও, সত্যি বলতে, সে মনে করতে পারে না, যেদিন টাকা নেই বলে এমন কোনো অসুবিধে ভোগ করেছে যেটা সহ্য করা তার পক্ষে সহজ হয়নি।

বাবা মারা গেলেন এম. এ. পরীক্ষার ক-মাস আগে। একটু হঠাৎ-ই। তবু পৌঁছতে পেরেছিল ঠিক সময়ে, মানে, শেষ সময়ের একটুখানি আগে। বড্ডো ফাঁকা লেগেছিল প্রথমটায়, আর একটু অন্যায্যও। কী-ই বা বয়স বাবার—এই-তো সেদিন চল্লিশ পেরোলেন। আর স্কলতে গেলে, এই দুজনই তো আমরা ছিলাম। কিন্তু বেঁচে থাকার আপাতচিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে বাবাদেরই তো ছুটি হয় আগে। মানে, সেটাই উচিত, আর উচিতটাই ভাল। আমার এখন যে রকম লাগছে, এর চাইতে অনেক, অনেকগুণ খারাপ লাগত বাবার, যদি আজ আমি মরে যেতাম আর তিনি থাকতেন। যদি ধরো, মৃত্যুর কোনো দূত এসে আমাকে বলত—এক্ষুনি চল আমার সঙ্গে, নয় তোমার বাবাকে ধরে নিয়ে যাব, আমি তাহলে কী বলতাম? বলতাম কি—আমি যাচ্ছি, বাবাকে ছেড়ে দাও? না, সেটা বোকামি হত, বিদ্রী নির্ভুর হত বড্ডো। অবশ্য আরো দশ, কুড়ি, তিরিশ বছরও বেঁচে থাকতে পারতেন—কিন্তু তারই বা অর্থ হত কী, কী ছিল তাঁর জীবনে? কী ছিল তাঁর জীবন? বাবার জীবনে খুব একটা উজ্জ্বলতা সত্যেন দেখতে পায়নি কখনোই। কেননা নিজের মনে মার জন্য কোনো অভাববোধ যদিও সে বহুকাল ভুলে গেছে, তবু সবসময় বাবার জন্য কষ্ট পেয়েছে মা নেই বলে। মনে মনে এটা সে পরিষ্কার বুঝেছিল যে মাতৃহীন যুবকের প্রায় কোনো দুঃখই নেই, প্রায় সব দুঃখই আছে বিপত্নীক শ্রৌণ্ডের। এসব চিন্তা দিয়ে চোখের জলকে ঠেকিয়ে রাখল সত্যেন,

তা থেকে একটু তেতো-মতো সান্ত্বনাও নিংড়ে বের করল। আর তারপরের দিনগুলিতে তার মুখ ভরে খোঁচা-খোঁচা দাড়ির মতোই আরো অনেক চিন্তা গজিয়ে উঠল মনের মধ্যে। অদূরবর্তী পরীক্ষাটা তাকে শক্তি দিল। মনথারাপের সময় কই—এম. এ.-টা ভাল না হলে কিছুই হল না। কেননা নিজের সম্বন্ধে দুটি, আর দুটিই মাত্র, স্পষ্ট সিদ্ধান্তে সে অনেক আগেই পৌঁছেছিল—প্রথমত, জীবিকার জন্য প্রোফেসরি ছাড়া আর কিছুই তার করবার নেই। আর দ্বিতীয়ত, থাকবারও তার আর কোনো জায়গা নেই কলকাতা ছাড়া। ছাত্রজীবনের ক-বছরেই সে বুঝেছিল যে কলকাতায় প্রতিযোগিতা তীব্র, শক্তিশালীরা নির্বিবেক, আর কর্তৃপক্ষ সাধারণতই স্বজনবৎসল। রোগা ডিগ্রি নিয়ে কলেজঘাটে ভিড়তে পারে শুধু তারাই, জন্মটা যাদের জোরালো। কিন্তু তার পরিচয় যেহেতু মাত্র তার নিজের নামটুকুতে শেষ, আর আরও সেইখানেই, সেইজন্য সেটুকুতে কোনোরকম খুঁত থাকলে তার চলবেই না। আরো ভাবতে-ভাবতে আরো দেখতে পেল যে বাবা থাকতে তার জীবনের যে গড়ন ছিল এখনো তা-ই আছে। আর বাবা থাকলে তার জীবনের যে গতি হত, এখনও তাই হবে, বাবা না থেকে বলবার মতো কোনো বদল তো ঘটালেন না। মা-ছাড়া বাড়িতে, উদাসীন বাবার সংসর্গে আবাল্য সে স্বাবলম্বী, আর অন্য অর্থেও স্বাবলম্বী হতে পেরেছিল প্রায় সতেরোর পর থেকেই। তার জীবনটা, বলতে গেলে, এখন পর্যন্ত কেটেছে বিবিধ হোস্টেলে আর বাবার এই বাড়িতে ভাগাভাগি করে। আর এ বাড়িও তো অন্য একরকম হোস্টেলই। তার জীবনটা যে-রকম চলছিল, চলবে, চলতে পারে, তার কোনও নড়চড় হল না। শুধু এটুকু তফাৎ হল যে বছরে তিনবার করে এই গ্রামে আর আসতে হবে না তাকে। আর এটা অবশ্য সুবিধে বলেই লাগল তার মনে, মস্ত সুবিধে, কেননা সত্যেন পল্লীপ্রেমিক নয়, দেশপ্রেমিকও না। সে নিশ্চিত জানল সে এই বাড়িতে, গ্রামে আর কোনোদিন সে ফিরবে না, আর জানতে পেরে যেন গুমোট-ভাঙা হাওয়া দিল মনে। এতদিন সে শুধু স্বাবলম্বী ছিল, এতদিনে স্বাধীন হল। বেড়াতে পারবে টাকায় যতটা কুলোয়, যেখানে ইচ্ছে যেতে পারবে প্রত্যেক ছুটিতে, আর কোনো বাধা নেই, ভাবনা নেই। শেষের কথাটা ভাবতে দীর্ঘশ্বাস পড়ল, কিন্তু শ্রদ্ধা চুকিয়ে, সেই মোগল ইতিহাসের বই ক-খানা, আর অন্য যা খান পাঁচ-সাত বই ছিল বাবার, সব তার হোস্টলে ঢুকিয়ে, বাবার বিয়েতে পাওয়া এখন ফুটোঙলা শালখানা সুটকেসের সব-তলায় বিছিয়ে, গোছগোছ শেষ করে সে যখন তার মাথাটার মতই ন্যাড়া একটা তক্তাপোশে চুপ করে বসল, তখন দীর্ঘশ্বাস ফিরে এল না। জ্ঞাতিসম্পর্কের জ্যাঠামশাই এসে বললেন—কী হে, আজই যাচ্ছ?

আজই যাচ্ছি।

সত্যি—কী একটা কাণ্ডই হল! নরেন যে এরকম হঠাৎ...তা— গলানিয়ে, যদিও এই সতর্কতা সেখানে একেবারেই অনর্থক—তা, কিছু রেখে-টেখে গেছে তো?

আমাকেই রেখে গেছেন—জবাব দিল সত্যেন।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি—কথায় হার মানলেন না জ্যাঠামশাই, কিন্তু তোমার জন্য রেখে গেল কী? সত্যেনের মুখে এল—সমস্ত পৃথিবীটা। কিন্তু সামলে নিল, পাছে ওঁর কানে ফাজলেমি শোনায়; আর কোনো জবাবও মনে এল না। অভ্যেসমত চুলে হাত বুলোতে গিয়ে ন্যাড়া মাথার খসখসে ছোঁওয়ায় অপ্রস্তুত হয়ে বলে ফেলল—আমার তো দরকার নেই কোনো।

শোনো কথা! দরকারের জন্যই কি সব, আর দরকারের তুমি কতটুকু জানো হে এখনও! তা তোমার এই বাড়ি, আর জমিজমা— সত্যেনের ঠোট-বাঁকানো অবজ্ঞা লক্ষ্য করে আরো বেশি অবজ্ঞা জানিয়ে হাসলেন একটু—এমন মন্দই বা কী, শ-তিনেক টাকা আয় হবে বছরে। এসবেও

কি কোনো দরকার নেই তোমার?

আমি তো সত্যি ভেবে পাই না—সত্যেন একটু ভেবেই বলল—এসব আমার কোন কাজে লাগবে।

তাহলে এক কাজ করো—জ্যাঠামশাই গম্ভীর হলেন—বেচে দাও। আমি কিনে নিতে পারি বলো তো।

কিনে আবার নেবেন কী—সত্যেন একটু চপলভাবেই হেসে উঠল—আপনার কোনো কাজে লাগে তো লাগবে। জ্যাঠামশাই ভুল বুঝলেন কথাটা। মনে মনে ভাবলেন ছেলেটার বিষয়বুদ্ধি যে একেবারেই নেই তা কিন্তু নয়। তাতে অখুশি হলেন না। বেশ একটু নরম সুরেই বললেন—বুঝেছ তো...মেয়েটা বিধবা হয়ে এল, অতগুলো কাচ্চাবাচ্চা, তাই ভাবছিলাম ওর মাথার উপর একটা চাল অস্ত্রত—

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। এখানে যদি ওঁর সুবিধে হয়—

অসুবিধে তো তোমার, আসবে তো মাঝে মাঝে? মোলায়েম হাসিমুখে সত্যেন জানাল—আমি আর আসব না।

না, না, আসবে না কেন, আসবে বইকি! আরে আমরা তো আছি। আর তুমি হলে এ গ্রামের গৌরব। অবশ্য ভেবো না যে বড়ো বড়ো স্কলার আর হয়নি এখানে—তমালপুরের মৃত ও জীবিত কীর্তিমান রায়চৌধুরীদের উপাধি ও বৃত্তির বিবরণ সোৎসাহে আবৃত্তি করলেন তমালপুরের অন্যতম অনতিকৃতী রায়চৌধুরী। সত্যেন শুনল যে তার জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে আছেন কিংবা ছিলেন দুজন প্রিন্সিপাল (একজন তাঁদের গটিনজেনের ডক্টর), একজন ডেপুটি-পোস্টমাস্টার-জেনারেল, একজন এঞ্জিনিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, লাহোরের ডেইলি নিউজ-এর এডিটর একজন, ভাইসরয়ের বাগানবাড়ির হটিকালচারিস্ট একজন, আর ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট একগুণ। কোনোটাই যেন নতুন লাগল না, যেন আগেও শুনেছে বারকয়েক, তবু মুখে-চোখে সচেতন মনোযোগ জঁইয়ে রাখল। তোমার কাছেও তমালপুর অনেক আশা করে হে!—বলে জ্যাঠামশাই কথা শেষ করলেন। আমাকে না হলেও বোধহয় তমালপুরের চলবে—সত্যেন মনে মনে বলল—আর আমিও বোধহয় তাতেই ভাল থাকব।

শিলঙের হালকা হাওয়ায় বিকেল-ছায়ায় বসে-বসে চার বছর আগেকার সেই দিনটিকে যেন জ্যান্ত করে অনুভব করল সত্যেন। হেঁটে-হেঁটে স্টিমারঘাটে আসার সময় ঘাড়ের উপর গরম রোদ্দুর আর স্টিমারের সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় একটা ভিজে ভিজে ঘোঁষার গন্ধ। ভাল লাগছিল তার। মাত্র ক-দিন আগে যে-ছেলের বাপ মরেছে তার পক্ষে হয়তো একটু অন্যায়রকমই ভাল। সত্যি স্বাধীন লাগছিল তমালপুর ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে, সত্যি সুখী লাগছিল তমালপুরে আর ফিরতে হবে না বলে। জায়গাটা কোনোদিনই সে পছন্দ করেনি, এমনকি, বাবা-যে পছন্দ করেছিলেন সেটাও পছন্দ করতে পারেনি। ওখানকার সকলেরই, তার বাবারও, মনের সেই ভাবটাতে খোঁচা খেয়েছে ছেলেবেলা থেকেই, মনে মনে যার নাম সে দিয়েছিল তমালপুরাঘ্রবোধ কিংবা রায়চৌধুরীচেতনা। প্রতিবাদ জানিয়েছে কলেজে ভর্তি হবার সঙ্গে সঙ্গে নামের 'চৌধুরী'টাকে তালুক দিয়ে, ওখানে গিয়ে যথাসম্ভব কম মেলামেশা করে, আর প্রতিশোধ নিয়েছে কেউ দেশ কোথায় জিজ্ঞেস করলে ঝাপসা জবাব দিয়ে। দেশ! দেশ মানে কী? সে-যে ওখানকার, ওটা যে তার দেশ, এতো তার মনের হাজার মাইলের মধ্যে নেই। ওখানে

কিন্তু লাগে তার, ওটা তার প্রতিকূল, বাবাকে ছাড়া একটুও আপন লাগেনি আর একজনকেও। পৃথিবীতে এত ভাল-ভাল জায়গা থাকতে ঐ দম-আটকানো তমালপুরটাই তার দেশ? কী আশ্চর্য কথা! কান পেতে স্টিমারের ঝকঝক শুনল একটু, শুনল দূরত্বের আশা; চোখ তুলে তাকাল জলভরা দূরত্বের দিকে, দেখল দিগন্তের আশ্বাস।

বাবা মরবার পরেই খানিকটা অসুখী লাগতে পারত। কিন্তু তাও যখন তেমন লাগল না, সত্যেন প্রায় ধরেই নিল যে অসুখী অবস্থার সঙ্গে চেনাশোনা তার হবেই না। আর তার জীবনও তার এ-ধারণার খোরাক যোগাল। যেমন সে ভেবে নিয়েছিল ঠিক-ঠিক তাই হল পর-পর, তার এম. এ. পরীক্ষায় পূর্ব-ইতিহাসের বাঞ্ছিত পুনরাবৃত্তি ঘটল, চাকরি জোটাতেও হিমশিম হল না। দেশ বেড়ানোর শখ মেটাতে লাগল, বিশেষ-বিশেষ বই পড়ার বাধ্যতার দায়টাকে জীবনের মতো চুকিয়ে দিয়ে সাহিত্যের স্বরাজ পেল। শুধু একটু কষ্ট হয়েছিল হস্টেল ছেড়ে সাধারণ মেস-এ উঠতে, কিন্তু তাও তো শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচিয়ে দিল টালিগঞ্জের গলির মধ্যে একতলার ঘর দুটো। নিশ্চয়ই মানতে হয় যে ভাগ্য তাকে নেকনজরে দেখেছে, সে যা চেয়েছে—সত্যি-সত্যি যা চেয়েছে তা সবই পেয়েছে এ পর্যন্ত, আর যা সে পায়নি তা সত্যি-সত্যি সে চায়ওনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের যিনি শিরোধার্য, তাঁর কাছে গিয়েছিল চাকরির সুপারিশ আনতে। কলেজের নাম শুনে ঈষৎ নাক কঁচকে তিনি বললেন—ওখানে কেন? বি. ই. এস-এর চেষ্টা করো, পেয়ে যাবে।

আপাতত—

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, কিন্তু এখন থেকেই উঠে পড়ে লেগে যাও—শিগগির একটা খালিও হচ্ছে কেউনগরে। ডি. পি. আই-এর কাছে একটা পার্সনাল চিঠি দেব তোমাকে? কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ল সত্যেন। ঢোক গিলে, রুমালে মুখ মুছে, কোনোরকমে আওয়াজ বের করল—আমি কলকাতাতেই থাকতে চাই।

আহা, এখন যাও-তো, সময়মতো ধরাধরি করে প্রেসিডেন্সিতে চলে আসতে কতক্ষণ! আর নয়তো—যুবকের লজ্জা-লাল মুখের উপর একবার চোখ ফেললেন প্রৌঢ়—একটা ক্রিসার্চ-ফেলোশিপ নাও আমার কাছে। টাকা ঐ কলেজের চাইতে কম হবে না, বেশিই সম্ভব। একটু থামলেন, শ্রোতার মুখে ইচ্ছার ঝিলিমিলি দেখে নিয়ে আরো একটু গভীর গলায় বললেন—এইটিছ সেধুরির শেষ দিকটাকে ধরো। পিরিয়ডটা নিয়ে বেশি কিছু বসিয়ে বিলেতেও হয়নি, খানিকটা তৈরি করে পি. আর. এস.-এর জন্য দাও—তদ্দিনে লেকচারারশিপ হয়ে যাবে। তারপর ঘোষ-ফেলোশিপ নিয়ে লন্ডনের পি. এইচ. ডি. আর তারপর—বিশ্ববিদ্যার প্রধান পুরুষ নিজের অতীতের ম্যাপটাকেই মেলে ধরলেন চাকরি-চাকরি ছোঁকা-নবিশের ভবিষ্যতের সামনে—তারপর আয় কী! তারপর যে আর কিছুই ভাবনার থাকে না, সেইটা বোঝাবার জন্য হেলান দিলেন ইংরেজি চেয়ারের চামড়া-পিঠে। সহৃদয়, সদয় একটু চোখ টিপে আবার বললেন—কিছু ভেব না, আমি ঠিক চালিয়ে নিয়ে যাব তোমাকে—ফ্র্যাংক-এর উপর কিছু নোট আছে আমার—কথা শেষ করলেন না, আর তাতেই বুঝিয়ে দিলেন নোটগুলির মূল্য, আর শিষ্যের প্রতি তাঁর গুরুদাক্ষিণ্যের গুরুত্ব। আশাতীত পাবার পর যেমন হয় ঠিক তেমনি নীরব, নতমুখ, অভিভূত দেখলেন প্রার্থীকে। আর তাঁর এই তৃতীয় দৃষ্টিপাতে, যদিও সত্যেন দেখল না, প্রায় পূর্ণস্নেহ প্রকাশ পেল। নিজের গুরুত্ব প্রায় ভুলে গিয়ে প্রায় মিত্রবৎ প্রশ্ন করলেন—

ক্র্যাবকে তোমার কেমন লাগে?

ক্র্যাব! ইংরেজিতে এত-এত কবি থাকতে জর্জ ক্র্যাব! সত্যেনের বলতে ইচ্ছে করল, ক্র্যাব কে? প্রোফেসরের চোখে চোখ রেখে, শান্ত মুখে, গভীর গলায় বলতে ইচ্ছে করল কথাটা, ভীষণ ইচ্ছে করল, মনের মধ্যে একটা ত্রাস উঠল যে আর একটুক্কশ বসে থাকলে সত্যি না বলে আর পারবে না, তাই উঠে পড়ল হঠাৎ। বোকার মতো হাসল, বেচারার মতো হাত ঘষল, বাম্পার মতো পিছে হাঁটল, আর অধ্যাপক তৃপ্ত হলেন তার সর্বশরীরে কৃতার্থতার সর্বলক্ষণ লক্ষ্য করে। সত্যি তো, অবস্থা তাকে দয়া করেছে দরাজ হাতে। সবচেয়ে সুবিধে এইটা পেয়েছে যে সাংসারিক অর্থে সে একেবারেই একা। যেহেতু কলকাতায় এসেই সে বুঝেছিল যে তার পড়াশুনোর খরচ বাবার পক্ষে একটু বেশি হয়ে পড়ছে, আর সেইজন্য প্রথম সুযোগেই দশটাকা-বারোটাকা মজুরিতে ছেলে পড়ানোর বৌনি করেছিল। তাই বাবার আনুষঙ্গিক অন্য কিছু, যেমন, মা, ভাইবোন, আর বিবিধ আত্মীয় এসব তার মনের উপর আশ্রয়ের ছায়া ফেলতে পারেনি। ঠিক উল্টো, তার কাছে পারিবারিক সম্বন্ধ মানেই বন্ধন, ভার, স্বাচ্ছন্দ্যনাশ, কেননা এটা তো অবধারিত যে কাছাকাছি অন্য কোনো মানুষ থাকলে সে কিংবা তারা নিশ্চয়ই নির্ভর করত তারই উপর। যদি, ধরো, তার ছোটো ভাইবোন থাকত কয়েকজন তাহলে? তাহলে তো তাকে ঐ করতে হত—বি. ই. এস.-এর সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে ঘুরতে হত কেটনগর-রাজসাহী-চট্টগ্রাম, নয়তো জর্জ ক্র্যাবকে নিয়ে রিসার্চ করে ইউনিভার্সিটির কৃপা কুড়োতে হত। করতেই হত এসব, হয়তো আরো অনেক কিছু যা ক্র্যাব কিংবা কেটনগরের চেয়েও মারাত্মক। কোথায় থাকত তার স্বাধীন জীবন, কোথায় থাকত সাহিত্যস্বরাজ। তার সঙ্গে বি. এ.-তে সেকেন্ড হয়েছিল অসিত ঘোষ। এম. এ. বাদ দিয়ে আই. সি. এস. দিল—হল। এখন কোথায় যেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট। এম. এ.-তে সেকেন্ড হয়েছিল প্রাণতোষ বাগচী, সে কৃষ্ণনগরকে কচ্ছ-নগর মনে করল না—সেদিন বদলি হল ঢাকায়। আর অল্পের জন্য ফার্স্টক্লাসের ফাঁড়া কাটাল যে ধীরাজ গুপ্ত, সে চলে গেছে দিল্লিতে রেডিওর প্রপাগান্ডার পাণ্ডা হয়ে। পুরোনো সহপাঠীদের কারো কারো সঙ্গে এখনও তার দেখা হয় মাঝে-মাঝে। তারা প্রত্যেকেই তাকে বলে—করছ কী হে, ঐ একটা রদ্দি কলেজেই পচবে নাকি? উত্তরে সত্যেন শুধু বলে—বেশ আছি। কথাটা ভান নয়, স্তোক নয়, সত্যি সে যা বিশ্বাস করে তা-ই সে বলে। কত ভাল আছে, কত সুখ আছে, তা কি এরা বোঝে না? কলকাতায় আছে, অল্প কাজ, লম্বা ছুটি, নিজের ছাঁড়া আর কারো ভায় নেই, বলতে গেলে কোনও ভারই নেই, কেননা তার নিজের খুব অল্পই চলে যায়। কলেজে পায় একশো কুড়ি টাকা, একটি (একটিই মাত্র) টুশনি করে সেই সঙ্গে সবসুদ্ধ যা পায় তাতে ভেসে যায় তার। বই কেনা, দেশ দেখা সবসুদ্ধ। এর বেশি আয় হলে তা নিয়ে কী করবে তা প্রায় ভেবে পাওয়াই মুশকিল। আর, আয় বাড়বার কথাটা অবশ্য ওঠে না, যদি না সে রাজী হয় অবসর বেচতে, স্বাধীনতা বিকোতে। আর তার কাজে যা আসল, সবচেয়ে যা মূল্যবান, তা-ই যদি না থাকল তাহলে অন্য কোনো কিছুই কোনো কাজে লাগবে না তো! ঐ তো হিলভিউ হোটলেই আর একজন আছেন কলকাতার প্রোফেসর, প্রবীণ, পরার্থপর। কেননা শিলঙের এই সোনার মতো সকালবেলার প্রত্যেকটিকে তিনি জবাই করেছেন, বি. এ. পরীক্ষার খাতায় লাল পেন্সিলের খোঁচা দিয়ে-দিয়ে। ভাগ্য তার, ম্যাট্রিকুলেশনের পরীক্ষক তাকে করেনি এখনও। দরখাস্ত দিয়ে যাচ্ছে নিয়মমারফিক, নয়তো কলেজে ভালো দেখায় না। আর দিয়েই মনে মনে বলছে—না যেন হয়! আর যেহেতু আরেদনপত্রে নাম সই ছাড়া এ পর্যন্ত এ বিষয়ে আর কিছুই সে করেনি, তাই তার এই অনুস্ত প্রার্থনা নির্ভুলভাবে মঞ্জুর হয়ে যাচ্ছে নিয়মিত। যেটা

না-হলে অন্যদের বাঁচা শক্ত, সেটা না হলেই সে বাঁচে। না, আশেপাশে এমন একজনকেও সে দেখতে পায় না, যার সঙ্গে জায়গা বদলাবার ইচ্ছা মুহূর্তের জন্যও তার হতে পারে। এক হিসেবে একটু হয়তো স্বার্থপরতা, অন্য হিসেবে স্বার্থবোধের সাংঘাতিক অভাব—মানে সাংসারিক মূঢ়তা—দুটোই দেখতে পেল সত্যেন তার মনের এই ভঙ্গিতে। কিন্তু তাই বা কেন? ভাইবোন, অন্যান্য আত্মীয়, যারা আদৌ ছিল না, কিংবা নামমাত্র ছিল, তারা নেই বলে যদি তার ফাঁকা না লাগে, বরং হাঙ্কা লাগে, সেটা কি স্বার্থপরতা? পাঁচটা-সাতটা ভাইবোন কি পাতিয়ে নিতে হবে, যাতে সে অধমতম গরিব হতে পারে? আর মূঢ়তা—কীসের? যদি কোনো বিপদে পড়ে? যেমন, শক্ত কোনো অসুখ হতে পারে, চাকরি যেতে পারে হঠাৎ, আরো কত কিছু হতে পারে—হয় তো অনেকের... কিন্তু সত্যেন যতই ভাবল, কিছুতেই নিজের কোনো বিপদে পড়া অবস্থা কল্পনা করতে পারল না। কিংবা যতদূর ভাবতে পারল, কোনো বিপদই বিপদ লাগল না তার কাছে। ভয় কী—পাইন-হাওয়ার খিরখিরানি তার কানে-কানে বলল— ভয় কী! পাতার ফাঁকে-ফাঁকে আকাশের নীল চোখও তাই বলল। কিছুতেই ভাবতে পারল না যে তার এই একলা অবস্থা মানেই অসহায় অবস্থা। ভাল আছে, বেশ আছে, খুব ভাল—এ ছাড়া কিছুই ভাবতে পারল না। একা বলেই ভাল। সেটাই—এইমাত্রই তার মনে হল কথাটা—তার সবচেয়ে মূল্যবান, তার জীবনের আসল, আর এটাকেই সে নানা দিক থেকে আঁকড়ে থাকে, অবসর, স্বাচ্ছন্দ্য কি স্বাধীনতার নাম দিয়ে। কলকাতার এই ন-বছরে অনেক অনেক লোকের সঙ্গেই তার আলাপ হয়েছে—তাকে পছন্দ করেছে অনেকেই, সে-ও উপভোগ করেছে অনেকের সঙ্গ, কেউ-কেউ কখনও-কখনও খুব কাছেও এসেছে, বন্ধু হয়ে উঠেছে প্রায়... প্রায়, ঠিক বন্ধু কেউ হয়নি। একজনও না; ঠিক জায়গায় ঠেকিয়ে দিয়েছে, কিংবা নিজেই ঠেকে গেছে। কিন্তু সেটাই সে চেয়েছে, এর বেশি হলে কী যেন সে হারাত, নিজেরই খানিকটা খোওয়া যেত যেন। পকেটের মধ্যে চিঠিটার উপর একবার হাত রাখল সত্যেন। তার চিঠি? কে? ছাত্রী? ছাত্রীর সঙ্গে শিক্ষকের এ কী-রকম পত্রবিনিময়? বন্ধু? পঁচিশ বছরের পুরুষের সঙ্গে আঠার বছরের মেয়ের বন্ধুত্ব? এ বন্ধুত্বের পরিণাম সে কি প্রত্যক্ষ করেনি গল্পে-উপন্যাসে হাজার বার? বিদ্বান, সুসংস্কৃত, বাকনিপুণ, এমন কি সত্যিকার জ্ঞানী কিংবা গুণীও দু-একজন, যত পুরুষের সঙ্গে সে মিশেছে, তাদের একজনকেও ঠিক বন্ধু বানাতে পারল না। পারল না মানে চাইল না। আর বন্ধু হল কিনা এই কাঁচা, হাঙ্কা, কাঁপা-কাঁপা, প্রায় চোখ-না-তোলা, কথা-না-বলি একটুখানি মেয়ে? শুধু মেয়ে বলেই? বাড়ি তার ত্রীলোকবর্জিত, কিংবা বাড়ি বলেই কিছু নেই। তা-বলে দেখাশোনা যে একেবারেই হয়নি তাও নয়। সহপাঠিনী ছিলেন কয়েকজন, বাছা বাছা সহপাঠির মা, বোন, বৌদি, ছাত্রাবস্থার শেষের দিকে কোনো কোনো অধ্যাপকের স্ত্রী, এমন কি ডিগ্রির জোরে জ্বলজ্বালন্ত যুবতীকেও বি. এ. পরীক্ষায় তরিয়ে দিতে পেরেছে নিজের বিপজ্জনক বয়সটা সত্ত্বেও। কিন্তু বিপদ সে কিছু ঘটায়নি, সে-রকম কোনো সম্ভাবনার প্রথমতম উকিঝুঁকিও দেখতে পায়নি নিজের মনে। ইচ্ছে করলেই ভাব জমাতে পারত কোনো কোনো তরুণীর সঙ্গে, চেষ্টা করলে (হয়তো খুব কঠোর চেষ্টাও না) এগোতে পারত আরো—কেন করেনি? যৌবনের মধুর ভীষণ জৈব-ষড়যন্ত্র থেকে সে কি মুক্ত? তা কি হতে পারে! কখনও কি আকৃষ্ট হয়নি, লুব্ধ হয়নি? তাও হয়েছিল একবার। কিন্তু আরও প্রবল ছিল তার নিজের নির্জনতার টান। তাই হারেনি। তাহলে স্বামী মিত্র আলাদা হল কীসে? অন্যদের থেকে অন্যরকম হল কেমন করে? স্পষ্ট মনে পড়ল কোলরিজ-পড়ানো কলেজ-ক্লাসের সেই সকালবেলা, প্রথম যেদিন চোখ রেখেছিল তার মুখে। সেদিন ভাল লেগেছিল—সেটা না-লেগেই পারে না—অনেকগুলি বিরুদ্ধ,

পাশ-প্রতিজ্ঞ ফাঁকামুখের মধ্যে হঠাৎ এক জায়গায় প্রাণের অনুকম্পন অনুভব করে। তারপর...ইঁা, কলেজের লাইব্রেরিতে— আশ্চর্য এই আবিষ্কার সেদিন করেছিল যে সাহিত্যের স্বাদ যাদের দিতে গিয়ে প্রতিদিন সে গভীর আত্মিক যন্ত্রণা ভোগ করে, তাদের মধ্যে এমন একজন অন্তত আছে যার কবিতার খিঁদে পেয়েছে। আরো আশ্চর্য এই কারণে, কেননা সত্যেন দেখেছে—অল্প যে-কজন কবিতা পড়ে তারা সকলেই পুরুষ, মেয়েরা গল্পটেলেরই মক্কেল— যে সে একজন মেয়ে। মেয়েটিকে একটুখানি মনে রাখার মতো মনে হল সেদিন। কেননা তার নিজের উপর যাদের আগ্রহ, তাদের উপর তার আগ্রহ বরং কম, কিন্তু তার যে-সব বিষয়ে আগ্রহ, অন্য কারো সে-সবে আগ্রহ দেখলে সেই মানুষের দিকে আগ্রহ তার দৌড়ে ছোটে। কিন্তু তাতে কী? সাহিত্য ভালোবাসে এমন মানুষ সে তো এই প্রথম দেখল না, তার মেলামেশার সমস্ত জগৎটাতেই একটু-না-একটু সাহিত্যের হাওয়া বয়। কী তবে, নিজেকে প্রশ্ন করল সত্যেন, কী তোমাকে টেনে আনল স্বাভাবিক মিত্রের এতটাই কাছে যে আজ তা নিয়ে এত ভাবনাই ভাবতে হচ্ছে? তার রূপ? তার বয়স? তার ভীক, নরম, উষ্ণ, বিস্মিত নারীত্ব? না কি তার উৎসাহ, উৎসুকতা, আনুগত্য, তার মনের মতো চমৎকার অচম্ব্য খেত, যেখানে তুমি মনের সুখে চালাচ্ছ পৃথিবীর বড়ো-বড়ো লেখকদের লাঙল? আর তো কারো মন-তৈরির ভার এমন করে পাওনি। আর এমন মন, যা তৈরি হবার যোগ্য, আর যার তৈরি হবারই সময়! আর তাই থেকেই কি কোনো একদিন একথা ভাবতেও শুরু করেছে যে এমন আর দ্যাখনি, এমন মানুষ, এমন মেয়ে? সত্যেনের চোখ বুজে এল, দু-আঙুলে কপালের চামড়া টেনে ধরল একবার।

দৈবক্রমে প্রতিবেশীও হয়ে পড়ল। আরো দেখা হল, আরো ভাল লাগল। প্রথম দেখাতেই ভাল লাগল তার বাবাকে, আর যদিও সে নিজেকে এটুকু অন্তত অক্ষত রাখতে পেরেছে যে দেখাশোনাটা ঘন ঘন হতে দেয়নি, তবু সমস্ত বাড়িটাকেই যেন সঙ্গী করে নিয়েছিল তার চলাফেরার। বাড়ি! কথাটার অর্থ বুঝেছিল বড়দির নিমন্ত্রণের দিন। আর সেইদিনই জেনেছিল পারিবারিক জীবনের আনন্দ। শুধু যে বড়দি তাকে মুগ্ধ করল তাও নয়। সমস্তটা মিলিয়ে একটা সুস্বাদু স্পর্শ করল তাকে, সব যেন ছন্দে বাঁধা, কোনো এক-হয়ে-ওঠা সম্পূর্ণতার গড়ে তোলা অংশ। এমন কি হারীতবাবুকেও বেসুরো ঠেকল না শেষ পর্যন্ত। আর সবচেয়ে বড়ো কথা নিজেকে একবারও বাইরের লোক মনে হল না সেই আত্মীয়মণ্ডলে। কলকাতার শহরে কোনো-কোনো বাড়িতে সে নিমন্ত্রিত হয়েছে কয়েকবার, অনাদর পায়নি কোথাও, সৌজন্য পেয়েছে সর্বত্র। এমন আরাম, এমন একান্ত আরাম পায়নি আর কখনো কোনোখানেই। পরের দিন সকাল থেকেই আবার যাবার ইচ্ছা প্রবলভাবে চেতিয়ে উঠল মনের মধ্যে, আর সেইজন্যেই কিছুতেই গেল না।

সেটা ভালই করেছিল। কিন্তু ভুল, মস্ত ভুল ঘটিয়ে রেখেছিল আগেই। কেন সেই চিঠি লিখেছিল শান্তিনিকেতন থেকে? কী সেই ইচ্ছা, চিন্তা, জল্পনা বা কল্পনা, যা তাকে তখনকার মতো দখল করে সেই প্রথম চিঠি লিখিয়েছিল? তারপর এবারও আবার! আর এই চিঠি লেখা—এটা তার একটা বাসনা ছাড়া আর কী? সাহিত্য ভালোবাসে, কিন্তু নিজে লিখতে পারে না, তাই দুধের সাধ ঘোলে মেটায় মাঝে মাঝে একে-ওকে লম্বা চিঠি লিখে। কিন্তু সেবারে শান্তিনিকেতনে বসে আর কারো কথাই কি মনে পড়ল না, অল্প-চেনা ছিপছিপে ছাত্রীটিকে ছাড়া? ঐ বাধো-বাধো আধো-বলার মেয়েটির কাছেই কি ভাবোচ্ছ্বাসটি পাঠাতে হল? আর এবার—লিখবে, যেন জানা কথাই, যেন না লেখার কথাই ওঠে না। ভুল করেছে... ভুল করেছে?

পকেটে রাখা চিঠিটার অন্তঃসার মনে মনে আউড়িয়ে গেল আরো একবার। আর তো ভিত্ত-
ভিত্ত নয়, আধো-বাধো নয়... বেড়েছে, জোর বেড়েছে, সাহস পেয়েছে, দ্বিধা ভুলে যাচ্ছে, বাধা
ঠেলে দিচ্ছে, কেউ যেখানে আসেনি, সেখানেই শেষ পর্যন্ত পৌঁছবে নাকি এই মেয়ে, পার হবে
নাকি সীমান্ত? এক লাফে উঠে দাঁড়াল সত্যেন, প্রায় আওয়াজ করে বলে উঠল—না, আর
না। এ চিঠির জবাব দেবে না, আর লিখবে না কোনোদিন। শুধু দেখাশোনার ফলে যা হতে
পারত না, সেই অভাব্য, অবিশ্বাস্য, অসম্ভবকেই সে কি ডেকে আনবে চিঠির পর চিঠিতে!
সত্যেনের ত্রাস লাগল, শীত করল হাওয়ায়, পা ফেলল দ্রুত। রাত্রে ঘুমোবার আগে লঠনের
আলোয় আবার চিঠি পড়ল। অনেকক্ষণ ঘুম হল না, কিন্তু ঘুম ভাঙল খুব ভোরেই। চায়ের
আগেই বেরিয়ে পড়ে কয়েক মাইল হেঁটে এল আর হোটেল ফিরে চা খেয়েই চিঠির উত্তর
লিখতে বসে গেল—কী সুন্দর দিনটি আজ!...

৬

শিলঙে সুন্দর, কিন্তু কলকাতায় সবচেয়ে বিখ্যাত-গরম গ্রীষ্মদিনের একটি। আকাশে নীল নেই।
পাতলা...খুব পাতলা একটা ধোঁয়ারং ছড়ানো, হঠাৎ কখনো মেঘের মতো ছায়া-ফেলা, কিন্তু
মেঘ নয়। মেঘের উল্টো—কেননা বৃষ্টির আশাকেই সে দূরে সরায়, আর হাওয়া বন্ধ করে
দিয়ে পৃথিবীর হাঁপ ধরায়। বাইরের দিকে তাকালে রোদ্দুরটা কড়া লাগে না, বরং মিনমিনেই।
প্রথম গ্রীষ্মের মুড়মুড়ে ফিটফিট টাটকা-তাজা তাত—যা মনে হয়, হাতে তুলে বাগ্লে ভরা যায়
—তার বদলে একটা পিছল, প্যাঁচালো, নাছোড়, ঘূর্ত তাপ—স্নানের জলে ধোয়া যায় না, আবার
উড়িয়েও তাকে নিতে পারে না ইলেকট্রিকের হাওয়া। তাকে ফাকি দেবার একটি মাত্র উপায়
আছে—কাজ... এমন কাজ, যা অস্তুত মনটাকে আঁকড়ে রাখে। কিন্তু তেমন কাজ স্বাতির কি
আছে? স্নান করেছে সকালেই, বসে আছে তার বেতের চেয়ারটিকে পাখার তলায় টেনে এনে,
পড়ছে রবীন্দ্রনাথের ‘ছেলেবেলা’। কামড়ে-ধরা বই, তবু মন তার সরে যাচ্ছে মাঝে-মাঝে,
মনে হচ্ছে পাখাটায় যেন জোর নেই আজ, মনে হচ্ছে শুধু বই পড়ে আর সময় কাটছে কত?
বিজ্ঞান ডাকল ঘরে এসে তার নাম ধরে। স্বাতি তাকাল একবার, চোখে আগুন ফুটল না।
এই, মজুমদার এসেছে—ব্যস্ত বিজ্ঞান মস্ত খবর দিল। স্বাতির মুখ শক্ত হল একটু, অল্প একটু।
ভাইয়ের দিকে না তাকিয়ে বলল—উনি বুঝি দুপুরবেলা ছাড়া কারো বাড়ি আসবার সময়
পান না?

দুপুর কী রে? মোটে তো দশটা!

দশটা? এখনো এতগুলি ঘণ্টা পড়ে আছে দিনের? কী লম্বা দিন! বোনের এই চূপ-করাটুকুর
সুযোগ নিল বিজ্ঞান। তাড়াতাড়ি জুড়ল—বিশেষ একটা দরকারেই এসেছে। বিশেষ জোর লাগল
‘বিশেষ’ কথাটায়।

কিন্তু স্বাতি যেন শুনতেই পেল না, কিংবা শুধু শেষ শব্দটা শুনল। বই থেকে চোখ তুলে, কিন্তু
এবারেও বিজ্ঞানের দিকে না তাকিয়ে আস্তে-আস্তে বলল—এসেছেন তো আমি কী করব?
বলেই মনে পড়ল, ঠিক এই কথাটাই আগে একদিন বলেছিল, সত্যেন রায় যখন এসেছিলেন।
একই কথা কতই আলাদা করে বলি আমরা!

কী করবি? বিজ্ঞান চটপট জবাব দিল—বাড়িতে বন্ধুবান্ধব এলে সবাই যা করে তাই করবি।

আমার কোনো বন্ধু এলে নিশ্চয়। বিজন একটু থামল, স্বাতী বুঝল যে মুখে প্রথম যে কথা এসেছিল সেটা বদলে নিল সে, হেসে বললো—আচ্ছা, আচ্ছা, আমার বন্ধুর সঙ্গেই না হয় দয়া করে একটু দেখা করলি।

এখন ব্যস্ত আছি, স্বাতী চোখ নামাল 'ছেলেবেলায়'। বিজনকে চটাতে চাইল, পারল না। হঠাৎ তার স্বভাবের আদিম সরলতায় ফিরে গেল বিজন। জানতে চাইল—ব্যস্ত কেন, পড়ছিস তো। স্বাতীকে বলতে হল—সেইজন্যেই ব্যস্ত। গভীরভাবে, কিন্তু ঠোটের দূর-কোণে একটু হাসিও রেখে বিজন বলল—তাই-তো! তুই-যে এত বড়ো একজন ব্যস্ত মানুষ, মজুমদার তো আর জানে না। আর জানবেই বা কী করে—সেদিন দুপুরবেলা বসে এক ঘণ্টা গল্প করলি। স্বাতী বই নামাল কোলে, বসল সোজা হয়ে, এতক্ষণ পরে বিজনের চোখে চোখ রাখল। বলল—ভুল করেছিলাম।

আশ্চর্য! তক্ষুনি জবাব দিল বিজন—তুইও ভুল করিস! স্বাতী কথা বলল না।

বিজন একটু দাঁড়াল—অন্তত দরকারি কথাটা শুনে আয়।

আমার সঙ্গে দরকার?

তোর সঙ্গেও।

তাহলে তো তুই শুনলেই চলতে পারে—স্বাতী প্রশ্নের মতো আরম্ভ করল, কিন্তু শেষ করল সিদ্ধান্তের সুরে—মানে, তোর মুখে আমার শুনলে।

তা পারে, কিন্তু তুই একবার চেহারটাও দেখাবি না? বিজন একবার জিভটাকে ঘুরিয়ে আনল গালের মধ্যে। মুচকি হেসে রঙের টেকা ছাড়ল—মজুমদার আবার একা আসেনি, তার ভাগনিও এসেছে সঙ্গে।

ভাগনি?

হ্যাঁ, ভাগনি। বিজয়ী ভঙ্গি এবার বিজনের।

ভদ্রলোকের আবার ভাগনিও আছে?

থাকতে নেই? বিজন হাসল। তা হলে তুই একবার—বিজন কথা শেষ করল না; দৌতী সমাধা করে বেরিয়ে গেল।

তাহলে না গেলেই নয়? স্বাতী দেৱী করল না। অনিচ্ছার কাজে তাড়াতাড়িই ভুলি। যত শিগগির আরম্ভ, তত শিগগিরই শেষ। ভেবেছিল, অন্য-একজন মেয়ের প্রতি তার মেয়েলি কর্তব্য সেরে একটু পরেই ফিরতে পারবে। কিন্তু ভুল ভেবেছিল, উর্মিলা ঘোষ সুজ্জ্বল উঠল না। স্বাতী ঘরে দিয়ে দাঁড়ানো মাত্র আলাপ করিয়ে দেবার সবুরটুকুও না করে মেয়েটি সম্ভাষণ জানাল—আসুন, অনেকক্ষণ বসে আছি আমরা। এই যে এখানে বসুন—বেজের সোফায় নিজের পাশের জায়গাটি দেখিয়ে দিল। একটু দূরে বসতে যাচ্ছিল স্বাতী, কিন্তু এ-আদেশ অমান্য করতে পারল না। মুখ ঘুরিয়ে হ-কোণ কাচের ঝকঝকে চশমার ভিতর থেকে স্বাতীকে বেশ মন দিয়ে একটু দেখে নিয়ে নবাগতা আবার বলল—আপনার কথা এত শুনেছি যে আলাপ করতে না এসে পারলাম না।

আমার কথা কোথায় শুনলেন? অন্য কেউ হলে, হয়তো দিন-কয়েক আগে হলেও স্বাতী হেসে বলত কথাটা, একটু খুশি-খুশি ঠাট্টা ধরনে। কিন্তু এখন কথাটা উচ্চারণ করল ঠিক সেই সুরে, যে সুরে রেলস্টেশনে লোকে জিজ্ঞেস করে—নৈহাটির গাড়ি আবার কখন?

কেন? আমার কাছে! আর আপনার দাদার কাছেও— দুজনের দিকে ছিমছাম দুটি হাসি ঝলসাল স্বাতীর অনুরাগিণী। প্রথমোক্তকে লক্ষ্য করে স্বাতী বলল—আপনাদের আলোচনার এর চেয়ে ভাল বিষয় কি নেই আজকাল?

কীসের চেয়ে ভাল? মজুমদার হাসল। আর এই প্রশ্নের তাৎপর্য স্বাতীর অনুমানের অস্পষ্টতায় ছেড়ে দিয়ে আরো চণ্ডা হেসে আবার বলল—মিলুর কথা! যা বলতে ওর ভাল লাগে, তাই ও বলে...আমার ভাগনি, উর্মিলা। স্বাতী সৌজন্যসম্মত নমস্কারের ভঙ্গি আনল মাথায়। কিন্তু উদ্দিষ্টা তা লক্ষ্য না করে আমার কথার জবাব দিল—যা ভাল লাগে তাই বলি আমি? না, যাকে বলছি তার যা ভাল লাগবে, তাই বলতে চেষ্টা করি—কেমন, তা-ই ভাল না? উর্মিলা সদ্য আলাপিতার দিকে তাকাল অনুমোদনের জন্য। কিন্তু স্বাতী একটু হেসে বলল—এখানে কিন্তু হিসেবে আপনার ভুল হয়েছে।

ভুল কেন? আপনাকে নিয়ে অন্যেরা কথা বলছে, এ-কথা শুনতে আপনার ভাল লাগে না? একেবারেই না—স্বাতী গম্ভীর হল।

সে কী! ফেমাস হতে ভাল লাগে না আপনার?

ফেমাস! স্বাতী যেন এই প্রথম শুনল, আলগোছে আওড়াল কথাটা। কিন্তু উর্মিলা স্পষ্ট জবাব চাইল—লাগে না?

যা আমি হইনি, যা আমি হব না, তা হতে কেমন লাগবে ঠিক বুঝতে পারছি না।

উর্মিলা সশব্দে হেসে উঠে কথাটাকে রসিকতা বানিয়ে দিল। চেয়ারের মধ্যে পিঠটাকে একটু ঢিল দিয়ে সবুজ জুতো-পরা পা-দুটো বাড়িয়ে দিল মেঝেতে, একটা হাত ঝুলিয়ে দিল চেয়ারের বাইরে। আর সেই হাতে তার জুতোর রঙেরই ব্যাগটাকে দোলাতে দোলাতে বলল—যদি ধরেই নেন যে হবেন না, তাহলে আর কী করে হবেন? ও তো আর কিছু না, লোকে যাকে নিয়ে কথা বলে, সেই ফেমাস। ভাল বললে ভাল, মন্দ বললেও ভাল। কিন্তু কথা বলবে—না বলে পারবে না। আর সেটা চেষ্টা করলেই হয়।

চেষ্টা করলেই?

ঠাট্টা করছেন আমাকে? কিন্তু আমি ঠিক করে নিয়েছি যে ফেমাস হব... হবই। এখন থেকেই চেষ্টা করছি সেজন্য—হব যখন, দেখবেন।

আমি তো নগণ্যই থেকে যাব। তাই দেখব না, শুনব।

কেন, ফেমাস লোকদের চোখে দেখতেও কি আপনার আপত্তি?

দেখতে চাইলেই কি দেখা যায় তাদের?

চেষ্টা করলেই যায়।

চেষ্টা করার চেষ্টাই আমার আসে না।

চড়া গলায়, পিছনে মাথা হেলিয়ে, উর্মিলা আবার হেসে উঠল। ব্যাগটা পড়ে গেল হাত থেকে। নড়েচড়ে বসল পায়ে উর্পা তুলে, ব্যাগটা স্থির করল হাঁটুর উপর, যেন হাসিঠাট্টার শেষে এবার আসল কথা পাড়ছে, এমনি একটা গাঙ্গীর্ঘ মুখে এনে বলল—যদি আমি বলি, একজন ফেমাস মানুষের সঙ্গে আপনার দেখা করাবার জন্যই আমরা আজ এসেছি, তাহলে কি আপনি সুখী হন না?

এর উত্তরে স্বাতী বলল—আমি এমনিতেই সুখী। উর্মিলার ছ-কোণাচ চশমা-আঁটা দৃষ্টি প্রায় কঠোর হল স্বাতীর মুখের উপর। পাছে আবারও ঐ ‘ফেমাস’ কথাটা কানে শুনতে হয়, সেই

ভয়ে এর পরের কথাটাও স্বাতীই বলে ফেলল—তাছাড়া বিখ্যাতদের বেশি ভালও লাগে না আমার। বলবার সময় ভাবেনি, কিন্তু বলেই মনে পড়ল দ্রুত দস্তকে।

কাকে দেখেছেন? উর্মিলা জেরা করল।

দেখিনি ঠিক কাউকেই, তবে মনে হয়—

আপনার মনে হওয়াটাকে যাচাই করে দেখুন না একবার। কাল আসুন সন্ধ্যাবেলা আমাদের ওখানে শশাঙ্ক দাসের গান শুনতে—শশাঙ্ক দাসের গান। আবার সাড়ম্বরে ঘোষণা করল উর্মিলা।

—আপনাকে নিমন্ত্রণ করতেই এসেছি আমরা। উর্মিলা ধরেই নিল যে নিমন্ত্রণ করা মানেই অন্য পক্ষের গ্রহণ করা। কথা শেষ করে চোখে তাকাল পুরুষ দুজনের দিকে, হাসল, যেন নিজের উপর খুশি হয়ে, আর সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে হাঁটু নাড়তে লাগল বসে বসে।

সে দুজন একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ। স্বাতী দু-একবার তাকিয়েছিল তাদের দিকে। তারা দ্যাখেনি। আর স্বাতী দেখেছিল তারা দুজনেই উর্মিলাকে দেখছে, আর চোখাচোখি করছে পরস্পরে। উর্মিলাকে উৎসাহ দিচ্ছে তাদের চোখে, বাহবা দিচ্ছে। দু-জনে যেন পরামর্শ করে পুরো রঙ্গমঞ্চটা ছেড়ে দিয়েছে তাকে। রঙ্গমঞ্চ কথাটাই এখানে ঠিক, একটা অভিনয় তাকে দেখানো হল। ভাল অভিনয়—ভালই। কিন্তু ওখানেই যেন শেষ নয়, তাকে একটা পাটও দিতে চাচ্ছে, নামাতে চাচ্ছে রঙ্গমঞ্চেই। ভাগনির শেষ হবার পরে ঠিক সময়ে আরম্ভ করল মজুমদার। স্বাতীকে লক্ষ্য করে বলল—শশাঙ্ক হঠাৎ এসেছে কলকাতায়, আমি খবর পেয়েই পাকড়েছি। ততক্ষণে স্বাতী তার মনের মাকড়শা-বোনা কম আলোর কোণ খুঁজে-খুঁজে শশাঙ্ক দাসকে উদ্ধার করেছে, তাই বলতে পারল—সেই ফিল্মের গাইয়ে?

হ্যাঁ, ফিল্মের গাইয়ে বলেই শশাঙ্ককে লোকে চেনে আজ—স্বাতী যেন আশা করেনি মজুমদারের মুখে এই কথা, কথার এই সুর। ঈষৎ চমকাল, কিন্তু বস্তা সেটা লক্ষ্য না করে আগের কথার জের টানল—পরশু ও ফিরে যাবে, ভয়ানক ব্যস্ত। কিন্তু আমি তো ছাড়বার পাত্র নই।—শেষ কথাটায় মজুমদার নিজে হাসল বড়ো-বড়ো দাঁত দেখিয়ে। কিন্তু স্বাতীর মনে হল না সেটা হাসির কথা।—কলকাতার কেউ তো জানেই না উনি এসেছেন—যোগান দিল বিজ্ঞ।

তাহলে কি আর রঞ্জে ছিল, ছেঁকে ধরত না চারদিক থেকে?

মাত্র দু-একজনই জানে। বিজ্ঞের ভাষার ভুল শোধরাল স্বাতী—তাই অল্পেই রঞ্জে পেলেন। তা নয়—স্বাতী ঠিক বুঝল না মজুমদার কোন কথার প্রতিবাদ করল—হাজার লোকের মধ্যেও আমি ঠিক ধরে আনতাম শশাঙ্ককে। তা আসবেন কাল। বেশি লোক মিলিনি। বেশি বলবার মতো বাড়িও নয় আমার। আপনারা, আর অল্প কজন বন্ধুবান্ধব—বলতে বলতে মজুমদার উঠে দাঁড়াল—হ্যাঁ, আপনার বাবাকেও যদি বলেন...আমার আসার সময় নেই, চলি। বিজ্ঞ, তুমি মিলুকে পৌঁছিয়ে দিও ভাই—শেষ কথাটা দরজার ধার থেকে ছুঁড়ে দিয়ে আচম্বিতে, অকস্মাৎ, অপ্রত্যাশিত প্রস্থান করল মজুমদার।

আমাকে কারো পৌঁছিয়ে দেবার দরকার নেই—উর্মিলা আরম্ভ করেছিল মামাকে লক্ষ্য করেই, কিন্তু মামা তার কথা শোনার জন্য দাঁড়ালেন না। অগত্যা বিজ্ঞকেই তাক করল চশমা-চোখ—তবে আপনি যদি ইচ্ছা করেন, আমার সঙ্গে যেতে পারেন। ভাগনিকে রেখে, তাকে পৌঁছিয়ে দেবার ভার দাদাকে দিয়ে, মজুমদারের হঠাৎ চলে যাওয়ায় স্বাতী একটু অবাক হল। কেননা ব্যবহারের যে-সব ধারণা তার মনে বদ্ধমূল, তার সঙ্গে এটা মেলে না। যেন বিষয়টা বুঝে নেবার জন্য বলল—নিজের গাড়ি থাকার একটা সুবিধে এই যে পৌঁছিয়ে দিতে লোক লাগে

না।

গাড়ি না হলেই লাগে নাকি? উর্মিলার প্রতিবাদ উঠল তখনই—আপনি ভেবেছেন কি আমাকে? তবু, আপনার মামা গাড়িটা পাঠিয়ে দেবেন নিশ্চয়ই।

কেন? গাড়ি পাঠাবেন কেন? ট্রাম-বাস আছে কী করতে?

ও! কাছেই বুঝি? স্বাতী অন্য দিকে আলোর সন্ধান করল।

আমরা কোথায় থাকি আপনি জানেন না?—উর্মিলা যেন অবাক হল। আর তার অবাক হওয়ায় অবাক হল স্বাতী, নিঃশব্দে মেনে নিল নিজের অজ্ঞতা। আমরা থাকি বেনেপুকুরে—উর্মিলা আলো ফেলল।

সেটা কোথায়?

ও মা, বেনেপুকুর জানেন না? খিলখিল করে হেসে উঠল উর্মিলা। স্বাতী লজ্জা পেল—বিখ্যাত বুঝি জায়গাটা?

না, না, সে রকম কিছু নয়, পাড়াটা বাজেই—তা ঠিক সুবিধেমতো পাওয়া গেল না আর কোথাও। অনেক ঘর চাই, গ্যারেজ চাই, গ্যাস চাই, আবার ফ্ল্যাট হলেও চলবে না। উর্মিলা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক খবর উগরে দিল—এই সব হয়ে ওঠা ভাড়া-বাড়িতে তো শক্ত? এই একেবারেই সত্য কথাটায় উর্মিলা প্রশ্নের সুর লাগাল, আর এমনভাবে তাকাল যেন সে ভাবছে স্বাতী এ নিয়ে তর্ক করবে, স্বাতীকে তাই সায় দিতে হল—নিজের বাড়িতেও সহজ না। ঠিক বলেছেন, অনেকের পক্ষে তাই। তবে মামা যখন বাড়ি বানাবেন—এ-বিষয়ে এর বেশি বলা উর্মিলারও বোধহয় বাঙ্ল্য লাগল, ফিরে এল আগের কথায়—তা এটাও মন্দ না। বড়ো বড়ো ঘর, চওড়া-চওড়া বারান্দা, আপনার ভালই লাগবে। উর্মিলা একবার চোখ ঘুরিয়ে আনল স্বাতীদের বসবার ঘরের চারটি কাছাকাছি দেয়ালে।

আর কী-কী আমার ভাল লাগবে বলুন তো, শুনি আপনার মুখে। কিন্তু স্বাতীর এই আঘাত জলের উপর পড়ল। জলের মতো সহজে উর্মিলা জবাব দিল—তা তো জানি না, তবে গান যে ভাল লাগবে, এটা নিশ্চিতই।

কিন্তু আমি তো এখনও বলিনি যে কাল যাব।

ও আবার বলবেন কী—যাবেন তো? উর্মিলা মুখে বলল এ-কথা, আর চোখে বলল—শশাঙ্ক দাসের গান শোনার সুযোগ কেউ কি পেয়েও হারায়?

স্বাতী কিছু বলল না। আপনি কি ভাবছেন যে যাবেন না? ইশ! হেসে তাকিয়ে ভুরু বাঁকিয়ে স্বাতীর একটি হাত ধরে উর্মিলা বলল—তোমাকে বড়ো ভাল লাগেছে আমার....সত্যি তারপরেই অন্য হাতে বাঁধা ছোট্টো সোনার ঘড়ির দিকে কোণচোখে তাকিয়ে, মুখ ঘুরিয়ে, প্রায় একই রকম মধুর সুরে বলল—আমার সঙ্গে বেরোয়েন নাকি বিজনদা, আমি কিন্তু আর বেশিক্ষণ বসব না। বিজন এতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে দেখছিল বোধহয় দু-জনকেই। কথা শোনামাত্র তড়াক করে উঠল।

তার চেয়েও কমক্ষণে আমার হয়ে যাবে—বলে দ্রুত বেরিয়ে গেল দ্রুত স্নানাহার সারতে। সেই কম-ক্ষণই স্বাতীর পক্ষে অনেকক্ষণ হল। কেননা, বিজন চলে যাওয়া মাত্র উর্মিলা ঘুরে বসল হাঁটুতে প্রায় হাঁটু ঠেকিয়ে। একেবারে দু-চোখভরা ঢলঢলে তাকিয়ে বলল—এস তাই, এখন একটু মন খুলে কথা বলি দু-জনে। এর পরেও আরো মন খুলবেন ইনি? স্বাতী একটু সরে বসল, 'তুমি'-টাকে যেন লক্ষ্য করল না। একটু বেশিই ভদ্রভাবে বলল—আপনাকে কিছু

পানীয়? কথাটা উচ্চারণ করেই স্বাতী প্রায় জিভ কামড়াল। কেমন করে সে আগেই না-বুঝে পারল যে ওটা শুনে তার সঙ্গিনীর খিলখিলে-কলকলে হাসি আবার উথলোবে? কিন্তু স্বাতী সবচেয়ে বেশি যা ভাবতে পারত, তার চেয়েও বেশি হল। হাসির অঁখে জলে পড়ে গেল উর্মিলা। অনেক টোক হাসি গিলতে-গিলতে একটি-একটি কথার বুদ্বুদ তুলল কোনোরকমে—পানীয়? না ভাই পানীয়-টানীয় কিছু চাই না আমার। স্বাতী অদম্যভাবে আবার বলল—কিছু না? না। প্-পানীয়!—উঃ! ডুবতে ডুবতে বেঁচে গিয়ে উর্মিলা এবার দুর্বলভাবে হাসির হেঁচকি তুলতে লাগল। দাদা বোধহয় খেতে গেল, আমি একবার— উর্মিলা দৃষ্টিপাত করল ভিতরের দিকে— কেন, চাকর নেই? তক্ষুনি উর্মিলা উঠে এল শুকনো ডাঙার কেজো ঘাটে।

সে জন্য না—স্বাতী জরুরিভাবে উঠে দাঁড়াল।

আরে বসো, বসো—উর্মিলা হাত ধরে সাধল, বাদ সাধল—দাদার অত যত্ন না করলেও চলবে। বসো, একটু গল্প করি। স্বাতী বিবর্ণভাবে বসে পড়ল। ভিতরে যাবার দরজাটায় রইল তার চোখ... চোখের তৃষ্ণা।

তুমি বোধহয় আই. এ. পাশ করলে এবার।— উর্মিলা আরম্ভ করল মন-খোলা গল্প। স্বাতী মৌনভাবে বুঝিয়ে দিল যে অনুমানটা মিথ্যে না।

এখন কী করবে?

পড়ব।

পড়াশুনো তো শেষ হবে একদিন।

হোক তো।

তোমার শিগগিরই শেষ হবে— উর্মিলা প্রায় দৈবজ্ঞের মতো বলল।

পড়াশুনোর কি শেষ আছে জীবনে? প্রায় আর্ষভাবে উত্তর দিল স্বাতী।

তুমি তাহলে তোমার জীবনটা নিয়ে বেশি কিছু ভাবনি?

আপনি ভেবেছেন মনে হচ্ছে? স্বাতী বলতে চেয়েছিল, আমার জীবন নিয়ে আপনি ভেবেছেন, কিন্তু উর্মিলা উথলে উঠে বলল—নিশ্চয়ই! আমার জীবন নিয়ে আমি যদি না ভাবি—কিন্তু এ ‘আপনি’ টা আর কেন ভাই, মোটে ভাল শোনায় না। আর বয়সে বেশি বড়ো না আমি জীবিত। এবার বি. এ. দিলাম, আর এর পরেই মুশকিল। পরীক্ষার আগে থেকেই মা চিঠি লিখছেন মামাকে—মা তো দেশে থাকেন, আর আমার বাবা নেই। কিসের জন্য বুঝতে পারো, আর মামারও তাই মত। মনে মনে উনি বেশ সেকেলেই আছেন এখনও, আর আমাদের মতো মডার্ন হবেনই বা কী করে—মামাও কথাবার্তা এমন বলেন যেন বিয়ে ছাড়া মেয়েদের গতি নেই। আমি বলি—না, কক্সনো না, বিয়ে-বিয়ে করে চ্যাচামেচি কি এখনো শুনতে হবে, এই উনিশ-শো একচল্লিশেও? অবশ্য তোমার মতো মেয়ের কথা আলাদা, আমাকে দেখেই বোঝা যায় তুমি বিয়ে করারই টাইপ। দ্যাখো না, কলকাতায় আছ তো জন্ম থেকেই, অথচ শহরটাই চেন না এখনও, একলা চলাফেরাও ভাবতে পার না। তাই বিয়েটাই তোমার পক্ষে ঠিক। কিন্তু সকলে তো আর লক্ষ্মী মেয়ে নয়, তোমার মতো, ইচ্ছা-অনিচ্ছাও অনেকের অন্যান্যরকম। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো বিয়েতে আমার মত নেই কেন? আমি কি কোনোদিনই বিয়ে করব না? মামা যদি এ কথা জিজ্ঞেস করেন আমাকে— আমি বলব, না, তা নয়, কোনো একদিন করব হয়তো। যেদিন ইচ্ছে হবে করব, আর সেদিনই করব—কিন্তু তার একদিনও আগে না। এখন? এখন সে কথা ভাবতেও পারি না, এখন আমি জীবনটাকে দেখতে চাই, চাখতে চাই, সবচেয়ে বেশি চাই ফ্রিডম, পুরুষরা যেটা

মনোপলি করে রেখেছে এতকাল। তাছাড়া আমার একটা প্ল্যানও ঠিক করা আছে—তখন যে বলছিলাম ফেমাস হব তারই প্ল্যান। আমি পলিটিস্ক করব। পলিটিস্ক ছাড়া আর কিছুতেই নাম নেই আজকাল, আর কিছুর দরকারও নেই বোধহয়। মোটামুটি একটা প্রোগ্রামও ভেবে রেখেছি। নেহাতই মেয়ে হয়ে জন্মেছি যখন, মেয়েদের নিয়েই হৈ-চৈটা তুলতে হবে। বাপের সম্পত্তির ভাগ দিতে হবে আইনে। পুরুষ যে-কটা ইচ্ছে বিয়ে করতে পারে, আর মেয়েরা নাকি কিছুতেই একবারের বেশি না। সব ঠিক করে ফেলেছি। বুঝতে পারছি না এখনও শুধু এইটুকু, যে কোন পার্টিতে যাব—প্রোগ্রেসিভ-ডেমক্রেসি, না র‍্যাডিকল-লিবারল, না অ্যাডভান্স-গার্ড। সবচেয়ে জোরালোটাতেই যাওয়া উচিত নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রত্যেকেই বলে আমরাই সবচেয়ে জোরালো। আবার ভুল পার্টির জন্য না জেলেই যেতে হয় কোনো সময়। ঐ একটা শুধু অসুবিধে আমাদের দেশে পলিটিস্ক করার। হাত নেড়ে, পা নেড়ে, হাঁটু নেড়ে, হাঁটু ছড়িয়ে, চোখ ঘুরিয়ে, সমস্ত শরীরে কম্প তুলে, সমস্ত কথায় রঙ্গ তেলে, প্রত্যেকটি চীৎকার-চিহ্ন কঠোর পরিশ্রুতি করে স্বাভাবিক নতুন বন্ধু এই বিচিত্র বস্তুত্বটি তাকে শোনাল। মাঝে মাঝে একটু একটু থামল, যেন অন্যজনের কিছু বলবার কথা, যেন এমনকি সত্যিই অন্যজন কিছু বলেছে। আর স্বাভাবিক কিছু বলল না, বলতে চাইল না, পারল না। চাইলেও পারত না, পারলেও চাইত না। শুনলও না সব, প্রায় কিছুই শুনল না। শুধু তাকিয়ে থাকল স্থির, কিন্তু খানিক পরে আর দেখলও না। শুধু তার কানের মধ্যে ঘনঘোর গোলমালের গোলাগুলি চলতে লাগল।

উর্মিলার মনের কথা এখানেই হয়তো শেষ হয়নি, হয়তো মন খুলতে আরম্ভ করেছিল মাত্র। কিন্তু গভীরতর উন্মোচনের আর সময় হল না, বিজন ফিরে এল। সময় বাঁচাবার জন্য স্নানটা বাদ দিয়েছিল সে। হোক গরম, স্নানে গরম কমে এটা কুসংস্কার ছাড়া আর কী! রাস্তায় বেরোলে একই, আর একশো ডিগ্রির উপরে তাতা রাস্তাটাই তখন তার কাছে কলকাতার সুখস্থান। ঘরে পা দিয়েই বলল—চলুন। উর্মিলা এমন চিরস্থায়ীভাবে চেয়ারটায় বসেছিল যে তাকে উঠতে দেখে স্বাভাবিক অবাক হল।

আচ্ছা, আজ চলি ভাই, অনেক গল্প করলাম—হঠাৎ যেন নিজের ভাষার ভুল বুঝতে পেরে জুড়ে দিল—তুমি তো কথাই বললে না। আমাকে বোধহয় পছন্দ হল না তোমার—কী বলো? আমার কিন্তু তোমাকে খুব পছন্দ হয়েছে। উদার, উচ্ছল, বৎসলভাবে স্বাভাবিক পছন্দকারিণী হাত রাখল তার কাঁধে। তারপর ব্যাগ খুলে, স্বাভাবিক ঠিক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, প্রসঙ্গের ভাঙচুর মেরামত করে নিল। ভুরু কঁচকে নিজেকে দেখল আয়নায়, নিজেকেই উপহার দিল মিষ্টি একটি হাসি। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বিজনকে বলল—চলুন। বিজন বলল—একটা ট্যান্ডি আনানো যাক।

ট্যান্ডি কেন? বিজনের প্রস্তাবটা হাত ঘুরিয়ে উড়িয়ে দিল উর্মিলা—বাসে-ট্রামে সাত-রাজি ঘুরে বেড়াই আমি!

আপনার জন্য বলিনি—ক্ষিপ্ত উত্তর দিল বিজন—নিজের জন্যই বলেছিলাম। সম্ভবত নিজে বুঝল না কথাটা কত গভীর। কিন্তু উর্মিলা বুঝল।—ঐ তো দোষ বিজনদার। বলতে বলতে কুলকুল করে হেসে উঠল—বাজে খরচের রাজা। দাদাটিকে একটু শাসন করো ভাই, বড্ড বয়ে যাচ্ছে।

ওকে আপনি নাম ধরে ডাকলেই পারেন, স্বাভাবিক হঠাৎ নিজেকে বলতে শুনল—ও আপনার ছোটোই হবে।

না ভাই, এটা কিন্তু ভাল বললে না। এতই কি বুড়ো দেখায় আমাকে? কিন্তু এ কথার উত্তর

সৌজন্যের প্রত্যাশাও স্বাভাবিক মেটাতে পারল না, আর কিছু বলবারই শক্তি পেল না।

তা এ কথা ঠিক—অকাতর উর্মিলা আবার বলল—যে অমুকদা-অমুকদির দিন আর নেই, সকলেই এখন সমান, সকলেই সকলকে নাম ধরে ডাকবে। তা না হলে আর হল কী? কথাটা শেষ করল বিজনের দিকে জ্বলজ্বলে তাকিয়ে। আর এই আশ্চর্য স্বর্ণযুগ—তার আরো আশ্চর্য প্রমাণ—বিজনের মুখে স্বর্গসুখ উদ্ভাসিত করল।

* * *

নিজের ঘরে, একলা বাড়িতে, শুদ্ধ দুপুরে স্বাভাবিক আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল আন্তে-আন্তে। তার চেতনা ফিরে এল। কিন্তু অভ্যস্ত আশ্রয়গুলিতে ঠিক যেন ফিরতে পারল না। ক্রোরোফর্ম থেকে জেগে উঠে এইরকম লাগে মানুষের? নিজের এই ঘর যেন অচেনা, বইগুলি অথহীন, দিনটা জ্বরের মতো শূন্য। খানিক আগে বসে বসে ‘ছেলেবেলা’ পড়ছিল, এখন আবার সেই চেয়ারটিতেই বসেছে, ‘ছেলেবেলা’ও আছে, কিন্তু বই খোলার নিয়মরক্ষাটুকুও করছে না। এর মধ্যে কী যেন একটা সামাজিক ঘটে গেছে, যেন একটা দেয়াল উড়ে গেছে তার ঘরের, কিংবা হঠাৎ তার ডান হাত আর নাড়তে পারছে না। এমন একটা সামাজিক কিছু, যা তার জীবনটাকে এক ধাক্কায় অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে, যেন একেবারে আরম্ভে, আবার প্রথম থেকে নতুন করে সব ভাবতে হবে। মনের তলার পাগলা-ঘোলা ঘূর্ণি থেকে যে কথাটি প্রথম স্পষ্ট হয়ে উপরে ভেসে উঠল তা এই যে তার মা নেই। কথাটা ভাবতেই—আর কোনোদিন এ রকম লাগেনি—অসহায় লাগল, ভয়-ভয় করল। যেন কোনো অদ্ভুত বিদেশে, কোনো ভীষণ ভিড়ের মধ্যে সবাই তাকে ফেলে চলে গেছে, বাবাও। বাবা যে এ সময়ে আপিশে, সেটাও মনে হল তার এখনকার কান্না-পাওয়া হারিয়ে-যাওয়ার অংশ। আর এখন এই লম্বা-লম্বা দমবন্ধ ঘন্টাগুলি ভরে বাবার জন্য বসে থাকা ছাড়া কিছুই তার করবার নেই। স্বাভাবিক একবার জোরে নিশ্বাস নিল, মুখ মুছল আঁচলে। বড্ডো ঘাম—কিন্তু ঘামটা যেন ঠান্ডা, গরমটা যেন ভিতরে-ভিতরে শীত। খুব চুপ করে, খুব মন দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করল বাবা এলে কী বলবে। কী বলবে? এখন যদি থাকতেন তাহলেই বা কী বলত? কোন ভাবনাটা তার মনে পরিষ্কার, কোন ভাবটা তৈরি? সে তো নিজেই এখনও জানে না তার কী আছে। নিজেই জানে না এই ভয় কেন। আরো—সেটা জানতেও তার ভয়। হঠাৎ তার শরীরটিই দুর্বল লাগল—ক্লান্ত, অবসন্ন, ঘুমিয়ে পড়ার মতো।

রামের মা ঘরে এসে বলল—দিদিমণি, খাবে নি? রামের মা-র চেহারা, গলায় সাওম্যাজ স্বাতীকে যেন সাজুনা দিল। চেয়ারের মধ্যে একটুও না নড়ে বলল—তুমি বুড়ো তাদা দাও রামের মা।

—এসু বেলা হয়ে যায়, খাবার জন্য মন বলে না তোমার? একটু চুপ করে থেকে স্বাভাবিক জিজ্ঞেস করল—রামের মা, তোমার নাম কী?

নাম! আমার নাম?

হ্যাঁ, নাম কী তোমার?

আমার নাম—যেন একটু চেষ্টা করে এই তথ্য মনে করতে হল—আমার নাম মনোরমা।

তবে আমরা তোমাকে মনোরমা ডাকি না কেন?

কী যে বলো, দিদিমণি! এমনভাবে শরীর বোঁকিয়ে হাসল যেন একটা লজ্জার কথা।

তুমি তো আর জন্ম থেকেই রামের-মা ছিলে না। রাম জন্মাল, তবে তো হলে। এই যুক্তি অনুধাবন করতে পারল না রাম-জননী, ফাঁকা মুখে তাকিয়ে রইল। স্বাভাবিক আবার বলল—

রামের বাবা কী বলে ডাকত তোমাকে? মুখে আঁচল চেপে হাসি লুকোল রামের পিতার পুত্রের মাতা। তার শরীরে এমন একটা ভঙ্গির ঝিলিক দিল যে স্বাতী হঠাৎ বুঝল যে তার বয়স অত্যন্তই বেশি না। আধখানা মুখ ফিরিয়ে সে জবাব দিল—সে আমি বলতে পারব নি, দিদিমণি। বলো না।—স্বাতী যেন জীইয়ে উঠল এই প্রাকৃত, পার্থিব কৌতুকে।

সে বড় নাজের কথা, তোমাদের কানে সইবে নি। স্বাতী একটু ভেবে বলল—তবে তো ভালই। শুনলে ভাল বলতে না, দিদিমণি—এত বড়ো একটা স্বাধীন মস্তব্য শুনতে স্বাতী আশা করেনি, একটু বেশি মন দিল কথা শোনায়—আর্থেক শুনলে মূর্ছো যেতে। তা আমাকে যা বলে বলত, সোয়ামি যখন, বলতেই-পারে, কিন্তু মা-বাপ তুলে যখন মুখ ছাড়ত—স্বাতী ভেবেছিল কথাটা শেষ হবে না, কিন্তু তার আশাতীত আর একটা কথা বলল তার পরিচারিকা—তখন আমিও ছাড়তাম, না!

স্বাতী দমে গেল। ‘নাজের কথা’র সে অন্য মানে বুঝেছিল। এত বছর ধরে রোজ যাকে দেখছে, অথচ কিছুই যার জানে না, তার কথা আর একটু জানবার তার ইচ্ছে হল। জিজ্ঞেস করল—তোমার স্বামী মারা গেছে কদিন?

মরেছে কবে? প্রশ্নটা যথাযথ জেনে নিল, তারপর উত্তরও দিল যথাযথ—সে অনেক কাল হবে। সেবারে খুব আম হয়েছিল না? সারা জষ্টি বিষ্টি নেই এক ছিটে। ভোররাতে কলিরা হল, আর মানুষটাকে যেন হিঁচড়ে টেনে নে গেল যমে। একটু থেমে স্বাতী এর পরের প্রশ্নটি করল—তোমার কষ্ট হয় না?

মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে রামের মা প্রশ্নটা বোঝবার চেষ্টা করল। তারপর তৃতীয়বার স্বাতীকে তাক লাগিয়ে বলল—না দিদিমণি, মিছে বলব না, কষ্ট আমাকে তেমন দিত নি, খেতে পরতে দিত। ঐ-যা এক দোষ ছিল, মুখটা আস্তাকুঁড়। তা দোষ বিনে মানুষ হয়? আর মারধোরটা ছেল না তো, রোজগারেও কামাই দেয়নি একদিন, একদিনের তরে ব্যামো হয়নি একটা—তা মরণে ডাকলে তার উপর তো কথা নেই! চুপ করে থাকল স্বাতী। মাথার কাপড়টা কথা বলতে বলতে পড়ে গিয়েছিল। সেটা যথাস্থানে তুলে দিয়ে রামের মা যথারীতি আবার প্রস্তাব করল—দিদিমণি, এখন খাবে চলো।

চলো। স্বাতী উঠল তক্ষুনি, আর নিজেকে তার অনেক বেশি নিজের মতো লাগান খাবার পরে ঘোর দুপুরের মস্ত ঘন ঘন্টাগুলিতে। হঠাৎ যদি কেউ চলতে চলতে অজান হয়ে পড়ে যায়, রাস্তায় ভিড়, পাড়ায় হৈ-ঠে, অ্যাম্বুলেন্সে খবর, তারপর ডাক্তার বলে কিছু না, এক্ষুনি সেরে যাবে—এ যেন সেই রকম অনেকটা। এখন স্বাতী মনে করতে পারল সব, ভাবতে পারল সমস্তটা। উর্মিলার বকরবকরের বাছাবাছা অংশগুলিকে টেনেটেনে তুলে পর-পর সাজাতে পারল—তখন যদিও শুনছে বলেই মনে হয়নি। দাদার মুখখোখের ভঙ্গি মনে পড়ল স্পষ্ট—মজুমদারের সঙ্গে তার চোখাচোখি, উর্মিলার দিকে তার তাকানো, উর্মিলার সঙ্গে তার বেরোনো... আর তাকে, স্বাতীকে, কেমন এড়িয়ে-এড়িয়ে চলা। এক মজুমদারেই কিঙ্কিন্যা, তার উপর আবার ভাগনি, আর ঐ লম্বা-হাবা লেজুড় তার দাদা! আবার, মুহূর্তের জন্য, স্বাতী যেন শিউরে উঠল। মনে মনে বলল—মেয়েদের যেন কখনও মা না মরে, আর মা যদি-বা মরে, এমন ভাই যেন কখনও কোনো মেয়ের না হয়।

কিন্তু দাদা—হঠাৎ গর্বের একটা ঢেউ উঠল স্বাতীর মনে, আর সেই সঙ্গে সাহসের হাওয়া লাগল। দাদা তার কী করতে পারে? দাদা কি একটা মানুষ? তাকে যন্ত্রণা দিতে পারে এমন

সাধ্য কী দাদার? এইটাই তার ভুল হয়েছে যে সে আশ্রয় খুঁজছিল, মা-র আশ্রয়, বাবার। কিন্তু কেন? এই ব্যাপারটাকে একটা বিরক্তিকর বইয়ের মতো তাড়াতাড়ি পাতা উন্টিয়ে সে কি শেষ করে দিতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে, নিজেই পারে। সে নিজেই তার আশ্রয়—আর আবার কে? সে যদি সোজা হয়ে দাঁড়ায়, চোখ তুলে তাকায়, যদি সে শুধু একবার মনস্থির করে নেয়, তাহলে কেউ কি তার কিছু করতে পারে? সঙ্গে সঙ্গে, আর একসঙ্গে, স্বাতীর মন দুটি সিদ্ধান্তে পৌঁছল। প্রথম, বাবাকে কিছুই বলবে না এসব। দ্বিতীয়, কাল যাবে গান শুনতে। গান শুনতে অবশ্য নয়, যাবে উর্মিলাকে কয়েকটা কথা বলতে। অন্য কোথাও, অন্য কোনো সময়ে হলে ভাল হত, উপলক্ষটা ঠিক উপযুক্ত নয়। কিন্তু আবার সুযোগ পাবে কবে, আর যে-কোনো জায়গায়, যে-কোনো সময়ে কথাটা যখন অস্বস্তিকর, তখন একই কথা। আর উর্মিলাকে ঠিকমত বলতে পারলে বাবাকে আর বলতে হয় না, এ-বিষয়ে জানবারই দরকার নেই তাঁর। এক দাদাই যা জ্বালাচ্ছে বাবাকে, তার উপর আরো অশান্তি?

ছায়া লম্বা হল রাস্তায়, রোদের রং বদল হল, আর ঠিক যখন বর্ষার আগের দুরন্ত দিনগুলির আরো একটির শেষ হবার খবর ফুরফুর করে হাওয়ায় উড়ল, তখন স্বাতী উঠল চেয়ার ছেড়ে। জানলা খুলে দিল ঘরের, শেলফের সবগুলি বই নামিয়ে নতুন করে গোছাতে বসল। উর্মিলাকে কাল যা বলবে, তার প্রত্যেকটি কথা এতক্ষণ ধরে ভেবে-ভেবে সে ঠিক করেছে, অনেকবার আউড়েছে মনে- মনে। এতক্ষণে পরীক্ষার পড়ার মতো প্রায় মুখস্ত হয়ে গেছে। উর্মিলা বার-বার বাধা দেবে, বার-বার জিভ নাড়বে, চ্যাপ্টানো আমের রসের মতো চুইয়ে চুইয়ে গড়াবে তার আঠা-আঠা কথা। স্বাতী শুধু একটু দূরে সরে যাবে, হাত যাতে চিটচিটে না হয়, চোখ দিয়ে বিঁধে রাখবে উর্মিলাকে, বিঁধিয়ে দেবে তার কথাগুলি... সব... সমস্ত... প্রত্যেকটি। কথাগুলি বেশি না, কথাগুলি এই : আপনার মামার বয়স হয়েছে, টাকা হয়েছে। এখন তাঁর জীবনের একটি যোগ্য সঙ্গিনীর সন্ধান করছেন আপনারা। তিনি নিজেও করছেন, কিংবা নিজেই করছেন। তিনি ভাবছেন—তাই আপনারাও ভাবছেন যে, এখন সেই সময় এসেছে যখন মনে করা যায় যে অনুসন্ধানের আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু না, আপনাদের অনুমান ভুল, সম্পূর্ণ ভুল। আর সেই ভুল অনুমানের অনুসরণ আরো যদি আপনারা করেন, সেটা শুধু পশুশ্রমই হবে না অপ্রীতিকরও হবে। অনেকের পক্ষেই অপ্রীতিকর। আমি আজ এসেছি শুধু এই অপেক্ষা থেকে আপনাদের বিরত করতে। দয়া করে আপনার মামাকে এই কথাটা বলবেন, খুঁজিয়ে দেবেন, দয়া করে একটুও অস্পষ্টতা রাখবেন না। তাঁর সঙ্গিনীর সন্ধান অন্যত্র করতে হবে। আপনাদের পারিবারিক বিষয়ে আমার মন্তব্য করা অশোভনতার চরম। কিন্তু এক্ষেত্রে নিলিপ্ত থাকা আমার পক্ষে আর যে সম্ভব হল না, আপনারাও...আপনারাই তার কারণ। তবুও আশা করি আমার ভব্যতার এই ব্যতিক্রম মার্জনা করতে আপনারা অনিচ্ছুক হবেন না। আরো একটা কথা আপনাদের জানানো দরকার। আমার দাদা আর আমি এক বাড়িতে বাস করি, থাকি দুজনে দুই জগতে। দাদার বন্ধু আমার বন্ধু হতে পারে না কখনও। তাই আপনার মামার, কিংবা আপনার, আবার যদি অবসরের এমনই প্রসার কি প্রয়োজনের এমনই বাধ্যতা ঘটে যে আমাদের বাড়িতে আসতেই হয়, তাহলে দাদাকে লক্ষ্য করেই আসবেন, দাদাকেই... শুধু দাদাকে। এই কথাগুলি শুনতে আপনার ভাল লাগল না, বলতে আমার আরো অনেক খারাপ লাগল। কিন্তু না বললে খারাপ হত, তাই বলাই ভাল হল।— স্বাতীর মন এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটি রচনা করে তার ভার নামাল। এখন বলতে পারলেই নিশ্চিত।

যবনিকা কম্পমান

বৃষ্টি পড়ছিল বাইরে। নিঃশব্দ, প্রায়-অদৃশ্য বৃষ্টি। অচেনা, ছায়া-ছায়া, ঝাপসা আলোর রাস্তায় গাড়ি মোড় নিচ্ছে এক-একবার, আর হেডলাইটের কড়া কৌতূহলের সামনে ধরা পড়ে যাচ্ছে লম্বা, বাঁকা, সমান্তরাল বৃষ্টিরখার এক-একটি ঝাঁক। কিন্তু মুহূর্তের জন্য। তারপর আবার আবছা, আবার কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ভিতরেও নিঃশব্দ। গাড়ি চলছে প্রায় দশ মিনিট ধরে, আর এই সময়টুকুতে একটা টুকরো কথাও পড়েনি ভিতরকার কাচ-বন্ধ, মখমল-ঘন অন্ধকারে। নরম, খুব নরম একটা আরামের মতো সেই অন্ধকার, তাতে সবাই ডুবে আছে যেন। কেউ যে কিছু বলছে না তাও কেউ জানে না।

একবার একটা মোড় নেবার পর রাজেনবাবু বললেন—খুব বৃষ্টি হচ্ছে। কথাটা পড়ল যেন বালিশের উপর কাচের টুকরো। কোনো রেশ তুলল না। একটু পরে রাজেনবাবুই আবার বললেন—কিন্তু গরম কী—!

ঐ ‘গরম’ কথাটায় স্বাতী জেগে উঠল। সত্যি—কত ইচ্ছার বৃষ্টি, কত আশার আশা, আর তার প্রথম ঝাপটা কিনা বাজে খরচ হয়ে গেল এই বন্ধু-গাড়িতে বসে! রওনা হবার পরে এই যেন প্রথম বুঝল সে কোথায় আছে, কোথায় যাচ্ছে, কোথেকে এল। একটু নড়ল, হাত বাড়িয়ে কাঁচ নামাল, আর সঙ্গে-সঙ্গে ধাক্কা লাগল বর্ষার। কানে ঝমঝম গান, গায়ে ঠাণ্ডাভিজে হাত—না, হাত না, কোনো হাত অত নরম হয় না। স্বাতী ঝুঁকল বাইরের দিকে, আর বর্ষার আস্ত একটা জগৎ তার দিকে ছুটে এল। কলকাতার বৃষ্টিবাতের কালো, চিকচিকে, আলো-পিছল রাস্তা, গাছগুলি আরো কালো, ফুটপাথের ছায়ার নাচ, আর মুখে, শরীরে, মনে এই মাটির ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা—আঃ!

আঃ! ভিতর থেকে শাশ্বতীর গলা উঠল। করছিস কী, শাড়িটা ভিজে গেল! আবার কাচ তুলে দিতে দিতে স্বাতী বলল—বেশ লাগছিল।

যত অঙ্কুর তোর—! কথা শেষ না করে শাশ্বতী হাত দিয়ে টান করতে লাগল হাঁটুর কাছে তার ইট-রঙের জর্জেট।

একটু নামিয়ে রাখলে কিন্তু মন্দ হয় না—রাজেনবাবু চেষ্টা করলেন তাঁর দিকের কাচটা নামাতে। কিন্তু হাতলটা হয় খুঁজে পেলেন না, নয় ঘোরাতে পারলেন না।

আমি দেব, বাবা, নামিয়ে?—স্বাতী ঝুঁকে পড়ল ওদিকে, শাশ্বতীর হাঁটুর উপর দিয়ে হাত বাড়াল, শাশ্বতী সরু গলায় চৌঁচিয়ে উঠল—এই!

কী হল? বিজন, ড্রাইভারের পাশে, মুখ ফেরাল।

পাড়টা মাড়িয়ে দিলি বোধহয়— বলল শাশ্বতী। বলতে বলতে নিচু হয়ে দু-আঙুলে ঝুঁটে দেখতে লাগল।

এক শাড়ি দিয়ে সমস্তটা গাড়ি ভরে রেখেছ, কিছু করা যাবে না।—কিছু করবার চেষ্টা ছেড়ে দিল স্বাতী, বসল আবার ঠিকমতো।

হয়েছে কী? বিজন জানতে চাইল। রাজেনবাবু জবাব দিলেন—কিছু না।

একটু পরে, যেন কিছু বলবার জন্যই, যেন শাড়ি নিয়ে একটু যে বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে সেইটে চাপা দেবার জন্যই শাশ্বতী বলল—এটা কোন রাস্তা রে, বিজু?

আমিরালি এভিনিউ—শাশ্বতী সঙ্গে সঙ্গে জবাব পেল। তারপর মুখ না ফিরিয়ে, চোখ না ফিরিয়ে গড়গড় আউড়িয়ে গেল কলকাতার ভৌগলিক—এখনও আমিরালি এভিনিউ, বাঁয়েরটা ব্রাইট স্ট্রীট...ঐ ডাইনে রইল স্টোর রোড...এই ওল্ড বালিগঞ্জ রোড আরম্ভ হল।

এর পরে শাশ্বতী যে কথা বলল, আগেরটার সঙ্গে তার কোনেই যোগ নেই—সত্যি করে বল তো স্বাতী, কেমন লাগল তোর আজ?

সত্যি করে মানে!

মানে... তোর তো কিছুই ভাল লাগে না।

তা নয়, তুমি বলতে চাচ্ছ যে আসলে আমার ভাল লাগে, কিন্তু মুখে বলি, না। কিন্তু না, ও-রকম আমি বলি না কখনো। তাছাড়া ভালোও আমার লাগে, সবই... প্রায় সবই।

নতুন একটা খবর পেলাম আজ—শাশ্বতী ঠাট্টার চেষ্টা করল—তাহলে ধরে নিতে পারি যে আজ তোর ভালই লেগেছে।

আপাতত খুব বেশি ভাল লাগবে, যদি তুমি আপত্তি না কর ঐ কাচটা... একটা... একটুখানি নামালে।

এবার সহজেই শাশ্বতী রাজী হল বোনের মরজিতে। কিন্তু যতটা সম্ভব বাবার দিকে ঘেঁষে বসল, আর স্বাতীও কাচ নামাল। সবটা না, মাত্র নাক পর্যন্ত। শাড়ি-টাড়ি বাঁচল। আর স্বাতীও বাঁচল বুকে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া আর একটু জলছিটে নিতে পেরে।

বলিনি আমি তোমাকে! দ্রুত ঘাড় ফেরাল বিজন।—আগে যা ছিল! একটু মোটা হয়ে তত স্মার্ট আর নেই।

অনেক অ্যাক্টরের চেয়ে ভাল— শাশ্বতীর মন্তব্য ঠিক যেন বিজনের লক্ষ্য করল না—ফিল্মে কেন নামেন না, জানি না।

চেহারা আর গান হলেই তো হল না! বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞভাবে, আর একটুখানি তচ্ছিল্যেরও সুরে বিজন সমস্যার সমাধান করল—অ্যাক্ট করতেও পারা চাই তো!

গান কিন্তু ফিল্মে যা শুনেছি তার চেয়েও ভাল। শাশ্বতী একটু থামল, তারপর সোজাসুজিই লক্ষ্য তাক করল—না রে স্বাতী?

স্বাতী বসে ছিল সামনে এগিয়ে, নামানো কাচের ধারটুকুতে প্রায় নাক ঠেকিয়ে। তেমনি বসেই জবাব দিল—কিন্তু মানে?

তুই আজ বড্ডো মানে জিজ্ঞেস করছিস, স্বাতী! শাশ্বতী হাসল, বিরক্ত হলে মানুষ যেমন হাসে।

আরো কিছু বলবার সময় দিল স্বাতীকে। তারপর একটু চড়া গলায়, একটু বেশি জোর দিয়ে বলল—আমার তো চমৎকার লাগল।

কিন্তু স্বাতী এতেও সাড়া দিল না।

গড়িয়াহাট—রাসবিহারী মোড়! বাস-কণ্ঠাঙ্করের মতো মোটা গলায় ঘোষণা করল বিজ্ঞ—তুমি এক্ষুনি পৌঁছে যাবে, ছোড়দি।

এতক্ষণে বাইরে তাকাতে ইচ্ছে করল শাশ্বতীর। পুরোনো বালিগঞ্জের ধমথমে বড়োমানুষি অঙ্ককারের পরে ভালো লাগল আলো-দোকান, এখানে-ওখানে বৃষ্টিতে আটকে থাকা ভিড়। নিজের এলাকায় ফিরে আরাম পেল, সহজে নিশ্বাস নিল। গাড়ি ডাইনে ফেরার পরে রাসবিহারী এভিনিউর এই অংশটুকুর অন্তরঙ্গতা, যাতে আর কারো অংশ নেই এখানে, নিঃশব্দে উপভোগ করল, তারপর স্বাতীকে আর আলাপে টানবার চেষ্টা না করে তার অন্য পাশের মানুষটির দিকে ফিরল—বাবা, তোমার কেমন লাগল গান?

ভালো। যেন যথেষ্ট বলা হল না, রাজেনবাবু আবার বললেন—ভালো। বাবার কাছে শাশ্বতী এর বেশি আশা করেনি, তাই দমে গেল না। বরং উৎসাহ চড়িয়ে বলল—কী সুন্দর গান, সত্যি! ভাগ্যি শ্রমজুমদারের সঙ্গে চেনা হয়েছিল আমাদের, তাই তো শুনতে পেলাম!

বিজ্ঞের পিঠটাতেই একটা জাঁকালো ভঙ্গি হল, আর অঙ্ককারেও তা বোঝা গেল। রাজেনবাবু ভাবলেন ড্রাইভের শুনল নাকি কথাটা, আর শুনে থাকলে ভাবছে কী? কিন্তু শাশ্বতীকে অবহিত করে দিতে হলে যতটা দরকার, ততটা গলা নামাতে রাজেনবাবু পারেন না, কোনো পুরুষই পারে না বোধহয়। তাই কথাটা ঘোরাবার চেষ্টা করলেন, হারীত এল না কেন জিগ্যেস করে।—ও এ-সব গান ভালবাসে না। দ্রুত, নিশ্চিত জবাব দিল শাশ্বতী। যেন নিজের সঙ্গে স্বামীর এই রুচিভেদে সে একটুও বিমর্ষ না, বরং খুশি।

আজকাল বুঝি স্বামীকে ‘ও’ বলে মেয়েরা?—রাজেনবাবুর মৃদু প্রশ্ন।

স্বামীরাও তাই বলে যে!—অর্ধেক প্রশ্নের সুর শাশ্বতীর উদ্ভিতে।

আমাদের সময় স্বামীরাও ‘উনি’ বলতেন।

ও একটা বললেই হল—শাশ্বতী চাপা দিল কথাটা। কিন্তু একটু পরে আবার বলল—আজকালকার মেয়েদের আর তুমি কী জান, আর আমিই বা কী জানি?

কথাটা সে বলল উর্মিলার কথা ভেবে। কী একটা অদ্ভুত খোঁপা করেছিল! কী অদ্ভুত সাজ, কী কটকটে রং ঠোঁটের, আর গানের পরে যতক্ষণ তারা ছিল, ততক্ষণের মধ্যে একবার থামল না তার চরকি-কথার তুর্কিনাচন! বাবা নিশ্চয়ই অনুমোদন করবেন না, তাই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল সে। কিন্তু তার গভীর মন্তব্যটি রাজেনবাবুর কোনোই প্রত্যাশিত জাগাল না, আর, সময়ও আর হল না— শাশ্বতী পৌঁছে গেল।

বাইরে হাত বাড়িয়ে বিজ্ঞ বলল—যাক বৃষ্টিটা ধরেছে। শাশ্বতী এখন অনেকটা পারে। কিন্তু এতগুলি ফ্ল্যাটের মধ্যে তেতলা পর্যন্ত সিঁড়ি... রাস্তিরে একলা তার খারাপ লাগে এখনও। বিজ্ঞকে সঙ্গে নিল।

* * * *

স্বাতী এতক্ষণ চুপ করে ছিল বাইরে তাকিয়ে। ছোড়দির নামার সময়ও কিছু বলেনি। কিন্তু গাড়িটা একেবারে একটা ল্যাম্প-পোস্ট ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে বলে সে সরে এল ভিতরের অঙ্ককারে। আর চোখ ফিরিয়েই বাবাকে দেখতে পেয়ে এমন খুশি হল যেন সে আশাই করেনি বাবাকে এখানে দেখতে। আরও একটু কাছে-সরে নিচু গলায় বলল—আমি কিন্তু ভাবিনি বাবা, যে

তুমি সত্যি-সত্যি ওখানে যাবে।

কেন, আমার কি কখনও কোথাও যেতে নেই?

অন্য কোথাও হলে—ড্রাইভরের ঘাড়ে চোখ রেখে স্বাতী চূপ করল।

আমিও... তোর কথা... ঠিক ঐ-রকমই ভেবেছিলাম— বললেন রাজেনবাবু।

স্বাতীর মুখ তক্ষুনি ফিরে গেল বাবার দিকে, আবার তক্ষুনি নিচু হল। বাবা তাহলে বোঝেন—
কতটা বোঝেন? তার মনের এ-দুদিনের, এ-কদিনের উথালপাতাল বাবা কি জেনেছেন,
বুঝেছেন, কিছু না বলে, না শুনে, শুধু তার মুখ দেখে? অস্বস্তি হল স্বাতীর, আর সেই সঙ্গে
আশঙ্কও হল সে। জীবনের যে জটিলতা তার কাছে একেবারে নতুন, আর সেই জন্য দূরন্ত
ভয়-দেখানো, তার চেয়ে... হঠাৎ বুঝল, তার চেয়েও ব্যাপ্ত তার প্রথম চেনা পুরোনো সব
সরলতা।

নিজের দিকের কাচটা এতক্ষণে ঠিক ঠাওরাতে পেরে রাজেনবাবু নামিয়ে দিলেন আস্তে আস্তে।
ছোট্টো বন্ধ জায়গাটুকুর মধ্যে বর্ষারাতের বাতাস ঝিরিঝিরি দিল।

বৃষ্টি হয়ে বাঁচল!—রাজেনবাবু নিশ্বাস নিলেন। স্বাতী মুখ তুলে বলল—কতকাল পরে আমাদের
সঙ্গে তুমি কোথাও গেলে, বাবা!

শাশ্বতী এমন করে বলতে লাগল—রাজেনবাবু তাঁর এই নিয়মভাঙা ব্যবহারের একটা
জবাবদিহির চেষ্টা করলেন।

আমি তোমাকে ইচ্ছে করেই বলিনি—স্বাতীর এই উত্তরটাও যেন জবাবদিহি।

আমি কিন্তু তোর জন্যই এলাম।

আমার জন্যে? কেন?

আমার মনে হল... সেটাই ভাল মনে হল।

এ কথাটা আগেরটার চেয়ে ধাক্কা দিল স্বাতীর মনে। মুহূর্তের জন্য চিরচেনা বাবার অন্য এক
চেহারা দেখতে পেল সে। সহজ... জল-সহজ বাবা, কোনোদিন কিছুর মধ্যে নেই, সবসময়
সবটাতেই রাজি। সেই বাবাও কি তবে গভীর জলের মতোই গভীর, স্রোতের মতোই বাঁকা,
চোখ-ঠকানো অজানা? এবার তার অস্বস্তিটা বেশি হল, বাবা যেন আড়ি পেতেছেন তার মনে,
যেন বাবাকে সে তার যত কাছের আর যে রকম কাছের মানুষ বলে জানে, তিনি তার চেয়েও
তার কাছে, অন্যরকম কাছে। যেন মনে-মনে ভাবনাতেও তার স্বাধীনতা নেই।

বিজ্ঞান ফিরে এল। ভিতরে জায়গা হওয়া সত্ত্বেও ড্রাইভরের পাশে বসল আবার। স্বাতী সরে
এল বাবার পাশ থেকে জানলার ধারে। সত্যি সে চায়নি যে বাবা ওখানে যান। কেননা, প্রথমত,
তার মতে বাবার যথোচিত নিমন্ত্রণ হয়নি। যদি হতও... দ্বিতীয়ত... তবু না যাওয়াটাই বাবাকে
ঠিক মানাত। আর তৃতীয়ত... আর এটাই আসল, বাবা কাছাকাছি থাকলে নিজেকে একটু
ছেলেমানুষ তো লাগেই। একটুও ছেলেমানুষ হতে আজ সম্ভ্রায় সে চায়নি, চেয়েছে সম্পূর্ণ
স্বাধীনতা। যাতে কোনো সময়ে কোনো একটা কৌশলে ক-মিনিটের জন্য উর্মিলাকে সে একা
ধরতে পারে...তারপর ফিরতে পারে নিশ্চিন্ত হয়ে। যে কথাগুলি মনে-মনে সে তৈরি করেছে
তা বলতে হলে সত্যিকার চেয়েও বড়ো হতে হবে তাকে, যেমন সত্যিকার চেয়ে বড়ো করে
ছবি আঁকে মানুষের, কিংবা যেমন সিনেমায় প্রকাশ করে দেখায়। আঠারো বছরের ঘরে-
থাকা, বই-পড়া বাঙালি মেয়ে হলে চলবে না, নিজেকে ছড়াতে হবে, হতে হবে বইয়ের কোনো
বানানো মেয়ের মতো, যেমন ধর পোর্শিয়া। কিন্তু পোর্শিয়ার বাবা যদি সেখানে বসে থাকতেন,

তাহলে সে পারত নাকি অ্যান্টনিওকে জিজ্ঞাস্যে দিতে? বাবার পাশে বসে ট্যান্সিতে যেতে-যেতে সারা পথ স্বাভী এ-ই ভাবল যে, যে-কাজে যাচ্ছে সেটা মস্ত, আর সে ছোটো। এমনিতেই ছোটো, আরো ছোটো বাবা সঙ্গে বলে। প্রতিকূলতার পুরো হিসেব নিল মনে মনে। অচেনা বাড়ি, অচেনা লোকজন, নিমন্ত্রিত হবার অসুবিধে—আর শুধু কি তাই? বিষয়টা বিব্রী, উর্মিলা বিব্রী—ঐ বিব্রীটাকে ঠেকাতে গেলেও তো হাতে ছুঁতে হবে, ঐ কথাগুলি মুখে আনলেই একটু নোংরা সে নিজেই কি হয়ে যাবে না? আর, যে তার কেউ নয়, তাকে মুখের উপর অপ্রিয় কিছু বলা, এ-ও কি কম কথা? কোনোদিন তো বলেনি, কেন বলতে হচ্ছে...বলতে হয়? যে যার মনে থাকলেই তো পারে পৃথিবীতে, তাহলেই তো সুখী হতে পারে সকলেই। কেন একজন অন্যজনকে দুঃখ দিতে গিয়ে দুঃখ পায় নিজেই?

দুঃখ? কথাটা খট করে বিধল স্বাভীর কানে, মনের কোণে। ভাল না কথাটা, ওতে আরো দুর্বল করে। তার একটা আবছা-আবছা ধারণা হল যে সংসারে এতরকম লোক আছে, আর তারা এতরকম মতলবে ঘুরে বেড়ায় যে দুঃখ যদি সব-শেষের বেশি-দামের না হয়, তাহলে বেঁচে থাকাই শক্ত। বেঁচে থাকতে হলে, মানে ঠিকমতো, নিজের ইচ্ছেমতো বেঁচে থাকতে হলে একথাই ভাবতে হবে, মেনে নিতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে যে আমাকে কেউ দুঃখ দিতে পারে না। আমি আমার নিজের মনে যত ইচ্ছে মনখারাপ করতে পারি, কিন্তু অন্য কেউ আমাকে একটুও নড়াবে কেন যেখানে আছি সেখান থেকে? ছেলেবেলা থেকে তার খুব চেনা যে মনখারাপ, সেটা স্বাভী এতদিনে বুঝেছিল, সেটা দুঃখ না, দুঃখ বাইরে থেকে আসে, আর মনখারাপটা নিজের মধ্যে জন্মায়, আর নিজের সবই তো আমরা ভালবাসি? তাছাড়া মনখারাপেরও সুখ আছে, ওটা যেন সুখেরই ছড়িয়ে-পড়া চেহারা। সুখ জুলজুলে রং, সূর্যাস্তের আকাশের মতো, এখানে লাল, ওখানে সোনালি, আরো দূরে হলদে, কিন্তু মাঝে মাঝে ফাঁক, অনেকটাই ফাঁকা। তারপর ওসব যখন মুছে যায় আর সমস্তটা আকাশ জুড়ে কেবল একটা ছায়াবর্ণ, ছাইবর্ণ, না-বর্ণ থাকে, মনখারাপও সমস্ত মন ভরে সেইরকম। আর দুঃখ? যাতে গলা শুকায়, কথা ফোটো না, ভয় করে। না, দুঃখ কিছুতেই না।

একটি হাতের একটুখানি মৃদু ভঙ্গিতে স্বাভী যেন জানা, অজানা আর না-জানানো সমস্ত দুঃখকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল চলতি ট্যান্সি থেকে রাস্তায়। হালকা করেছিল মন—এ তো কিছুই না, কোনো নিমন্ত্রণে যাব না বলার মতো। কিন্তু কেউ যদি আমাকে অন্য-কেউ ভেবে কথা বলে, তার ভুল শুধরে দেবার মতো। আবার তার যত্নে বানানো বক্তৃতাটি আড়িড়ে নিল মনে-মনে। বইয়ের শেষ প্রফ পড়ার সময়ে লেখকের মতো প্রত্যেকটির কথা শেষবার ভাবল। এখানে একটা সরাল, এখানে একটু বসাল, কমা-টমাগুলির কড়া পরীক্ষা নিল, বাধ্য হল মানতে যে যতটা সে পারে, ততটাই এটা ভাল। এর চেয়ে ভাল হতে পারে না, এখন পারে না। আর ট্যান্সি থেকে নামল হালকা, নিশ্চিন্ত, তৈরি—আর ছাপা হয়ে না বেরোনো পর্যন্ত লেখক যেমন থাকে, তেমনি একটু একটু উদ্বিগ্ন।

বেরতে দেরি হয়েছিল, নির্দিষ্ট সময় পার করে দিয়েছিল বাড়িতেই। শাস্ত্রীর তাড়া আর বিজুর ছটফটানিতে রাজেনবাবু জল ছিটিয়েছিলেন এই বলে যে গান-বাজনার ব্যাপারে দেরিটাই নিয়ম। কিন্তু তিনি পুরোনো মানুষ—এযুগের কথা কী জানেন। আর তার অন্যতম প্রতিনিধি শশাঙ্ক দাসের কথা তো কিছুই না। এখনকার গাইয়ে-বাজিয়ে মহলের 'ভিতরকার' খবর যারা রাখে—ততটা ভিতরে বিজুও ঢুকতে পারেনি এখনও—তারা সকলেই জানে যে অন্যান্যরা যেমনই

হোক, শশাঙ্ক দাস কোথাও গাইবে বললে কাঁটায় কাঁটায় যায়, আর গিয়েই দেরি-হওয়াদের কারো জন্যই অপেক্ষা না-করে এমনকি গল্পগুজবও এড়িয়ে, পারলে তক্ষুনি আরম্ভ করে দেয় গান। কম কথার মানুষ বলে নাম... বদনাম আছে তার। ভক্তরা পছন্দ করে না তার আঁটোমুখ স্বভাব। বলে—লোকটা মিশুক হলে তার পসার জমত আরো। আবার কেউ বলে ওটা তার ব্যবসার চাল, ঐ গভীর, হামবড়া ভাবটার জন্যই তার রোজগারে নাকি শূন্য বেড়ে যায় ডান দিকে। আর তাই, স্বাতীরা যখন পৌঁছল, তখন তানপুরায় সুর দিয়েছেন শশাঙ্ক। মামা-ভাগনির অভ্যর্থনা খর্ব হল, বসে পড়তে হল আসরের ভিড়ের মধ্যে। হ্যাঁ, রীতিমত ভিড়, আর ঘরটাও প্রকাণ্ড যদিও মজুমদার অন্যরকম বলেছিল, কিংবা সেইজন্যই বলেছিল বোধহয়। কিন্তু মজুমদারের বর্ণনার সঙ্গে বাস্তবের ঠেঁষম্য ভাল করে লক্ষ করার সময় হল না স্বাতীর। নতুন জায়গা, চারিদিকে নতুন মুখ, দেয়ালে সোনালি-ফ্রেমে সজ্জা বিলিতি ছাপা ছবি, দরজা-ধারে জুতোজঙ্গল, সারামুখে হাসি-চোঁওয়ানো মজুমদার, উর্মিলার বুক-দেখানো পোশাক—এই সব সূতীক্ষ্ণ বাস্তব তানপুরার গুঞ্জে চাপা পড়ল।

তোমাদের দেরি হল... আমরা ভাবছিলাম... যাক, ঠিক সময়েই এসেছ, এই মাত্রই আরম্ভ হল—তার পাশে বসা উর্মিলার এই কথাগুলি সে যেন কানেই নিতে পারল না। আর এর পরে—উনি আজ যা গাইবেন সব একেবারে নতুন গান, ওঁর নিজের সুর, নিজের বানানো—এই আলোর রেখাটিও মুছে গেল তানপুরার কন্ঠ্য কুয়াশায়। আর এরপর অবশ্য খানিকক্ষণ... কতক্ষণ? আর কিছুই ছিল না কোনোখানে, গান ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

মজুমদার তার জায়গা থেকে মাঝে-মাঝে দেখছিল স্বাতীকে, চোখাচোখিরও চেষ্টা করছিল। কিন্তু স্বাতীর চোখ বোজা, শরীর স্থির। একেবারে স্থিরও না, কোমরের উপর থেকে একটু-একটু দুলছিল অল্প হাওয়ায় কাঁচা বাঁশের ঝাড়ের মতো। আর তার একটু ফাঁক-হওয়া ঠোঁট দুটিতে আর যেন ভাষার চেতনা নেই। আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছে, হাত দুটি কোলের উপর জড়ো করা, তুলে ধরা সম্পূর্ণ মুখটি যে-কোনো ইচ্ছুক চোখের তলায় খোলা। অদ্ভুত একটা সৌন্দর্য মজুমদার লক্ষ্য করল সেই মুখে—অদ্ভুত আর নতুন, আগে দ্যাখেনি। কোনো ছবির মতো, ধূপের ধোঁয়ায় আবছা দেখা প্রতিমার মুখ, কোনো দূর, উদাসীন, কারো-কোনো-কাজে-না-লাগা সৌন্দর্য আর তাতে—মজুমদার অনুভব করল, যদিও অনুভূতিকে ভাষা দিতে পারল না—তাকে যেন কৌমার্য আঁকা আছে তা যেন কোনোদিন নষ্ট হবে না। মজুমদারের ঠিক ভাল লাগল না, যেন ধাঁধায় পড়ল, ব্যবসার কোনো হাত-সাফাইতে ঠকে যাবার মতো ভাব হল হঠাৎ।

পুরীতে, ঘিঞ্জি শহরের অলিগলির ভিতর দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে হেঁটে হেঁটে, সমুদ্র ভূলে গিয়ে, কোনো এক অচেনা পাড়ায় হঠাৎ এক অচেনা মোড় নিতেই সামনে যখন সমুদ্র খুলে যায়, তখন যেমন লাগে, তেমনি লেগেছিল স্বাতীর। মানে, ভাববান্ধু শক্তি যদি তার থাকত তাহলে বুঝত, তার এখনকার অবস্থাটা সেইরকম। এসেছিল পোশিয়া সেজে তর্ক করতে, যুক্তি দিয়ে মামলা জেতার ফন্দি নিয়ে; আসামাত্র কোথায় সে পড়ল? প্রথমে ছেলেবেলার জগতে, স্বাধীন, সহজ, অবোধ ছেলেবেলায়—মনে পড়ায় ভরে গেল মন। যতীন দাস রোডের বাড়ি, মা, মেজদি-মেজদির বিয়ে, আর শুভ্র—শুভ্রকেও মনে পড়ল। কিন্তু কিছুতেই কোনো আবেগ আর নেই, দুঃখ নেই; দুঃখ না, রাগ না, সুখ না, শুধু স্তব্ধতা। যা কিছু এখন আর নেই, আর নেই বলে কখনো ফুরোবে না, সে সবার স্তব্ধতা। তারপর, আরো গভীর, আরো জটিল সুর যখন উঠল, মনে পড়ায় সেই জাদু-করা জগৎ মিলিয়ে গেল, তখন পটে-আঁকা ছবির শাস্ত সীমানার বদলে এবার দিগন্ত, শূন্য, অন্ধাশ, সেই সব অসম্ভব উঁচু-উঁচু আকাশ, সব সমান্তরাল রেখা যেখানে

মেলে, আর যেখানে প্রত্যেকটি ইচ্ছা... সেই ইচ্ছারই পূর্ণতা।

এখনও ঝাপসা হয়ে আছে স্বাতীর মন। কী-গান, কেমন গান, রাগিণীর নাম কী, কেউ জিজ্ঞেস করলে কিছুই বলতে পারবে না। হঠাৎ তাকিয়ে বড্ডো কড়া লেগেছিল আলো, আর সকলেই যেন বড্ডো চড়া গলায় কথা বলছে। শশাঙ্ক দাস চওড়া বুক দিয়ে আরো একটি গানের পীড়াপীড়ি ঠেকিয়ে দিলেন, আর তিনি উঠতেই সকলে উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। সভা ভাঙল—কিচির-মিচির কথা, জুতো খোঁজাখুঁজি, দরজায় ঠেলাঠেলি। স্বাতী তাকাল ছোড়দির জন্য, আর তাকিয়েই পাশে দেখল বাবাকে।

বাবা কথা বললেন—চল আমরাও...

না, না, আপনারা এখন যাবেন না—স্বাতীর ঠিক পিছন থেকে উর্মিলা রাজেনবাবুর কথা কেটে দিল। তারপর স্বাতীর পাশে এসে বলল—একটু দেরি করো ভাই, লোকজন চলে যাক, এই প্রথম এলে আমাদের বাড়ি, বসবে তো একটু! ঐ মিসেস ঘোষ যাচ্ছেন, একটু কথা বলে আসি, নয়তো আবার... কী যে মুশকিল এত লোকের মধ্যে সকলের সঙ্গে কথা বলা!

এত বড় মুশকিলের মধ্যে যতটা সম্ভব উর্মিলা স্বাতীর কাছাকাছি থেকে আপ্যায়ন করল, পাহারা দিল, আর ভিড় ভাঙার পর উপরে নিয়ে গেল তাদের। মস্ত বারান্দায় রেস্টোর-মতো ছোটো-ছোটো টেবিল ঘিরে চেয়ার, খাবার-সাজানো থালা। চা, কফি, আইসক্রীম—যার যেটা পছন্দ। বাছা বাছা ক-জন বন্ধু আর হয়তো বাড়ির লোক, অবশ্য এত লোক জড়ো হবার যিনি কারণ, উর্মিলা তাকে হাত ধরে ধরে আলাপ করিয়ে দিল সকলের সঙ্গে, সকলের আগে শশাঙ্ক দাসের সঙ্গে। অন্যদের ভার নিল মজুমদার—নিজের বন্ধু বলে, আর অসাধারণ একজন মেয়ে বলে তার পরিচয় দিল সকলের কাছে। কিন্তু উর্মিলার বর্ণনার কোনো প্রমাণই স্বাতী দিতে পারল না, যদি না কারো সঙ্গে কথা না বলাটাই অসাধারণ হয়—কথা বলল না বলে বুঝলও না। কখন বেরোবে এখান থেকে—এ ছাড়া আর কথা নেই তার মনে, কখন মন দিয়ে শুনতে পাবে যে গান এখনো তার কানে লেগে আছে। একবার উর্মিলাকে বলতে শুনল—তুমি খাচ্ছ না, কথাও বলছ না, হয়েছে কী? স্বাতী একটু হাসল, আর তক্ষুনি ছুতো বানাল—মাথা ধরেছে। কথাটা শুনতে পেল মজুমদার।

মাথা ধরেছে? খুব? চেয়ার ছেড়ে উঠে এল ব্যস্ত হয়ে।

না, তেমন না—আবার হাসতে হল।

অ্যাস্পিরিন দেব? উর্মিলা বলল—আমার ঘরে চল, অ্যাস্পিরিন খেয়ে একটু শুয়ে থাকবে? স্বাতীকে চমৎকার সুযোগ দিয়েছিল উর্মিলা। কিন্তু স্বাতী উঠল না, বাড়ি যাবার অনুমতি চাইল। ভাগ্যিশ বাবা সঙ্গে ছিল, তার উপর মেঘ করে ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হল, তাই উঠতে পারল তাড়াতাড়ি। আর গলি থেকে বড়ো রাস্তায় যেই এল, অমনি বৃষ্টি বাড়ল স্বাতীর মনের সুরে ঠিক ঠিক সুর মিলিয়ে। তারও বেশি, বন্ধগাড়িতে নিঃশব্দ বৃষ্টি এমন মিশে গেল তার মনের মধ্যে যে যতক্ষণ না বাবা বিষয়টা উল্লেখ করেছিলেন, ততক্ষণ বৃষ্টিটাকে বাইরের একটা ঘটনা বলে সে যেন বুঝতেই পারেনি। কিন্তু বৃষ্টি শুধু নয়, একটু-নামানো কাচের ফাঁক দিয়ে বৃষ্টিটাকে শরীরে নিতে নিতে আরো বুঝল অনেক। মনে পড়ল এটা মজুমদারের গাড়ি, মনে পড়ল এতক্ষণে তার উদ্দেশ্য, প্রস্তুতি, প্রতিজ্ঞা, আর প্রতিজ্ঞার ব্যর্থতা।

বার বার করে লেখা, বার বার প্রফ পড়া, সবই হল—বই বেরোল না। কিন্তু স্বাতীর মনে

হল, লেখকদের সাধারণত যা মনে হয় না... মনে হল... তাতে কী? আজকের জন্য যা সে চেয়েছিল, তা পেয়েছে। বড়ো হয়েছে, যত বড়ো সে ভাবতে পারেনি। স্বাধীন হয়েছে, মনের কথা মুখে বলতে পারার মতো নিশ্চয়ই, এমন কি না বলতে পারারও মতো স্বাধীন। কিছু বলতে যাওয়াটা একরকম বাধ্যতা, প্রতিবাদ মানেই তো সেটা প্রতিবাদের যোগ্য? কিন্তু প্রতিবাদ কীসের? ভালই তো—মজুমদার, উর্মিলা এরা তো ভালই। তার এই বেড়ে ওঠার চূড়া থেকে এদের ভাল হবার বাধা নেই আর। এখন এখান থেকে, এরা কিছু না... কিছুই না... কিছু এসে যায় না। তার গাড়ি হুইসল দিল, আর এরা রইল স্টেশনে পড়ে— এর মধ্যেই কত ছোটো— আর সেই আকাশভরা-গান-জাগানো রেলগাড়িতে বসে বসে তার কষ্টে বানানো যত্নে সাজানো কথাগুলি তুচ্ছ হয়ে গেল সেই সব ফোঁটা-ফোঁটা স্টেশনগুলির মতো। গাড়ি যেখানে দাঁড়ায় না, অথচ গাড়ির চলে যাওয়ার জন্য যাদের তৈরি থাকতে হয়। রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ার আগে, কয়েকবারই তার মনে পড়ল মজুমদারকে, উর্মিলাকে। বোজা চোখে দেখল তাদের মুখের আশা, ইচ্ছা, উৎসাহ। একটু কষ্ট হল দু-জনেরই জন্য।

* * *

সেই রাত্রে ঘুমোবার আগে আর একজনেরও মনে পড়ছিল মজুমদারকে, কিন্তু তার ভাবটা করুণা থেকে বহুদূর। শাস্ত্রীর খুব আনন্দে কেটেছিল সময়টা। ইচ্ছে ছিল আরো থাকার, কিন্তু স্বাভাবিক যে রকম যাই-যাই করতে লাগল, আর বাবা তো স্বাভাবিক কথাতেই ওঠেন বসেন। গানের চেয়েও বোধহয় বেশি আনন্দের হয়েছিল গানের পরে উপরে গিয়ে বসটা। সুন্দর জায়গা, চমৎকার চা, জিভের উপর গলে-যাওয়া সন্দেশ, আর তার উপর... সবার উপর... শশাঙ্ক দাসের সঙ্গে এক টেবিলে বসার সম্মান। এই বিশেষ সম্মানটুকু শাস্ত্রীকেই দিয়েছিল মজুমদার, নিজেও বসেছিল সেখানে। কথা বলেছিল এমনভাবে যাতে শাস্ত্রীও যোগ দিতে পারে। সে অবশ্য বেশি কিছু বলেনি, শুনতেই ব্যস্ত ছিল শশাঙ্কর গম্ভীর-সুন্দর মুখের গম্ভীর-ভারি গলার অল্প-অল্প কথা, আর মজুমদারের জোরালো হাসির ফুর্তি। মজুমদারকে আজকের মতো ভাল আর কোনোদিন তার লাগেনি। আর সবটা মিলিয়ে মনে তো পড়ে না আরো ইচ্ছা জাগানো এমন ভাল শিগগির কোথাও পেয়েছে। কম তো পার্টিতে যায়নি হারীতের সঙ্গে, কতবার অগ্নীসংঘের নানা ব্যাপারে, নানা রেষ্টোরঁয়, বড়ো-বড়ো বাড়িতে, রাজপুত্র মকরন্দর নিমন্ত্রণে... জমকালো, যাবার সময় উৎসাহ লাগে... কিন্তু কখনও এমন হয়নি যে যাবার আধঘণ্টা পরেই মন চায়নি চলে আসতে, আর তার পরেও অনেকক্ষণ... কতক্ষণ... কোমর টাট্টিয়ে বসে থাকতে হয়েছে হারীতের কথা আর ফুরোয় না বলে। আজকাল তার সাহস হচ্ছে একটু একটু, কখনও কখনও যায়ও না, হারীতও জোর করে না তেমন, যদি না হোমরাগোলের নতুন কেউ আসেন; তাহলে অবশ্য স্ত্রীকে হাজির করাই চাই। কিন্তু দুজনের আনন্দের জগৎ— যদিও হারীত ও-সমস্তকে আনন্দ বলে না, বলে কর্তব্য—আলাদা হওয়ার একটা অসুবিধে হয়েছে এই যে কোনোখানে ভাললাগার খোরাকি পেলেও বাড়ি এসে কথা বলে-বলে সেটাকে হজম করা আর হয় না। যেহেতু আর কোনো লোক নেই বাড়িতে, আর এইরকম সময়ে স্বাভাবিক, বাবাকে, বিজুকে, বিয়ের আগের সমস্ত জীবনটাকেই— কোনোখান থেকে ফিরে—তাদের যতীন দাস রোডের পাটি-পাতা আড্ডা, স্বাভাবিক রং-বেরং বর্ণনা, বিজুটার লাফালাফি, চুপচাপ-বাবার নিচু আওয়াজ হাসি—এ সব তার যেমন অসহ্য মনে পড়ে, আর কখনও তেমন না। আজ ফিরতি-পথে গাড়িতে বসে কোনো কথাই প্রায় হল না। যদিও বলবার আর শোনবার অনেক ছিল। ওদের সঙ্গে

গেলে হত, খানিকটা বসে, গল্প-টল্প করে— কিন্তু এমনতেই নটা বেজে গেছে, আর বাড়ি ফিরে, স্ত্রীকে না পেলে কি ভাল লাগে কোনো স্বামীর? কিন্তু এখন, অন্ধকারে শুয়ে-শুয়ে, এ নিয়েও শাস্ত্রীর মনস্তাপ কম না, কেননা হারীত ফিরল তার প্রায় একঘণ্টা পরে। আর একলা ফ্ল্যাটে এই একটি ঘন্টায় প্রতিটি মিনিট দাঁত বদিয়ে গেল তার মনের মধ্যে।

খেতে বসে হারীত বলল—তোমার কি মনে হয় হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করবে?

আমি কী করে বলব?—শাস্ত্রী আজকাল চেষ্টা করে এসব বিষয়ে উৎসাহিত হতে, কিন্তু তখন তার কোনো কথাই মনে পড়ল না, হিটলারের গুঢ় অভিসন্ধি জানে না বলে লজ্জিত হতে হল।

আমি আজ বাজি রেখেছি একজনের সঙ্গে। সে বলছিল আর তিন মাসেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে, যুদ্ধের নাকি কিছুই বাকি নেই। সুখেই আছে বোকারা!

শাস্ত্রী বলল—তা সুখে যতক্ষণ থেকে নিতে পারি ততক্ষণই লাভ।

হারীত চোখ তুলল স্ত্রীর মুখে। তার বাঁকা ঠোঁটে যেন ছুরির ফলা ঝিলিক দিল। কিন্তু হঠাৎ অবিশ্বাস আর মিনতির মাঝামাঝি একটা সুর লাগল তার গলায়—সত্যি কি তোমার মনে হয় পৃথিবী জলুক-পুড়ুক যা-ই হোক, তোমার তাতে কিছু না? একথার একটা অদ্ভুত উত্তর দিল শাস্ত্রী—আচ্ছা, আমরা তো ও-বাড়িতেই থাকতে পারি।

কোন—

তোমাদের—আমাদের ভবানীপুরের বাড়িতে?

হারীত হাঃ করে হেসে উঠল—হঠাৎ আমার মা-বাবাদেরই পছন্দ করলে?

তেমন যদি বিপদের সময়ই আসে তবে তো সকলের একসঙ্গে থাকাই ভাল। আর তাতে খরচও বাঁচে। কিন্তু দ্বিতীয় যুক্তিটাতেও হারীত কান পাতল না—আমিই টিকতে পারি না সেখানে, আর তুমি! হাত নেড়ে উড়িয়ে দিল এই আজগুবি প্রস্তাব। শাস্ত্রী আবার বলল—কেন, আমার তো বেশ ভালই লাগে...

বেড়াতে যেতে— হারীত স্ত্রীর হয়ে কথা শেষ করল। কিন্তু থাকতে হলে? দু-দিনেই পাগল হয়ে যেতে। মানে, আমাকে পাগল করতে। আমি জানি না, একজন মেয়েও কি আছে আজকাল শাওড়িকে যে বিশ্বের চোখে না দ্যাখে? আর সেটাই তো ঠিক শাওড়িরা এবার ফেরৎ পাচ্ছেন হাতে-হাতে তাঁদের নিজের টাকাই! ইংরেজি বুকনির তর্জমা করে বিষয়টা প্রাঞ্জল করল সে, আর বলতে বলতে চোখ পড়ল স্ত্রীর থেমে-থাকা হস্তের উপর—তুমি কিছুই খাচ্ছ না!

ওখানে খেয়েছি, আর—শাস্ত্রী এতক্ষণে সুযোগ পেল, সুযোগ নিল—কী সুন্দর গান শুনলাম! হারীত বলল—অসময়ে খাওয়ানো আর খাওয়া—এই এক দুর্শ্চিকিৎস্য বদভ্যাস বাঙালির! খাওয়াতে হলে ঠিকমতো একটা করা উচিত, হয় চা নয় ডিনার—লোকে তাহলে বুঝতে পারে, তৈরি হয়ে যেতে পারে। তবু শাস্ত্রী আওড়াল—খু—ব সুন্দর গান। একটু থেমে জুড়ল—তুমি যদি যেতে—

সিনেমার গান? তার তো রেকর্ড আছে, আর রেডিওতে এত বাজায় সেসব যে পথে-ঘাটে অনিবার্যভাবে যা শুনতে হয় তার উপর আবার—তার বিলেতে শেখা অন্যতম বিদ্যে যে কাঁধ-নাড়া, হারীত কথা শেষ করল তাইতে।

ঠিক তা নয়—শাস্তী আরো একবার চেষ্টা করতে গেল। কিন্তু হারীত উঠে পড়ল খাওয়া সেরে, রেডিওর সামনে বসল শত্রুপক্ষের খবর টুকতে। কিন্তু সেই সময়টিতে মনে হল যুদ্ধে-জুলা ইউরোপ ভরে গান-বাজনাই শুধু হচ্ছে, বিরক্ত হয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল।

শাস্তী একবার তাকাল তার পাশে শোওয়া অঘোর-ঘুমোনা মানুষটির দিকে। পাজামা পরে শোয় হারীত, এমনিতেও পরে অনেক সময়, দরজির তৈরি লংকুথের পাজামা। অনেকবারের পরে আবারও শাস্তীর অবাধ লাগল যে ওগুলো আরো ঢোলা কেন বানায় না। এ নিয়ে তর্ক তুলেছে সে, তর্কে অবশ্যই হেরেছে। তার মন ফিরে গেল কাটিয়ে আসা সন্ধ্যায়। সেখানে যেন সবই বড়ো মাপের, খানিকটা করে বেশি, আর সেই বেশিটাই অভ্যাস। আরামে আছে মানুষটা—ইচ্ছেটাকে যত ইচ্ছে বাড়তে দেয়, খরচের একটা ছুতো পেলেই খুশি। আর ইচ্ছেগুলিও তার বন্ধুদের মতোই ভাল ভাল। আর সত্যি তো, শশাঙ্ক দাসকে বন্ধু বলতে পারে যে, সে তো নিজেও কিছু। তাদের সঙ্গে নামতে-নামতে মাঝসিঁড়িতে একটু দাঁড়িয়ে মজুমদার বলেছিল—মিসেস নন্দী, আশা করি আপনাদের কষ্টই শুধু দিলাম না?

খুব ভাল লাগলো—এর বেশি জবাব শাস্তীর যোগাল না।

সেটা প্রমাণ হবে আবার যদি আসেন।

আবার গান হবে?

শশাঙ্ককে আর কোথায় পাব, তবে অন্য কারো গান যদি আপনার ভাল লাগে...আর—শাস্তীর পাশে পাশে আস্তে নামতে-নামতে হঠাৎ এক সিঁড়ি এগিয়ে গেল, ঘুরে দাঁড়াল মুখোমুখি—কখনও যদি আমার এমন সৌভাগ্য হয় যে বিনা গানে শুধু আমাদের জন্যই এলেন!

বেশ তাই আসব আমরা—শাস্তী হেসে বলল।

অত সহজে ‘হ্যাঁ’ বলা মানেই ‘না’। কিন্তু আমি আশা ছাড়ব না।

কথা বলতে না পারায় হজম না হওয়া আনন্দ শাস্তীকে জাগিয়ে রাখল অনেকক্ষণ। বেশ হত, মজুমদার যদি কোনো আত্মীয় হত তাদের। হতে তো পারত, হতে কি পারে না? পারে না মানে? এমন হঠাৎ কথাটা মনে লাফিয়ে উঠল যে তার ধাক্কায় সে প্রায় উঠে বসেছিল বিছানায়। তাই তো চায় প্রবীর মজুমদার, প্রাণপণে চায়... তার জন্যই তো তার সব—এই সব। প্রথমে সেটা ঠাট্টা ছিল, আবছা ছিল, কিন্তু এতদিনে, একদিনেই স্পষ্ট সত্য আর আজ তো পোস্টারের মতো বড়ো বড়ো অক্ষরে রটে গিয়েছে সেটা, সেটাই ছিল মজুমদারের চোখে-মুখে, নড়াচড়ায়, স্বাতীকে এড়িয়ে-এড়িয়ে চলায়, আর সিঁড়িতে বলা এককথকতা কথায়। আশ্চর্য, এতক্ষণ মনে হয়নি! শাস্তীর ইচ্ছে হল স্বামীকে ডেকে তুলে কথাটা বলে। আরো ইচ্ছে হল... স্বাতীর বিয়ে ভাবতে অন্য একরকম উত্তেজনা লাগল তার মধ্যে। সমস্ত শরীরে ফিরে এল হারীতের সঙ্গে তার প্রথম চেনাশোনার দিনগুলি, তারপর বিয়ের পর প্রথম ক-টি মাস। মাত্র ক-টি মাস? শাস্তী পাশ ফিরল স্বামীর দিকে। কিন্তু হারীত আবার উল্টো দিকে ফিরেছে, তাই দেখতে পেল শুধু কাটা গেঞ্জিতে অর্ধেক ঠিকঢাকা প্রশান্ত পিঠ। সেই পিঠের দিকেই সরে এল, ঘাড়ের উপরকার মিহি চুলের উপর দিয়ে আস্তে হাত তুলল আর হাত নামাল। থাক, ডাকবে না, ডাকলেও জাগবে না, বড়ো গভীর ঘুম... আর সত্যি, সারাদিন যা খাটুনি!

* * * * *

ঘুমিয়ে পড়ার আগে শাস্তী শেষ কথা এই ভেবেছিল যে এখন কি প্রবীরই প্রস্তাব নিয়ে আসবে, না কি তাদের দিক থেকে কিছু করা উচিত? সকালে উঠে হারীতের কাছে কথাটা পাড়তে

গেল দু-তিনবার। যেন মনে হল এ-বিষয়টা তার কথা বলার একেবারে অযোগ্য লাগবে না। কিন্তু আপিশমুখো এই সময়টা হারীত এমন ছটফটিয়ে কাটায় যে শাস্ত্রী ঠিক সময় পেল না, কি নিজেই তাড়াহুড়োর মুখে মুক্তো ছিটোতে চাইল না, মোলায়েম সময়ের অপেক্ষা করাই ভালো ভাবল। কথাটা উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল নিজের মনে। দেখবার বেশি কিছু আছে বলেও মনে হল না, এ নিশ্চয়ই ঠিক! নিষাৎ! এমন কি এও মনে হল এর জ্যাস্ত প্রমাণ নিজে নিজেই হাজির হবে শিগগির। কিন্তু কত যে শিগগির শাস্ত্রীও তা ভাবতে পারেনি। হারীত বেরোবার প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে, শাস্ত্রী তখন বিজুর যোগানো একতাড়া সিনেমা-পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে শুয়ে-শুয়ে, তাদের চাকর এসে একজন আগন্তুকের খবর দিল—আপনাকে একটু ডাকছেন তিনি।

কে? স্বামীর বন্ধুদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতমর নাম করল শাস্ত্রী।

না, বৌদি— স্বশুরবাড়ির পুরোনো চাকর জবাব দিল—এনাকে দেখিনি আগে। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের ঘর থেকে মাত্রই একটি পরদা-ঢাকা দরজার আড়াল পেরিয়ে, স্পষ্ট পৌঁছল চড়ানো গলা—আমি প্রবীর মজুমদার, একটা কথা বলতে এলাম...

আরে! শাস্ত্রী উঠল, ছুটল। আর তাকে দেখামাত্র দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই মজুমদার কথা আরম্ভ করল—নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে করলুম এই সময় হঠাৎ এসে, হয়তো একটু অভদ্রতাও হল নিশ্চয়ই। অন্তত প্রথমদিন, এমন সময়েই আমার আসা উচিত ছিল যখন আপনারা দুজনেই থাকবেন। কিন্তু একটা কথা আমার বলার আছে, কথাটি আপনাকেই বলতে চাই, তাই হচ্ছে করেই এমন সময়ে এসেছি যখন মিস্টার নন্দী বাড়ি থাকবেন না। হঠাৎ ধক্ করে উঠল শাস্ত্রীর বুকের মধ্যে, মুখের রং লাল হল, পায়ের দাঁড়িয়ে থাকার জোর যেন কমে গেল। তবে কি সে ভুল ভেবেছিল? তবে কি—? কিন্তু কোনো কথা, কোনো একটা কথাও তার দুই ঠোটে তৈরি হতে পারার অনেক আগেই মজুমদার আবার বলল—কথাটা আপনার বোনের বিষয়ে তাই প্রথমে আপনাকেই— শাস্ত্রী নিশ্বাস ছাড়ল, সহজ হল, হাসতে গেল। কিন্তু হাসি চেপে গম্ভীর মুখে বলল—বসুন।

মিনিট কুড়ি পরে, কেননা বেশি বলাবলির দরকার হল না, আগন্তুক যখন উঠল, মর্মে জমানো হাসিটা মুখে খরচ করতে শাস্ত্রীর তখন বাধল না। কিন্তু প্রবীর মজুমদারের মুখ, যা শাস্ত্রী হাসিহাসি ছাড়া দ্যাখেইনি, সে মুখ ঐটো হয়ে গেছে গম্ভীরে। ছিলে চড়িয়ে প্রথম তীর ছুঁড়েছে, ঠিক বিধেছে, কিন্তু এটা প্রথম, আর এটাই সবচেয়ে কাছের তাক। আরো দূরে ছুঁড়তে হবে, সেটা সহজ না। প্রথম বাজি জেতার আত্মদে আখের না ভেঙ্গে যায়, এখন তাই গম্ভীর, তৈরি। যদি অনুমতি করেন— মজুমদার মাথা নোওয়াল—ও-বেলা এসে আপনাকে পৌঁছিয়ে দিতে পারি ও-বাড়িতে।

তা বেশ তো—ফশ করে কথাটা বলেই শাস্ত্রীর মনে পড়ল যে এই মানুষটি এখনও তার ভগ্নীপতি ঠিক হয়নি, তার সঙ্গে একা যাওয়াটা কি... তক্ষুনি তাই ছুতো বানাল—কিন্তু আজ যে এক জায়গায় যাবার কথা আমাদের!

তাহলে?

শাস্ত্রী ভাববার ভান করল—আচ্ছা, আমি নিজেই সময় করে যাব একবার।

আজই?

আজ—না হয় কাল।

তাহলে কাল আমি আসব একবার?

এখানে?

যেখানে বলবেন। আমার ভাগ্যের গাড়ির আপনিই এখন ইঞ্জিন।

শাস্বতী খুশিতে জ্বলজ্বলে হল—আচ্ছা, আসবেন।

কাল?

কাল।

এই সময়ে? শাস্বতী মাথা নাড়তে গিয়ে থামল—সন্ধ্যাবেলা আসবেন।

তখন...

আমি চেষ্টা করব যাতে আমার স্বামীও সে সময় থাকেন—বিবাহিত ভদ্রমহিলার সমস্ত সম্ভ্রম প্রকাশ পেল শাস্বতীর উঠে দাঁড়ানোয়—কাছাকাছি আমরাই যখন আছি, বাবা হয়তো তাঁর মতটাও নেবেন। পলকের জন্য শাস্বতীর মুখের উপর চোখ ফেলে মজুমদার বলল—আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

* *

শাস্বতী টালিগঞ্জে গেল সেদিনই বিকেলে। বাড়ি ফিরে স্বামীকে দেখে সুখী হল। হারীত এসময়টা হয় বাড়ি থাকে না, নয় বাড়িতেই তার বন্ধুরা আসে, কিন্তু এটা একটা শুভলক্ষণ বলে ধরল শাস্বতী। আজ সে একাও, আবার বাড়িতেও, যেরকম যোগাযোগ শিগগির ঘটেছে বলে মনেই পড়ে না। টেবিলে কয়েকটা চাট বই ছড়িয়ে ফুলস্কাপ কাগজে ঘশঘশ করে ইংরেজিতে কী লিখে যাচ্ছিল হারীত। শাস্বতী কাছে গিয়ে বলল—তুমি বাড়িতেই আছ? হারীত এই বাচ্চল্য প্রশ্নের জবাব দিল না।

কেউ আসেনি?

না।

তাহলে তো আমাকে আনতে যেতে পারতে।

এতদিনে বাপের বাড়ি যাওয়া-আসাটা অন্তত একাই তোমার পারা উচিত।

পারি যে না তা নয়, কিন্তু আজ যখন তোমার সময় ছিল—

স্ত্রীর গলায় যেন অন্যরকম একটা আওয়াজ পেয়ে হারীত মুখ তুলে তাকাল—কোন সময়? দেখছ না? হাওয়ায় হাতটা ঘুরিয়ে আনল তার প্যাম্ফলেট আর ফুলস্কাপের উপর দিয়ে। ছোটো ঘর, খাটের মাথা ঘেঁষেই লেখার টেবিল। খাটের ধারে, হারীতের যথাসম্ভব কাছাকাছি বসে শাস্বতী তাকাল হারীতের হাতের লেখার অক্ষরগুলির দিকে—এটা কি খুব জরুরি? খুব।

একটু সময় করে আমার একটা কথা শুনবে? হারীত এবার আরো অন্যরকম গলা শুনল।

আবার চোখ তুলল, একটু তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল—কী হয়েছে?

শোনো... একটা কথা... তোমার লেখা-টেখা রাখো এখন। এটাও জরুরি... ভীষণ...

কী ব্যাপার? শাস্বতী একটু দম নিয়ে বলল—মজুমদার স্বামীকে বিয়ে করতে চায়।

কে?

প্রবীর মজুমদার—ঐ যে—বিজুর—

ও! ছোটো আওয়াজ করল হারীত, হাঙ্কা বাঁকা একটি হাসি নামল ঠোটে। শাস্বতী অপেক্ষা করল হারীত আরো কিছু বলবে বলে, কিন্তু তার চোখ ফুলস্কাপেই নামল আবার। শাস্বতী

যেন ব্যথা পেয়ে চাঁচিয়ে উঠল—কিছু বললে না!

আমি কী বলব?

কেন, স্বাভাবিক তোমার কেউ নয়? ওর ভাল-মন্দে তোমার কি কিছু না? খোলা-কলমটিতে টুপি পরিয়ে রেখে হারীত বলল—তা—বিয়ে কবে?

শোনো কথা! কিছুর মধ্যে কিছু না... নাঃ পুরুষরা যে কী!

তবে যে বললে—

কী বললাম? একটা দিন কি আমার কথায় মন দিতে পারো না তুমি?

হারীত চটি-বইগুলি সাজাল, ফুলস্ক্যাপের পাতাগুলি গুছোল। আর সেই কয়েকটা সেকেন্ড অসহ্য লাগল শাস্ত্রীর। একপাশে সব সরিয়ে রেখে, চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল—বলো।

এ বিষয়ে তোমার কী মত সেইটে আমি জানতে চাই।

হারীত চিন্তা করে বলল—স্বাভাবিক বিয়ে করতে চাওয়া যে কোনো পুরুষের পক্ষে খুবই তো স্বাভাবিক মনে হয়। তবে পুরুষটি অবিবাহিত কিংবা বিগতীক হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ওঃ! শাস্ত্রী ককিয়ে উঠল—যুদ্ধ আর স্টালিন ছাড়া আর কিছুই কি তোমার মগজে নেই? খোদ মস্কো থেকে টাটকা পৌঁছনো চোরাই কাগজ পড়ে স্টালিনের জন্য দুশ্চিন্তা সে সন্ধ্যায় হারীতের একটু কম ছিল। তাই লঘুমুখে গুরু-নাম ক্ষমা করে বলল—আর স্বাভাবিক... হ্যাঁ, যাকে বলে বিবাহযোগ্য, স্বাভাবিক এখন রীতিমতোই তাই বইকি! শাস্ত্রী বুঝল না এটা হারীতের আগের কথারই রকমফের। তাই সোৎসাহে সাই দিল—তাই তো! এখন—ঠিক এখনই স্বাভাবিক বিয়ে হবার সময়। বাবার বয়স হচ্ছে, আর কদিন পরেই পেনশন, বাবারই সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তার কথা। আমার কী! আমি তো আর ও-বাড়ির কেউ নই এখন। আর বাবাই কি না কথাটা কানেই তুললেন না।

হঁ! একই সঙ্গে স্ত্রীর আর শ্বশুরের প্রতি সমবেদনা ফুটল হারীতের আওয়াজে।

বললেন—পাগল নাকি! দুঃখে শাস্ত্রীর গলা বুজল।

তাই তো! হারীত কপালে রেখা ফেলল—বেচারি মজুমদার।

মজুমদার কেন বেচারি হবে? বেচারি আমার বাবা, তাঁরই বুদ্ধির দোষ হয়েছে। ভাবছেন তাঁর স্বাভাবিক মতো মেয়ে সারা দেশে আর নেই। কিন্তু সত্যি তো তা নয়, সত্যি কি এর চেয়ে সুপাত্র ওর জুটবে কোনোদিন!

সে ভাবনা তোমার বাবাকেই ছেড়ে দাও না। আর তুমিই এক্ষুনি বললে না ও-বাড়ির কেউ আর নও তুমি?

তা-ই তো! শাস্ত্রী নিশ্বাস ছাড়ল—এখানেও গল্পনা, ওখানেও কেউ না! মেয়েদের জীবনটাই বাঁজে!

হারীত আরেক চোখে দেখে নিল স্ত্রীকে—অল্পেই যদি এত উত্তেজিত হও—

অল্প! এতক্ষণ ধরে এত বললাম, এত বোঝালাম, আর বাবা ভাল করে উত্তরও দিলেন না—এটা অল্প হল!

তুমি কেন? এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম যেন অবাক হল হারীত।

আমি কেন... কী? শাস্ত্রী প্রশ্নটা বুঝল না।

তুমি কেন বললে বোঝালে?

আমি ছাড়া আর গরজ কার—আর আছেই বা কে?

কিন্তু মজুমদার নিজেই যখন জবাব নিয়ে গেছে, তারপর আবার—

মজুমদার নিজেই—না তো ! সে তো এখনও জানেই না। আমাকে এসে বলল আজ দুপুরবেলা। আগে তোমাকে বলিনি একেবারে সবটাই বলব বলে। আর সময়ই বা কখন! আমার অবশ্য আগেই কাল রাত্রেই মনে হয়েছিল কথাটা—

তোমাকে এসে বলল কেন? হারীত বাধা দিল স্ত্রীর বিবরণে।

মা থাকলে মাকে বলত, মা যখন নেই—

তুমি স্বাতীর মাতৃস্থানীয়া হলে কবে থেকে? হারীত নিচু গলায় হাসল, যেন একটা মজার কথা শুনে। মা না থাকলে বাবাকেই বলতে হয়—আমি তাই বলেছিলাম—আগে অবশ্য তোমাকে। তখন তোমার বাবা যদি অমত করতেন, তুমি তাঁর সঙ্গেই যুক্ত হতে! স্বাতীও তাই করবে। আর আমার তো মনে হয় সে একাই বেশ চালাতে পারবে নিজের পক্ষের লড়াই। এর মধ্যে তুমি কোথায়? শাস্ত্রীর কথার তোড় হঠাৎ থেমে গেল। টেবিলের ফিকে ব্রাউন রংটার দিকে চোখ রেখে চুপ করে থাকল একটুখন। তারপর নিচু চোখেই বলল—মজুমদার স্বাতীকে এখনও বলেনি।

আসামী না পাকড়েই উকিল ধরেছে! হারীত হা-হা করে হাসল, চেয়ারের মধ্যে কোমর ঢিল দিয়ে টেবিলের তলায় লম্বা করল পা দুটো—খুব অদ্ভুত!

অদ্ভুতের কী আছে— কিন্তু শাস্ত্রীর প্রতিবাদে তেমন আর জোর লাগল না, যেন জোর করে একটু হাসল। —সবাই কি আর তোমার মত বীর? মানুষটা লাজুক—

আ—হু! ইংরেজ ধরনে বড়ো-হাঁ করে হারীত ইংরেজি আওয়াজ ছাড়ল, হসন্ত ‘হ’-টা আশ্তে মিলিয়ে গেল নিশ্বাসে। ইংরেজিতেই বলল—একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এতক্ষণ ধরে বিশুদ্ধ বাংলা বলে— এরপর কী শুনব আমরা? এবার আরো বেশিক্ষণ থেমে থাকল শাস্ত্রী। আরো মিয়ানো গলায় বলল—না-বলে ভালই করেছিল।

হারীতও একটু দেরি করল আবার কথা বলার আগে। হাতের কাছে শোওয়ানো কলমটি আঙুলে নাড়তে নাড়তে জিজ্ঞেস করল—তোমার কথাটার মানে কি এই যে পাত্রী নিজেই নারীজ? শাস্ত্রী জবাব দিল না, তার নিচু করা মুখে এমন একটা ভাব ঘনাল যেন দুদিন আগে তার কেউ মরেছে। আর সেই ভাবটি লক্ষ করতে করতে হারীতের ভুরু বেঁকল, কপাল কঁচকোল। দুহাতে ছোটো একটি তালি দিয়ে বলে উঠল—২-ভঙ্গ! তাহলে এতক্ষণ আমাকে বকালে কেন? শাস্ত্রী মুখ তুলে বলল—কথাটা কি এত সহজেই উড়িয়ে দেবার? স্বাতী যে ভুল করছে না তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে?

তা যেমন নেই, উল্টোটাই বা প্রমাণ কী! ভুল হোক, ঠিক হোক, বিয়ে তো হয় দুজন মানুষের, আর সে দুজনেরই একজন যদি না চায় তাহলে আর কার সঙ্গে কার বিয়ে? তাড়াতাড়ি, এদিকে-ওদিকে চোখ ফেলতে-ফেলতে হারীত কথাগুলি বলল। যেন না বললেও চলে কিংবা যেন সে অন্য কিছু ভাবছে। আবার সেইসঙ্গেই, সেইজন্যই সহজ কথাকে পেঁচিয়ে বলল ইচ্ছে করে, বেশ যেন মজা। সামনে সাদা, ফাঁকা, অনেকটা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে শাস্ত্রী আপত্তি তুলল—স্বাতী বোঝে কী? ছেলেমানুষ—

ছেলেমানুষ? তুমি যখন বিয়ে করলে তুমি ওর চেয়ে কত বড়ো?

আমি ঠিকই করেছিলাম।

স্বাভীও—হারীত শেষ করল না কথাটা, তার দরকার আছে বলেও ভাবল না। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে, আর তক্ষুনি আবার বসে পড়ে কাছে টেনে নিল তার লেখার কাগজ আর চটি-চটি বই ক-টা। শাস্ত্রী উঠে দাঁড়াল—আমি জানতাম তুমি এ-রকমই বলবে। তক্ষুনি, যদিও তার চোখ ফুলক্ষ্ম্যাপে লেখা শেষ কথাটির উপর, তক্ষুনি হারীত জবাব দিল—নিশ্চয়ই! তুমি জানবে না তো— হঠাৎ মুখ তুলল, হাসল, অন্যরকম সুরে বলল—তুমি যখন আমাকে বিয়ে করবে ঠিক করলে তখন তোমার বাবা যদি চাইতেন অন্য কারও সঙ্গে, ধরো, ঐ যে তোমাদের গৌফ-গজানো গাইয়েটি ছিল, অত্র না শুত্র, তার সঙ্গে—

কী বাজে! শাস্ত্রী মুখ ফেরাল, যেন সেখানে আর দাঁড়াবে না। কিন্তু পলক-পরেই ঘুরে দাঁড়িয়ে তর্ক তুলল—কিন্তু স্বাভীর মনের অবস্থা তো আমার যেমন ছিল তেমন না।

হারীত পিঠ সোজা করল, চেয়ারে হেলান দিল, এলিয়েই দিল শরীর। একটু বেশি প্রফুল্ল দেখাল তাকে—তার পক্ষে বেশি—মনটা বেশ হালকা যেন— যেন, তার বিশ্ব-বাঁচানো কাজ ঠেকিয়েও স্ত্রীর সঙ্গে বিশ্রজ্জালাপের জন্য সে তৈরি। কিংবা যেন অনেকদিন পর এই দাম্পত্য অন্তরঙ্গতাকুই তার মনে ফুটি এনেছে। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা না হলেই তো আর বদ্রুবাহনকে বিয়ে করতে না...আর তাছাড়া—স্ত্রীকে সে কিছু বলতে দিল না, তার মুখের রাগের রঙ উপভোগ করতে করতে বলল—স্বাভীর মনেরই বা কতটুকু খবর আমরা রাখি?

ঐ ‘আমরা’টা শাস্ত্রীকে কথঞ্চিত সাহুনা দিল। তাহলে এটা হারীত স্বীকার করে যে অন্তত এ বিষয়ে তারা ‘আমরা’। একটু একটু কাছে সরে এল, আস্তে আস্তে বসে পড়ল খাটে। ভাল করে শোনা গেল না তার গলা, যখন বলল—তোমার কী, তোমার কাছে হাসিঠাট্টা এসব, কিন্তু আমি যে কী যন্ত্রণায় পড়েছি। হারীতের ফুটি যেন চড়ল এতে, চকচকে চোখে বলল—তুমি এমন করে বলছ যেন তোমাকেই কেউ বিয়ে করতে চায়, আর তুমিও তাকেই— আর তোমার বাবা তাতে বাধা দিচ্ছেন।

হঠাৎ গলা ছেড়ে শাস্ত্রী বলে উঠল—আমি তোমার স্ত্রী! নিশ্বাস নিতে লাগল জোরে জোরে। সে বিষয়ে কি কোনো সন্দেহ আছে? হারীত স্ত্রীর চোখ এড়াল, কিন্তু লঘুতাটাও বজায় রাখল গলায়। কিন্তু সত্যি—তুমিই বা এত ব্যস্ত কেন আমি জানি না।

শাস্ত্রী থেমে থাকল, যতক্ষণ না তার নিশ্বাস স্বাভাবিক হল আবার। তারপর সাধারণ সাংসারিক সুরে বলল—মজুমদার কাল আবার আসবে। কী যে বলব তাকে—

কিছু না-ই বা বললে। হারীত চট করে বাংলা দিল—তোমার বাবার কাছেই পাঠিয়ে দিও, চাই কি স্বাভীর সঙ্গেও দেখা হয়ে যাবে সেখানে। এ-কথার সমস্তটা অর্থ বুঝতে একটু সময় লাগল শাস্ত্রীর। একবার টোক গিলল, জিভের ডগা বুলিয়ে মিল নিচের ঠোটটিতে। আস্তে বলল—আমার সঙ্গে তুমি যা খুশি করতে পার, কিন্তু কারো উপরেই কি দয়া নেই তোমার? হারীত একটু থমকাল, স্ত্রীর মুখে এ-রকম কথা শুনে সে আশাই করেনি। কিন্তু সেইজন্যই ওটা সে গ্রাহ্য করল না, যেন শুনেই পেল না, একটু বাঁকা ঠোটে মিটিমিটি হেসে বলল—তুমি বোধহয় বড্ডে আশা দিয়েছিলে তাকে? বোধহয় ভেবেও দ্যাখোনি যে শুধু তার ইচ্ছা আর তোমার গরভই এখানে চলবে না? শাস্ত্রীর কান্না পেল, হাত কামড়াতে ইচ্ছে করল। আর যেহেতু যে কোনো সময়ে যে কোনো অবস্থায় স্বামীর চেয়ে বড়ো বন্ধু বিবাহিত স্ত্রীলোকের হয় না, তাই আবার স্বামীকেই আবেদন জানাল—কাল সন্ধ্যাবেলা তুমি কি বাড়ি থাকতে পারবে?

থাকতেই হবে। কেজো সুর লাগল হারীতের গলায়—আমার কাছে লোক আসবে তখন।
—আমি ভাবছিলাম, মজুমদার এলে তুমিও যদি, তোমারই তো বাড়ি, আর তাছাড়া কথাটা
বলাও তো...

—আমার কি কোনও দরকার আছে? কথাটা তো ভাল লাগবে না তার, তবু তোমার মুখে
শুনলে... আর, তুমি অনেকটা মোলায়েম করেও বলতে পারবে। কিন্তু বসতে দেবে কোথায়?
শাশ্বতী না বুঝে ভুরু কঁচকাল।

সকাল সকাল এসে যায় তো ভাল, নয়তো ওরা সব এসে পড়লে—
এসে পড়লে কী হবে?

আমাদের কথাবার্তার মধ্যে বাইরের লোক থাকতে পারে না তো— হারীত গম্ভীরভাবে জানাল।
তার মানে—শাশ্বতী দিশেহারা চোখে তাকাল—ভদ্রলোককে বসতে দিতে পারব না? হারীত
স্ত্রীর উৎকণ্ঠা খুব সহজেই দূর করে দিল— কেন? খাবার ঘরে বসতে পারো তোমরা।
খাবার ঘরে! ঐ বিন-পাখার খুপরিতে! শাশ্বতীর মনের উপর দিয়ে ভেসে গেল মেট্রো সিনেমার
দোতলা, চাং-আন রেস্টোরাঁ, কাউফমানের কফি। সেদিন তো হারীতও ছিল, আর যতটুকুই,
যতক্ষণেরই হোক, ভালোও তো লেগেছিল তার? স্ত্রীর ফ্যাকাশে মুখে চোখ রেখে হারীত এবার
মলম লাগাল—বসতে আরাম হবে না ওখানে, কিন্তু তোমাদেরও তো নিরিবিচি চাই। আগে
যদি আমাকে জানাতে—

তোমাকে জিজ্ঞেস না করে এটা করাই ভুল হয়েছে আমার— মানতে হল শাশ্বতীকে।
তা এক কাজ করতে পার— আর একটু গুজ্জা করল হারীত—বিজুকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে
দাও—অন্য সময়ে, কি অন্যদিন।

আর আসবারই বা দরকার কী? বিজুই বলে দেবে। —শাশ্বতীর ঠোট এঁটে গেল, যেন আর
কথা বেরোবে না।

ভগ্নদূত বিজন! স্ত্রীর মুখ থেকে রঙের শেষ চিহ্নটুকু মুছে নেবার কৃতিত্বে হারীত গলা ছেড়ে
হাসল।

ভগ্নদূত! এত সহজেই? বিজন তাগুব বাখাল। কেন? মজুমদারের দোষ কী? কুচ্ছিৎ, না গরীব?
না কি মানুষ মন্দ? বয়স বেশি? পাশ করেনি? ব্যবসা করে? আরেকজন পাশ না-করা বেশি
বয়সের ব্যবসাদারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দাওনি তোমরা? কোন হিসেবে মগমলুকের টেকোমাথা
কাঠখোঁট্টা বর্ধনের চাইতে প্রবীর মজুমদার খারাপ হল? একটা আজীবাজে মানুষ নাকি?
পাঁচজনকে চেনে কলকাতা শহরে, পাঁচটা খোঁজখবর রাখে, ঘান বোঝে, ফাইন আর্টস-এ
ইন্টারেস্ট আছে... একটা ভদ্রলোক। এদিকে পয়সা কত? ঝালিগঞ্জে তার জমি কেনা আছে,
জান? আরেকটা গাড়ি কিনছে, জান? ইনশিওরেন্সের প্রিমিয়াম কত দেয়, জান? কী জান তোমরা
তার কথা! সে কি তোমাদের হারীত জামাইয়ের মতো কপ্পুষ, না কি কলকাতাই বাবুদের মতো
অন্ন-পরানি! কত বড়ো হার্ট! এই তো ভাগনিকে এনে রেখেছে, আর চাকরি দিয়ে বাঁচিয়েছে
কত গরিব আত্মীয়কে। আর কী অবস্থা থেকে উঠেছে...কিছু ছিল না, নিচ্ছন গরিব... সেই
থেকে আজ কোথায়! এটা কি একটা কম কথা? কমবীর... একদিন সার আরেন-টারেনই হবে
হয়তো। অনেক ভাগ্যি তোমার মেয়ের যে তাকে পছন্দ করেছে এই মানুষ। আর তোমরা তুড়ি
মেয়ে উড়িয়ে দিলে তাকে? কানেই তুললে না কথাটা? কেন, এত ডম্ফাই তোমাদের কীসের?

বেশ তো, বিয়ে দেবে না বুঝলাম, কিন্তু কারণটা শুনতে পাই না? আর তো কিছু না, আমার চেনা, আমার বন্ধু, আমিই তাকে এ-বাড়িতে এনেছি, এই তো তার দোষ? আমি যা বলব ঠিক তার উল্টোটা না করে তো টিকতে পারে না রাজেন মিত্র! এই কথাই যদি অন্য কেউ বলত, অন্য যে-কেউ, তাহলে এর সঙ্গেই বিয়ে দিতে না নাচতে নাচতে? চিনি না আমি তোমাদের!

সকাল সন্ধ্যায় রাজেনবাবু যখন বাড়ি থাকেন—বিজ্ঞান বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক-একবার চিৎকার করে এসে বন্ধুতাটি উগরোতে উগরোতেই ছটকে বেরিয়ে যায় রাস্তায়। তক্ষুনি ফিরে আসে গোলপোস্টে ধাক্কাখাওয়া ফুটবলের মতো, আবার গলা লোটায়, দম আটকে যেন খুন হয়ে যাবে সেখানেই। ঘেঁষাঘেঁষি পাড়ার পাশাপাশি বাড়িতে পৌঁছয় তার গলা, কথা। কাছাকাছি জানলাগুলিতে মেয়েরা দাঁড়িয়ে যায়, পুরুষরা কেউ কেউ রাস্তায় বেরিয়ে আসে, আর বাড়ির যে দুজন এর লক্ষ্য, তারা দুই আলাদা ঘরে নিঃশব্দে বসে তখনকার মতো বধির হবার প্রার্থনা জানায়। পুনরুজ্জীবিত গুণে বাগ্মিতার আরো বিকাশ হয়, আরো তথ্য জোটে, আরো জোরালো যুক্তি। সুচিত্র বর্ণনায়, বিচিত্র বিশেষণে আর মর্মস্পর্শী ইঙ্গিতে বিজ্ঞান এক-একবার প্রায় প্রতিভার পরিচয় দিয়ে ফেলে।

একবার বিজ্ঞান বলল—এই যদি তোমাদের মনের কথা আগে মনে ছিল না? বিয়ে যদি নাই দেবে, এগোলে কেন এত দূর! স্বাতী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল—বলছিস কী তুই? এতক্ষণে স্বাতীকে যুদ্ধে নামাতে পেরে বিজ্ঞানের মুখে হিংস্র হাসির ঢেউ উঠল—ঠিক বলছি! মনে ছিল না নেমস্তম্ভ নেবার সময়? ঢলে ঢলে কথা বলার সময়? দুপুরবেলা একলা বাড়িতে একঘণ্টা গল্প করার সময়?

—আস্তে কথা বল!

আস্তে বলব কেন, আমি কি ভয় করি তোকে না তোর বাবাকে? সকলে জানুক তোর কেলেকারি। এই!—দরজার ধারে দাঁড়িয়ে রাজেনবাবু একটা চিৎকার দিলেন, যতটা চিৎকার তাঁর পক্ষে সম্ভব।

বিজ্ঞানের বিক্রম কমল না। ফুলে ফুলে বলতে লাগল—হ্যাঁ, সকলে জানুক। কেউ কি জানে, বাবাও কি জানে তুই কী একটা! তলে তলে আরেকজনের সঙ্গে, ঐ যে একটা ছটকে প্রোফেসর, কত চিঠি লেখালেখি, কত রঙ্গরস, তোর কীর্তিকাহিনী সব ফাঁস করব না আমি! আর তারপর কি ভেবেছিস কাউকে তুই পাকড়াতে পারবি? হয় তুই মজুমদারকে বিয়ে করবি, নয় কেউ তোকে বিয়ে করবে না। শোন, শুনে রাখ, কেউ না, আর শেষ পর্যন্ত ঐ তাকেই...হ্যাঁ, তবে আমার নাম বিজ্ঞানচন্দ্র। নিজের বুকে থান্ড মারল সে, শুনো আমি দিল একটা, বেরিয়ে গেল গনগনে একটা কামান-গোলার মতো।

* * * * *

স্বাতী কাঁপছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। রাজেনবাবু তার পিঠে হাত রেখে তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। খানিকক্ষণ দুজনেই যেন বোবা হয়ে রইল, তারপর যখন বোঝা গেল যে বিজ্ঞান আপাতত আর ফিরবে না, তখন রাজেনবাবুর গলা দিয়ে অশ্রুট একটা 'উঃ' বেরোল। আওয়াজটা আস্তে-আস্তে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, কোনো প্রতিধ্বনি জাগল না। আবার শব্দহীনতার জলে ডুবতে ডুবতে রাজেনবাবু পায়ের তলায় হঠাৎ মাটি পেলেন। মুখ তুলে নিশ্বাস নিয়ে বললেন—এক কাজ করলে হয়—

স্বাতীও মুখ তুলল কথা শুনে।

এইরকমই তো যন্ত্রণা করবে তোকে—রাজেনবাবু বিজনের নামটা ছেড়ে গেলেন—আমি তো সারাদিন বাড়ি থাকি না, আর থাকলেও... তাঁর গলা বুজল এখানেই। বাবার জন্য তীব্র একটা কষ্ট হল স্বাতীর।

তুই না হয়—একটু থামলেন রাজেনবাবু—না হয় তো বড়দির কাছে একবার... কত খুশি হবে! আমিই দুদিনের ছুটি নিয়ে... নয় তো সরস্বতীর কাছে দিল্লিতে... যাবি?

স্বাতী বলল—না, বাবা, কোথাও যেতে হবে না।

গেলে হয়তো ভালই লাগবে... মনটাও—

স্বাতী আবার বলল—না।

কিন্তু—এবার রাজেনবাবু একটা অস্পষ্ট সর্বনামের সাহায্য নিলেন।—কিন্তু ওরা যদি... কী বিত্ৰী... বাড়ির মধ্যে একটা—তখনকার মতো একটা সম্পূর্ণ বাক্যরচনার শক্তি তাঁর যেন লোপ পেল।

দাদার ভয়ে আমি বাড়ি ছেড়ে পালাব নাকি?—স্বাতী চোঁট বাঁকাল, প্রায় হাসল, আর বাবার চুপ করে তাকানোর উত্তরে আবার বলল—দাদা আমার কী করবে? এরপরে একজনও আর কথা বলল না, একজনও উঠল না সেখান থেকে। স্বাতী, যদিও সে-ই সাহস দিল বাবাকে, তবু বাবার কাছেই বসে থাকতে তার মন চাইল। আর রাজেনবাবু হঠাৎ বুঝলেন, বুকে ধাক্কা দিল কথাটা—যে এই আরম্ভ হল, আর এই আরম্ভ মানেই শেষ... শেষ মানে, স্বাতীর নতুন আরম্ভ। সন্ধ্যা তখন, ঘোর নেমেছে ঘরে। হাওয়ায় উড়ছে দেয়ালের ক্যালেন্ডারের পাতা, যেন পরের মাসগুলির জন্য অস্থির। হালকা পায়ের শব্দ হল বাইরে।

শাম্ভতী বোধহয়—বলে রাজেনবাবু উঠে আলো জ্বাললেন।

ঘরে ঢুকে শাম্ভতী একবার বাবার, একবার বোনের দিকে তাকাল। দাঁড়িয়ে থাকল চুপ করে। স্বাতী উঠে বলল—বোসো, ছোড়দি, আমি স্নান করে আসি। মাঝে কদিন শাম্ভতী আসেনি। তার গভীর মুখের দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন—বোস! স্বাতীর ছেড়ে-যাওয়া চেয়ারটা যদিও কাছেই ছিল, শাম্ভতী এগিয়ে এসে বসল খাটের ধারে, আড় হয়ে বাবার মুখোমুখি। জিগেস করল—কী হয়েছে? রাজেনবাবু উত্তর দিলেন না।

বাবার গুনো, কুঁচকানো মুখের উপর চোখ রেখে শাম্ভতী প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি না করে পারল না। রাজেনবাবুকে শেষ পর্যন্ত মুখে আনতে হল—বিজুর যন্ত্রণা—বিজু? বিজুর কথা ছেড়ে দাও! কেন যন্ত্রণা, কী রকম যন্ত্রণা, শাম্ভতী যেন নিজেই তা বুঝে নিল।

বুক ভরা গভীর একটা নিশ্বাস ছাড়লেন রাজেনবাবু।

একটু থেমে শাম্ভতী বললো—কিন্তু বিজু মন্দ বলে তুমিও অন্ধ হোয়ো না বাবা। যেন সামনে কিছু ভয়ের দেখতে পেয়ে রাজেনবাবু হঠাৎ চোখ বুজে ফেললেন—শাম্ভতী... থাক... এখন আর—

না বাবা, আমি তর্ক করব না তোমার সঙ্গে। শুধু একটা কথা বলে যাব। তারপর তুমি যা ভাল বোঝ, কোরো। রাজেনবাবু অপেক্ষা করলেন, ডাক্তারের ছুঁচের সামনে রোগীর মতো। কথাটা এই—শাম্ভতী নড়ে-চড়ে বসল—বিজুর কথা ভুলে যাও, স্বাতীকেও এখানে এনো না,

মনে করো তুমি একজন মেয়ের বাপ—মেয়ের মা নেই—সমস্তটা দায়িত্বই তোমার উপর। শাশ্বতী তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছে তাঁর দায়িত্বের কথা, এটা নিঃশব্দে মেনে নিলেন রাজেনবাবু। এখন, মেয়ের যদি বিয়ের কোনো প্রস্তাব আসে, তুমি সেটা নিয়ে ভাববে তো অস্বস্ত একবার? তুমি কি ঠিক জানো যে এই—এই ব্যাপারটা নিয়ে যতটা তোমার ভাবা উচিত ততটাই তুমি ভেবেছ? এবারেও রাজেনবাবু কিছু বললেন না, আর শাশ্বতী যেন উৎসাহ পেয়ে তক্ষুনি আবার বলল—না কি তুমি কিছু না-ভেবেই নেহাৎ হেলাফেলা করে, কি মেয়েকে আরো কদিন কাছে রাখতে চাও বলে—

তোর তাই মনে হয়? রাজেনবাবু হঠাৎ বাধা দিলেন কথায়।

রাখতে চাইলে কিছু দোষের না—বিজুটা যেরকম... আর আমাদের মধ্যে ওকেই তো তুমি সবচেয়ে...

নাকি?

তাই যদি হয়—বেশ তো, মজুমদার অপেক্ষা করবে—ছ-মাস—একবছর—এমনকি দু-বছর—গিয়েছিল বুঝি তোর কাছে?

তার পক্ষ নিয়ে আমি কিছু বলছি না—সে আমার কেউ না— আমি শুধু এটুকু দেখছি যে মেয়ের জন্য মা-বাপের... সাধারণ যেসব আকাঙ্ক্ষা থাকে, তার সব না হোক অনেকগুলোই সে মেটাতে পারে আর—আর এমনও তো হতে পারে যে স্বাতীর মনই বদলে গেল পরে? বদলাবার ভার তুই নিবি? না সে নিজেই?

শাশ্বতী আরো গম্ভীর হয়ে বলল—না, সে আর আসবে না তোমাদের বাড়িতে, কিছু বিরক্ত করবে না, যদি না... যতদিন না তোমরা তাকে ডেকে পাঠাও।

রাজেনবাবু নিঃশব্দে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন।

তোমাকে কথাটা জানানো দরকার মনে করলাম—মজুমদারের জন্য না, নিজেদেরই জন্য। আপাতত স্বাতীর মন উঠছে না বলে কিংবা নিজে তুমি ওরকম মানুষ পছন্দ কর না বলে উড়িয়ে দিয়ে না একেবারে, ভেবে দেখো... আর কিছু বলবার নেই আমার।—শাশ্বতী উঠল, আর তখনই নিজের শেষ কথাটার বিরোধিতা করে বলল—মা থাকলে একে অপছন্দ করতেন না। তোমার তিন মেয়ের পাত্র মা-ই তো পছন্দ করেছিলেন?

আর তারপর থেকে অবশ্য তুই করছিস— বললেন রাজেনবাবু।

আমার পছন্দই কী মন্দ? হাসির একটু ঝিলিক দিল শাশ্বতী, অসি-সসি-সসি রাজেনবাবুও চিকচিকোলেন—আজ কী? পাঙ্কুয়া না জলতরঙ্গ?

আজ যাই, বাবা।

এখনই?

হ্যাঁ, এখন থেকে আবার ভবানীপুরের বাড়িতে—। একটু থেমে রাজেনবাবু বললেন—বেশ একা-একাই চলাফেরা করিস আজকাল?

ভালই লাগে, আর সবসময় সঙ্গে নিয়ে ঘুরবেই বা কে?

হারীত বুঝি ওখানে?

আপিশ থেকেই ফেরেনি—এতক্ষণে ফিরেছে হয়তো—উনি যাবেন তাঁর সময়মতো... আচ্ছা, বা বললাম ভুলো না। হিল-তোলা জুতোর খুটখুট আওয়াজ করতে করতে শাশ্বতী চলে গেল।

হঠাৎ যেন রাজেনবাবুর মনে হল এই ভদ্রমহিলাটিকে তিনি চেনেন না।

স্নানের পরে স্বাতী এসে বলল—ছোড়দি কোথায়?

তাড়া ছিল, শ্বশুরবাড়িতে নেমস্তন্ন আবার... আর শ্বশুর-শাশুড়ি খুব-তো ভালবাসেন ওকে। রাজেনবাবু দরকারের চেয়ে খানিকটা বেশিই বললেন।

চলে গেল! স্বাতীর মুখ ফুটল না, কিন্তু কথাটা তার সমস্ত মুখে লেখা দেখলেন রাজেনবাবু। আর তখনকার মতো সব কথা যেন ফুরিয়ে গেল তাঁর সঙ্গে স্বাতীর।

স্বাতী একখানা বই হাতে বসবার ঘরে এল। বসবার ঘরের একটা প্রভাব আছে মনের উপর। ওখানেই আমরা বাইরের জগৎকে বাড়িতে ডাকি—বাইরের কেউ না থাকলেও, একা থাকলেও ওখানে নিজেকে অন্য অনেকের অংশ মনে হয়। যেটা একান্তই নিজের এলাকা সেটাকে তত যেন প্রকাশ আর লাগে না। স্বাতী অন্তত সেই আশাতেই ও ঘরে এল, তার একলার ভার হালকা হবার আশায়, অন্তত জানলা দিয়ে চারদিককার পৃথিবীর একটু আভাসের আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু আশার চেয়ে বেশি পেল সে, অনেক বেশি, কেননা সে স্থির হয়ে বসবার মাত্র কয়েক মিনিট পরে—জানলা দিয়ে একটুখানি আভাস না, খোলা দরজা দিয়ে বাইরের সমস্তটা পৃথিবী একেবারে সশরীরে হেঁটে চলে এল ঘরের মধ্যে।

শুনেছ খবর? শুনেছ? হারীতের চুল উড়ুক, চোখ চকচকে, আর মুখের রোদে-পোড়া চামড়ার তলায় অন্য একটা লালচে রঙের ছটফটানি।

কী? কী-হয়েছে? কী-জানি-কী ভেবে ত্রস্তে উঠে দাঁড়াল স্বাতী। হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেছে! হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেছে! দু-বারই শূন্য হাত ছুঁড়ল হারীত। শোনোনি এখনো? নিরাশ হয়ে, নিশ্চিত হয়ে স্বাতী বসে পড়ল আবার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে হারীত ভেরী বাজাল—মরবে! মরবে এবার! ছিন্ন হবে কাস্তেতে, চূর্ণ হবে হাতুড়িতে! এতদিন তো শুধু রিহার্সেল... আসল পালা তো এবার!আছ কোথায়, স্বাতী, ভাবছ কী... কী যে হবে দেখতে-দেখতে... লড়তে হবে, সকলকে লড়তে হবে... সমস্ত পৃথিবী ভরে সকলকে... তৈরি হও, তৈরি হও সব! একটু চুপ করে থেকে স্বাতী বলল—আপনি কী আপিশ থেকে?

তা বলতে পারো—হঠাৎ শরীরটাকে একটা চেয়ারের উপর ছেড়ে দিয়ে হারীত অন্য কয়লায় বলল—খবরটা অবশ্য তোমার কাছে কিছু না—এখন না—কিন্তু বুঝবে একদিন, বুঝিয়ে ছাড়বে।

স্বাতী বলল—ছোড়দি এই একটু আগে চলে গেল।

নাকি?

আপনাদের ভবানীপুরের বাড়িতে গেল এখান থেকে।

ভাল—আমি অবশ্য তোমার ছোড়দির জন্য আসিনি, এসেছিলাম তোমাকেই খবরটা দিতে। আমাকে! স্বাতী হেসে ফেলল। আমাকে এতটা যোগ্য ভাবলেন হঠাৎ? হারীতের মুখের ভাব সহজ হল, ছোট্টো হাসি ফুটল ঠোটে—তা আজকাল বেশ যোগ্য হয়ে তো উঠেইছ। বেচারী প্রবীরচন্দ্র মজুমদার! বিশ্ব-কাঁপানো ঘটনা সত্ত্বেও কৌতূকের ক্ষেত্র এখন বেশ প্রশস্ত দেখা গেল হারীতের মনে। স্বাতী তার মুখের ভাবটা বেশ সপ্রতিভ রাখবার চেষ্টা করল।

বেচারী! আশা ছাড়েনি এখনো—শাস্বতীর কাছে কী যেন ঘ্যানর-ঘ্যানর করছিল কাল। বেচারী!

প্রত্যাখ্যাত পাণিপ্রার্থীকে ঐ আখ্যায় বিদ্ধ করে করে হারীতের যেন আশা মেটে না। স্বাভী অবাক হল খবরটা শুনে। ঘ্যানর-ঘ্যানরের সারমর্মটা কী? জিগেস করল না, কিন্তু আশা করল হারীতদা নিজেই বলবেন। সে আশা মিটল না। হারীত এর পরে বলল—তা বেশ, ভালো! আরো গৌরব হোক তোমার, আর ক-জনের হৃদয় ভাঙে—তবে তো! ফরাসিরা বলে, সে মেয়েই বিয়ে করার যোগ্য যে সাতজনকে অস্ত্রত... কথা শেষ করল না হারীত, হঠাৎ বোধহয় বিশ্ববাস্ত্য মনে পড়ল আবার, মুখের পেশী শক্ত হল, একটানে দাঁড় করাল অনেক-ঘোরা ক্লাস্ত শরীরটাকে।

যাচ্ছেন নাকি?

হ্যাঁ, এখন মকরন্দর ওখানে—

চা—

না— হারীত ঘুরে দাঁড়িয়ে রাজেনবাবুকে দেখতে পেল, আর স্বশুরের সম্মানে মুখশ্রীতে অমায়িকতার চেষ্টা করল। রাজেনবাবু আরম্ভ করলেন—শাস্বতী তো...

শুনলাম—। হারীত সময় নষ্ট করল না। হ্যাঁ—আজ বুঝি মা-র কী ব্রত-দ্রুত... ওসব আবার আছে তো ওঁদের! হারীতের হাসিতে করুণা ফুটল একসঙ্গে নিজের মা আর স্ত্রীর বাবার প্রতি।

তুমি ওখানে—

দেখি। এখন যাচ্ছি এক জায়গায়... সেখান থেকে যদি... না।— স্বশুরের অনুক্ত অনুরোধের আগাম জবাব দিল সে—এখন আর চা না। যাচ্ছিলাম... আচ্ছা যাই। ফ্রিপ্র পিছনে ফিরল হারীত, দ্রুত অদৃশ্য হল দরজার বাইরে। রাজেনবাবু বসলেন মেয়ের কাছে। একটু হেসে বললেন—হারীত তোর ছোড়দির জন্যই এসেছিল, তাকে না পেয়ে আর বসল না।

না বাবা, স্বাভীও হাসল বাবার উত্তরে। হারীতদা এসেছিলেন আমাকে এই খবরটা দিতে যে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেছে।

নাকি?

হ্যাঁ, সেই জন্যই—

যুদ্ধ তবে ছড়াল! বাবার মুখে এ কথা শুনে স্বাভী থমকাল।—সত্যি কি খুব আশ্রাপ হবে এর পরে? হারীতদা তো হলুদুল করে গেলেন।

আমরা ভেবে কী করব! আর এর চেয়েও বড়ো ভাবনা আমাদের আছে এখন। বাবার শেষ কথাটা শুনে আবার ভারি হল স্বাভীর মন। মিনিটখানেক রাজেনবাবু কিছু বললেন না। তারপর আস্তে আস্তে আরম্ভ করলেন—স্বাভী শোন। তোর মা নেই, তাকেই বলতে হচ্ছে— আর তুইও বুদ্ধিমতী, নিজের ভাল-মন্দ নিজেই তো বুঝিস। স্বাভীর সাদা গালে সরু একটি নীল শিরা একটু স্পষ্ট হল।

আর এতদিনে এটাও নিশ্চয়ই বুঝেছিস— রাজেনবাবুর গলায় যেন একটু হালকা সুর লাগল— যে মানুষের জীবনে—মেয়েদের জীবনে বিশেষ করে—বিয়েটা একটা মস্ত ব্যাপার, জীবনের অনেকটা সুখেরই কারণ। বলে রাজেনবাবু মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন। আর মেয়ে— যদিও তার শরীরের প্রত্যেকটি স্নায়ুতে টান পড়ছিল তখন—কিছু বুঝতে দিল না বাবাকে। চোখ এড়িয়ে উত্তর দিল—দুঃখেরও। নভেল পড়া কন্যার কথা শুনে একটু অবাক হলেন রাজেনবাবু—কিন্তু ও যদি এতটাই বোঝে, তবে তো আরো ভালো। এই দুরাহ আলাপের পরের

ধাপটি মেয়েই যেন যুগিয়ে দিল বাপের মুখে —হ্যাঁ, দুঃখেরও হতে পারে। আর তাই তো এত চেষ্টা আমাদের, এত চিন্তা। দুঃখ তো কেউ চায় না, সুখের চেষ্টাই করে সকলে। স্বাতী একটু চুপ, তারপর—আগে বলা যায় নাকি?—অদৃষ্ট বলে একটা কথা আছে তো সেইজন্যই।—বলেই রাজেনবাবু বুঝলেন মেয়ের কথার ঠিক উত্তর এটা হল না। তাই আবার বললেন—সে তো যায়ই না। দেখতে যেটা তেমন ভালো না, সেটাই হয়তো সুখের দাঁড়িয়ে যায়। ঐ প্রবীর ছেলেটি, তার স্ত্রী হয়তো সুখী হবে খুব। গলার উপর স্বাতীর মাথাটি একটু পিছনে সরল। স্থির হয়ে বলল—হয়তো কেন—নিশ্চয়ই! তারপর হঠাৎ জিগেস করল—ছোড়দি এসে কী বলে গেল তোমাকে?

শাশ্বতীর ইচ্ছে তো জানিসই— স্পষ্ট জবাব দিলেন রাজেনবাবু। আমি তোর ইচ্ছেটা জানতে চাই, তাই—

তা কি তুমি জান না? স্বাতী আর পারল না, দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। স্বাতীর বাঁকা বাঁকা কুচকুচে কালো ঘন চুলের উপর রাজেনবাবুর চোখ পড়ল, একটু দেরি করে বললেন—আমি তো তোকে জিগেস করিনি, আগে ধরেই নিয়েছি এ বিষয়ে আমার কথা তোরও কথা। কিন্তু আমার অপছন্দ বলেই তুই যদি—

তুমি আমাকে তা-ই ভাব? স্বাতী মুখ তুলে জ্বলজ্বলে চোখে তাকাল।

আমার যা ভালো লাগে না, রাজেনবাবু আস্তে আস্তে বললেন—সেটা তোরও যাতে ভালো না লাগে, সে রকম চেষ্টাই তো তোর পক্ষে স্বাভাবিক... কিন্তু আমাকে বাদ দিয়ে তুই ভেবে দ্যাখ, তারপর যদি তোর মনে হয়, যদি একটুকুও—

বাবা! রাজেনবাবু কণ্ঠের কান্না শুনলেন সে ডাকে। মেয়ের মুখে শান্ত চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন—আমি তোকে এই শুধু বলতে চাই যে আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা ভাবিসনে। তোর ইচ্ছামতোই সব হবে।

তবে আর কী! রং, রস, রক্ত ফিরে এল স্বাতীর মুখে।

তোর ইচ্ছাটা তুই যাতে বুঝতে পারিস—

ইচ্ছা বুঝি বুঝিয়ে দিতে হয় কাউকে?

তাও হয়—রাজেনবাবু হাসলেন। ছোটোছেলে কি বুঝতে পারে তার খিদে পেয়েছে?

আমি আর ছোটো নেই, বাবা! স্বাতী উঠে দাঁড়াল, লম্বা, সংবৃত সন্দর।

কিন্তু যত বড়ো তাকে দেখায় সে কি তত বড়ো? এখনো তো স্বাভাবিকের কাছে আশ্রয় তার অক্ষুণ্ণ, প্রশ্রয় প্রচুর। এখনো তো জীবনের অনেকটাই তাঁর খেলা-খেলা, তার দিন-রাত্রি শুধু ভাললাগা আর না-লাগার সাদা-কালোয় আঁকা। বয়স্ক জীবনের ভয়, অনিশ্চয়তা, বাধ্যতা, দায়িত্ব—এ সবের সে কী জানে? একশো রকমের আশ্চর্য জটিলতার কথা সে পড়েছে কিন্তু নিজের জীবন যখন একটুখানিও জটিল হয়ে ওঠার ভয় দেখায়, তার ব্যবস্থা কি স্বাধীনভাবে নিজেই করতে পারে? তখন তো সেই পুরোনো আর প্রথম নিশ্চয়তাই তার নির্ভর? কিন্তু তাও কি ভাঙল আজ? বাবাও কি তাকে ছেড়ে দিলেন এই ভীষণ পৃথিবীতে? খুব তো তখন সাহস দেখাল, কিন্তু রাত্রে বিছানার মধ্যে কঁকড়ে রইল ভয়ে, বুকের ভিতরটা শুকিয়ে উঠতে লাগল। দাদার সঙ্গে হারীতদার কথার কোথায় একটা মিল দেখল সে, আর বাবাও কি ভাবছেন সে—ই? তবে কি তারই দোষ? প্রথম থেকে সতর্ক হলে, সচেতন হলে, এই কাঁড়াটা এড়াতে

পারত না কি? ফাঁড়া কাটল, কিন্তু কথাটা কি এই দাঁড়াল যে মনে-মনে এটা সে চেয়েইছিল? কিন্তু কেউ যদি তাকে অন্যায়ভাবে চিন্তা করে, সে কী করতে পারে? তাকে কি আজ প্রমাণ করতে হবে যে সেই অন্যায়ের তার কোনো হাত ছিল না? আর সেটা প্রমাণ করার পরেও অপরাধীই থেকে যাবে? কী বিপদ—কী আপদ এসে জুটল তার কপালে!

ভালো ঘুম হল না সে রাতে। অনেক বেলায় উঠল পরের দিন, আর সে ওঠবার খানিক পরেই, যেন ঠিক-সময়ের অনেকটা আগেই, বাবা চলে গেলেন আপিশে। স্বাতীর মনে হল, বাবা তাকেই এড়ালেন। স্বাতী চুল খুলল না, স্নান করল না, বই খুলল না। দাঁড়ানো বইগুলির পৃষ্ঠের উপর দিয়ে চোখ চালিয়ে গেল, কোনোখানে থামল না চোখ, কোনো বই তাকে ডাকল না। আজ প্রথম সে বইয়ের কাছে কোনো জবাব পেল না। হয়তো অন্য কোথাও জবাব আছে। ছাপার অক্ষরে, না হাতের লেখায়? দেবরাজ থেকে বের করল—চিঠি, একটি নীল আর এক গোছা সাদা খাম। একটু দেখল তাকিয়ে, এখানে ওখানে হাত হোঁয়াল। তারপর খুলে-খুলে পড়তে লাগল প্রথম নীল খামটি থেকে শুরু করে। কিন্তু এ-ও তো বইয়ের মতো! শেষেরটি, শেষের কটির উপর সে প্রয়োগ করল মনের সমস্ত ইচ্ছা আর ইচ্ছার সমস্ত শক্তি। তন্নতন্ন খুঁজল লেখার ফাঁকে ফাঁকে অন্য কোনো কথা। প্রাণপণ চেষ্টা করল কথাগুলিকে দুমড়ে মুচড়ে জবাব ছিনোতে, এক ফোঁটা নিশ্চয়তা নিংড়ে বের করতে—কিছু না! শুধুই সারি-সারি কথা, সাজানো কথা, সুন্দর কথা—কিন্তু এ সুন্দর দিয়ে কী করবে সে, এর চেয়েও আরো কত সুন্দর কথা তো ছাপানো আছে বইয়ের পাতায়... পাহাড়ে বেড়াচ্ছেন, আনন্দে আছেন, মাঝে মাঝে চিঠি লিখে সাহিত্যচর্চা করেন—এদিকে ছুটিও আর বেশি নেই, কিন্তু তাতে কী? একেবারে শেষ সম্ভব দিনটি কাটিয়ে তবে তো ফিরবেন। চিঠিগুলি তুলে রাখতে রাখতে স্বাতীর মনে হল সে যেন অনেক, অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছে, অথচ কোথাও যাচ্ছে না, স্বপ্নে যেমন পথ আর ফুরোয় না, সেইরকম। আর হঠাৎ যেমন চমক দিয়ে স্বপ্ন ভাঙে তেমনি একটা জেগে ওঠার ধাক্কায় সব তার কাছে সহজ হয়ে গেল, স্বপ্নকে স্বপ্ন বলে চিনল—সোজা দেখতে পেল চোখের সামনে বাস্তবের পরিষ্কার পথ। কাগজ নিল, কলমের টুপি খুলল। প্রথমবার ‘শ্রীচরণেশ্বর’ লিখেছিল, এখন ‘শ্রদ্ধাস্পদেষু’ লেখে, আজ কিছুই লিখল না, শুধু—

কবে আসবেন? ছুটি তো প্রায় শেষ, আর আসতেই তো হবে। চিঠি আর চাই না, চিঠি আর ভালো লাগে না। এর উত্তরে আসবেন।

নিজের নাম লিখে একটু তাকিয়ে থাকল। দু-মিনিট পরে স্বাতী নিজের হাতে সমর্পণ করল ডাকবাক্সের বিশ্বস্ত অঙ্ককারে তার জীবন... তার ভবিষ্যৎ... তার অদৃষ্ট।

২

সুখী, সুশ্রী, উজ্জ্বল একটি দিন। গ্রীষ্মের ধোঁয়ামুখে মেঘের ধোঁয়া, মেঘের ধোঁয়ারং কালো, আকাশ ভরা কালো, আকাশভাঙা বৃষ্টি, তারপর বৃষ্টি পড়ে পড়ে তাপ জুড়োল, মেঘ লুকোল, আকাশ ফেটে নীল বেরোল। সত্যি নীল... নরম অথচ জ্বলজ্বলে ঘন নীল, যে নীল—যদিও নীলের জন্যই তার খ্যাতি—বাংলার আকাশে দেখা দেয় বছরে আট কি দশ দিনের বেশি না। বাইরে রোদদূরটা নিশ্চয়ই গরম, কিন্তু ঘরে আলো, হলদে-সবুজ-বেগুনি মেশানো আভা, যেন গাছপালার ভিজেসবুজ নিজের গায়ে মেখে নিয়েছে এই আলো। ভিজ়ে ভাবটা হাওয়াতেও,

ঝিরঝির বইছে ঠান্ডা, যখন বইছে না তখনো ঠান্ডা, এমনকি ইলেকট্রিক পাখাটাকে, যদিও এখন দুপুর, একটু ছুটি দিলেও চলে। স্বাতীর অন্তত থেমে থাকা পাখাটার দিকে লক্ষ্যই নেই। পরনে ঘাস রঙের শাড়ি, নিচু করা মাথার মাঝখান দিয়ে আলোর সূতোর মতো সিঁথি, আলোর দিনটির সমস্ত সুখ তার মুখে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটি চিঠি পড়ছে সে। আর তার পিছনে তার বাঁকানো ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার চেয়ে লম্বা একজন, তোলা মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরা, গায়ে শার্ট, পায়ে স্যান্ডেল, হাতে দু-খানা বই আর একটি খাতা। তার দাঁড়িয়ে থাকার ভাবটা এমন যেন সে স্বাতীর মুখের কোনো একটা কথা শুনবে বলে অপেক্ষা করছে, আর সেই কথার উপরে অনেক কিছু নির্ভর করছে তার। একটা চিঠি পড়ে উঠতে যেটুকু সময়, তার মতে লাগতে পারে, সেটুকু দেরি করল সে, তারপর কথা বলল—

কী লিখেছেন মা?

ভালোই আছে সব—মুখ না তুলেই জবাব দিল স্বাতী।

আমার কথা?

আমার উপরেই তোঁর ভার দিয়েছেন বড়দি, স্বাতী মুখ ফেরাল, তাকালো... হাসল।

আমি কি এখানেই থাকব, না হস্টেলে যাব?

ওঃ বড়ো যে হস্টেলের শখ! সেখানে বাবু সেজে ঘুরে বেড়াবেন আর কলেজ ফাঁকি দেবেন রোজ! ও সব হবে না—কেমন আমি তোমাকে কড়া শাসনে রাখি দ্যাখো না!

মা বলেছিলেন আমি এখানেই থাকব। কিন্তু বাবা বলেছিলেন—না, না, ওদের অসুবিধে হবে।

আর কী বলেছিলেন তোমার বাবা?

বাবা কিন্তু আনতেই চেয়েছিলেন আমাকে—সেই পূজোর সময় সবাই যখন এল। তখন মা-ই বললেন— না, সামনে পরীক্ষা!—এমন তখন রাগ হয়েছিলো মার উপর!

খুব রাগ? স্বাতী ভুরু বাঁকাল।

হবে না? ছ-মাস দেরি তখনো পরীক্ষার!—আর ঐ এক মাস আমি কি পড়েছিলাম নাকি? মিছিমিছি আমার আসা হল না!

তা বেশ তো, বেড়াতে না এসে একেবারে থাকতেই এলি।

তাও কি তুমি ভেবেছ সহজে? মা কি কম প্যানপ্যান করেছেন—কেন, এখানকার কলেজেই তো—ছেলেমানুষ, একা-একা কলকাতায়—যত হ্যানো-ত্যানো জানেন না! আচ্ছা, তুমিই বলো, ওখানকার কলেজকে কি কলেজ বলে, না পুরো মোলো বছর রুমসিকে ছেলেমানুষ বলে? বড়দি যে তোকে ছেড়ে দিলেন শেষ পর্যন্ত, সেটাই তো আশ্চর্য! যা ভালো তিনি বাসেন তাদের! নিজের ছেলেমেয়েকে সব মা-ই ভালোবাসেন, ওতে আর মতন কী আছে?

বাঃ, এক মাস হয়নি কলকাতায় এসেছিস, এরই মধ্যে বুলি কপচাতে শিখেছিস তো বেশ! নাঃ, তুমিও আমাকে ছেলেমানুষ ভাবো!

তাতে আর দুঃখ কী—লম্বা তো হয়েছিস খুব! চিনতেই পারিনি প্রথম দিন দেখে—এই ডালিম? আমাদের ডালিম? ঠাশ করে এত বড়ো হয়ে গেল কবে?

তুমিও অনেক বড়ো হয়েছ, ছোটোমাসি। এ কথার উত্তরে স্বাতী কিছু বলল না, কয়েক-পা হেঁটে গিয়ে একটি চেয়ারে বসল। চেয়ারগুলি, আগে ছিল ঘরের মাঝখানে যেমন থাকা উচিত, এখন আছে একপাশে একটু ঘেঁষে ঘেঁষে, কেননা বসবার ঘরের অর্ধেকটা এখন ডালিমের,

সক একটা তক্তাপোশ, ছোটো টেবিল—শাম্বর্তীর পুরোনো দিনের পড়ার টেবিল, এতদিন যেটা রাজেনবাবুর ঘরে জায়গা জুড়ে পড়ে ছিল—সেই সঙ্গে বেখাপ্পারকম নতুন একটা চেয়ার—মামার উপহার ভাঙে—টেবিলে বই, গোল টাইমপিস, দেয়ালে দৃশ্য-আঁকা ক্যালেন্ডার, কিন্তু ছবির অংশ অনেকটাই ঢাকা পড়ে গেছে একই পেরেকে ঝোলানো মালিকের নিজের কেনা চকচকে নতুন চৌকো আয়নাটিতে। এত জিনিসে নিশ্চয়ই একটু আঁটো হয়েছে ঘরটি, কিন্তু এখন—এই আলোর দিনে, এই সুখী, সুখী, সুন্দর দিনটিতে বেশ হালকা, খোলা, ছিপছিপে লাগছিলো ঘরটিকে। যদিও একতলা, তবু জানলা বেশি বলে, আর জানলার পরদাগুলি দুপুরবেলার নিরিবিলির সুযোগে আর আজকের আশ্চর্য আলো-হাওয়ার খাতিরে স্বাভাবিক সুরিয়ে দিয়েছিল বলে, আকাশের নীল সোনার সচ্ছলতা পৌঁছতে পেরেছিল ঐ ঘরটি পর্যন্ত।

ডালিম বসল না, এগোলও না, যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলল—আচ্ছা, ছোটোমাসি, আমি কি খুব বেশি লম্বা?

লম্বাই তো ভাল।

ভাল, কিন্তু বড্ডো বেশি হওয়া ভাল কি? আমি আবার রোগাও কিনা—কী করা উচিত আমার বলো তো? এক্সারসাইজ করব? কিন্তু এক্সারসাইজ একবার ধরলে তারপর ছেড়ে দিলেই নাকি মোটা হয়ে যায়?

রোগাও থাকবি না, মোটাও হবি না—মুশকিল হল তো তোকে নিয়ে।

কেন, রোগা-মোটর মাঝামাঝি কিছু নেই বুঝি? ডালিম তার ছোটোমাসির দিকে তাকাল, একটু থেমে থাকল, তারপর বলল—তুমি ব্যাকব্রাশ করতে বলেছিলে—ঠিক হয়েছে?

দেখি?

লম্বা ডালিম মাথা নিচু করল। বাপের মতোই শক্ত, কৌকড়া চুল তার, ছেলেবেলার সিঁথি-স্মৃতি নিশ্চিহ্ন করে ঠেলে তুলে দিয়েছে উপর দিকে। স্বাভাবিক বলল—বড্ডো তেল দিয়েছিস, অত দিবি না। আর ঐ নীল শার্টটা কি নিজে পছন্দ করে কিনলি?

ডালিম মুখ তুলল—ভালো না?

রংটা বেশ—পরদা হলে মানাত। আর তুই বুঝি কৌচাবিরোধী?

ডালিমের মাথা আবার নিচু হল। বিচ্ছিরি—এখন তা-ই লাগল—বিচ্ছিরি মালিকৌচার ফুলে ওঠা ভাঁজের দিকে একবার তাকাল, বিচ্ছিরি নীল রঙের শার্টটার দিকে একবার, তারপর মাথা নিচু রেখেই ভুরু কঁচকে চোখ তুলল, স্বাভাবিক পিছন দিকের দেয়ালটা দেখতে দেখতে বলল—আমি যা-ই করি আর না করি, আমি তো আমিই থেকে যাব। তোর বুঝি অন্য কেউ হতে ইচ্ছে করে? স্বাভাবিক মুখ টিপে হাসল, নিজের তেরো-চোদ্দ বছরের জ্বালা-যন্ত্রণার কথা মনে করে।

ইচ্ছেতে আর কী হয় বলো? এরপরে, সেই দেয়ালে চোখ রেখেই, ডালিম আবার বলল—ইচ্ছে করলেই কি আমি সত্যেনবাবু হতে পারি? স্বাভাবিক জোরে হেসে উঠে বলল—এত লোক থাকতে ওঁকেই পছন্দ করলি?

বাঃ, সত্যেনবাবু খুব সুন্দর যে!

সুন্দর? আর এক দমক হাসল স্বাভাবিক—এ-কথা পৃথিবীতে তোর আগে কেউ উচ্চারণ করেনি।

আহা—লোক তো ফর্সা রং আর মাপজোক মতো নাক-চোখ হলেই সুন্দর বলে। কিন্তু আমরা

বলি— না, লাভণ্যই আসল।

আমরা মানে কে-কে?

ডালিম হেসে ফেলল তার একটু ফাঁক-ফাঁক দাঁত দেখিয়ে। চোখ সরিয়ে, ঠিক স্বাতীর মুখের উপর এনে বলল—তুমিই বলো ছোটোমাসি, সত্যেনবাবু সুন্দর না? একবার উত্তরে ছোটোমাসি ঠাট্টা করলেন—এ রকম বুঝি কোনোদিন কেউ দ্যাখেনি?

ডালিম গম্ভীরভাবে বলল—কাউকে দিয়ে আমি কী করব? আমি আমার চোখ দিয়েই দেখি। ওরেব-বাবা! স্বাতীর হাসিতে দিনটির সমস্ত আলো সুর হয়ে বেজে উঠল—এদিকে ওঁকে ম্বলেই তো পালিয়ে যাস।

‘আমি আর কী কথা বলব ওঁর সঙ্গে? একটু চুপ করে থেকে স্বাতী হঠাৎ বলল—তোর বোধহয় অসুবিধে হয় এ ঘরে?’

অসুবিধে? কেন?

বসবার ঘর তো—কখনো কেউ এলে—

ওঃ, আমি কি আর তেমন ছেলে যে সবসময় শুধু পড়ব বসে বসে! আর আসেই বা কে... মাঝে মাঝে সত্যেনবাবু— হঠাৎ থামল ডালিম, তক্ষুনি আবার বলল—তোমাদের হয় না তো অসুবিধে? স্বাতী বলল—বড্ডো। বাবার তো রান্ধিরে ঘুম হয় না এ কথা ভেবে যে তুই বুঝি একা ঘরে ভয়-টয় পেলি।

সে কী! গোঁফের ছায়া-পড়া ঠোট এমন করে বাকাল ডালিম যে দেখতে মিষ্টি হল—আমি ভয় পাব কেন?

আমিও তো তা-ই বলি। কিন্তু বাবা রান্ধিরে উঠে একবার দেখেই যাবেন—কী জানি, বলা তো যায় না, তোকে যদি ভূতেই ধরে কি রান্ধসেই খেয়ে ফ্যালে!

কী অন্যায়!

বাবার ইচ্ছে তুই তাঁর ঘরেই থাকিস। বলেন—এখানে তো অনেক জায়গা, আর আমি তো থাকিই না সারাদিন—

দাদু বড্ডো—

হ্যাঁ, বাবা বড্ডো। তা তুই কী বলিস? তার টেবিল, তার তক্তাপোশ, তার আয়না, তার ছিমছাম ওছোনো ছোটো রাজহুটির উপর একবার চোখ ঘুরিয়ে এনে ডালিম বললো—আমি আমি... এখানেই থাকি... কেমন, কেমন ছোটোমাসি? তারপর ইচ্ছার স্বপক্ষে একটু যুক্তিও উদ্ভাবন করে ফেলল—তোমাদেরও সুবিধে—কেউ এলে-টলে তক্ষুনি খবর দিতে পারি।

মস্ত সুবিধে! স্বাতী হাসল, তারপর কড়া চোখে তাকিয়ে বলল—গল্প করেই কাটাবি দিনটা, না কি কলেজ আছে-টাছে? টেবিলের টাইমপিসটার দিকে একবার চোখ ছুঁড়ে ডালিম উত্তর দিল—এখনো দেরি আছে একটু। তোমাদের বেশ সকালে কলেজ—সারাটা দিন ছুটি পাও।

—আমার ভালো লাগে না। ডালিম তক্ষুনি বলল—আমারও না! কোন ভোরে উঠতে হয়—! আচ্ছা ছোটোমাসি, সত্যেনবাবু তোমাদের কী পড়ান?

তুই যা একেবারেই পড়িস না, উনি তা-ই পড়ান। ডালিম চোখ দিয়ে হাসল।—বাঃ, আমি বুঝি কবিতা পড়ি না? দেখছ না আমার টেবিলে ‘সঞ্চয়িতা’?... নিশ্চয়ই খুব ভালো পড়ান উনি? আগে জানলে ওখানেই ভরতি হতাম, কিন্তু বাবা বলে দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্সির কথা—

বাবাও সেখানেই পড়েছিলেন—আর তাঁর কথামতো সায়াসও নিয়েছি—কিন্তু একটুও ভাল লাগছে না, ছোটোমাসি! ছোটোমাসি ধমক দিলেন—ভাগ, পালা এখন, আর আড্ডা নয়! দেরি হচ্ছে না কলেজের? ডালিম বই-খাতা হাতে কয়েকটি অনিচ্ছুক পা ফেলে দরজা পর্যন্ত এল। আবার দাঁড়িয়ে বলল—আজ কলেজ হবে কি না কে জানে!

কেন?

রবীন্দ্রনাথের যে রকম...

যাঃ! ও কথা মুখে আনতে নেই।

না, না, কাল সবাই বলছিল কিনা আর আজকেও তো কাগজে... আচ্ছা, যাই।—ডালিম যেন নিজেকে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিল রাস্তায়।

* * *

স্বাতী একভাবেই বসে থাকল। আরাম লাগছিল তার, শরীরের আরাম, বিরঝিরে দুপুরের আরাম, খেয়ে উঠে একটু গল্প-টল্লের পর পরিপাকের মসৃণতার আরাম। বসে বসে কিছুনি এল—ঘুমই আসছিল, সত্যি বলতে—হঠাৎ ঘরের মধ্যে হালকা আওয়াজ শুনে চোখ বুজেই বলল—কী-রে, ফেলে গিয়েছিলি কিছু? উত্তর না পেয়ে স্বাতী চোখ খুলল, চোখ খুলেই ছিটকে উঠে দাঁড়াল—কী? কী হয়েছে? শুকনো মুখ, উশকো চুল, চাপা ঠোঁট আর না-কামানো গাল—এতদিনের মধ্যে কখনো স্বাতী দ্যাখেনি সত্যেন রায়ের এ রকম চেহারা। আর কথা যখন বললেন, আওয়াজটাও অন্যরকম শোনাল—শোনানি এখনো?

কী?

সত্যেন চোখ তুলল স্বাতীর মুখে, চোখ নামাল মেঝেতে, বলল—রবীন্দ্রনাথ...। আর বলতে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে স্বাতীর মাথাও নীচু হল, আর হাত দুটি এক হল বুকের কাছে। খানিক আগে যখন বড়দির চিঠি পড়ছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, ভঙ্গিটা সেই রকমই হল অনেকটা আর তার ঘাড়ের, কাঁধের, পিঠের গড়নে—যেখানে তখন সুখের সুখমা প্রায় কথা বলছিল—সেই সব রেখাই দুঃখ আঁকল সেখানে, স্তব্ধ আনতি, দুঃখের আরও গভীর সুখমা। দুজনে দাঁড়িয়ে থাকল মুখোমুখি। কিন্তু মুখোমুখি না, কেননা দুজনেই নিচু-মাথা, আর দুজনেই চুপ। একটু পরে সত্যেন চোখ তুলল, স্বাতী তা দেখল না, কিন্তু সেও চোখ তুলল তখনই। পুরনো শান্ততায় তাদের চোখাচোখি হল। সত্যেন রায় বললেন—চলো।

যাব? কোথায়?

যাবে না একবার? দেখবে না?

নিশ্চয়ই। বলেই স্বাতীর মনে হল—কিন্তু বাবাকে না বলে।

চল তা হলে।

কিন্তু আপনি—এখন কোথেকে?

আমি ওখানেই—এখন আসতাম না—তোমার জন্য এলাম। তুমি তো দ্যাখেনি কখনো—দেখলে না—তবু যদি শেষ একটু...

সত্যেন রায়ের দাড়ি-গজানো শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে স্বাতী বলল—কিন্তু আপনার স্বান-খাওয়া বোধহয়—

ও-সব এখন না—ঈষৎ ভঙ্গি হল সত্যেনের কাঁধে, ঈষৎ অসহিষ্ণুতার। আর দেরি না। চলো!

আপনি একটু কিছু খেয়ে নিন। কিছু খাননি সকাল থেকে?

না, না! একটু জোরেই বলে উঠল সত্যেন। মনে-মনে একটু খারাপ লাগল তার—যেন আঘাত লাগল—আজকের দিনে, এ-রকম সময়ে এসব তুচ্ছ খাওয়া-টাওয়া নিয়ে স্বাতীর এই ব্যস্ততায়। সকালে প্রথম পেয়ালা চায়ের পরে এ পর্যন্ত কিছুই খায়নি, তা সত্যি। কিন্তু তখন তার ক্ষুধাবোধ একটুও ছিল না, ক্লান্তিও না, আর কোনো চেতনাই তার ছিল না দুঃখের চেতনা ছাড়া। মহৎ, মহামূল্য, তুলনাহীন দুঃখ—কল্পনায় চেনা, সম্ভাবনায় পুরোনো, তবু বাস্তবে আশ্চর্য, আকস্মিকের মতো নতুন, অবিশ্বাস্যের মতো অসহ্য। সকালে গিয়ে যেই বুঝল যে আজই শেষ, তখনই স্থির করল শেষ পর্যন্ত থাকবে—তারপর কেমন করে কাটল ঘন্টার পর ঘন্টা, ভিড় বাড়ল, জোড়াসাঁকোর বড়ো বড়ো ঘর আর বারান্দা ভরে গেল, উঠানে আরো। টেলিফোনে বসে গেঞ্জি গায়ে কে একজন ঘামতে ঘামতে খবর জানাচ্ছে টেঁচিয়ে—তাছাড়া চুপ, অত লোকের মধ্যে কারো মুখেই কথা নেই, চেনাশোনারা পরস্পরকে দেখতে পেয়ে কিছু বলছে না, নতুন যারা আসছে তারা কিছু জিগেস না করেই বুঝে নিচ্ছে। অপেক্ষা, বোবা অপেক্ষা, শুধু অপেক্ষা—কীসের? একবার, অনেকক্ষণ পর, একটু বসেছিল সে, বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা শব্দ শুনল—পাশের ঘর থেকে—অনেকক্ষণ চেপে রাখার পর বুকফাটা ঝাপটা দিয়েই থেমে যাবার মতো, আর সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই তাকাল হাতের, দেয়ালের ঘড়ির দিকে, বারোটা বেজে কত মিনিট... কী যেন ফিশফিশানি উঠল। খানিক পরে যখন একবার করে ঘরে যাবার অনুমতি দিল সবাইকে—সেও গেল। মাথাটি মনে হল আগের চেয়েও বড়ো, প্রকাণ্ড, কিন্তু শরীরটি একটু যেন ছোটো হয়ে গেছে, যদিও তেমনি চওড়া কজির হাড়, তেমনি জোরালো প্রকান্ড আঙুল। শেষবার সে চোখ রাখলো তার কতকালের চেনা সেই মুখের, মাথার, কপালের দিকে, মহিমার দিকে, একবার হাত রাখল হিমঠান্ডা পায়ে। আর সেই মুহূর্তটি যেই মনে পড়ল সত্যেনের, যেই দেখতে পেল মনের চোখে আবার সেই প্রকাণ্ড মাথার ক্লান্ত নুয়ে পড়া, অমনি তার বুক ঠেলে একটা গরম শিরশিরানি উঠল, মুখ ফিরিয়ে নিল তাড়াতাড়ি। মুহূর্তের চেষ্টায় আত্মস্থ হয়ে নিয়ে আবছা একটু হাসির ধরনে বলল—আচ্ছা, জল দাও এক গ্লাস। শুধু জল? স্বাতী তাড়াতাড়ি জল এনে দিল ডালিমের কুঁজো থেকে। জল খেয়ে সন্তোষে বলল—আর দেরি না, চলো। তখন স্বাতী বলল, কিন্তু—আমি ভাবছি—

তোমার বাবার কথা ভাবছ? সত্যেন ঠিক আন্দাজ করল—অর্ধেকটা ঠিক—তিনি এসে পড়বেন এখনই। আপিশ সব ছুটি। স্বাতীর মুখ উজ্জ্বল হল—তাহলে, একটু দেরি করলে হয় না? বাবাকে বলে যেতে চাও? সত্যেন এবার ধরল পুরো কথাটা, আর আবার একটা ধাক্কা লাগল তার মনে। আজকের দিনেও নড়চড় হতে পারবে না কেনো নিয়মের? দৈনন্দিন বাধ্যতাকে একটু ভোলা যাবে না কোথাও? ভাবতে হবে অন্য সব দিনের মতোই অন্য সব কথা? কিন্তু সে তো আর কিছু ভাবেনি... ভিড়ের মধ্যে বেঁকে বেঁকে বেরিয়েই দৌড়ে বাস ধরে ছুটে এসেছে জোড়াসাঁকো থেকে টালিগঞ্জ, তক্ষুনি আবার টালিগঞ্জ থেকে জোড়াসাঁকো ছুটবে বলে। কিন্তু কেন? প্রশ্নটা সত্যেনের মনে উঠেই মিলিয়ে গেল, নিজের সঙ্গে সওয়াল-জবাবের অবস্থা তার নেই এখন, সময়ও না। বলল—তোমার বাবা কিছু বলবেন না, আমি জানি।

আমিও জানি।

তবে? স্বাতী জবাব দিলো না। সত্যেন বলল—তাহলে তুমি বরং থাকো। কিন্তু আমি আর

থাকতে পারছি না। স্বাভী তক্ষুনি বলল—না, আমিও যাবে। ছুটে ভিতরে গেল, দু-লাইন চিঠি লিখে বামের মার হাতে দিল বাবার জন্যে, বদলে নিল জামা আর জুতো, হাতে নিল ব্যাগ, আর সত্যেন রায়ের সঙ্গে রাস্তায় নেমে প্রথমেই লক্ষ করল যে দিনটি এখনো তেমনি সুখী আর সুখী আর উজ্জ্বল।

কালিঘাটের আগেই ভরতি হয়ে গেল বাস। তবু উঠছে... কলেজের ছেলে, মেয়ে, স্কুলের ছেলে, দোকানদার, বেকার, আড্ডা দিয়ে দিন কাটানো ছোকরা। দম আটকে আসে, এমন ভিড়। কিন্তু স্বাভীর লেডিজ সিট নিরাপদ— আর সে বসেছে জানলাধারে, একমনে বাইরের দিকে তাকিয়ে। রাস্তায় বিকেলের মতো লোক, দলে দলে চলেছে স্কুলছেলেরা, হুপ্পা নেই। বুড়োমতো অনেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেন কিছুই করবার নেই... যে দোকানেই রেডিও চলছে তার সামনেই ভিড়। আর মোড়ে মোড়ে ছোটো ছোটো ভিড় কোনো একটা বাস-ট্রামে উঠতে পারার আশায়। সিনেমার দেয়াল-ছবি কালো কাগজে কাটা পড়েছে, দরজা বন্ধ। মেয়েরা, খোলা চুলে, বাচ্চা কোলে, দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়, জানলায়, দেখে নিচ্ছে যতটা সম্ভব রাস্তাটাকে। রাস্তাতেই আজ সকলের চোখ, সকলের মন।

মেঘলা হয়ে এল দিন, চৌরঙ্গিতে আসতে আসতে বৃষ্টি নামল। কিন্তু এসপ্লানেডে এসে বাস দাঁড়াল যখন, আবার জুলজুলে রোদ আর সেই ভিজেনরম আলোয় স্বাভী দেখল ভিড়ের এক আশ্চর্য আলোড়ন, এসপ্লানেডের পক্ষেও আশ্চর্য। স্যুটপরা আপিশচাকুরে, কালোকোর্তা উকিল, ছাতাহাতে আধবুড়ো বাবুরা, ছিপছিপে ছোকরাকেরানি, ইংরেজ, চিনে, মাদ্রাজি, পাঙ্গি, পার্শি— চৌরঙ্গি, ধরমতলা, কার্জন পার্ক, কর্পোরেশন স্ট্রীট— সব দিক থেকে আসা যাওয়া করছে সকলে। কিন্তু কোথায় যাচ্ছে ঠিক যেন জানে না, একটু যেন দিশেহারা। আপিশ ছুটি হলেনই সোজা বাড়ি ফিরতে হবে, এই মুখস্থ কথাটা অনেকেই যেন ভুলে গেছে। দেখতে যতই ছিন্নভিন্ন হোক, কলকাতার ভিড় কখনই লক্ষ্যহীন নয়, প্রত্যেকে জানে কোথায় যাচ্ছে আর কেন যাচ্ছে। কিন্তু সেই লক্ষ্য, লক্ষ্যের নিশ্চয়তা আজ হারিয়ে ফেলেছে সবাই— আর সেইজন্যই আশ্চর্য, অদ্ভুত এই ভিড়। সোজা দাঁড়িয়ে সোজা তাকিয়ে আছে কেউ, কেউ মিছিমিছি হাঁটছে, কেউ হুপ্পা যেন মনস্থির করে বারকয়েক পা ফেলেই থেমে যাচ্ছে আবার, কেউ কাগজ পড়ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, আর তার ঘাড়ের উপর দিয়ে গলা বাড়িয়েছে আরো দু-তিনজন। এইমাত্র গোল্‌ফ কাগজের স্পেশল—হাতে হাতে উজাড় হয়ে যাচ্ছে।

সত্যেন, স্বাভীর পিছনে বসে, হাত বাড়িয়ে কাগজ কিনল। একবার তাকিয়েই স্বাভীকে দিল। স্বাভী একবার তাকিয়েই রেখে দিল কোলের উপর। তার পাশে বসেছিল যে বছর পনেরোর মেয়েটি, অনুমতি না নিয়ে সেটা হাতে নিল, তার চোখ নড়তে লাগল উপর থেকে নিচে, আর সেই চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়তে লাগল কালো-কথা-ছাপানো কাগজটার উপর, ছাপাখানার কাঁচা-কালি মুছে মুছে দিয়ে। জোড়াসাঁকোয় প্রায় খালি হয়ে গেল বাস। সকলে ছুটল দ্বারকানাথের গলির দিকে, কিন্তু সত্যেন রাস্তা পেরোতে গিয়ে থমকাল। দেখে গেল মানুষের জাঙাল—হল কী? কেউ নেই যে? —এর মধ্যে নিয়ে গেল? তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল কথাটা। হ্যাঁ, নিয়ে গেছে... দেখতে চান তো কলেজ স্ট্রীটে—বলতে বলতে চলে গেল একজন।

স্বাভী আগে কখনো আসেনি চিৎপুরে, অবাক হয়ে দেখছিল গলির মতো রাস্তায় ট্রাম-বাস-

এর ঠেলাঠেলি। আবার ওই মধ্যে আরো গলি, প্যাচালো, অন্ধকার, উঁচু-উঁচু বাড়ির আকাশঢাকা ঘেঁষাঘেঁষি; ফুটপাতে অদ্ভুত ভিড় আর অদ্ভুত সব জিনিসের দোকান! প্রায় ভুলেই গিয়েছিল কেন এসেছে, মনে পড়ল সত্যেনের কথায়—নিয়ে গেছে, চলো কলেজ স্ট্রীট। হাঁটতে পারবে না তাড়াতাড়ি? নামমাত্র ফুটপাতে গায়ে গায়ে ধাক্কা বাঁচিয়ে দ্রুতনিঃশব্দ হাঁটতে লাগল দুজন। ক-মিনিট পরে বেঁকল বাঁয়ে, ঢুকল মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে। কলকাতার এসব পাড়া—স্বাতীর মনে হল—যেন অন্য দেশ, অন্য জগৎ। এর আলো, হাওয়া, এর গন্ধ পর্যন্ত অন্যরকম। এদিক ওদিক তাকাতে চাইল, কিন্তু ভাল করে দেখতে পারল না—এত তাড়াতাড়ি হাঁটছিলেন সত্যেনবাবু। লম্বা, বাঁকা, অন্ধকার মুক্তারামবাবু স্ট্রীট কর্নওআলিস স্ট্রীটে শেষ হল, আর একটু পরেই দেখা গেল কলেজ স্ট্রীট-হারিসন রোডের মোড়। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের ছাতে-ঢাকা ফুটপাতে সত্যেন দাঁড়াল, একটা জুতো-দোকানের সিঁড়িতে উঠল। আরো অনেকে দাঁড়িয়েছে সেখানে, বেশির ভাগ কলেজের ছাত্র। মুখে মুখে শোনা গেল, এক্ষুনি এসে পড়বে। সত্যেন বলল—কষ্ট হল তোমার হাঁটতে?

না।

মনে হচ্ছে কি, না এলেই পারতে?

না। কথা ফুরোল ওখানেই, আবার দুজন চুপ। উল্টোদিকে একটা একতলা দোকানঘরের কার্নিশছাড়া বিপজ্জনক ছাতে কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে ক্যামেরা তাক করে। পাশের দোতলার বারান্দায় মেয়েদের, বাচ্চাদের ভিড়, আশেপাশে একটা জানলা নেই, যেখানে তিন-চারটি করে মুখ না বেরিয়ে আছে, আর রাস্তায় কেউ চলছে না, সকলেই দাঁড়িয়ে। সত্যেন আবার অনুভব করল মনের উপর সেই অপেক্ষার, সেই বোবা অপেক্ষার চাপ। আসছে.... আসছে.... গুনগুন রব উঠল ভিড়ের মধ্যে।

স্বাতী মনে মনে ভাবছিল লম্বা, গম্ভীর, আনন্ত, আচ্ছন্ন, স্তব্ধ, মধুর মিছিল, কিন্তু মাত্রই কয়েকজন যেন অত্যন্ত তাড়াহড়ো করে নিয়ে এল কাঁধে করে—নিয়ে গেল উত্তর থেকে দক্ষিণে—পিছনে এলোমেলা অল্প লোক— বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে মিলিয়ে গেল স্বাতীর চোখের সামনে দিয়ে—রোদ্দুরে ঝিলিক দিল লম্বা সাদা চুল আর মস্ত সাদা শাস্ত্র, তন্ময় কপাল। একটু দেখল স্বাতী, আর দেখতে পেল না। সত্যেন দেখল, স্বাতী দাঁড়িয়ে আছে শক্ত সোজা হয়ে, হাত মুঠো করে, ঠোটে ঠোট চাপা, দেখল তার কণ্ঠের কাঁপুনি, ঠোঁটের কাঁপুনি, গালের ঘন রঙ... দেখল তার তরল কালো উজ্জ্বল চোখ দুটি আরো উজ্জ্বল হল, বকঝক দুটি আয়না হয়ে উঠল, তারপর ভাঙল আয়না, আবার তরল হল, উপচোল, মাথা নিচু হল। আর তাই দেখে সত্যেনেরও নতুন করে গলা আটকাল, চোখ ঝাপসাল, আর সেজন্য লজ্জা করল নিজের কাছেই। এ মৃত্যু তো কাল্লা চায় না। এই দুঃখ, এই মহান, মহামূল্য দুঃখ, আশি বছরের পরম পরিশ্রমের এই সবশেষের রত্ন—এ কি চোখের জলে বাজে খরচ করবার?

চলো এখন— সত্যেন কথা বলল। সে যে কাঁদছিল তা লুকোবার চেষ্টা করল না স্বাতী, আঁচলে চোখ মুছল, কাশল একবার, একটু ভাঙা গলায় বলল—চলুন।

কিন্তু ট্রাম-বাস আকণ্ঠ। নানা রাস্তা দিয়ে, নানা রাস্তা ঘুরে সবাই ছুটেছে নিমতলার দিকে। অসহায় দাঁড়িয়ে রইল দুজনে, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ধরে এল। স্বাতী বলল—হাঁটলে হয় না? একটু এগিয়ে গেলে হয়ত—

একটু এগোলে কিছু হবে না। এক যদি এসপ্লানেড পর্যন্ত—

এসপ্লানেড কি খুব দূর? স্বাতী, এ-অঞ্চলের ভূগোল-বিষয়ে অনিশ্চিত, জিগেস করল।

তেমন আর দূর কী—সোৎসাহে বলল সত্যেন—চিত্তরঞ্জন অভিনিউ দিয়ে... হাঁটবে তাহলে? বেশ তো।

কলুটোলা পার হয়ে চিত্তরঞ্জন অভিনিউয়ে পৌঁছতেই আকাশ কালো করে আবার বৃষ্টি নামল একেবারে হঠাৎ। একটা পোর্টিকোর তলায় আশ্রয় নিল তারা। ঘোর বৃষ্টি, জোর নামল, ঝমঝম, আর সেই বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে চলে গেল একদল শান্ত নিঃশব্দ, গম্ভীর মম্বুর চীনে। প্রত্যেকের মাথা নিচু, প্রত্যেকের হাতে ফুল, প্রত্যেকের খালি পা। যতক্ষণ দেখা গেল স্বাতী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল তাদের। তারপর বলল—কী সুন্দর এরা! সত্যেন মাথা নেড়ে সাই দিল।

যাচ্ছে কোথায়?

নিমতলায়...নিশ্চয়ই।

নিমতলার নাম শুনেছিল স্বাতী, তাই বুঝল।—আপনি যাবেন না?

যেতাম—কিন্তু...

আমি বুঝি যেতে পারি না সেখানে?

তুমি যেতে পার, কিন্তু আমি নিয়ে যেতে পারি না।

কেন?

ভাবতে পার না কী ভিড়! স্বাতীর ভাল লাগল না কথাটা। মনে হল আজকের দিনেও সত্যেনবাবু বড্ডো সাবধানী, ধরাবাঁধা, বড্ডো নিয়ম মেনে চলা। এদিকে বৃষ্টি থামে না। আর একটি দল এল—সাহেব পাদ্রি, দাড়িওলা বুড়ো বুড়ো, লম্বা সাদা আলখাল্লা পরনে, হাতে ফুল, মুখে শান্তি, চোখে প্রার্থনা। ভিজে ভিজে চলে গেল। বৃষ্টি কমল, বৃষ্টি থামল, ফেঁটা ফেঁটা বৃষ্টিতে আবার রওনা হল তারা, ফেঁটা ফেঁটা বৃষ্টি... হাতে, ঠোটে, মাথায়। রোদ ফুটল, ভিজে কালো রাস্তায় চিকচিকোল বিকেলবাঁকা হলদে রোদ, ভিজে নরম হাওয়ায় ঝলমলাল।

সত্যেন বলল—ক্লান্ত লাগে তো বল, এখানে বাসে ওঠা যেতে পারে মনে হচ্ছে। স্বাতী বলল—বেশ তো লাগছে হাঁটতে। কথাটা বলেই অনুতাপ হল, অপরাধী লাগল, আজকের দিনে এরকম সময়ে কারও কি কিছু 'বেশ' লাগতে পারে? না কি লাগলেই কেউ মুখে বলে 'জী' আড়চোখে স্বাতী তাকাল সত্যেন রায়ের মুখের দিকে, কিন্তু বেশ-লাগার বিসদৃশতা শোকাচ্ছন্ন অধ্যাপক যেন লক্ষ্যই করলেন না, বরং খুশি গলায় বললেন—তাহলে আর কী! আবার চুপচাপ হাঁটল দুজনে, কিন্তু জোড়াসাঁকোয় বিফল হয়ে মুক্তারামবাবু স্ট্রীট দিয়ে যেমন চুপচাপ হেঁটেছিল, সে রকম না। তখন গতি ছিল দ্রুত, গলি ছিল সরু, মন উৎকণ্ঠ, আর এখন চোখের সামনে চিত্তরঞ্জন অভিনিউর উদার ঝঞ্জুতা—মস্ত চওড়া দিলখোলা রাস্তা, নিরিবিলি, ট্রাম নেই, মোটরগুলো যেন আলগোছে ভেসে যাচ্ছে চুপচাপ, দুধারে মস্ত উঁচু উঁচু বাড়ি, কিন্তু আরো মস্ত, আরো অনেক উঁচু এখানে আকাশ, আর রাস্তা এত ছড়ানো যে বাড়িগুলিকে হালকা লাগে—দুধারের বাড়ি যেন দু-পাড়ার—আর সমস্ত রাস্তাটির উপর কাঁপছে, দুলছে, জ্বলছে বৃষ্টিধোয়া হলদে-সবুজ বিকেলের স্বচ্ছ, সূক্ষ্ম আভার একটি পরদা। আস্তে চলছে তারা, এখন আর তাড়া নেই... কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের জুতোদোকানের বারান্দায় পরমক্ষণ কেটে গেছে, কানে কানে টানা মনের ছিলা এখন টিলে। এখন সময় আছে তাকিয়ে দেখার—বিকেলের দিকে,

আলোর দিকে, সুন্দর, উজ্জ্বল আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখার। অস্পষ্ট একটা সুখ মনের মধ্যে অনুভব করল স্বাতী। একটু পরে তাব অপরাধবোধও থাকল না, কিন্তু মনের এই হাওয়াবদলের খবর নিজেই জানল না যেন, ভাবল না কিছু, বিশেষ কিছু ভাবল না, আস্তে ডুবে গেল নতুন সুখচেতনায়। আর সত্যেন—কবিতা-পাগল মানুষ, আবাল্য রবীন্দ্রপূজক, সেও অনুভব করল অস্পষ্ট একটা সুখ। রবীন্দ্ররহিত বাংলাদেশে শোকোচ্ছ্বাসী কলকাতার উপরে যেমন এই মুহূর্তে আকাশের বিকারহীন তোরণে নীলিমার নিশান উড়ল, তেমনি এখন তার মনেও ঐতিহাসিক শোকের গভীর কালো কবরটাকে ঢেকে দিল বর্তমানের, উপস্থিতির, জীবন্ত মুহূর্তের সবুজ—আর এতই সহজে যে সে নিজেই তা বুঝল না। এই আবছা-চেতন ভাললাগাটা দুজনেই মেনে নিল নিঃশব্দে—নিজেরটা... আর অন্যজনেরটাও। এর আগে তারা কথা বলেনি বলবার কিছু নেই বলে, আর এখন বলল না, যেহেতু দরকার নেই।

* * * * *

এসপ্লানেডে এসে আবার চাকার চিৎকার, জনতার আবর্ত, ছুটোছুটির ধাক্কা। অনেক থেমে থেমে রাস্তা পার হল। চৌরঙ্গিতে এসে সত্যেন বলল—চা খাবে?

আপনি তো কিছু খাননি সারাদিন—স্বাতীর মনে পড়ল।

তোমার দেরি হয়ে যাবে যদি মনে কর—

কত আর দেরি হবে?

তার মানে—ভীষণ দেরি হয়ে গেছে এমনিতেই?

একথায় স্বাতীর মনে পড়ল যে বাড়ির কথা, বাড়ি ফেরার কথা, বাবার কথা এতক্ষণের মধ্যে একবার তার মনে পড়েনি। বাবা কী ভাবছেন? কতক্ষণ বেরিয়েছে? বেজেছে ক-টা? হোয়ইটওয়ে লেডলর ঘড়ি দেখার চেষ্টা করল, কিন্তু এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে—যাকগে। বলল—কোনটাতে যাবেন?

সারি-সারি ছোটো-ছোটো রেস্টোরাঁ, প্রত্যেকটা বোঝাই। মাঝখানে বড়ো একটা ইংরেজ হোটেল, রাস্তার দিকটা ঘষা কাচে আঁক করা, রবর-মোড়া সিঁড়ি—সেইটিতে ঢুকে পড়ল স্বাতী। সত্যেন। রাস্তার আলোভিড়গোলমালের উথালপাতাল থেকে হঠাৎ চলে এল মসৃণ, শব্দহীন, প্রশস্ত, গভীর অন্ধকারে। আবার একটা নতুন গন্ধ পেল স্বাতী, কেমন একটা বিলেতি গন্ধ, শুকনো হালকা, গরম করা গন্ধ—অচেনা, কিন্তু ভালো... ভালো। ফাঁকা ফাঁকা টেবিলের ধার দিয়ে দিয়ে একটা কোণ-টেবিলের দিকে যাচ্ছিল তারা, হঠাৎ 'এই' 'এই' আওয়াজ দিল একটা টেবিলে একলা বসা একজন। সত্যেন দাঁড়াল, হাত তুলল নমস্কারে। কিন্তু কোনো প্রত্য্যভিবাদন না করে ভদ্রলোক বললেন—কোথেকে? নিমতলা?

না, ও-পর্যন্ত আর—স্বাতী, চিনতে পারছো ঐকে—

স্বাতী চিনেছিল। কালো, অপ্রসন্ন, উশকোখুশকো ধ্রুব দস্ত বসে আছেন চেয়ারের মধ্যে ছড়িয়ে, আস্পুলের ফাঁকে সিগারেট, সামনে গেলাশে ফিকে ব্রাউন পানীয়, যে রকম—হঠাৎ ঝলসাল স্বাতীর মনে—যে রকম সে দেখেছিল চাং-আন রেস্টোরাঁয় বড়োমতো ফিরিসির সামনে। সত্যেনবাবুর নমস্কারের ব্যর্থতা লক্ষ্য করে সে আর অনুরূপ কোনো চেষ্টা করল না, শুধু মুখের নম্র ভাব দিয়েই বোঝাতে চাইল যে এই যশস্বীর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য একবার তার হয়েছিল। কিন্তু সেটুকুরও দরকার ছিল না, ধ্রুব দস্ত লক্ষ্যই করলেন না তার উপস্থিতি। সত্যেনের

দিকে তাকিয়ে বললেন—কেমন দেখলেন হায়-হায় কাণ্ড, হৈ-হৈ ব্যাপার? সত্যেন তখনই কোনো জবাব বুঁজে পেল না এ-কথার, আর ধ্রুব দত্ত তখনই আবার আরম্ভ করলেন—রবীন্দ্রনাথের জন্য দুঃখ হচ্ছে আমার। এত চেষ্টা করলেন ইওরোপে মরতে, এতবার বললেন, লিখলেন সে-কথা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত... আমার এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি! তেতো, ছোট্টো হাসলেন ধ্রুব দত্ত, আর সেই মস্ত ফাঁকা রেস্তোরাঁয় আবছা আলোর চূপচাপের মধ্যে বড্ডো চড়া আর কর্কশ শোনালা তাঁর কণ্ঠ। সত্যেন কিছু বলতে যাচ্ছিল বোধহয়, কিন্তু পলকে বুঝে নিল যে ইনি কিছু শুনতে চান না, নিজের মনের জমানো কথাগুলো উগরোতে চান শুধু—সিগারেটে টান দিয়ে, কিন্তু পানীয়টাকে তেমনি ফেলে রেখে, একটু ঠোট বেকিয়ে বলতে লাগলেন কবি—আমি বেরিয়েছিলাম, অনেকক্ষণ ঘুরলাম রাস্তায়-রাস্তায়, তারপর টিকতে না পেরে ঢুকে পড়লাম এখানে। ওঃ, কী একটা সুযোগ! যারা ‘কথা ও কাহিনী’ ছাড়া কিছু রবীন্দ্রনাথ পড়েনি, পড়লেও বোঝেনি, বুঝলেও মানেনি, আর যে সব ধূর্ত, নির্বোধ, ধুরন্ধর তেলতেলে ঠোটে ‘গুরুদেব’ আওড়ায়, অথচ যাদের সমস্ত অস্তিত্বটাই রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধতা আর সেইসব অসংখ্য হুজুগনাচুনিরা, যারা সারা জীবনে কখনো জানবে না, জানতে চাইবে না, রবীন্দ্রনাথ কী, কেন, কেমন... সেই দেশসুন্দু সঙ্কলের কী একটা সুযোগ আজ! দশটা আই. এফ. এ. ফাইনালের সমান, একশোটা কানন-সাইগল একসঙ্গে! কাগজগুলাদের পৌষ্যমাস, মিটিংগুলাদের মরশুম, ব্যবসাদারি বড়কর্তাদের নাম-ফাঁপানো হুলা! কী উৎসাহ, কী হট্টোপুটি, কী ফুর্তি! রবীন্দ্রনাথের বেঁচে থাকা বা না-থাকায় কিছুই যাদের এসে যায় না, এই শোকের হোলিতে চরম মেতেছে তারাই! হাঃ! থেমে থেমে, প্রত্যেকটি কথা ভেবেচিন্তে, চড়া, কড়া, কর্কশ গলায় পূর্বসূরীর অস্ত্যোষ্টিভাষণ উচ্চারণ করলেন উত্তরসাধক, শেষ কণ্ঠধ্বনির পরে ঠিক জায়গায় থামলেন, সামনে ঝুঁকে হাত বাড়ালেন, অন্তঃস্থ করলেন কিঞ্চিৎ পানীয়, তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন এ বিষয়ে আর কিছু তাঁর বলবার নেই।

সত্যেন কথাগুলি শুনছিল চুপ করে, শুনতে-শুনতে গম্ভীর হল তার মুখ, তারপর বিষন্ন, এমনকি একটু ব্যথিত হল। একটু পরে বলল—আচ্ছা, তাহলে—হাত তুলল বিদায় জানিয়ে। আপনারা—ধ্রুব দত্ত হঠাৎ তাকালেন স্বাতীর দিকে, যেন এইমাত্র দেখতে পেলেন—এখানেই বসুন না। অস্বস্তি হল স্বাতীর, এর আগে সত্যেনবাবুর ঘরে এঁকে দেখে যেমন হয়েছিল তার চেয়েও বেশি, মুখ ফেরাল তখনই, তবু অনুভব করল মুখের উপর হঠাৎ জ্বলজ্বলে চোখ—আর তার ভয় হল যে সত্যেনবাবু না ও-টেবিলেই বসে পড়েন, তাই নিজেই এগিয়ে গেল কয়েক পা। আমরা একটু ওদিকে—বলে সত্যেনও এগোল। অনেকটা দূরে কোণখোঁষা টেবিলে দুজনে বসল যখন, নিপুণভাবে চা ঢেলে, নিঃশব্দে চুমুক দিয়ে বা হাতে একটি স্যাণ্ডউইচ খুলে স্বাতী বলল—তার পক্ষে একটু বেশিই গরম সুরে বলল—কবি হতে পারেন, বিখ্যাত হতে পারেন, কিন্তু মানুষ ভাল না! সত্যেন তখন পর্যন্ত ধ্রুব দত্তের কথাই ভাবছিল, একটু হেসে বলল—ভালমানুষ? মনের কথা যে মুখে বলতে পারে না, অন্যায়ের প্রতিবাদ পারে না, যার চক্ষুলজ্জা বেশি, সংসাহস কম, আর সেইজন্য অন্যেরা যাকে যেমন-তেমন ব্যবহার করে—সেই তো ভালমানুষ? বলতে বলতে নিজের কথাই মনে পড়ল সত্যেনের, ধ্রুব দত্তের কথার উত্তরে কিছু তার বলবার ছিল, বলা উচিতও ছিল, কিন্তু কিছুই বলতে পারেনি—আর এ রকম নিতাই ঘটে তার জীবনে, মনে-মনে অনেক কষ্ট পায় সে জন্য। না, তা কেন—স্বাতী

প্রতিবাদ করল। নিজে কষ্ট পেলেও অন্যকে যে আঘাত করে না, সে-ই ভালমানুষ। বলেই
নে পড়ল নিজের বাবাকে—কিংবা বাবাকে ভেবেই কথাটা বলল।

সত্যেন তাকাল স্বাতীর দিকে, একটু তাকিয়ে থাকল। আবেগের উষ্ণতার রং লেগেছে তার
মুখে, এতক্ষণের হাঁটাচলায় ঈষৎ বিশ্রান্ত চুল, চোখে আত্মবিশ্বাসের ঝঙ্কুতা। এতদিনের মধ্যে
এই প্রথম এত স্বাধীনভাবে কথা বলল সে। এই সেদিনও একটা বাধো বাধো ভীর্ণভাব ছিল
প্রোফেসরের সামনে। এবার শিলং থেকে এসে অবধি বদল দেখছে সত্যেন—শিক্ষকের প্রাপ্য
সম্মিহ মুছে গেছে মন থেকে—যদিও সপ্তাহে একদিন কলেজের অনার্স-ক্লাশে রীতিমতো দেখা
হচ্ছে আজকাল। সত্যেন চেষ্টা করেছে সেটা লক্ষ্য না করতে—অন্তত স্বীকার না করতে—
কিন্তু এই মুহূর্তে স্বাতীর এই স্বচ্ছন্দ, প্রাণবন্ত প্রতিবাদে সেটা স্পষ্ট, মূর্ত, সংজ্ঞায় হয়ে উঠল,
সংজ্ঞাত হল সত্যেনের মনে—চোখ সরিয়ে নিল সে, চোখ নামাল চায়ের পেয়ালায়। আমি—
আমিই কি বজায় রেখেছি শিক্ষকের মাত্রা-মাপা সৌজন্য? এই দূরত্বলোপে, এই অস্তুরালমোচনে
আমিও কি সহকর্মী নই, আমিই কি দায়ী নই, উদ্যোক্তা নই? কী করছি আমি, কোথায় চলেছি?
কেন ছুটেছিলাম উর্ধ্বশ্বাসে জোড়াসাঁকো থেকে টালিগঞ্জ, অন্নাত, অভুক্ত, শোকাচ্ছন্ন
দুপুরবেলায়? রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু!—সে কি আমার পক্ষে এমন একটা ঘটনা নয়, যা আমাকে
তখনকার মতো ভুলিয়ে দেবে অন্য সব, সব চেষ্টা, ইচ্ছা, উৎসাহ? তবু তো শেষ নিশ্বাস যখন
পড়ল, শেষ প্রণাম করে যেই বেরিয়ে এলাম, তক্ষুনি আমার মনে পড়ল—ওকে। মনে হল
আজকের এই মহান অভিজ্ঞতার অংশ ওকে দিতেই হবে, আর সেটা আমার কর্তব্য, আমারই
দায়িত্ব...কিন্তু কেন?... কিন্তু কেন?—কেমন একটা লজ্জায়, বিক্ষোভে, আত্মপীড়নে মাথা নুয়ে
পড়ল সত্যেনের, আর সেই ভাবটা লুকোবার জন্য চায়ে চুমুক দিতে লাগল ঘন-ঘন।

সত্যেনের এই অনুচিন্তনের সমস্তটুকুতে কয়েক সেকেন্ডের বেশি সময় লাগল না। স্বাতী তাই,
তার সঙ্গীর কোনো ভাবান্তর না বুঝে পরের কথাটি তেমনি স্বচ্ছন্দে বলল—নিজের দেশে
বুঝি কিছুই ভাল দেখতে পান না উনি? সত্যেন হঠাৎ বুঝল যে ধ্রুব দণ্ড নিছক সত্য বলছেন,
তঁার শোক অনেক বেশি পবিত্র, তাঁর রবীন্দ্রভক্তি অনেক বেশি নিষ্কাম আর কথাগুলি সত্য
তার—সত্যেনের—যে খারাপ লাগছিল তার কারণ তার সাময়িক ভাবানুতা, তার কারণ তার
মনেও আজকের গণোন্মাদের সংক্রমণ। মুখ তুলে বলল—ভাল না থাকলেও ভাল দেখতে
হবে? কিন্তু... স্বাতী তর্ক তুলল—দেশের দোষ তিনি যেমন বোঝেন নিজের দোষও কি তেমনি?
নিশ্চয়ই! মৃদু হাসল সত্যেন। পর-পর তাঁর চারখানা কবিতার বই-ই তো তার প্রমাণ। নিজের
প্রতিটি দোষ কাটিয়ে ওঠার, নিজেকে প্রত্যেকবার ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টায় কখনো তাঁর ক্লান্তি
নেই। আর বোঝো তো, প্রায় মাস্টারি সুর লাগল শেষ কথাটার, নিজের দোষ নিজে দেখতে
পাওয়া কত শক্ত, আর কত কষ্টের!

লেখার কথা জানি না, কিন্তু তাঁর নিজের দোষ যে কত তা কি তিনি বোঝেন?

নিজের দোষ মানে? আর তাঁর কথা তুমি জানই বা কী? এবার প্রায় কঠোর হল সত্যেন।
স্বাতী হঠাৎ জিগেস করল—উনি যেটা খাচ্ছেন সেটা কী?

উনি ওসব...ওসব ব্যবহার করেন বোধহয়— সত্যেন গম্ভীর জবাব দিল।

স্বাতী থামল একটু। সে যা ভেবেছিল, কিন্তু ভাবতে চায়নি, তা-ই তাহলে সত্যি! কবি ধ্রুব
দণ্ড বসে-বসে তাই খাচ্ছেন, সোজা বাংলায় যাকে বলে মদ? মাঝারি ঘরের সব বাঙালি মেয়েরই

মতো স্বাতী ছেলেবেলা থেকেই ঐ বস্তুটাকে বিভীষিকা বলে জেনেছে—আর যদিও সম্প্রতি বিদেশী বইয়ে এর একটা অন্যরকম ছবিও সে পেয়েছে, তবু সেটা যেন অন্য জগতের, ইংরেজিতেই ভালো শোনায়, বাংলায় কথাটা শুনেই তার গা শিউরে ওঠে। শুনেছে অনেক, শরৎচন্দ্রও পড়েছে, ফিল্মও দেখেছে, কিন্তু জলজ্যাস্ত একজন মানুষকে বসে-বসে মদ খেতে চাক্ষুষ দেখল বলতে গেলে এই প্রথম। আর সে মানুষ কে? একজন কবি। আর সময়টা কখন? যখন কয়েক ঘণ্টা আগে কবিতার হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে গেছে, আর সমস্ত দেশ আত্মহারা... চমৎকার সময় এ-সবের! মনের কথাটা সে মুখে বলে ফেলল। আমরাও তো চা খাচ্ছি বসে বসে, সত্যেন মৃদুস্বরে বলল—ওতে কী আছে? স্বাতীর ভাল লাগল না সত্যেনবাবুর মুখে ধ্রুব দন্তর এই সমর্থন। উনি নিজেও কি ঐ দলে? উনিও কি মাঝে মাঝে ব্যবহার করেন ও-সব? কবিতা ভালো, কবিতা খুব ভালো, কিন্তু বোকারা যা রটায়, তারও কি কোনো ভিত্তি আছে তাহলে—কবিতা যারা বানায়, কবিতা নিয়ে দিন কাটায়, তারা কি সকলেই একটু ... একটু?

তাছাড়া— সত্যেন আবার বলল—কাউকেই কিছু বলবার থাকলে সামনেই বলতে হয়, আমরা এখন যা করছি তাকেই ইংরেজিতে বলে ব্যাকবাইটিং, আক্ষরিক অর্থেই তা-ই—বলে তাকাল অনেকগুলি ফাঁকা টেবিল পেরিয়ে ধ্রুব দন্তর পাঞ্জাবি-ঢাকা পিঠের দিকে। স্বাতী অনুসরণ করল সত্যেনের দৃষ্টি। সে যেখানে বসেছিল, সেখান থেকে মুখেরও একটুখানি দেখা যাচ্ছিল, আর পোঁচিয়ে-ওঠা সিগারেটের ধোঁয়া, আর মাত্র ওটুকু থেকেই স্বাতী বুঝে নিল যে ভদ্রলোকের সমস্ত মন এখন একান্তনিবিষ্ট সামনে রাখা ঐ গেলাশটার উপর। যেন ধাক্কা খেয়ে সরে এল তার চোখ, পড়ল সত্যেনের অন্যমনস্ক মুখে, দেখল সে মুখে সরলতা, সততা, শাস্তি... দেখল বিশ্বাসের আশ্রয়, 'শ্রুততার আশ্বাস—আর একটু আগে কবিভাবের মানুষদের বিষয়ে যা ভেবেছিল তার জন্য অনুশোচনায় মেঘলা হল চোখ, আর সেটা মিথ্যা জেনে চোখের মেঘ কেটে গেল। সত্যেন, যেন তার দিকে স্বাতীর চোখের নিবিড়তা বুঝতে পেরেই ফিরে তাকাল, আর স্বাতী চোখে চোখ পড়তেই হেসে ফেলল—আকস্মিক, অবাস্তব, এমন কি একটু অসংগত হাসি।

সত্যেন ভুরু কঁচকে বলল—কী?

কিছু না। আপনার সব কথাই ঠিক, কিন্তু একটা কথা আমি বলবই—ভদ্রলোকের চোখের তাকানোটা ভালো না, বলে আর একবার তাকাল ধ্রুব দন্তর পিঠের দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে ধ্রুব দন্ত উঠলেন কোনো দিকে না তাকিয়ে, লম্বা শরীরে একটু কঁজে হয়ে; দ্রুত বেরিয়ে গেলেন কেমন এলোমেলো, অস্থির, লক্ষ্যহীনভাবে। সত্যেন তাকিয়ে থাকল ঐ চলে যাওয়ার দিকে, তারপর বলল—এটা একেবারেই ভুল বললে। ওঁর চোখেই তো ওঁর প্রতিভা—কিন্তু এ কথা আর না, অন্য কিছু বলো। কিন্তু স্বাতী তখন ধ্রুব দন্তর অভদ্র চোখের কথাই ভাবছিল।

সত্যেনই অন্য কথা পাড়ল—ডালিমকে দেখেছিলে তখন?

ডালিমকে? কখন?

যখন কলেজ স্ট্রীটে দাঁড়িয়েছিলাম। একটা বাসে ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছিল। আমাদের দ্যাখনি, বেশ ছেলে ডালিম। শেষের কথাটা খামকা শোনাল—মানে, যথেষ্ট শোনাল না স্বাতীর কানে। জিগেস করল—কেন? বেশ কেন? সত্যেন একটু দেরি করে জবাব দিল—কোনো কারণে নয়, এমনি। ধ্রুব দন্ত সেখান থেকে চলে যাওয়াতে স্বাতীর স্বাচ্ছন্দ্যবোধ সম্পূর্ণ হয়েছিল, চেয়ারে

হেলান দিয়ে আরামে বসে বলল—কাউকে বরবাদ করার যে-কটা উপায় আছে তার মধ্যে একটা হল ঐ ‘বেশ’ কথাটা।

সত্যেন হেসে বলল—অন্যের মুখে ‘বেশ’ শুনতেও ভাল লাগে না—না?

তার মানে?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সত্যেন বলল—আর, তোমার বড়দি, তিনি কেমন আছেন?

বড়দির কথা আপনি মাঝে-মাঝেই জিগেস করেন, কেন বলুন তো?

মাঝে-মাঝেই মনে পড়ে বলে।

কিন্তু কতটুকুই বা দেখেছেন আপনি ওঁকে!

সেইজন্যই বোধহয়।

বেশি দেখা হলে মনে পড়ে বুঝি কম? স্বাতী খুব যুক্তিসংগত প্রশ্ন করল একটা।

যেটা নেই, সেটাই আমাদের মনে পড়ে। যেটা আছে, সেটা তো আছেই।

স্বাতী বলল—তাহলে তো ‘নেই’-টাই ভাল!

কেন? মনে পড়াটাই ভালো বুঝি? স্বাতী একটু ভাবল। তার তরুণ জীবনে একটুখানি যে স্মৃতির চর পড়েছে, সেই নতুন নরম মাটির গন্ধ নিল মনে মনে। বলল—ভালো না? খুব ভাল। আর এটা?

কোনটা?

যেটা আছে... হচ্ছে।

কী জানি! স্বাতী, ঈশৎ লাল, হাসল।

এই তো অসুবিধে আমাদের— সত্যেন হেলান দিল চেয়ারে—যে সব সময়ই আমাদের চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। যেটা আছে, হচ্ছে, সেটা আমাদের কাছে কিছুই না; আমাদের সুখের সময়গুলিকে আমরা বুঝতে পারি, তখন-তখন না, পরে—অনেক পরে; আর তাই সব সময় মনে হয় যা হয়ে গেছে তার মতো আর হল না, হবে না—এটা অবশ্য— একটু হেসে জুড়ে দিল—আমার নিজের কথা না, নতুনও না, কিন্তু পুরোনোকেই নতুন লাগে যখন সেটা জীবন দিয়ে বুঝি। সত্যেন কথা শেষ করে পিঠ সোজা করল, পেয়ালা হাতে নিল, পেয়ালায় আলি করে রুমালে ঠোঁট মুছল। সারাদিনের উপবাসভঙ্গের প্রভাবে, চায়ের তাপে, স্বাতীর চোখের উষ্ণতায় সত্যেনের খুব বেশি জীবন্ত লাগছিল নিজেকে, ভাল লাগছিল বসে থাকাতে, দেখতে, শুনতে, বলতে। আর তার কথা শুনে স্বাতী ভাবল এটাই আমার সুখের সময়ের একটা নয় তো? এখন বুঝি না, পরে বুঝব? কিন্তু এখনই বুঝতে চাইল স্বাতী, চেষ্টা করল হাতে হাতে চোর ধরতে—আর তখনই দিকার দিল নিজেকে যে সমস্ত দেশের এত বড়ো একটা শোকের সময়কে নিজের একটি সুখের সময় বলে কল্পনা করতেও পেরেছিল! কিন্তু সত্যেনবাবুরও মুখে-চোখে দুঃখের কোনো চিহ্ন তো আর নেই।

বাসন সরাল, বিল শোধ হল, ব্লুস থাকার আর কোনো কারণ থাকল না, তবু সত্যেন দেরি করল। এতক্ষণে তার চোখে পড়ল যে রোস্টারীয় ভিড় বর্ধিষ্ণু, আলো উজ্জ্বলিত, আর ঢুকেই যে কজনকে দেখেছিল তার সকলেই প্রস্থিত। চারদিক ভ্রমণ করে ফিরে এল তার চোখ, খুব সহজে, হালকাসুরে যেন আগের কথার সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ আছে, এমনভাবে বলল— একটু যেন ব্যস্ত হয়েছিলে তখন?

ব্যস্ত, কখন? কীসের?

শিলঙে তোমার শেষ চিঠি যেটা পেয়েছিলাম—

এই প্রথম সে চিঠির কোনো উল্লেখ করল সত্যেন। এর আগে একবারও করেনি—আর সে জন্য স্বাতী কৃতজ্ঞ ছিল মনে মনে। চিঠিটা পাঠিয়েই লজ্জা করছিল তার, আর তার ঠিক চারদিন পরে সত্যেনবাবু যখন এলেন, আর এসেই দেখা করলেন তার সঙ্গে, তখন আরো বেশি লজ্জা করছিল—কিন্তু সত্যেনবাবুরও কোনো কথায় কি ব্যবহারে যখন বোঝাই গেল না যে সে চিঠি তিনি পেয়েছিলেন, তখন স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো তার; এমনকি—যদিও মনের কোনো গভীর অংশে নিশ্চয়ই জেনেছিল যে তার চিঠি ভ্রষ্ট হয়নি, ব্যর্থ হয়নি, কেননা ছুটির বাকি ক-দিনও উনি কাটিয়ে আসতেন তাহলে—তবু নিজের কাছে এরকম একটা ভাণ্ড সে করছিল যে সে-চিঠি পৌঁছয়নি, বাঁচা গেছে, আপদ চুকেছে! আর এখনও যদিও তার মুখের তপ্ত-লালিমা তার মাথাটাকে নুইয়ে দিচ্ছিল বুকের কাছে, চোখের পাতা টেনে দিচ্ছিল চোখের উপর, তবুও সেই ছলনাই তাকে আত্মরক্ষার শক্তি দিল, স্পষ্টই প্রশ্ন করল—কোন চিঠি?

যেটাতে লিখেছিলে আমাকে—চলে আসতে।

আপনি সেটা পেয়েছিলেন?

তুমি কি ভেবেছিলে পাইনি?—সত্যেন, সরল পুরুষ, শক্তি বাড়িয়ে দিল ছলনায়।

কী জানি! স্বাতী আত্মস্থতা ফিরে পেল, উদাস চোখে তাকাল, একটা নিশ্বাস ছাড়ল গোপনে, খুব গোপনে...বড্ড ভয় পেয়েছিল তখন, দম আটকে আসছিল!...যাক... মজুমদার, আর, যাই হোক, এটুকু ভদ্রতা অঙ্গত করেছে যে তারপর আর আসে না, দাদার কাছেও না, আর দাদা....দাদা এখন খুব গম্ভীর, এর মধ্যে আটটা-দশটা কথাও বোধহয় বলেনি তাকে তা, তা-ই ভালো, রাগই লক্ষ্মী। কী ভীষণ চেহারা নিয়েছিল তখন, অথচ কত সহজেই মিলিয়ে গেল। ছোট্টো হাসি ফুটল স্বাতীর ঠোঁটে, মুখ নিচু করল লুকোতে।

এদিকে সত্যেন ভাবছিল সেই চিঠিটার কথা, চোখে দেখছিল কাগজটার নীল রং, নিশ্বাসে পাচ্ছিল তার ঝাপসামতো গন্ধ, পাঠ নেই, কয়েকটি... মাত্র কয়েকটি কথা, আর তলায় সেই নাম, সুন্দর নাম, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর নাম। ফেরার পথে সমস্ত রাত ঐ চিঠির কথাগুলি ট্রেন-চাকার তালে তালে তার মাথায় ঘুরেছে, কেমন একটা অস্বাভাবিক সুখের স্রোত হয়ে চলতি ট্রেনের আবহাওয়ার ফাঁকে-ফাঁকে বয়ে গেছে—আর সেই স্রোত, সেই গূঢ় গোপন সুখ, সেই অস্বাভাবিক কম্পন—যদিও বাইরে কিছু বোঝা যায় না, আর তার দিনরাত্রি তেমনি নিশ্চিন্ত নিয়মেই কাটছে—এখনো তার মনের তলায় থেমে যায়নি... আর এখন, এই মুহূর্তে সেটা যেন উপরদিকে উঠে এল, কোনো একটা কথা হয়ে ফুটে চাইল সত্যেনের মুখে, কিন্তু কথায় ভাষায় তৈরি হতে যে সময়টুকু লাগল, সেই ফাঁকে স্বাতী বলে উঠল—এখন উঠলে হয় না

হ্যাঁ, চলো। বাইরে প্রায় সন্ধ্যা, আবার মেঘলা, বৃষ্টি টিপটিপ, ট্রামে ভিড়। স্বাতী বসতে পেল লেডিজ সিটে, আর সত্যেন দাঁড়াল যদিও তার ঠিক পিছনেই, তবু কথাবার্তা অসম্ভাব্য জেনে—কিংবা ইচ্ছে করে—সে রকম চেষ্টা করল না একজনও। স্বাতী বসে বসে ভাবল যে দু-মাস আগেও সে যেন ছেলেমানুষ ছিল, বোকা ছিল, এখন সে ঠিক-ঠিক নিজেকে পেয়েছে, খুঁজে পেয়েছে সেই নিজেকে, যার মতো হতে সবচেয়ে বেশি তার ইচ্ছা। আর এক-একবার বাইরের প্রিয়মাণ সন্ধ্যার দিকে, এক-একবার স্বাতীর আলাগা হওয়া, কাঁটা বেরিয়ে-পড়া মস্ত খোঁপার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সত্যেন ভাবল যে স্বাতীকে ঐ চিঠির বিষয়ে যে কথা সে জিগেস করেছিল, তার কোনো উত্তর পায়নি।

স্বাতী স্তম্ভিত হল বাড়ি ফিরে বাবাকে দেখে। বাবাকে এত অভিভূত করেছেন রবীন্দ্রনাথ! বাবার মুখ কালো, ঠোঁট শুকনো, চোখ যেন গর্তে বসা। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বলল—রামের-মা চিঠিটা দিয়েছিল তোমাকে? রাজেনবাবু মাথা নাড়লেন।

দেরি হল আমার—না? এবারেও বাবা যখন কথা বললেন না, কিছু জিগেস করলেন না, কী রকম একটা সন্দেহ হল স্বাতীর—বাবা, তুমি...তোমাকে...বাবা, কী হয়েছে?

একটা টেলিগ্রাম এসেছে।

টেলিগ্রাম? কই দেখি— বলতে-বলতেই স্বাতীর চোখে পড়ল বাবার হাতের কাছে পড়ে থাকা ফ্যাকাশে রঙের খামটা। তুলে নিয়ে এক পলক পড়ল, তারপর বাবার দিকে তাকাল। বাবা কিছু বললেন না। স্বাতী জিগেস করল—‘স্টোক’ কাকে বলে, বাবা?

অসুখ— স্বাতী যা বুঝেছিল রাজেনবাবু তার বেশি বললেন না।

খারাপ অসুখ?

ভাল না— মেয়ের দিকে তাকালেন না বাবা।

ডালিম—? স্বাতী এদিকে ওদিকে তাকাল।

ফেরেনি এখনও।

ওর তো আজই যাওয়া চাই। কিন্তু গাড়ির কি সময় আছে?

সময় বদলেছে, নটায় আজকাল। ও যদি আটটার মধ্যে না ফেরে—

আসবে—এক্ষুনি আসবে—সকলেই তো আজ...কিন্তু আটটার মধ্যে ঠিক এসেই পড়বে।

তাহলে আমিই চলে যাব— রাজেনবাবু তাঁর কথা শেষ করলেন।

তুমি—তুমি কেন—না, না যাবে বইকি, তোমাকে দেখলে কত ভালো লাগবে বড়দির—অসুখটা কি খুবই খারাপ?

রাজেনবাবু উত্তর দিলেন না।

খারাপ—খুব খারাপ—কত আর খারাপ— ঘরের মধ্যে ছটফট করে হাঁটতে-হাঁটতে স্বাতী বলতে লাগল—মানুষের কি শক্ত অসুখ করে না...করেও, সেবেও যায়—তুমি অতি জাবছ কেন, ওখানকার ডাক্তাররা যদি না পারে এখানে চলে আসুক—হ্যাঁ, তা-ই তো ভাল, কলকাতায় কত বড়ো-বড়ো ডাক্তার—সব অসুখ সারাতে পারেন তাঁরা... হঠাৎ থেমে গেল স্বাতীর কথা, ছুরির খোঁচার মতো মনে পড়ল যে কলকাতার ডাক্তাররা যদি সব মর্মেতে পারত তাহলে মা...আর রবীন্দ্রনাথ...। অথচ চুপ করে থাকতে পারছিল না—কিছু না-বলা চুপচাপটা যেন অসহ্য, তাই আবার বলল—কখন এসেছে টেলিগ্রাম?

এই—দুটো।

তুমি কখন ফিরেছ?

তার একটু আগে।

দুটো! চার-পাঁচ ঘন্টা! এতক্ষণ বসে আছেন বাবা এই দুশ্চিন্তার ভার নিয়ে একলা! আর আমি... ছোড়দিকে খবর দিয়েছ?

হরিকে পাঠিয়েছিলাম—বাড়ি ছিল না। আজ তো সবাই—

এখন আবার পাঠাও।

থাক, এখন আর ওকে ব্যস্ত করে কী হবে? এমনিতেই ক্লান্ত হয়ে ফিরবে!— রাজেনবাবু

তাকালেন পুরনো হলদে হওয়া দেয়ালঘড়ির দিকে।

দাদা?

রাজেনবাবু কথা না বলে হাত ওলটালেন।

দাদা এলেও তা—দুটোর সময় এসেছে টেলিগ্রাম, না?—তা—তুমি চা খেয়েছ? হঠাৎ কথাটা মনে পড়ল স্বাতীর।

দিয়েছিল।

এ থেকে ঠিক বোঝা গেল না বাবা খেয়েছিলেন কি খাননি; কিন্তু ও বিষয়ে আর কিছু বলা, কি আবার চা দিতে বলা—অর্থহীন লাগল, সব কথাই অর্থহীন লাগল। স্বাতী আর একবার টেলিগ্রামটা পড়ল, উল্টে-পাল্টে দেখল, তারপর যেন বাইরের ঘরে শব্দ পেয়ে ছুটে গেল ডালিমকে কিংবা দাদাকে আশা করে—কিন্তু—না—কেউ না। রাজেনবাবু উঠলেন, হোস্টলে ডালিমের বিছানা বাঁধালেন হরিকে দিয়ে, আর শতরঞ্জিতে জড়িয়ে নিলেন সুজনি, বালিশ আর নিজের দু-একটা জামাকাপড়।

স্বাতী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, তারপর বলল— তুমি যাবে, বাবা?

দেখি।

হ্যাঁ, বাবা, তুমি যাও—আমার জন্য ভেব না—আমি থাকতে পারব।

তুই না হয় শাস্ত্রীর ওখানে—

কেন? হরি আছে, রামের-মা আছে—কী হবে আমার? আর তুমি তো চলেই আসবে, আর জামাইবাবুও সেরে উঠবেন— বলতে বলতে বাঁধা বিছানা দুটোর দিকে তাকিয়ে ভীষণ ফাঁকা-ফাঁকা লাগল স্বাতীর, কেমন একটা দমবন্ধ-করা শূন্যতা ছড়িয়ে পড়ল সারা বাড়িতে। সব তৈরি করে রাজেনবাবু আবার বসলেন চুপ করে, আর স্বাতীরও সব কথা ফুরিয়ে গেল, নিজেকে তার মনে হল একটা নিংড়োনো ভিজে গামছার মতো, আর ঘরের মধ্যে টিকটিক করতে লাগল হলদে বুড়ো-ঘড়িটা।

ডালিম ফিরল আটটার আগেই। জামাকাপড় কাদায় মাখামাখি, মুখে বিজয়ীর নম্র হাসি। ছাড়াই সে, নিমতলা গিয়েছিল, ঢুকেছিল, মানুষের চাপে মরে যেতে যেতেও হেরে যায়নি, আর ফিরতে ফিরতে ভেবেছে কী রকম করে বলবে সব ছোটোমাসিকে, আর ছোটোমাসি কী রকম অবাক হতে-হতে শুনবে। ছোটোমাসি—ডাকতে ডাকতে সে ঘরে এল, আর দুকেই থমকে দাঁড়াল দরজার কাছে। ছোটোমাসি এলিয়ে আছে খাটে, আর দাদুর মুখ যেন কেমন, আর মেঝেতে দুটো বিছানা বাঁধা—কেন?

ডালিমের তৈরি হতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগল না। কোনোরকম স্নান—গায়ের কাদাও উঠল না—আর খাবার সামনে একবার বসল আরকি। তার যে ভীষণ একটা উদ্বেগ হচ্ছিল তা নয়, কিন্তু বাবার অসুখের জন্য এখনি তাকে যেতে হচ্ছে, হঠাৎ এত বড়ো একটা দায়িত্ব পেয়ে তার আত্মমর্যাদা বেড়ে গেল। অনেকখানি, আর তারই ফলে চরমে উঠল তার ক্ষিপ্ততা, আর তাকে দেখতেও হল গম্ভীর, খুব গম্ভীর। বুদ্ধি করে বলল—কিছু ফল-টল নিয়ে যাব শেয়ালদা থেকে? একথার উত্তরে রাজেনবাবু বললেন—ট্যাক্সি এসেছে। চলো— বলে নিজেই এগোলেন।

আপনি—আপনি কেন?

তোমাকে তুলে দিয়ে আসি—

না—না—কিছু লাগবে না—আমি বুঝি—বাঃ! ডালিম প্রায় হাত দিয়ে ঠেলে দিল দাদুকে,

তারপরেই নিচু হয়ে প্রণাম করল আর তার ছোটোমাসির দিকে একবার তাকিয়েই লাফিয়ে উঠে বসল ট্যান্ডিতে। এতক্ষণে স্বাতী জিগেস করল—বাবা, তুমি গেলে না? গেলাম না তো। দেখি—কাল—এতক্ষণে রাজেনবাবু মেয়ের দিকে ভাল করে তাকালেন।

৩

স্বাতীর ঘুম ভাঙল অন্ধকারে। কিন্তু তখনই বুঝল রাত আর নেই। কানে এল কাকের কা-কা, রান্নাঘরে হরির কয়লা ভাঙার ঠকাশ-ঠকাশ, বাথরুমে জলের ছলছল। শেষের শব্দটায় বুঝল বাবা উঠে পড়েছেন। নিজেও দেরি করল না। বেরোতে গিয়ে হোঁচট খেল। দরজার ঠিক বাইরে, দুটো ঘরের মাঝখানকার ফালি গলিতে, ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে রামের-মা—এ রকম করে ঘুমোয় নাকি সে, এমন অসহায়, নিঃস্ব ভঙ্গিতে? রামের-মাকে প্রায় টপকে স্বাতী এগোল, পিছনের বারান্দায় দেখা হল বাবার সঙ্গে—হাত মুখ ধুয়ে বেরিয়ে আসছেন বাথরুম থেকে। ছাইরঙা আবছায় স্বাতী দেখল বাবার মুখ ছাইরঙা। ফ্যাকাশে অন্ধকারে রাজেনবাবু দেখলেন স্বাতীর মুখ ফ্যাকাশে। কেউ কিছু বলল না।

স্বাতী বাথরুমে ঢুকল; বেরিয়ে এসে—আবার রামের-মাকে টপকে—ঘরে এল। পরনের কুঁচকোনো, আধময়লা, মনমরা বেগুনিরঙের শাড়িটা ছেড়ে একখানা পাটভাঙা মিলের শাড়ি পড়ল—সাদা শাড়ি, বড্বেডা সাদা, চুনের মতো, চুনকাম-করা দেওয়ালের মতো সাদা আর মনমরা। শাড়ি বদল করে স্বাতী আবার এল পিছনের বারান্দায়। এটাই বাবার বসবার ঘর, আর এটাই তাদের খাবার ঘর। লম্বা সরু রেঞ্জিনে মোড়া খাবার টেবিল—ডাক্তারদের রোগী দেখার টেবিলের মতো, যেন এক্ষুনি কোনো অপারেশন হবে। লম্বা দিকে ধারের চেয়ারটায় বাবা বসেছেন উঠোনের দিকে মুখ করে, স্বাতী বসল উঠোনের দিকে মুখ করে সরুদিকের একলা চেয়ারটায়। কেউ কিছু বলল না।

ঘোর কাটল, ভোর হল। ছাইরঙা আবছায়ার পর ফ্যাকাশে ছাইরঙা ভোর, ময়লা ধোঁয়াটে আলো রান্নাঘর থেকে পেঁচিয়ে বেরোনো ধোঁয়ার মধ্যে মিশল, রান্নাঘরের দেয়ালটা কালো, উঠানে ধুলো আর কয়লাগুঁড়ো—ময়লা, মনমরা, শীত করা ভোর। স্বাতী আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নিল—এর মধ্যেই শীতের ভাব। গ্রীষ্ম কেটে গেল কবে? বর্ষা ফুরলো কখন? রামের-মা ঘুম থেকে উঠে বেরিয়ে আসছিল ঘোমটা-খোলা মাথায়। বাবাকে দেখে থমকে দাঁড়াল, কাপড় টানল, ঘোমটার তলায় দিদিমণির দিকে একবার তাকিয়ে ফিরে গেল উঠোনের দিকে। দুঃখী মুখ রামের-মার—স্বাতী পলকে দেখল—কালো, কুঁকড়োনো, কুঁচকোনো মুখ।

ঘোর কাটল, রোদ ফুটল। রান্নাঘরের ময়লা ছাদে রোদ পড়ল। রোগা, ছোট্ট, চৌকো, হলদে রোদ উঠানে নামল। হরি এল রান্নাঘর থেকে চা নিয়ে, চায়ের সঙ্গে রুটি-মাখন। তারও দুঃখী মুখ, গুঁকনো, সুখ নেই, বিষণ্ণ ছেলেবেলা থেকে হরিকে দেখে আসছে স্বাতী, আজ প্রথম দেখল যে তার মুখ দুঃখ দিয়ে আঁকা। নিঃশব্দে চা খেল দুজনে। ঘোমটা ঢাকা রামের-মা নিঃশব্দে এল, টেবিলে রাখল চশমা আর খবর-কাগজ, নিঃশব্দে চলে গেল। রাজেনবাবু কাগজের ভাঁজ খুললেন, চশমা-চোখে পড়তে লাগলেন খুব বেশি মন দিয়ে। স্বাতী নিঃশব্দে বসে থাকল। ছোট্টো, চৌকো, হলদে রোদ মিলিয়ে গেল—রোগা, সাদা, লম্বা রোদ এগিয়ে এল। স্বাতী নিঃশব্দে উঠল, নিঃশব্দে চলে এল ঘরে—রাজেনবাবু নিঃশব্দে কাগজ পড়তে লাগলেন। না—কিছু

বলবার নেই, কিছু করবারও নেই। যে কথা এ-কদিন ধরে সব সময় মনে পড়ছে তার, যে কথা কাল সারা রাত ঘুমের মাধ্যেও এক মুহূর্ত সে ভোলেনি, তা নিয়ে একটি কথাও বলবার নেই, একটি কথাও শোনবার নেই—এমনকি, নতুন কোনো ভাবনাও ভাববার নেই আর, অথচ অন্য কোনো কথাও নেই, অন্য কোনো ভাবনাও নেই—যে সব কথা হাজার বার ভাবা হয়ে গেছে, ঘুরে ফিরে সে সবই ভাবতে হয় আবার। এই যেন প্রথম মৃত্যুকে চিনল স্বাতী। মা মরেছিলেন, কেমন লেগেছিল? অসুখ দেখে-দেখে সয়ে গিয়েছিল, জ্ঞান হবার সময় থেকেই বুঝেছিল মা ব্যাপারটা তার পক্ষে তেমন মজবুত নয়। আর ছেলেমানুষও ছিল। কষ্ট খুব, ভীষণ কষ্ট, কিন্তু আরামও সঙ্গে সঙ্গে; যত কষ্ট তত কান্না, আর যত কঁদেছে ততই ভুলেছে। তারপর সেই একবার ছুটির পরে কলেজে গিয়েই মায়া সান্যালের মৃত্যুর খবর। সেদিন—এখন ভাবলে বোঝে সে কথা—সেদিন সবচেয়ে বেশি তার হয়েছিল মনে-মনে একটা জিতে যাওয়ার ভাব—অন্য একজন মরল, তাকে মরতে হল না, আর সেইজন্য কলেজ থেকে রাস্তায় বেরিয়ে অনেক বেশি ভালো লেগেছিল—সব। শুধু-শুধু বেঁচে থাকতেই ভালো লেগেছিল। আর এই সেদিন রবীন্দ্রনাথের—কিন্তু ও-তো কোনো মৃত্যু নয়। পৃথিবীতে রবীন্দ্রনাথেরা মরেন না, তাঁরা চলে যান সময় থেকে সময়ের বাইরে, শরীর ছেড়ে মানুষের মনে, তাঁদের শেষ নেই। কিন্তু অন্যেরা, লোকেরা, সকলেরা? তারা মরে গেলেই মরল, শরীর থেকে বেরোলেই হারিয়ে গেল, কিছু থাকল না। আর এই মরই সকলকে মরতে হবে... স্বাতীর মনে পড়ল স্কুলে যখন ‘আমরা সাতজন’ বলে সেই ইংরেজি কবিতাটা পড়েছিল। মেয়েটি বলছে—আমরা সাত ভাইবোন—হ্যাঁ, সাতজনই তো! যদিও সাতজনের দুজনই মরে গেছে। ছেলেমানুষ, মৃত্যু কাকে বলে বোঝে না। পড়ে হাসি পেয়েছিল স্বাতীর। আট বছরের মেয়ে—মৃত্যু বোঝে না! যত দূর স্মৃতি পৌঁছয়, এমন দিনের কথা মনে করতে পারেনি, যখন সে এ কবিতার মেয়েটির মতো ছিল। খুব, খুব ছেলেবেলাতেই—বোধহয় চার কি পাঁচ বছরেই—এই খবরটা সে পেয়েছিল যে সকলকেই মরতে হয়, এমনকি তাকে—তাকেও মরতে হবে। এই তো সে খেলছে, হাসছে, খাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে, যা ইচ্ছে তাই করছে, কিন্তু সবসময়, সবসময় তাকে পিঠের দিকে তাক করে আছে এক তীরন্দাজ, কানে-কানে ধনুক টেনে, মহাভারতের ছবিতে কিরাতের মতো পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে—যে কোনো মুহূর্তে ছাড়তে পারে তীর, ছাড়ছে না কেন কেউ জানে না, কিন্তু শেষপর্যন্ত ছাড়বেই। কখন কেউ জানে না, আর ছাড়লেই হয়ে গেছে। ঘরে কখনো একা থাকলেই এই তীরন্দাজকে মনে পড়ত স্বাতীর, পিছন ফিরে তাকাত্তে ভয় করত, পিঠটা শুড়শুড় করত যেন। কিন্তু একলা তাকে তো না, সকলকেই তো একসঙ্গে তাক করে আছে ঐ এক তীরন্দাজ, এক তীর, অন্যেরা জানে না? ভাবে না? ভয় পায় না? বড়োদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে স্বাতী চেষ্টা করেছে তাঁদের মনের ভাব বুঝতে—কই, তাঁরা তো ভয়ে ভয়ে নেই, দিব্য! তাহলে তারও কি আর ভয় থাকবে না বড়ো হলে—কবে বড়ো হবে? কত বড়ো হলে ও রকম নিশ্চিন্ত হওয়া যায়? ছোট্টো স্বাতী আশায়-আশায় থাকল, কিন্তু কবে যে সেই শুভক্ষণ এল আর গেল, কবে থেকে যে পিঠের শুড়শুড়ানি সারল, মহাভারতের কিরাতের মতো সেই তীরন্দাজকে ভুলল, তা আর মনে করতে পারে না এখনকার স্বাতী। এখন শুধু এইটে মনে পড়ে যে অনেক... অনেকদিন তাকে মনে পড়েনি... সেই ঝাপসা ছেলেবেলার পর আর না—মা যখন মরলেন তখন না। একটানা অনেক... অনেক বছর সে এমনভাবেই কাটিয়েছে যেন মৃত্যু নেই।

টেলিগ্রাম!

আওয়াজটায় বুক কঁপে উঠেছিল স্বাতীর, যদিও এর জন্যই বিকেল থেকে বসেছিল ছোড়দির আর বাবার সঙ্গে। একটু দেরি হয়েছিল উঠতে, বাবা তার আগেই উঠলেন। স্বাতী দেখল দরজায় একটা দৈত্যের ছায়া, আর একটু পরে রাস্তার অন্ধকারে রাস্কসের একচোখের মতো সাইকেলের আলো। মুহূর্তের জন্য বাবার মুখটা যেন ভেসেচুরে অন্যরকম হয়ে গেল, তারপর ফিশফিশে আওয়াজে বললেন—আমি যাই।

স্বাতী বলল—আমিও যাব।

না।

বাবা!

না।

আগের দিনের বাঁধা-বিছানা বাঁধাই ছিল, আর দু-একটা জিনিস শাস্বতী গুছিয়ে দিল চটপট—আর পাঁচটা মিনিটও দেরি হল না, কোনোরকমে ট্রেন ধরবার সময়টুকুই ছিল তখন। রাজেনবাবু দুই মেয়েকে নামিয়ে দিলেন শাস্বতীর বাড়িতে। সেই তো বাবা গেলেন, তবু আগের দিন গেলে—কিন্তু তাতেই বা কী হত! তাদের দেখে, তাদের মুখ দেখে হারীত বলল—খবর ভাল না? শাস্বতী জবাব দিল না। তোমার বাবা চলে গেলেন আজ? হারীত তাকাল স্বাতীর দিকে। স্বাতী আস্তে মাথা নাড়ল। হারীত কপাল কঁচকাল—অবস্থা কি খুব খারাপ?

শেষ—কথা বলল শাস্বতী।

গুনে হারীত চুপ করে থাকল মিনিটখানেক, তারপর খুব গভীর মুখে বলল—হঁ—এত খাওয়া—যদি শেষের দিকেও খাওয়াটা কমাতে—তাছাড়া তো আর ওখুধ নেই এর—আর স্ট্রোক একবার হয়ে পড়লে মুশকিল! ‘মুশকিল’ কথাটা একটু আলগা করে উচ্চারণ করল, যেন এখনও এ থেকে উদ্ধার পাবার আশা আছে। শাস্বতী দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ছোড়দির দীর্ঘশ্বাস, আর হারীতদার কথা, দুটোই খুব খারাপ লাগল স্বাতীর। খারাপ লাগল ও-বাড়িতে থাকতে—বাড়িতে থাকলেই হত, কিন্তু বাবা কিছুতেই দিলেন না। যে কটা দিন বাবা ফিরলেন না, কী যে খারাপ তার কেটেছিল! একবার ঘুরেও আসতে পারেনি বাড়ি থেকে, কেননা সে-কদিনের মতো ছোড়দির তো কথা ওঠে না বাপের বাড়ি যাবার, আর দাদা যদিও মাঝে মাঝে এসেছে, একবারও তাকে নিয়ে যেতে চায়নি—আবার, যদিও বাবা নেই, বলতে গেলে কেউ নেই, তবু বাড়িতেই যে তার মন পড়ে আছে এ কথা ছোড়দির কাছে লুকোতে দরকার।

অন্য বাড়িতে এই প্রথম থাকল স্বাতী। ঠিক ঠিক নিজের অভ্যেস মতো সব হয় না অন্য কোথাও, কিন্তু ঐ অসুবিধে আর কতটুকু, আর সেজন্য খারাপ লাগার মতো মনও ছিল না তার। কিন্তু যেহেতু বাড়িটা ছোড়দির, তার ছোড়দির... এ বাড়ির যা কিছু তাদের বাড়ি থেকে আলাদা, সবই একটু বিশেষ হয়ে তার চোখে পড়ল। ছোড়দির সঙ্গে তার মাখামাখি ছিল সবচেয়ে বেশি। মেজদি-সেজদির বিয়ের পর, আরো বেশি মা মরবার পর—ছোড়দিকে না হলে এক দণ্ড তার চলত না। আর এখন সেই ছোড়দির সঙ্গে—মাঝে মাঝে দেখা হলে খুব ভালো—কিন্তু সারাদিন একলা কাটাতে হলে সে যে একটু হাঁপিয়ে ওঠে, এইটে বুঝতে পেরে তার বিবেকে কামড়াল। ছোড়দির অনেক অভ্যেসই আলাদা, কথাবার্তা আলাদা, অনেকটাই মেলে না তার সঙ্গে। স্বাতী খরে নিল যে ছোড়দি যা ছিল তা-ই আছে, সে নিজেই বদলেছে। তাই নিজেকে দোষ দিল মনে-মনে, আর সে দোষ ঢাকবার জন্য ছোড়দিকে খুব বেশি করে ভালোবাসতে চেষ্টা করল।

দুপুরবেলা পাশে শুয়ে-শুয়ে নিবিড় হতে চাইল ছেলেবেলার স্মৃতিতে, কিন্তু ঠিক সুরটি যেন লাগল না, আর ছোড়দিও তাকে রেহাই দিল খানিক পরেই ঘুমিয়ে পড়ে। রাত্রে খাওয়ার পর আবার—কিন্তু তখন যদি ছোড়দি একটু বেশিক্ষণ কাটিয়েছে তার সঙ্গে, হারীতদা, সে স্পষ্ট বুঝেছে, সেটা পছন্দ করেননি। আবার হারীতদা যদি কখনো তার সঙ্গে বেশি কথা বলেছেন, তাহলে ছোড়দির মুখভার হয়েছে। অন্যসময় হলে স্বাতীর হয়তো মজা লাগত, তখন শুধু খারাপই লাগল, শুধু মনে হল এখানে তার জায়গা নেই, এখানে সে আছে কেন।

কিন্তু সবচেয়ে খারাপ লাগল মৃত্যুর প্রতি ছোড়দি-হারীতদার উদাসীনতায়। দুজনের মধ্যে হারীতদাই অবশ্য ভালো, তিনি স্পষ্টই বুঝতে দিলেন যে স্ত্রীর দিদির স্বামীর মৃত্যু তাঁর কাছে কিছুই না, তবে স্ত্রীর মন রক্ষার জন্য কয়েকটা দিন তিনি একটু চুপচাপ কাটাতে প্রস্তুত। কিন্তু ছোড়দি প্রায় সব সময় একটা শোকের ভাব রাখল, থেকে-থেকেই বলতে লাগল জামাইবাবুর, বড়দির কথা, বলতে-বলতে নিশ্বাস ফেলল ঘন-ঘন, চোখের জল মাঝে-মাঝে। এইটে অসহ্য লাগল স্বাতীর। কেন? ছোড়দি কি কপট, না স্বাতীর দুঃখ বেশি? না, ছোড়দির দুঃখও খাঁড়ি তার দুঃখও বেশি না। বেশি দুঃখের কথাই বা কী, ছোড়দির চেয়ে বেশি তো আর দ্যাখেনি জামাইবাবুকে। হয়তো ভালো লেগেছিল বেশি, খুব। কিন্তু সে-মানুষ হারিয়ে গেল বলে তার কি কিছু হারাল? কিছু না। কোনো এক প্রমথেশ চৌধুরী পৃথিবীতে আর নেই, তাতে ছোড়দির যতটা এসে যায়, তারও ঠিক ততটাই— কিছু না। ছোড়দির দুঃখ বড়দির জন্য, আর সেটাই ঠিক... স্বাভাবিক, কিন্তু স্বাতী বড়দিকে তেমন ভাবল না, ডালিমদেরও না, জামাইবাবুকেই ভাবল বার বার। বার বার ভাবল তাঁর লম্বা, ঠান্ডা, নিঃসাড় শুয়ে থাকা—মরা! কেমন দেখাচ্ছিল? সব সময় হাসি-হাসি সেই মুখে একটুও হাসির ভাব ছিল কি? না কি যন্ত্রণায় মোচড়ানো মুখ? না কি কিছুই না—শূন্য? কিছু না, শুধু শূন্যতা—স্বাতী ভাবল—জামাইবাবুকে, না...মৃত্যুকেই ভাবল স্বাতী— তাহলে এই? অদৃশ্য তীরন্দাজ অব্যর্থ তীর নিয়ে ঠিক তৈরি? যেমন ছিল তার ছেলেবেলায়, তেমনি? তখন তেমনি, এখন তেমনি, সবসময় তেমনি! আমরা ভুলে যাই, আমরা ভুলে থাকি। সে কখনো ভোলে না। সে আছেই, সে আছে। তাক করে আছে পিঠের দিকে, আমার দিকে, যা কিছু আমার আর যা কিছু আমি সেই সমস্তর দিকে। যত আমার ইচ্ছা, চিন্তা, চেষ্টা, সবার ওপরে সে। আর যত আমার ভালবাসা, তার ওপরেও সে। কেমন করে এতদিন ভুলে ছিলাম! মৃত্যুকে এতদিন ভুলে ছিল বলে স্বাতীর অবাক লাগল, আর স্বাতী অবাক লাগল অন্যদের এখন ভুলে থাকতে দেখে। আর চোখের উপর ছোড়দি-হারীতদাকে দেখে। মৃত্যুর সঙ্গে হারীতদার ভদ্রতার সম্পর্ক, আর ছোড়দির করুণার। যে যার সম্পর্কের পাওনাটুকু মিটিয়ে আবার বেঁচে থাকতেই বাস্তু। একবার মনে পড়ল না তাদের সেই মৃত্যুর আরো পাওনা আছে। মনে পড়ল না যে, জন্মের সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যুর কাছে বিক্রি হয়ে গেছে তারা নিজেরাই। সেই নিশ্চিত, নিশ্চিত, ভীষণ তীরন্দাজকে কখনো তারা দ্যাখেনি, এখনো তারা দেখল না।

ছোড়দি-হারীতদার সঙ্গে মস্ত একটা বিচ্ছেদ অনুভব করল স্বাতী। শুধু ও-দুজন নয়, সকলের সঙ্গেই বিচ্ছেদ। যারা বেঁচে আছে, যাদের নিয়ে পৃথিবী, স্বাতীর মনে হল তারা তার কেউ না। এমন কিছু সে জেনেছে যা আর কেউ জানে না, সেইজন্য সকলের থেকে সে বিচ্ছিন্ন, পৃথিবীর মধ্যে সে একলা। সবাই চলেছে একদিকে নেচে, লাফিয়ে, ছুটে, ঘুরে, তাড়াতাড়ি, দেরি করে, দলে দলে চলছে বলির পাঁঠা... কেউ জানে না কোথায় যাচ্ছে, একলা সে জানে। একলা সে জানে যে জীবন্ত মানুষরাই মরন্তু, যারা বেঁচে আছে, তারাই দিনে দিনে মরছে, মৃত্যু নেই

শুধু মৃতের। একলা সে জানে যে মৃত্যু ছাড়া সত্য নেই, যতদিন পারি আর যেমন করে পারি মৃত্যুকে আমরা পালিয়ে বেড়াই, আর সেই পালিয়ে বেড়ানোর নামই জীবন। আর এই জীবন— এতে দুঃখই সত্য, দুঃখই নিশ্চিত আর স্থির। যতক্ষণ পারি আর যেমন করে পারি আমরা তাকে এড়াই, ফাঁকি দিয়ে বেড়াই আর সেই ফাঁকির নামই... সুখ, আশা, ইচ্ছা। এও সেই জানে, একলা সে। গান আরম্ভ হবার আগে যেমন ঝমঝম তানপুরা বাজে, তেমনি একটা ঝিমোনো, গম্ভীর, একটানা সুর স্বাতীর মনের মধ্যে বাজতে লাগল সবসময়। দুঃখের সুর, সব জড়ানো দুঃখের। গম্ভীর, মধুর, নিশ্চিত দুঃখের স্রোত বয়ে চলল একটানা। থামে না, কমে না, বাড়ে না, ছাড়ে না... সবসময় একরকম। বাবা ফিরলেন, বাড়ি ফিরল—একই রকম। দিনের পর দিন কাটতে লাগল—একই রকম।

যেদিন বাড়ি ফিরল, সেদিনই সত্যেনবাবু এলেন। তাঁকেও একটু দূর লাগল, পর লাগল, কিন্তু এও মনে হল যে তার এখনকার মনের ভাব কেউ যদি বোঝে তো তিনিই বুঝবেন। তাকে প্রথম দেখে হাসিমুখে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু আর একবার তাকাতেই হাসি মিলিয়ে গেল মুখ থেকে, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—কী হয়েছে? স্বাতী তখনই কোনো জবাব দিতে পারল না। এখানে ছিলে না তোমরা?—আমি এসেছিলাম দুদিন—বাড়ি বন্ধ ছিল— কোথায় গিয়েছিলে?—কী? কী হয়েছে? স্বাতী আরো একটু দেরি করল, মনে মনে কথাগুলি সাজিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল—আমার বড়োজামাইবাবু—মানে, বড়দির স্বামী—তিনি—মারা গেছেন।

কথাটা শুনে সত্যেনবাবু একবার মাত্র তাকালেন—চকিত, দ্রুত, একটু ভীত দৃষ্টি। তারপরেই বসে পড়লেন, বসে থাকলেন নিচু মাথায় চুপ করে। কিছু বললেন না, জিগেস করলেন না, কোনো বৃত্তান্ত জানতে চাইলেন না। শুধু বসে থাকলেন চুপ করে খানিকক্ষণ, অনেকক্ষণ... আর স্বাতীও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল, মনে পড়ল এই সেদিনের কথা, যেদিন উনি এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর খবর নিয়ে। সেদিন তক্ষুনি কিছু করবার ছিল, অনেক করবার ছিল, তারপর বলবারও ছিল অনেক... আজ কিছু নেই, আজ শুধু চুপ। শহর ভরে, দেশ ভরে এখনও রবীন্দ্রনাথের হৈ-হৈ, কাগজে সেটাই বড়ো খবর এখনও। কত পত্রিকা, কত বক্তৃতা, ছবি, গান, কথা, কমিটি, সমিতি—এ রকম চলবে আরো কিছুদিন—আর এরই মধ্যে আরো বড়ো এক খবর এসে পৌঁছল মাত্র কয়েকজন মানুষের কাছে, সব মানুষ থেকে আলাদা হয়ে গেল সেই কজন, আরো কাছাকাছি হল পরস্পরের। যে কোনো একজনের মরে যাওয়াটা কিছুই না, রোজই মরছে। চলাতে চলাতে একবার ‘আহা’ বললেই ফুরোল, কিন্তু যে-কজন তাতে দুঃখ পায়, তাদের দুঃখের মতো দুঃখ নেই, নিজের দুঃখ ছাড়া দুঃখ নেই... সেটাই শুধু দুঃখ, অন্যসব খবর, ঘটনা, কথা বলার বিষয়। হঠাৎ স্বাতীর মনে পড়ল রেস্তোরাঁয় বসে ধুব দস্তর সেই কথাগুলি—খুব খারাপ লেগেছিল তখন, খুব রাগ হয়েছিল, কিন্তু—ঠিকই তো—ঠিক কথাই তো বলেছিলেন। দুঃখ কি অমন করে শহর ভরে ছড়ায়, দুঃখ কি পৃথিবী ভরে সোর তোলে? কেমন করে হবে—দুঃখ-তো সেটাই, যা মানুষকে একলা করে দেয়। সকলে মিলে, অনেকে মিলে দুঃখী হওয়া যায় না তো। আমরা যে শুধু দুঃখকে ডরাই তা নয়, দুঃখীকেও এড়াই। তাই, যতক্ষণ পারি, এমনভাবে চলি-ফিরি যেন দুঃখ বলে কিছু নেই, যেন ওটা কিছুই না। যে কথা শুনে সত্যেনবাবু অমন করে বসে পড়লেন, সেটা কি তাঁর কাছে কিছু? তাঁর মুখে চোখ রেখে এ প্রশ্নের উত্তর

খুঁজল স্বাতী। কিন্তু কপালে হাত রেখে নিচুমাথায় এমন করে বসেছেন যে খুঁতনি ছাড়া কিছু প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। সত্যি যেন একটা আঘাত পেয়েছেন এইরকম দেখাচ্ছে ভঙ্গিটা। কিন্তু তাঁর আঘাত পাবার কী আছে? আর আমিই বা কেন ভাবছি সে কথা—তিনি তো বলতে গেলে চেনেনই না ওঁদের। এটা তাঁর ভদ্রতা—হারীতদার চেয়ে উঁচু জাতের ভদ্রতা—সুন্দর সৌজন্য, কিন্তু আমারও তো ভদ্রতা আছে, আমারই কথা বলা উচিত, যাতে উনি সহজ হতে পারেন। স্বাতী বসে আলাপ করল—আপনি এসেছিলেন এর মধ্যে?

সত্যেনবাবু হাত সরালেন কপাল থেকে, কথা বললেন না।

কলেজেও যাইনি এ-কদিন—স্বাতী আলাপ চালাল—ছোড়দির ওখানে ছিলাম। বাবা তো গেলেন বড়দির কাছে। সত্যেনবাবু মুখ তুললেন, কথা বললেন না।

একেবারে হঠাৎ—আপনাকে তাই আগে জানাতে পারিনি। বলেই অপ্রস্তুত লাগল স্বাতীর—সবই ওঁকে জানাতে হবে নাকি? আর খবরটাও যেন ওঁর কাছে জরুরি?—তাই তাড়াতাড়ি আবার বলল—আপনি এ-কদিন কী করলেন? এতক্ষণে উনি তাকালেন, এতক্ষণে কথা বললেন, আমি—আমি আর কী করব। এখন যাই—বলে একবার একটু তাকালেন স্বাতীর চোখে, তারপর চলে গেলেন। সেই চোখের গভীর স্তব্ধতাকে স্বাতী অবিশ্বাস করতে পারল না। একটু অবাকই হল, একটু ভাবল মনে-মনে। উনি কি তবে বুঝেছেন আমার মনের কথাটা? উনিও কি দেখেছেন সেই ভীষণ তীরন্দাজকে? যা শুধু আমিই জানি, পৃথিবীর আর কেউ জানে না, তা কি তবে উনিও জানেন? বালতি-ন্যাতা হাতে ঘর মুছতে এল রামের-মা। তার দিকে তাকিয়ে সত্যেনকেই দেখল স্বাতী, দেখল সেদিনের সেই স্তব্ধ গভীর চোখ। তার মনের মধ্যে খেলে গেল—আমি দুঃখ পেয়েছি, সেটাই তার দুঃখ, আমি বড়দিকে ভালবাসি, তাই সে বড়দিকে প্রায় না দেখেই ভালবাসে। কথাটা এর আগেও অনেকবার উঁকি দিয়েছে তার মনে—আমল দেয়নি—এখনো আমল দিল না। কিন্তু নিজেরই অজান্তে সত্যেনের কথাই ভাবতে লাগল বসে বসে। এই দেড়-মাস ধরে একটু ঘন-ঘন আসছে। এই দেড় মাসে স্বাতী সবসুদ্ধ যত কথা বলেছে তার অর্ধেকেরই বেশি সত্যেনের সঙ্গে। বাবা বড়ো চুপচাপ আজকাল আর একটু মেনি ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন, চশমা চোখে বসে চিঠি লেখেন বড়দিকে, বড়দির বড়ো দেওরকে—স্বাতী কখনো বাবাকে দ্যাখেনি নিজের হাতে এত চিঠি লিখতে। এতদিন সে-ই ছিল বাবার সেক্রেটারি কিন্তু এসব চিঠির বিষয়ে সে কিছু জানে না পর্যন্ত, মেজদি-সেজদির চিঠি এলেও বাবা তাকে দেন না। একদিন জিগেস করেছিল—কী লিখছ, বাবা, বড়দিকে?

আসতে লিখলাম এখানে।

বড়দি আসবেন! কথাটা খুশির না, উচ্ছ্বাসের না। কথাটা যেন প্রশ্ন, যেন দ্বিধাভরা প্রশ্ন। কেমন করে চোখ রাখবে বড়দির উপর আবার, কেমন করে কথা বলবে?

হ্যাঁ, আসাই ভাল। বাবাও এমন করে কথাটা বললেন যেন এর বিরুদ্ধ যুক্তিও আছে। স্বাতী বুঝল যে বড়দির পক্ষে এখানে আসা এখন আর সহজ না—আগেও সহজ ছিল না, কিন্তু তখনকার বাধা আর এখনকার বাধা একেবারে উল্টোউল্টি, তাই বলল—তুমি বললে আসবে না?

দেখি।—বাবা আবার লিখতে লাগলেন, একটু পরে চোখ তুললেন তার দিকে। চশমার পিছনে বাবার কুঁকড়োনো বড়ো চোখে স্বাতী কী যেন দেখল; আর তাকাল না, আর দাঁড়াল না সেখানে। বাবার মুখ শিলিয়ে গেল, সত্যেনকে মনে পড়ল আবার। স্বভাবত সরল তার চোখ, মুখে

গম্ভীরতর লাভণ্য, আশ্তে কথা বলে, কিন্তু অস্পষ্ট কখনো না। আর এমন কথা বলে যে সবসময় উত্তর না দিলেও চলে, চুপ করে শুনলেও মনে হয় দু-পক্ষেরই কথাবার্তা এটা। এখন আর মইয়ের কথা না, নানা কথা। তিন বছরে সব সুদ্ধ যে কটা কথা বলেছিল তারা, এই দেড়-মাসে তার বেশি বলা হয়ে গেছে। স্বাতী ভাবতে চাইল সেই কথাগুলি, কিন্তু কী আশ্চর্য—একটা কথাও মনে আনতে পারল না। কী? কী বলে সত্যেন? হঠাৎ চমকে উঠল স্বাতী, চমকে বুলল সত্যেনবাবুকে সে মনে মনে ‘সত্যেন’ ভাবছে। একা ঘরে লাল হল, যেন নিজের দিক থেকেই মুখ ফেরাল আর ঠিক তখনই ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল শরতের শীতল, উজ্জ্বল, সুন্দর একটি সকাল, যে সকালটা এতক্ষণ মরে ছিল তার কাছে। সত্যেন!—আওয়াজ না করে, কিন্তু ঠোঁট নেড়ে, নামটা উচ্চারণ করল একবার। কবে থেকে সত্যেন হল?

* * * * *

একটু শব্দ হল ঘরে, তাকিয়ে দেখল, ছোড়দি। দু-বোনে চোখাচোখি বরল নিঃশব্দে, তারপর স্বাতী বলল—তুমি খুব সকালেই এসেছ!

হ্যাঁ, ঘুম থেকে উঠেই চলে এলাম, আর একটু সকাল সকালই উঠেছিলাম। বলতে বলতে শাস্ত্রীর মনে পড়ল অন্যদিনের চাইতে সকালে উঠে ভোরবেলাটি কেমন ভালো লাগল, ভালো লাগল একলা ট্রামে করে এই পথটুকু আসতে। বলল অন্য কথা—ভালো ঘুমোতেও পারিনি রাত্রে, কীসব আবোলতাবোল স্বপ্ন দেখছিলাম। বোধহয় এক রাত্রির অল্প একটু অনিদ্রার ফলেই, শাস্ত্রীর গাল একটু বেশি লালচে দেখাল, চোখ একটু বেশি বকঝক। কিন্তু স্বাতী চোখে যা দেখল মুখে তা বলল না। শাস্ত্রী আবার বলল—সেবারে বড়দি এলেন—ঠিক এইরকমই ছিল সকালবেলাটা। একটুখোমে খামকা জুড়ল—না রে? কথাটা স্বাতীরও মনে হয়েছিল এইমাত্র, কিন্তু সে সায় দিল না, কথা বলল না। কী ভালোই লেগেছিল! কী ফুটি জামাইবাবুর, আর বড়দি যেখানে, সেখানেই আনন্দ। আর সেই বড়দি—টলটল করল জলের ফোঁটা শাস্ত্রীর চোখে। তার মনে হল, অমন ভালো আর কখনো লাগেনি, অমন সুখী কখনো আর হয়নি জীবনে—যদিও তখন তা বোঝেনি। তখন বরং রোজই প্রায় দুঃখই পেয়েছে তাদের পারিবারিক উৎসবে হারীতের যোগ দেবার অনিচ্ছায়, আর ও-ধরনের আমোদের প্রতি হারীতের প্রকাশ্য অবজ্ঞায়। তার মন আরো পিছনে সরল, পৌঁছল তার বিয়ের সময়ে প্রথম না ঘুমোনো রাতটির পরে আলো-ভরা সকালে... আসনপিঁড়ি হয়ে খাটে বসে জামাইবাবুর হেসে হাসি, আর বড়দির সেই ওকে—মাত্র সেদিন থেকেই হারীত ‘ও’ হয়েছে তার কাছে—জোর করে খাওয়ানো। মজার দেখাচ্ছিল ওকে, কত অন্যরকম ছিল তখন। শাস্ত্রী নিশ্বাস ফেলল—বড়দির জন্য না, নিজের জন্যই নিশ্বাস ফেলল এবার। মনে পড়ে তোর—যেন অম্ম কিছু বলতে বলতে সামলে নিল সে—মনে পড়ে সেই সবাই মিলে থিয়েটারে যাওয়া?

পড়ে না? সবই মনে পড়ে। বড়দি এলেন, এসেই ধরে ধরে সকলকে খাওয়াতে লাগলেন ক্ষীর-নারকোলের মিষ্টি, তারপর রান্নাঘরে বসে সেই আলুসেদ্ধ—আলুসেদ্ধর ধোঁয়া-ওঠা একটা গন্ধ—ও-রকম গন্ধ পৃথিবীর আর কোনো আলুসেদ্ধর হবে না। কিন্তু এ সবই ভাবা হয়ে গেছে হাজার বার। শাস্ত্রী বলল—জামাইবাবু কী রকম হাসতেন! হ্যাঁ, হাসতেন। আর যাবার সময় ট্যান্ডিতে উঠে অন্যরকম একটু হেসে বলেছিলেন—স্বাতী, তাহলে যাই...আবার কবে...। কিন্তু এসবও হাজার বার ভাবা হয়ে গেছে। যাতে আবারও এসব ভাবতে না হয়, স্বাতী বলল—

চা খেয়ে এসেছ?

হ্যাঁ—হারীত ওঠেনি তখনো—নিজেই করে নিলাম এক পেয়ালা—শাস্তীর কথার বদলে যাওয়া সুর স্বাতীকে প্রায় জানিয়ে দিল যে স্বামী ওঠার আগে স্বাধীনভাবে এ এক পেয়ালা চা বেশ উপভোগ করেছিল সে। হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল—সময় হল নাকি?

এখনই? একটু কেঁপে উঠল স্বাতী।

গাড়ি ক-টায় পৌছয়?

আটটা—কত মিনিট যেন—

তাহলে দেরি আছে এখনো, শাস্তী তাকাল হাতের ছোট্টো সোনার ঘড়ির দিকে—তার বিয়েতে জামাইবাবুর উপহার।

বাবা স্টেশনে গিয়েছেন?

কী-জানি... বোধহয়— বাবার গতিবিধি সম্বন্ধে এই ‘বোধহয়’টা একটু বেখান্না শোনাল শাস্তীর কানে। যাই, দেখে আসি। তখনই ফিরে এসে বলল—হ্যাঁ, গিয়েছেন। এবার বেখান্না লাগল স্বাতীর। বাবা কোথাও বেরিয়ে গেলেন তাকে কিছু না বলে, তার সঙ্গে দেখা না করে—এটা তার কাছে নতুন।

বিজু? শাস্তী জিগেস করল।

ওঠেনি...বোধহয়।

শাস্তীর মনে হল স্বাতী অন্য কথা ভাবছে, যে কথার সঙ্গে বড়দির আজ আসার কোনো যোগ নেই। নিজেই গেল বিজনের ঘরের দিকে। দরজা বন্ধ। টোকা দিল, ‘বিজু, বিজু’ বলে ডাকল। জবাব পেল না। ফিরে এসে বলল—বিজু এত বেলায় ওঠে? স্বাতী বলল—এমন আর বেলা কী। আমরা আজ ভোরে উঠেছি কিনা, তাই মনে হচ্ছে।

কারণ আছে বলেই উঠেছি, বিজুরও ওঠা উচিত। স্বাতী চুপ।

ওকে ডাকলে হয় না?

তুমি ডাকলে তো শুনলাম।

কিন্তু—ওদের আসবার সময়ও ঘুমিয়ে থাকে যদি বিজু? শাস্তীর চোখে-মুখে উদ্বেগ ফুটল—কী বিত্ৰী! কী ভাববেন বড়দি—ছি! আমার তো মনে হয় ধাক্কাধাক্কি করে ওকে ডেকে তোলাই উচিত— শাস্তী ব্যস্ত হল।

দেখো চেষ্টা করে।

তোর ভাবটা যেন তোর কিছুই না?

স্বাতী চুপ।

এখনও তোর রাগ পড়েনি বিজুর উপর?

রাগ ছিল নাকি কোনোদিন? স্বাতী পাতলা হাসল।

শাস্তীও হাসল—আমার উপরেও রেগেছিলি খুব।

মজুমদারের ব্যাপারটি চুকে যাবার পর এই প্রথম তার কোনো উল্লেখ হল দু-বোনের মধ্যে। স্বাতী বলল—আমি কি তোমার উপর রাগতে পারি? শাস্তী তাকাল স্বাতীর দিকে, ঘরের দিকে। এই ঘরেই সে থাকত, ঘুমোত—স্বাতীর সঙ্গে। একটু আবছা করে বলল—তখন যা ভাল মনে হয়েছিল করেছিলাম, মনে রাখিস না। এর পরে দুজনেই চুপ করে রইল একটুক্ষণ।

আসবার সময় সত্যেনবাবুকে দেখলাম ট্রাম-স্টপে—শাস্তী কথা বদলাল।

কে সত্যেনবাবু?

সত্যেনবাবু—সত্যেন রায়—তোর আজ হয়েছে কী বল তো? ছোড়দির সঙ্গে একটু একটু কথা বলতে বলতে মনের গভীরে যে মানুষের কথা সারাফণ সে ভাবছিল, তার সম্বন্ধে হঠাৎ ও রকম একটা দৈনন্দিন উল্লেখ শুনে স্বাভাবিক বৃদ্ধিতেই পারেনি প্রথমটায়। কিন্তু ঠিকই তো, অন্যদের কাছে সে মাত্রই একজন সত্যেনবাবু, যেকোনো একজন সত্যেন রায়। ছোড়দির সাধারণ সুরটা নকল করে বলল—কলেজে যাচ্ছেন বোধহয়।

ছুটি হয়নি এখনো?

এই হবে।

আমি তাকালাম, কিন্তু উনি দেখলেন না—নয়তো কথা বলতাম একটু। একটু পরে শাস্তী আবার বলল—বেশ লাগে আমার ঝুঁকে স্বাভাবিক লক্ষ্য করেছে সত্যেনকে আজকাল একটু অন্য চোখে দেখছে ছোড়দি। কবে থেকে যেন ভাবটা স্পষ্ট বদলেছে। এখানে এসে দেখতে পেলে কেমন হাসে, এগিয়ে কথা বলে, একটু বেশিই বলে—অন্তত স্বাভাবিকের তাই মনে হয়। দাদা ছোড়দিকে কিছু বলেছে—এ-ই সে ধরে নিয়েছিল মনে-মনে, যেহেতু তার মনেই হয়নি তাকে আর সত্যেনকে একসঙ্গে দেখতে পাওয়াই সত্যেনকে লক্ষ্য করার যথেষ্ট কারণ আজকাল। ছোড়দির মুখ দেখে বোঝবার চেষ্টা করল দাদার কথা সে কতটা বিশ্বাস করেছে, তারপর তার কাঁধের দিকে তাকিয়ে বলল—সুন্দর ব্লাউজটা। কিন্তু শাস্তী আগের কথাতেই ফিরে গেল—একদিন চা খেতে বলব ভাবি বাড়িতে, কিন্তু—যেটা ভাবছিল স্বামীর বিষয়ে সেটা চালিয়ে দিল স্বামীর বন্ধুদের নামে—হারীতের বন্ধুদের সঙ্গে ঠিক-তো মিলবে না সত্যেনবাবুর।

একা ঝুঁকে বললেই পারো।

তা পারি, কিন্তু তোরা হারীতদকে তো জানিস, নিজের দলের দু-তিনটি বন্ধু যেখানে নেই, সেখানে তাঁর কিছুই ভাল লাগে না, আবার দু-চারজন না হলে জমেও না ঠিক, আর—আর সত্যেনবাবুর কি ভাল লাগবে তুই না গেলে? স্বাভাবিক হেসে ফেলল, হেসে বলল—বেশ তো, আমাকে যদি বলো আমিও যাবো।

না, তোকে বলব না।

শাস্তী হাসল, বাঁকা।

খানিকটা এটা মনের কথা শাস্তীর। সম্প্রতি এ বাড়িতে সে যে-কোনো এসেছে—যদিও এক-একদিন এক-এক সময়ে—তার মধ্যে চার-পাঁচদিনই দেখেছে স্বাভাবিককে এই প্রোফেসর ভদ্রলোকটির সঙ্গে বসে থাকতে। সে এলে স্বাভাবিক যেন একটা ইতি-উতি অবস্থা—একবার এ-ঘর একবার ও-ঘর—আবার তিনজনে একসঙ্গে বসতেও উশখুশ। এ থেকে যা ভেবে নেবার তা অবশ্য ভেবেইছিল শাস্তী, যদিও মজুমদারের ব্যাপারটা তখন তার মনে ততোহ্যে লেগেছিল বলে কাউকে কিছু বলেনি এ পর্যন্ত—বাবাকে না, স্বামীকেও না। মনে মনেই পুষছিল কথাটা, ভালই লাগছিল। মনে পড়ছিল নিজের—নিজেদের কথা। আহা, এই একটা সময় জীবনের! তার ইচ্ছে করে সত্যেনের সঙ্গে একা একা কথা বলতে, টিপে টিপে তার মনের কথা বের করতে—কিন্তু তার স্বামীটি যে সে রকম না, এ রকমের মেলামেশা ভালোবাসে না, আরো কম বাসে খরচ করতে। মজুমদার মানুষটা কিন্তু মন্দ ছিল না, যদি আসা-যাওয়াটা

রাখত অন্তত—যাঃ, ওর পরে তা আর হয় নাকি—সত্যি, স্বাতীকে বিয়ে করতে চেয়েই সব মাটি করে দিল মজুমদার। তখনকার মতো শাস্ত্রী ভুলে গেল যে মজুমদারের এই ইচ্ছায় সে-ই যোগান দিয়েছিল সবচেয়ে বেশি, আর এ-কথাও তার মনে হল না যে ঐ মানুষটাকে সে ভাবছে শুধু নিজের ইচ্ছা মেটাবার একটা উপায় হিসেবে, এই অসম্ভব আশা করছে তার কাছে যে যে-মেয়েকে সে চেয়েছিল কিন্তু পেল না, তাকেই ফুটিসে এগিয়ে দেবে অন্য একজনের দিকে। অনেক অসংলগ্ন, অনুচিত, পরস্পরবিরোধী ভাবনা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শাস্ত্রীর মনের উপর দিয়ে ভেসে গেল। তিন বছরের চেষ্টাতেও স্বামীর দলটির মধ্যে মিশিয়ে দিতে পারল না নিজেকে, এখন চেষ্টাও ছেড়ে দিয়েছে। বাপের বাড়িতে বাবা বুড়ো হচ্ছেন, আর স্বাতীটা একটু অন্যরকম মানুষ তো, আর বিয়ে হয়নি বলে অসুবিধেও অনেক—শাস্ত্রীর অসুবিধে। আনন্দের জায়গা বলতে এখন তার শ্বশুরবাড়িটাই। জা-দেওর-ননদ-নন্দাইতে বেশ ঝঝঝে এক-এক সময়, কিন্তু চালচলন তাঁদের সাবেকি। বাইরের জগতে মেয়েদের আনাগোনা এখনো পাড়ার দোকানে শাড়ি-জামা কেনা আর বাংলা ফিল্ম একটিও বাদ না-দেয়াতেই আবদ্ধ। ওখানে তার ভালো লাগে, কিন্তু হারীত যে ও-বাড়ি ছেড়েছে তাতেও সে মনে মনে খুশি। ঠিক তার মনের মতো একটা মেলামেশার জগৎ, যার স্বাদ ঐ অল্প কদিনের জন্য মজুমদার তাকে দিয়েছিল, এখন খুঁজে পাচ্ছে না কোথাও। সত্যেনকে দেখে, সত্যেনের সঙ্গে স্বাতীকে দেখে আবার নতুন করে আশা হল।

শাস্ত্রীর এই একটা চূপ করে থাকার সুযোগ নিল স্বাতী—দাদাকে ডেকে দেখবে নাকি আরেকবার? এবার তার চেষ্টায় কাজ হল, মনের বাঞ্ছা ডালা এঁটে শাস্ত্রী তখনই উঠল—হ্যাঁ, দেখি। যেন একটা মস্ত কাজ নিয়ে যাচ্ছে, যে কাজ আর কেউ পারবে না, এমনি চেহারা করে বেরিয়ে গেল। ফিরে এল মুখ লাল করে মিনিট দুই পরে—নাঃ! কত ডাকলাম, ধাক্কালাম—পাত্তাই নেই! শেষ পর্যন্ত ‘উঃ আঃ’ আওয়াজও শুনলাম দু-একবার, একটু দাঁড়ালাম, কিন্তু আবার চূপ!—সত্যি! ছোটোদের অবাধ্যতায় গুরুজনের মুখ যেমন গম্ভীর হয় তেমনি হল শাস্ত্রীর। স্বাতী বসে বসে ওসব ডাকাডাকি শুনেছিল, তার ফলও বুঝেছিল, তাই কিছু বলল না। অত ঘুমোতে পারে নাকি কোনো মানুষ! ঘুম কি আর না ভেঙেছে এতক্ষণে—ইচ্ছে করে শুয়ে আছে, ইচ্ছে করে জবাব দিল না পাছে কিছু করতে হয়। তুই ঠিকই বলিস স্বাতী, বিজুটা মানুষ না।

ও-কথা আমি কবে বলেছি? স্বাতীর আপত্তি শাস্ত্রী গ্রাহ্য করল না, আবার বলল—এত নড়ো একটা কাণ্ড ঘটে গেল—একটু বিকার নেই ওর মনে? দাদা যে একটাকে চূপচাপ মেনে নিয়েছে, তাতেই বরং স্বাতী স্বস্তি পেয়েছিল—বা ওর রোলারলি স্বস্তি! তাই বলল—কী আর করবে! পুরুষমানুষ—

আরে রাখ ও-সব! মনে লাগলে কেউ আবার চাপতে পারে! বিজুটা মানুষ না, ওর আত্মা নেই। কী রকম স্বার্থপরের মত থাকে দেখিস না—খায়, ঘুমোয়, তা ছাড়া আর সম্পর্ক নেই বাড়ির সঙ্গে! বলতে বলতে শাস্ত্রী বড়ো রেগে গেল ভাইয়ের উপর, হঠাৎ তার মনে হল স্বাতীকে বিয়ে করতে চাওয়ার দুর্বুদ্ধি বিজুই দিয়েছিল মজুমদারকে।—ও কি জানেও না বড়দি আসবেন?

জানে—স্বাতী সংক্ষেপে উত্তর দিল।

জানে তো জেগে-জেগে শুয়ে আছে কেমন করে—আর এত ডাকলাম! ভদ্রতা বলেও তো আছে একটা! স্বাতী বলল—সত্যি ঘুমোচ্ছে হয়তো।

কীসের! কোনো হাঙ্গামার মধ্যে থাকবে না, এই আর কী। শাশ্বতী থামল, দম নিল। তা এদিকে সব ঠিকঠাক তো?

ঠিকঠাকের আর কী!

বাঃ, এত লোক আসবে, তার একটা ব্যবস্থা আছে না! চল দেখে আসি। আবার কেজো ধরনে শাশ্বতী উঠল, ছোট্টো বাড়িটি ঘুরে এল রান্নাঘর পর্যন্ত। রান্নাঘরে হরি দুধ ফুটিয়ে রেখে, চা-বাসন সাজিয়ে, এখন সিঙাড়ায় পুর ভরছে বসে বসে—আসামাত্র ভেজে দেবে গরম-গরম; আর বারান্দায় বসে রামের-মা আনারস কাটছে, টুকরোগুলো বাঁটি থেকেই পড়ছে সাদা পাথরের থালায়, আর তার বাঁ দিকে একটি বুড়িতে পেঁপে, আপেল, কমলালেবু কত কী! কাজ খুঁজে না পেয়ে শাশ্বতী আবার ঘরের দিকেই ফিরল, চলতে চলতে বলল—কেমন লাগে রে তোর ভাবতে?

কী ভাবতে?

যে বড়দি আর—তঁার খাওয়া-পরা কিছুই তো আর আমাদের মতো থাকল না!

বাজে নিয়ম সব!

আজকাল অনেকেই তো মানে না ওসব। কিন্তু বড়দি বোধহয়—। ভাবতেই পারি না রে। ঐ সাদা কাপড়! শাশ্বতী থামল, নিশ্বাস ছাড়ল—কী রূপ বড়দির, আর কী-বা বয়স! বড়দির সম্বন্ধে এই অত্যন্ত সংগত, স্বাভাবিক সহানুভূতির কথা শুনে হঠাৎ জামাইবাবুর জন্য ভীষণ একটা কষ্ট হল স্বাতীর। ছোড়দি যেন জামাইবাবুকে প্রায় দোষ দিচ্ছে মরে যাওয়ার জন্য। সর্বনাশ হল বড়দির, কিন্তু সে তো শুধু মুখের কথা—কথার কথা; সত্যি সর্বনাশ হল অন্যজনেরই—যে মরল তারই সর্বস্ব গেল। স্বাতীর একটা ঝাপসা ধারণা হল যে শোকার্তের জন্য আমাদের যে সহানুভূতি জাগে, তাও মৃত মানুষটিকে ভুলে যাই বলেই, মৃত্যুকে ভুলে থাকি বলেই। মৃত্যু এত করেও পারল না মানুষকে দিয়ে তাকে মনে রাখাতে। দু-বোন এল বাবার ঘরে, সেখানে বাবার বড়ো খাটে আর শাশ্বতীর পুরোনো দিনের ছোটো খাটে পরিষ্কার বিছানা জেরি, বড়োটা সুজনিতে আর ছোটোটা চিকনপাটিতে ঢাকা, সব ঠিক আছে। বাবা কিছু ভোলেনি না, সময়মত সব করেন, করান, কারো জন্য ফেলে রাখেন না কিছু। রাখলে এখনকার মতো ভালো হত, কেননা ঘড়ির কাঁটা আটটার দিকে যত এগোল, ততই কমে এল দু-বোনের কথাবার্তা, আর কেমন একটা ছটফটানি শুরু হল দুজনেরই ভিতরে ভিতরে। একবার এখানে, একবার ওখানে একটু একটু করে বসে শেষ পর্যন্ত বাইরের ঘরে এল তারা। সেখানে চেয়ারগুলি তেমনি একদিক ঘেঁষে ঘেঁষে আছে, অন্য দিকে ডালিমের বিছানা তেমনি সুজনি-ঢাকা, টেবিলে বইপত্র গুছোনো। তার গোল টাইমপিসটিতেও রোজ দম দিতে ভোলেনি স্বাতী।

একটু দূরে দূরে বসল দু-বোন। শাশ্বতী বসেই বলল—দরজাটা খুলে দে, স্বাতী। স্বাতী উঠে গিয়ে রাস্তার দিকের দরজা খুলে দিয়ে আবার বসল। একটু পরে শাশ্বতী বলল—পরদাটা সরে গেল যে। টেনে দে। আচ্ছা, তুই থাক—শাশ্বতী নিজেই উঠল, পরদা টেনে দিয়ে বসল অন্য একটা চেয়ারে। একটু পরে বলল—গরম—না? স্বাতী উঠে পাখা খুলে দিয়ে আবার বসল অন্য একটা চেয়ারে। একটু পরে শাশ্বতী বলল—কী জোর হাওয়া... একটু কমিয়ে—

নিজেই উঠে পাখা কমিয়ে আবার বসল প্রথম যেটায় বসেছিল সেই চেয়ারে। বসেই চোখ পড়ল ডালিমের টাইমপিসটায়।—আটটা কুড়ি! শাস্তী যেন আঁৎকে উঠল। কুড়ি! স্বাতীরও গলা কেঁপে গেল, যেন আটটা বেজে কুড়ি মিনিট হওয়া আর কখনো সে শোনেনি।

পর-পর খানিকক্ষণ দুজনেই চেষ্টা করল গোলমুখো টেবিল-ঘড়িটার দিকে না তাকাতে, আর দু-জনেরই চোখ ঐ সাদা-কালো গোল মুখের উপরেই পড়তে লাগল বার-বার।

শাস্তী বলল—গাড়ি ঠিক কটায়?

ঠিক জানি না।

টাইমটেবল নেই? স্বাতী মাথা নাড়ল।

খবরকাগজ?

দেখছি। স্বাতী উঠল, খবরকাগজটা খুঁজে পেল খাবার টেবিলেই, নিয়ে এসে ছোড়দির হাতে দিয়ে একটা চেয়ারে বসল। তাড়াতাড়ি, ব্যস্ত হাতে, যেন এর উপর জীবনমরণ নির্ভর করছে, শাস্তী কাগজ ওল্টাতে লাগল।—কই রে?... কোথায়?... কী-কাগজ এটা?... এই-যে, পেয়েছি। নাম কী গাড়ির?—তা তো জানি না।

তাও জানিস না? শাস্তী প্রায় খেঁকিয়ে উঠল। ঢাকা মেল—না, ঢাকা মেল কী করে হবে—মৈমনসিং থেকে তো—মৈমনসিং থেকে কোন গাড়িতে পৌঁছয় জানিস না? স্বাতী উত্তর দিল না।—কী মুশকিল! কাগজটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলল শাস্তী। স্বাতী নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে একটা পাতা তুলে নিল, হাঁটুর উপর ছড়িয়ে চোখ নামিয়ে রাখল সেখানে।

শাস্তীও নিচু হল আর একটা পাতা তুলে নিল, কিন্তু সেটা চোখের সামনে না ধরে হাতের মধ্যে গোল করে পাকাতে লাগল আর খুলতে লাগল, আর কয়েকবার এ রকম করার পর হঠাৎ তার হাত থেমে গেল, একটু শাস্তভাবে বলল—আমার মনে হচ্ছে ঠিক সময় হয়েছে এতক্ষণে।

নাকি? স্বাতী কাঁপল, তাকাল, উঠল—সঙ্গে সঙ্গে শাস্তীও উঠল। শাস্তী দেখল স্বাতীর মুখ ফ্যাকাশে, ঠোট শুকনো। স্বাতী দেখল শাস্তীর মুখ সাদা, ঠোট ফ্যাকাশে। তারপর কোমল কথোনা বলে দুজনেই বসে পড়ল আবার—শাস্তী যেটায় বসে ছিল স্বাতী বসল সেটায়, আর স্বাতী যেটায় বসে ছিল সেটাতে বসতে গিয়েও ফিরল শাস্তী, স্বাতীর ঠিক পাশের চেয়ারটায় বসল। কথোনা বলার চেষ্টাই আর করল না তারা। দুজনে বসে থাকল পাশাপাশি—দুজনেই তাকিয়ে থাকল সামনের দিকে... দরজার দিকে, পরদার ফাঁকে রাস্তার দিকে... দুজনেই শুকনো সাদা ফ্যাকাশে, আর দু-জনেই ভিতরে ভিতরে কাঁপছে। পাশাপাশি, কুছকুছ, প্রায় হাতে হাত ছুঁয়ে, অথচ কেউ কারো দিকে না তাকিয়ে, আর একটুও না নড়ি, এমন করে তারা বসে থাকল যে রাস্তা থেকে কারো চোখে পড়লে তার মনে হত যে বিশেষ কোনো মনোহর ভঙ্গিতে ছবি তোলাতে বসেছে দুই তরুণী। কিন্তু মেরুনরঙের ট্যাক্সিটা যখন বিলিক দিল জানলায়, দুজনে শাস্ত উঠল, আস্তে হাঁটল—যদিও কেউ কারো দিকে তাকাল না—কয়েক পা মেঝে পার হয়ে পরদা ঠেলে বেরোল, দাঁড়াল বাইরের সিঁড়িতে, পাশাপাশি, কেউ কারো দিকে না তাকিয়ে। প্রথমে লাফিয়ে নামল আতা-তাতা দুই বোন—কত বড়ো হয়ে গেছে!—তারপর ছোটন, কী কমে এঁটেছে হাফপ্যান্টের বেল্টটা!—তারপর গান্ধিটুপি এঁটে লম্বা, গম্ভীর, দায়িত্বপূর্ণ ডালিম—টুপি কেন? বাঃ, ন্যাড়া হয়েছিল না? আর ভাতে-ভাত খেয়ে মোটাও হয়েছে!—সেবারে তাকে

আনা হয়নি, আর এবারে সে-ই নিয়ে এসেছে সকলকে—আর একটা ট্যান্সিতেই সকলকে ধরে গেছে এবার। বাবা নামলেন বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে—এমন আর বাচ্চা কী এখন, আর কী রকম হাসছে সাদা সাদা দাঁত দেখিয়ে—কী মিষ্টি! অন্য সব কথা ভুলে গেল স্বাতী, সিঁড়ি থেকে রাস্তায় নামল, বাবার কোল থেকে নিজের কোলে নিল, বুকে চেপে ধরল, গালে চুমু খেল। আর এই নতুন মানুষটির মুখের দিকে একবার মাত্র চোখ ফেলেই সরু, ছোটো, কিন্তু বেশ জোরালো গলায় হঠাৎ কেঁদে উঠল বাচ্চাটি।

ছি-ছি, মাসির কোলে গিয়ে নাকি কাঁদে! মাসি—ছোটোমাসি—স্বাতী গলা শুনে চোখ ফেরাল। সাদা—সাদা কাপড়—সাদা সিঁথি—কিন্তু বড়দি...। চোখে দেখার প্রথম মুহূর্তটিকে আবছা লাগল স্বাতীর। ওকে দে আমার কাছে—বলে শ্বেতা সুখী, দুঃখী, হাসি-হাসি, ছলছলে, ছলোছলো চোখে স্বাতীর দিকে একটুখানি তাকিয়ে একটুখানি আদর করল তার গালে। স্বাতী কেঁপে উঠল, চোখ নামাল, কয়েক ফোঁটা চোখের জল দৌড়ে নামল পর পর তার গাল বেয়ে। বাচ্চাকে নিয়ে সিঁড়ি উঠে শ্বেতা বলল—কী, শাস্বতী? বিজু কই? বিজু—শাস্বতী একটা মিথ্যে বানাবার চেষ্টা করল, কিন্তু দরকার হল না। ঠিক যখন শ্বেতা বাড়িতে ঢুকছে, সেই মুহূর্তটিতে ভিতর থেকে ছুটে এল বিজু, এইমাত্র ঘুমভাঙা, এলোমেলো চুল, কাপড়টা লুঙ্গির মতো করে কোনোরকমে জড়ানো, গায়ে একটা বোতাম খোলা, বুকের চুল দেখানো ডোরাকাটা রঙিন বিলেতি রাত-জামা। বড়দিকে দেখেই একটু থমকে দাঁড়াল সে, আর সঙ্গে-সঙ্গে তার মুখের বিস্মী, বদ, বাঁকাচোরা একটা চেহারা হল, হঠাৎ ঘোড়ার মতো লাফিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলো বাচ্চাসুদ্ধ বড়দিকে... হাউহাউ করে লুটিয়ে কেঁদে পড়ল—ও—ও বড়দি! ও—ও জামাইবাবু! জামাইবাবু—উ!

বিজুর ধাক্কায় বাচ্চাটি প্রায় পড়ে যাচ্ছিল কোল থেকে, শ্বেতা কোনোরকমে সামলে নিল, চেষ্টা করে সরে দাঁড়াল আর বিজু যেন আশ্রয় হারিয়ে এলিয়ে পড়ে গেল শ্বেতার পায়ের কাছে মেঝেতে। ওঠার চেষ্টা করল না, মুখ ঢাকল না, কান্নার বেগে অবিশ্বাস্য সব ভঙ্গি হতে লাগল তার মুখের, আর ভাঙা, চড়া, সাংঘাতিক আওয়াজে এক একটা খাবি-খাওয়া কথা বেরোতে লাগল তার গলা দিয়ে—জামাইবাবুর মতো... আর কে! কে আমাকে টাকা দিয়েছিল... কার টাকা নিয়ে আমি আজ...ও...ও জামাইবাবু... ওঃ, হো-হোঃ! দু-হাঁটু উঁচু করে, দুহাত পিছনে ছড়িয়ে, দুহাতে মেঝে আঁকড়ে, রঙিন-ডোরাকাটা বোতাম-খোলা জামার ফাঁকে বুকের কালো-কালো চুল দেখিয়ে—বসে-বসে বিকটভাবে কাঁদতে লাগল বিজন। ট্যান্সি বিদ্যেয় হয়নি তখনো, প্রকাণ্ড শিখ ট্যান্সিওলা দাড়িগোঁফের ঝোপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, রাজেনবাবুও রাস্তায়, হরি মাল তুলতে-তুলতে থেমে গেছে, স্বাতী আর ডালিম উঠতে-উঠতে থমকে গেছে সিঁড়িতে, রাস্তাতেও দাঁড়িয়ে গেছে দু-একজন। দরজাটা হাঁ-করা, পরদাটা সরানো, সকলেই দেখছে, শুনছে, আশেপাশের বাড়ি-কটিতেও পৌঁছেছে বিজনের এই আন্তরিক, অকৃত্রিম, মর্মস্পর্শী শোকোচ্ছ্বাস। ঘরে শাস্বতী দাঁড়িয়ে থাকল অবাক, আতা-তাতা, ছোটন গোল-গোল চোখে তাকিয়ে থাকল অবাক, শ্বেতা চেষ্টা করল এক হাতে ভাইকে আরেক হাতে বাচ্চাকে সামলাতে। আর বাইরে ডালিম ঘন-ঘন তাকাতে লাগল ছোটোমাসির দিকে, কিন্তু ছোটোমাসি মুখ তুললেন না, নড়লেনও না, আর সেও তাই আর কিছু ভেবে না পেয়ে সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে থাকল রাস্তার দিকে পিছন দিয়ে, আর দুজনের মাঝখানে সাবধানে পথ করে শেষ মালটা ঘরে তুলল হরি। রাজেনবাবু ভাড়া

মেটালেন, গাড়ির ভিতরটা দেখলেন, আর ট্যাক্সির সঙ্গে-সঙ্গে প্রকাণ্ড শিখ চলে যেতেই গলিটা হাঁফ ছাড়ল। রাজেনবাবু ঘরে গেলেন না, সিঁড়িতে উঠলেন না, বিজুকে চোখে দেখেও দেখলেন না, কানে শুনেও শুনলেন না। বিজুর কথা কিছুই ভাবছিলেন না তিনি, আর কিছুই ভাবছিলেন না। ঘুম ভেঙে প্রথম যে-কথা আজ মনে পড়েছে, আর তার পরেও বার-বার, সে কথাই ভাবছিলেন আবার। বেলেঘাটার গরিব বাড়িতে সেই আঁতুড়ঘর, দরজায় দাঁড়িয়ে সেই প্রথম দেখা, দাইয়ের কোলে এইটুকু একটা ছোট্টো লাল শরীর আর খাটের উপর এলানো চুল, চোখবোজা সাদা মুখ, লেপের বাইরে সাদা একটি হাত। সেই সাদা দেখে ‘শ্বেতা’ কথাটা মনে এল... সেই শ্বেতা।

৪

আবার পূজোর ছুটি, আবার কলকাতার বাইরে যাওয়ার ধুম। রেলটিকিট এবার যেন অন্যবারের চেয়ে সস্তা। রাস্তায় বেরোলেই চোখে পড়ে পিছনে মাল-বাঁধা ট্যাক্সি। শাস্ত্রীর স্বশুরবাড়ির দল দেওঘর গেছে, স্বশুরের বাড়ি আছে সেখানে। হারীত-শাস্ত্রীরও যাবার কথা ছিল হারীতের ছুটি হলেই, কিন্তু আপিশের শেষ দিনটিতে বাড়ি ফিরে হারীত জানাল, তার যাওয়া হল না। শাস্ত্রী বলল —কী হল?

এখানেই থাকতে হচ্ছে আমাকে।

কেন?

অগ্রণী-সংঘের নাম বদলে প্রতিরোধ-সংঘ হল, কিন্তু তাতেই তো হল না, নতুন করে গড়তে হবে সমস্তটা। কথা হচ্ছে কবে থেকেই, কাজ কিছু হয়নি। কিন্তু এখন আর দেরি না। এই ছুটিতেই—বসে থেকে ঠান্ডানি আসছেন এইজন্য। এদিকে মকরন্দ চলে যাচ্ছে বিপ্লিবকম। তাহলে তুমি কেন যেতে পার না?

সেইজেন্যেই। মকরন্দ বড্ডো খেটেছে ক-মাস, ডাক্তার বলেছে বিশ্রাম নিতে। ওকে যেতেই হবে। মকরন্দ মুখুয়ের তিন-ডবল তো তুমি খাটো।

তর্ক করো না। হারীত কথা বলছিল ঘরের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে। প্রথম কোট খুলে হ্যান্ডারে ঐটে ব্রাকেটে লটকাল, তারপর আলনার ধারে এসে জুতো ছাড়ল, টাইটাকে ঝুলিয়ে দিল আলনার গলায়, তারপর টেবিলের ধারে এসে দেখল কোনো চিঠিপত্র আছে কিনা। তার চেয়ারটায় শাস্ত্রী বসে ছিল হাতলে হাত রেখে। জিগস ক্রস—বসবে?

না না, তুমি বোসো। আমি— হারীত আবার চলল বাথরুমের দিকে—আমার যাওয়া হল না তা তো দেখছ, তুমি যাও। শেষের কথাটা বলল বাথরুমের দরজা থেকে মুখ ফিরিয়ে। কিন্তু হারীতের কথা শোনার জন্য ঘরের মধ্যে নানা জায়গায় শাস্ত্রী তার চোখকে আর পরিশ্রম করাল না।

চা খেতে খেতে হারীত আবার কথা তুলল—আগে জানলে ওদের সঙ্গেই তোমাকে পাঠিয়ে দিতাম। কিন্তু ঠান্ডানির টেলিগ্রাম আজই মাত্র এল। শাস্ত্রী বলল—এখান থেকে দেওঘর আমি একাও যেতে পারি।

নিশ্চয়ই! হারীত খুশি হল—দিনের গাড়িতে যাবে, এখান থেকে আমি তুলে দেব, ওখানে ওরা

স্টেশনে থাকবে। বদল-টদল নেই—মুশকিল আর কী! কবে যেতে চাও? কাল?

আমি যাব না।

যাবে না? কেন?

না যাব না।

হারীত পর-পর তিনটে-চারটে বেগুনি খেয়ে ফেলল। কেন যে এসব মান-অভিমানগুলো এখনও যাচ্ছে না দেশ থেকে! হারীত একদম পছন্দ করে না এসব। শুধু যে পছন্দ করে না তা নয়, এর সামনে পড়লে অসহায় লাগে নিজেকে। কী করতে হবে, বলতে হবে বোঝে না, যেন বোকা বনে যায় আর তাইতে ভিতরে-ভিতরে এমন রাগতে থাকে যে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত বিত্রী হয়ে ওঠে তার জন্যই। রাগের চড়তি মুখটাকে মনে মনে চেপে ধরে নরম সুরে বলল—
যাবে না কেন? ভাল লাগবে তোমার, আর শরীরও সারবে।

আমার কি অসুখ নাকি, যে সারবে?

না, না—এই তো একঘেঁয়ে জীবন, আর খাঁচার মতো ফ্ল্যাট—মাঝে মাঝে বাইরে একটু ঘুরে মলে তবু—

আমার একঘেঁয়ে লাগে না।

হারীত বিলেতি ধরনে হাতের পাতা উলটিয়ে বুঝিয়ে দিল এসব বাজে কথা'র সময় তার নেই। ইংরেজিতে বলল—যা তোমার খুশি। তারপর বাংলায় বলল—আমি শুধু এই বলতে চেয়েছিলাম, যে আমার জন্য তোমাকে আটকে থাকতে হবে না। তুমি স্বাধীন, নিজের ইচ্ছেমত চলবে।

যদি বলি তুমি যাবে না বলেই আমার যাবার ইচ্ছে নেই? হারীত নিচু হয়ে চা খাচ্ছিল, একটানে মুখ তুলল স্ত্রীর দিকে। বাঁকা হেসে জবাব দিল—তাহলে আমি বলব তোমার অসুখ করেছে, আর সে অসুখ সারাবার জন্যই তোমার যাওয়া উচিত। এবার শাস্বতীও হাসল একটু বাঁকা করে।—আমি গেলেই তুমি যেন খুশি হও?

ও! ঐ একটিমাত্র জোরালো আওয়াজ করেই হারীত তার মনের ভাব ব্যক্ত করল। আবার জুতো-টুতো পরে হারীত পাঁচ মিনিটের মধ্যে বীরদর্পে বেরিয়ে গেল। কোথাও ফাঁদার কথা ছিল না সেদিন; বাড়িতেও কোনো কাজ ছিল না, অনেকদিনের মধ্যে এই একটা সন্ধ্যা ফাঁকা ছিল তার, আর সত্যি বলতে, মনে মনে সে এ-ই ভেবেছিল যে সন্ধ্যার পর শাস্বতীকে নিয়ে বেরোবে দরকারি কয়েকটা জিনিস কিনতে—নিউ মার্কেট আসবে, শাস্বতী আবার ভালবাসে নিউ মার্কেটে বেড়াতে। সব ঠিক হয়েও দেওঘরে যাওয়া হল না। এটা শাস্বতীর খারাপ লাগবে বলেই তার খারাপ লাগছিল, তবে শাস্বতীর আশাভঙ্গ হবেনা, তার যাবার ব্যবস্থা করে দেবে, এমনকি, দুটো দিন ছিনিয়ে তাকে দেওঘরে রেখেও আসবে—এও সে ভেবেছিল মনে মনে। কিন্তু যে রকম ভেবেছিল সে রকম কিছুই হল না। উল্টোটাই হল। তার দোষ? শাস্বতীর দোষ? হারীত একা-একাই নিউ মার্কেটে এল। নিজের জন্য দুটো গোঞ্জি, ক্যালিকো মিলের আধ-ডজন কমাল, আর শাস্বতীর জন্য দুটো রঙিন কাঁচুলি আর একটা খোঁপার জাল কিনল—এসব আবার বালিগঞ্জে পাওয়া যায় না—আর ফাঁকে ফাঁকে এ-কথাটা ভাবল একটু। না, কারোরই দোষ না, এ-ই নিয়ম। এরকম হয়েছে অনেকবার এর আগে—এরকমই হবে এরপরে অনেকবার, আরো অনেকবার। যা ভাবা যায়, যার জন্য মন তৈরি থাকে, ঠিক তার উল্টোটাই হবার।

পর-পর সাজানো আছে সব—গুম হয়ে থাকা, থমথমে হাওয়া, তারপর রাত্রে, কোনো এক রাত্রে সব ভুলে যাওয়া, সব ফিরে পাওয়া। কিন্তু সে আর কতক্ষণ, ক-মিনিট? তারপর ক্লান্ত হয়ে ঘুম, আর ঘুমের পরে দিন। আর পরের দিনই যদি আবার কিছু ঘটে, তুচ্ছতম কিছু, তাহলে আবার তা-ই, ভাবনার উল্টো, ইচ্ছার উল্টো, মুখ-ভার, মন-ভার, অস্বাস্থ্যকর স্যাংসেঁতে হাওয়া, তারপর আবার রাত্রি। কী ক্লান্তিকর দাম্পত্য!

সে রাত্রেও তাই হল। আর তারপর শাস্ত্রী খুব ছোট্টো গলায় বলল—আমি চলে গেলে তুমি খুশি হও?

কী সব বাজে—!

আমি থাকলে তুমি খুশি হও? আমি চলে গেলে তোমার কষ্ট হবে আমার জন্য? হারীত বিছানার মধ্যে নড়ল একটু। কী সব প্রশ্ন—মাথায় একটু মগজ থাকলে কী হয়?

বলো না!

বাজে কথার আমি জবাব দিই না।— হারীত এমনভাবে কথাটা বলল যেন উদ্ভট স্বতঃসিদ্ধ, তাই না বললেও চলে। কিন্তু শাস্ত্রী তাতে তৃপ্ত হল না। —না, বলো। আমি চলে গেলে কষ্ট হবে তোমার? অন্ধকারে শাস্ত্রীর চোখ স্পষ্ট দেখতে পেল হারীত। নিজের চোখ বুজে ফেলল, ভাবল মিথ্যে... মিথ্যে না বলিয়ে কিছুতে ছাড়বে না? আর মিথ্যেটা শুনলেই কি খুশি হবে? এড়িয়ে বলল—কর্তব্যের কাছে কষ্টকে আমি গণ্য করি না।

কোনটা তোমার কর্তব্য?

ছুটিতে কলকাতায় থাকা।

আর আমার কর্তব্য দেওঘর যাওয়া?

না, তোমার কর্তব্য এই— বলে হারীত সরে এসে স্ত্রীর বালিশে মাথা রাখল। কর্তব্যকে অবহেলা করতে পারল না শাস্ত্রী। থায় এক মিনিট পরে নিশ্বাস ছাড়ল, লম্বা নিশ্বাস, সুখের। আর হারীতও ছোট্টো, গোপন একটা নিশ্বাস ছাড়ল একেবারে স্পষ্ট মিথ্যেটা বলতে হল না বলে। তার জিতটাকে পাকা করার জন্য ওখানেই শুয়ে থাকল। গুনগুন নরম আওয়াজে শাস্ত্রী বলল—দ্যাখো, আমাদের যাওয়া হল না, ভালই হল।

ভাল কেন?

এই সেদিন বড়দির এ রকম—আর এর মধ্যেই আমরা ফুটি করে বেড়াতে যাব—মনটা কেমন লাগছিল আমার। জীবনের উষ্ণতা, পরম উষ্ণতার তলানিটুকু চাখতে চাখতে ইঠাৎ বড়দির জন্য একটা বুকভাঙা কষ্ট হল শাস্ত্রীর, তার এখনকার এই সুখটাকে যেন অপরাধের মতো লাগল। সুখের সঙ্গে দুঃখ মিলে সুখের স্বাদ বাড়ল। স্বামীর সঙ্গে নিজেকে একেবারে এক মনে হল, যেমন আগে কখনো হয়নি। মুখ-চাপা আবছা গলায় বলল—সত্যি, স্বামী না থাকলে মেয়েদের কিছুই থাকে না। সেই পুরোনো কথা! হিন্দুধর্মের ভূত! কিন্তু তার যুক্তি, তর্ক, আপত্তির তৈরি ফৌজটাকে হারীত ঝকুম ছাড়লো না, ঘুম ছড়াচ্ছিল চোখে, তাছাড়া সেই মুহূর্তটিতে তারও অলস লাগছিল, তারও... অলস আর সুখী। ছোট্টো নিশ্বাসের সঙ্গে শাস্ত্রীর কথা বেরোল— বড়দির দেওরদের কথা তো শুনেছ? কী যেন একবার শুনেছিল, ঘুমের সিঁড়িতে হাঁচট খেল হারীত। —হ্যাঁ—এ-রকমই তো— বলতে বলতে হারীত নেমে এল জাগার সমতলে— হিন্দু বিধবাকে কে না ঠকিয়েছে মনু-মাক্কাতার আমল থেকে আজ পর্যন্ত! ভূতের ল্যাঞ্জে শুড়শুড়ি

দেবার সুখটাকেও শেষ পর্যন্ত হাতছাড়া করল না।—আর এই ভাইদের জন্য জামাইবাবু শুনেছি...বৈমাথ্রেয় তো, বয়সে অনেক ছোটো, বলতে গেলে বড়দির কাছেই মানুষ তারা।—সেই তো! হারীত কথা বলার জন্য সরে এল নিজের বালিশে।—আমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলি মানেই তো এই! সকলের জন্য সব করো, নিজের স্ত্রীপুত্র ভাসিয়ে দাও! তবু কি চোখ খোলে আমাদের! প্রমথেশবাবু বোধহয় রেখেও যাননি বেশি কিছু?

সে রকমই তো গুনলাম—শাস্ত্রী সুরু গলায় কবুল করল, যেন তারই দোষ এটা। হারীত একটু গড়াল, তারপর বালিশের তলায় হাত দুটো ঢুকিয়ে উপুড় হল। এটা তার ঘুমের আগের সবচেয়ে আরামের শোওয়া। শাস্ত্রীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—এত অপব্যয়! হারীতের কথায় অনেকটা সহানুভূতিও ছিল, কিন্তু শাস্ত্রীর একটু ব্যথা লাগল। জামাইবাবুর অপব্যয়ের ফলে সেও তো সুখী হয়েছিল কত, আর এই সুখী হওয়া সুখী করাটাই কি পৃথিবীর সবচেয়ে বাজে? বাবার কাছে যা শুনেছিল তাই শোনাতে চাইল স্বামীকে। খুব নিচু গলায়, যে সুরে কোনো ভদ্রলোকের কোনো গোপন বদভ্যাসের উল্লেখ করে আরেকজন ভদ্রলোক, সে রকম লাজুক সুরে বলল—শুধু অপব্যয় নয়, অনেক দিয়েও দিতেন।

দিয়ে দিতেন!

এই সাহায্য করতেন আর কি অনেককে। অনেক দুঃস্থ পরিবার, গরিব ছাত্র—যে এসে যখন চাইতো—

সেটা তো আরো অপব্যয়! হারীত অস্ফুট হাসল। এত অভাব সংসারে—কতটুকু তার মেটাতে পারে একজন মানুষ? কিছুই হয় না, লাভের মধ্যে সেও গরিব হয়ে পড়ে। এর একমাত্র উপায় হচ্ছে এমন ব্যবস্থা যাতে গরীব কেউ থাকবে না... অবশ্য বড়লোকও না! কথাটা শেষ করে হারীত ভাবল যে—ব্যাক্ যেটা সে মাসে মাসে জমাচ্ছে, সেটাকে আদ্বৈত করে আর একটা ইনশিওরেন্স পলিসি নিলে হয়। হঠাৎই মরে গেলে কিন্তু ইনশিওরেন্সেই দারুণ লাভ। এর পর শাস্ত্রী আর কথা বলল না, চুড়ির রুনঠুন আওয়াজ করে পাশ ফিরল। হারীতও চোখ বুজল, ভাবতে আরম্ভ করল—প্রতিরোধ-সংঘের ব্যাপারে কী-কী করবে। কিন্তু একটু পরে আবার গুনল চুড়ির আওয়াজ। শাস্ত্রীর গলা এল—ঘুমোলে?

না—হারীত চোখ বুজেই জবাব দিল। একটু নড়েচড়ে শাস্ত্রী বলল—বিজুকে তুমি দু-হাজার টাকা দিয়েছিলেন জামাইবাবু।

বিজনকে? হারীত চোখ খুলে তাকাল—কেন?

বিজু চেয়েছিল আর কি। এতদিন কেউ জানত না, বিজু নিজেই বলে ফেলল সেদিন।

ঘুম ছুটে গেল হারীতের, অনুশোচনার কামড় পড়ল মনে। এত সোজা! তাহলে সেও তো পারত পার্টির জন্য মোটরকম একটা চাঁদা বাগাতে। পার্টির ঠিক নাম না করে একটু ঘুরিয়ে বললেই নিশ্চয়ই দিতেন। ঈশ—এমন একটা সুযোগ পেয়েও হারাল! ঐ বিজন—তাকে এক কথায় দু-হাজার! আর তার কিনা একবার মনেও হল না কথাটা! লোকটাকে ফ্যাসিস্ট ঠাউরে গর্জাল শুধু! সত্যি—ঠান্ডানির মতো ঠান্ডা মাথা হলে তবে তো কাজ হয়! বিছানায় উঠে বসে হারীত বলল—বিজন করছে কী টাকা দিয়ে?

ওতো বলে ব্যবসা করছে।

কীসের? হারীত এ প্রশ্ন ছাড়তে পারল না।

আমি ঠিক জানি না। কী সব যুদ্ধের—

যুদ্ধের? ভাল।

ভাল? এ নিয়ে তো বাবার আর এক অশান্তি—

কেন?

ওসব নাকি চুরি-জোচ্চুরির হরির লুঠ? হারীত দরাজ হাসল। অন্ধকারে শাস্ত্রী দেখতে পেল তার সাদা দাঁতের সারি। জিগেস করল—তা নয়?

বাবাদের ও-রকম মনে হলেও ছেলেরা কি আর বসে থাকবে? আর যুদ্ধের কাজে সাহায্য করা এখন প্রত্যেকেরই কর্তব্য। রাশিয়াকে বাঁচাতে হবে, যেমন করে হোক! বিজু কিছু একটা করে হিটলারকে হটিয়ে দিচ্ছে, এটা কল্পনা করা শাস্ত্রীর পক্ষে শক্ত হল। চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে বলল—তুমি বসে আছ কেন? শোও না।

হ্যাঁ, শুই। শুতে-শুতে বলল—বিজু বেশ কাজের ছেলে দেখছি।

সে কি আর এমনি-এমনি—ওকে চালাচ্ছে প্রবীর মজুমদার।

কে? ও—সেই মজুমদার! তাহলে তো স্বাধীনতার সঙ্গে তার বিয়ে হলে ভালই হত। হল না কেন? কথা শুনে শাস্ত্রী স্তম্ভিত হল। একটু পরে বলল—বিয়ে তো দু-জনের। তার মধ্যে একজনের অমত থাকলে কী করে হয়! হারীতের মনে পড়ল, এরকম একটা কথা করে যেন সে-ই বলেছিল শাস্ত্রীকে। তাড়াতাড়ি বলল—তাও তো বটে। স্বাধীনতার বেজায় রোমান্টিক। কবিতা-টবিতা পড়ে। ভাল না।

ভাল না কেন?

প্রশ্নের উত্তর দিল না হারীত। একটু এপাশ-ওপাশ করে স্থির হল বিছানায়, ঘুম-জড়ানো গলায় জিগেস করল—মজুমদারের আর সাড়া-শব্দ নেই?

নাঃ!

আর স্বাধীনতা কী বলে?

কী আবার বলবে! শাস্ত্রী পা ওটিয়ে শুলো ঘুমের জন্য তৈরি হয়ে। —কাল একবার যাবে? উ?

ও বাড়িতে কাল—

হঁ।

যাবে?

হ্যাঁ, চুপ করো এখন...বড্ডো— কথা শেষ না করেই হারীত ঘুমিয়ে পড়ল।

শাস্ত্রী একা জেগে রইল চোখ বুজে। রায়ে শুয়ে-শুয়ে এতগুলি কথা স্বামীর সঙ্গে বলল অনেকদিন পর। বোধহয় সেইজন্যই, আর স্বামীর সঙ্গে একটা নতুন, নিবিড় ঐক্যবোধের ফলে চোখে যেন একটুও আঠা ছিল না তার। এতক্ষণ যাদের নিয়ে কথা বলেছে তাদের কথা আবার ভাবল, পর-পর ভেসে উঠল তাদের মুখ বোজা-চোখের অন্ধকারে। বড়দি-জামাইবাবু-বাবা-বিজু-মজুমদার-স্বাধীনতা। আর তারপর, যদিও তাকে নিয়ে কোনো কথা হয়নি, তবু সত্যেন রায়কেও মনে পড়ল শাস্ত্রীর, ঘুমোবার আগে সত্যেন রায়কেও সে ভাবল একটু।

রায়ে শেষ যে কথা বলেছিল, বলতে চেয়েছিল, পরদিন সকালে সে-কথাই আবার বলল— একবার যাবে নাকি ও-বাড়িতে?

এখন? তক্ষুনি পৌঁছনো একটা চিঠি পড়তে পড়তে হারীত জবাব দিল।—এখন আমাকে ছুটে হাচ্ছে শ্যামবাজার। চিঠিটা খামে ভরে বলল—তুমি যাও।

আমি তো যাবই। রোজই যাচ্ছি।

আমিও যাব, হারীত আপসা হাসল, কাল—নিশ্চয়ই!

বড়দি আসার পর সেই একদিনের পর তো আর যাওনি। এখন ছুটি হল, গেলে পারো মাঝে মাঝে।

যাব।

বড়দি, মনে হচ্ছে, এখানেই থেকে যাবেন, বলে শাস্তী হারীতের দিকে তাকাল, কিন্তু মুখ দেখতে পেল না, কারণ হারীত তখন নিচু হয়ে টেবিলের দেরাজে কী খুঁজছে। নিচু হয়েই জবাব দিল, তাহলে আর তাড়া কী। কথাটা হারীত বুঝল না দেখে শাস্তী একটু দেরি করল। দেরাজ থেকে কয়েকটা কাগজ বের করে যখন সে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তখন আবার বলল—বাবা বোধহয় বড়দিকে তাঁর কাছেই রাখবেন।

বাবার?

তাই তো মনে হয়। আর তা-ই তো ভাল—কী বল?

একটু হেসে হারীত যেন বোঝাতে চাইল এ বিষয়ে জ্বর সঙ্গে তার মতভেদ নেই। হারীত শুনতে চাচ্ছে না, অন্য কথা ভাবছে, তা বুঝেও শাস্তী কথা না বলে পারল না। নিজেই প্রশ্নের জবাব দিল—ভাল বইকি! দেওরদের দয়ার চাইতে হাজারগুণে ভাল। কিন্তু বাবার আর ছুটি হল না। কোথায় এখন পেনশন নিয়ে জিরোবেন, এর মধ্যে কী হয়ে গেল!

শিগগিরই পেনশন?

বাঃ, তোমাকে বললাম না সেদিন—

ও, হ্যাঁ। হয়েই গেছে, না?

তা বলতে পারো। লম্বা ছুটি চলছে এখন, তারপরেই—

তাহলে তো—হারীতের কপালে রেখা পড়তে পড়তে মিলিয়ে গেল, তখনই আলোর দিকটা দেখতে পেল সে। তা পেনশন তো আছে—বসে বসে... তাকে মাইনে কম কথা না, আমাদের সব চাকরিতে তো কিছুই নেই—কী যে হবে বুড়ো বয়সে! আর তোমার বড়দিও ওখান থেকে কিছু তো পাবেন?

—কিন্তু দায়িত্ব বাবারই তো, প্রকাণ্ড দায়িত্ব। তাই তো আমি বলি, বাবাকে—তুমি ভেবো না, আমরা তো আছি। ‘আমরা’ মানে এখানে কে-কে, আর ‘আছি’ অর্থই বা কী, সেটা একটু চিন্তা করে হারীত সাবধানে জবাব দিল—এসব নিয়ে বেশি ভাবাই ভুল, কিছু করবার নেই যখন।

তা কেন? শাস্তী তখনই বলল। আমরা যে কাছেই আছি, সুখে-দুঃখে সবটাতেই আছি, এই তো অনেক। আর বড়দির দিকটাও ভেবে দ্যাখো! চোদ্দ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, সেই বাড়ি... সেই সব, তাঁরই সব—আজ হঠাৎ এক কথায় ছেড়ে চলে আসা কি সোজা কথা? জ্বর মুখে ‘আছি’র ব্যাখ্যা শুনে হারীত আশ্বস্ত হয়েছিল, অমায়িকভাবে বলল—সে তো সত্যি। আর তাই তো ওখানে যেতে কেমন অপ্রস্তুত লাগে আমার। ওসব সাস্তনা-টাস্তনা আমার আসে না, জানো তো। সাস্তনা! শাস্তী গভীর হয়েই কথা বলছিল, এবার আরো গভীর হল।—

এর কি কোনো সাস্থনা আছে, আর কাকেই বা সাস্থনা? দরকার হলে তোমাকেই সাস্থনা দিতে পারেন বড়দি। বড়দি আশ্চর্য! হারীত আলগোছে একটু বসেছিল চেয়ারটায়, হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। অনেক হয়েছে গার্হস্থ্য জীবন—এখন পৃথিবী তাকে ডাকছে। তাড়াতাড়ি বলল—আচ্ছা, চলি। শাস্থতী বলল—আমিও যাই।

নড়াচড়ার হাওয়া দিল ঘরের মধ্যে। দু-জনে দু-কোণে পরস্পরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে কাপড় পরল। শাস্থতীর পিছনে দাঁড়িয়ে আলমারির লম্বা আয়নায় চুল আঁচড়ে নিল হারীত। হারীতের মনিব্যাগ থেকে শাস্থতী কিছু খুচরো নিল তার হলদে হাতব্যাগে। ট্রামস্টপে দাঁড়িয়ে শাস্থতী জিজ্ঞেস করল —তোমার ফিরতে ক-টা হবে?

ঠিক নেই। অনেক ঘোরাঘুরি আছে।

আমি বারোটোর মধ্যে ফিরব।

বেশ।

ট্রাম খালি ছিল, পাশাপাশি বসতে পেল দুজনে। হারীত ভাবল—যা ভাবতে গিয়ে কাল রাতে বাধা পেয়েছিল—ঠান্ডানি পৌঁছবার আগেই কতটা গুছিয়ে রাখতে পারবে চারদিক; আর শাস্থতী ভাবল—সেই বড়দির কথাই ভাবল। তারও ভয় ছিল হারীতের মতোই, কিন্তু হারীত তো সে-দৃশ্য দ্যাখেনি, বিজুর সেই হাত-পা ছোঁড়া চ্যাঁচামেটির দৃশ্য! এক ঘর স্তম্ভিত মানুষের মধ্যে বড়দিই টেনে তুললেন বিজুকে, হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন, কথা বলে-বলে ঠান্ডা করলেন—যেন এটা বিজুরই ব্যাপার! ঠিক আগের মতোই—না, ঠিক না—শাস্ত, মানুষটা যেন শাস্ত হয়ে গেছে মনের মধ্যে, তাছাড়া আগের মতোই। কাছে গেলেই ভাল লাগে—তেমনি—কিন্তু তাঁর কেমন লাগছে কে জানে। আগে ভাবতাম বড়দি খুব সুখী মানুষ, ভরপুর সুখী, আর সেই সুখই চলতে ফিরতে উপচে পড়ে সাবধানে। কিন্তু এখন? নিজে যে সুখী না, সে কি পারে অন্যকে সুখী করতে? না কি নিজের সুখী হবার কথাই নেই এতে? না কি সুখ বলতে যেটাকে ভাবছি... কে জানে!...এই যে এসে পড়লাম। হারীতের কাছে চোখে বিদায় নিয়ে শাস্থতী নামল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল হারীতের ট্রাম বেঁকে গেল ডান দিকে। প্রতিরোধ-সংঘের খুঁটিনাটিতে ছিল হারীত, কিন্তু একটু পরে যখন বুড়োমতো একজন লোক পৌঁটলা-হাতে তার পাশে বসল, তখন তার শাস্থতীকে মনে পড়ল। মনে হল, এইরকম একটা ট্রামেই সে শাস্থতীর সঙ্গে চলেছে—কিংবা ট্রেনের কামরায়—লম্বা পথ, স্টেশন কম, মাঝে-মাঝেই এমন কক্ষ যে কামরটায় আর কেউ থাকে না, তখন বাধ্য হয়েই কাছাকাছি হতে হয় দুজনকে। কিন্তু হারীতের এ-সব ভাবনার শাস্থতী কিছু জানল না, নিশ্চিন্তে রাস্তা পার হয়ে টালিগঞ্জের ট্রামের জন্য দাঁড়াল।

* * * * *

দরজা দিয়ে ঢুকেই দেখতে পেল সত্যেনকে। সত্যেন লাজুক হেসে উঠে দাঁড়াল।

বসুন, বসুন। আপনি কতক্ষণ?

এই তো।

একা যে? শাস্থতী এদিক-ওদিক তাকাল। ওরা জানে না?

জানি না।

উত্তরটা মজার লাগল শাস্থতীর। একটু হেসে —আচ্ছা আমি— বলে পা বাড়াল সে। তার ঘুরে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা, সত্যেন দেখল, কোথায় যেন একটুখানি স্বাতীর মতো। তাড়াতাড়ি

বলল—বলে ফেলল—বসুন না এখানে।

বসব? আচ্ছা— একটু দ্বিধা শাস্বতীর গলায়, সেই সঙ্গে খুশিও। আপনি বসুন! এসব সৌজন্য-
বিনিময়ের পর দুজনেই বসল, আর তারপর সত্যেন সৌজন্যসূচক প্রশ্ন করল— হারীতবাবু
ভাল আছেন?

হ্যাঁ—আমাদের ওখানে আসুন না একদিন— ফশ করে বলে ফেলল শাস্বতী। আর সঙ্গে-
সঙ্গে সত্যেন সাড়া দিল— নিশ্চয়ই! কবে বলুন? এতটা উৎসাহ শাস্বতী আশা করেনি, মনে-
মনে একটু ফাঁপরে পড়ল। এদিকে হারীতের আবার ঠান্ডানি, আর তাকে না জানিয়ে
ভদ্রলোককে আসতে বলে কি বিপদে পড়বে আবার? কয়েক সেকেন্ড পরে বলল—আপনি
কবে ফ্রি আছেন?

ফ্রি? আমি রোজই ফ্রি। আপনি কি ভাবছেন আমি মস্ত একজন এনগেজমেন্টওয়াল্লা?

আমিও না। আমার মতে একদিনে একটাই যথেষ্ট।

সত্যেন হঠাৎ একটু লাল হল। শাস্বতী আড়চোখে সেটা লক্ষ্য করে আবার বলল—সেই একটা
অবশ্য খুব মনের মতো হওয়া চাই।

আমার কোনো-কোনোদিন একটাও থাকে না।

সেই আপনার ফাঁকা তারিখের একটাই বলুন আমাকে— শাস্বতী চমৎকার সুযোগ নিল। শাস্বতীর
হাসি-হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যেনের যেন বোকা লাগল নিজেকে, আর সেটাও মনে-
মনে ভাল লাগল। কিন্তু বাইরে দুটো ভাবই লুকোবার জন্য গভীর হয়ে বলল—এর পরে
সবই ফাঁকা তারিখ, আমি চলে যাচ্ছি।

কোথায়— শাস্বতী যেন চমকাল একটু।

প্রথমে রাঁচি—

ও, তা-ই বলুন। আমি ভাবলাম...কবে যাচ্ছেন? আগের কথাটার গুরুত্ব বজায় রাখতে হলে এখন
খুব কাছের একটা নির্দিষ্ট তারিখ জানাতে হয়, কিন্তু সত্যেনের মুখে কথা জুটল শুধু একটা অস্পষ্ট
'শিগগিরই'। এবার সত্যি তার মন খারাপ হয়ে গেল। ছ-টা দিন কেটে গেল কলেজ ছুটির পর।
এবার সে তাক করেছে ছোটোনাগপুর। রাঁচি-তোপচাঁচি-হাজারিবাগ, সেখান থেকে বাসে করে
গিরিডি। পরেশনাথ পাহাড়ে উঠবে, পাহাড়চূড়োর ডাকবাংলোয় রাত কাটাবে, সবশেষে
মহেশমন্ডায় ক-দিন বিশ্রাম—সেখানে চেনা একজনের বাড়ি আছে—চমৎকার সাজিয়েছিল সব
মনে-মনে। এত শুনেছে ও অঞ্চলটার কথা, আর এত ভাল লেগেছিল সেখান দিগ্নি থেকে ফেরার
পথে সেই পাহাড়ি দেশের ভিতর দিয়ে ঘণ্টা-দুই দুপুর। ট্রেন বোঝাই হয়ে সবাই চলে গেল কলকাতা
ছেড়ে, আর এখন এই দুর্গাপূজার কদিন তো শুধু ঢাকটোলের ভীমভোল—ছি, এ সময়টায় কোনো
ভদ্রলোক থাকে কলকাতায়?—থাকে না? এ বাড়ির সবাই তো আছে, থাকে।

আপনারা যাচ্ছেন না কোথাও? বলবার একটা কথা খুঁজে পেল সত্যেন।

আমরা? না আমাদের যাওয়া কি সোজা?

আমার তো সোজা, সত্যেন ভাবল, আমার তো কোনো বাধা নেই। কিন্তু যাচ্ছি না কেন? ছ-
টা দিন কেটে গেল ছুটির! এই পুজোভিড়ের বিচ্ছিরি কলকাতা—ওদিকে টোল-পড়া সবুজ
পৃথিবী। রোজ ভাবছি আজ যাব, রোজ ভাবছি কাল। ভাবছি কেন?

* * * * *

ছোড়দি! কখন?

এই এলাম। আমাদের যাওয়া হল না রে দেওঘর।

হল না তো? আমি আগেই ভেবেছিলাম—

আমারও বেশি ইচ্ছে ছিল না এবার— হারীতের অনুপস্থিতিতে শাস্ত্রী স্বচ্ছন্দে স্বীকার করল।

—বিশ্রামের দরকার তো হারীতের, কিন্তু তিনি নড়বেন না।

অগ্রণী-সংঘ বুঝি?

অগ্রণী না রে, প্রতিরোধ।

প্রতিরোধ! স্বাতী হেসে উঠল, আর শাস্ত্রীও নির্ভয়ে হাসল এই সঙ্গে। দু-বোনের এই কথাবার্তার সময়টুকুতে সত্যেন প্রথমে স্বাতীর তারপর শাস্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল, কিন্তু একজনের চোখও যখন তার দিকে ফিরল না, তখন সে উদাসভাবে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকল। অন্তত চেষ্টা করল ভাবটা যাতে উদাস দেখায়। স্বাতীকে আজ বড্ডো সুখী মনে হল সত্যেনের, ছোড়দিকে দেখে বড্ডো খুশি—এত খুশি হবার কী আছে ভেবে পেল না সে। তার মনে তো সুখ নেই, তার মন তো অবিরত অস্থিতিতে কাঁটা হয়ে আছে। দু-বোনের মিলিত হাসির শব্দটাও যেন কাঁটার মতো তাকে বিধল। সে কেন— সে কোথায়? এই সকালবেলায় এখানে বসে আছে কেন? আর কিছু কি তার করবার নেই? কেমন করে সময় কেটে যাচ্ছে। ইয়েটসের অ্যাঙ্কলজিটা কিনেছে সেদিন—পাতাও ওল্টায়নি—মম-এর গল্পের বইটারও না—সেটা অবশ্য পথে পড়বে বলেই কিনেছে। সত্যেন নিজেকে দেখতে পেল চলতি ট্রেনের জানলা-কোণে ছোটোগল্পের বই হাতে, আর মাঝপথের ডাকবাংলোর ভোরবেলায় বারান্দায় বসে কবিতার বই... আঃ!—সে যাবে—কাল—হ্যাঁ, কালই—

চলো, ভিতরে চলো— স্বাতী বলল শাস্ত্রীকে।

আপনি—শাস্ত্রী সত্যেনকে লক্ষ্য করল। স্বাতী বলল—উনি একটু বসবেন— তারপর সত্যেনের দিকে, এই প্রথম তাকিয়ে আবার বলল—একটু বসুন।

আমি— সত্যেন কী যে বলতে চাইল, কিন্তু পরের কথাটা তার মুখ দিয়ে বেরোবার আগেই বোনেরা চলে গেল ভিতরে।

একটু পরে স্বাতী ফিরে এসে সত্যেনের মুখোমুখি চেয়ারটায় বসল। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়েই একসঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল। আবার যখন চোখাচোখি হল, স্বাতী স্থির চোখে আবছা গলায় বলল—কী? সত্যেন দেখতে লাগল, তার একটু-লাল-হওয়া মুখ, ভিজে-ভিজে চিকচিকে চোখ, আর ভিজে ভিজে ঠোট দুটির একটু-বাঁকানো ভঙ্গি। আজ দ্যাখে এ-রকম, তবু কত যেন দেখার বাকি।

আজ যে সকালেই? এবারেও সত্যেন কথা বলল না। ভাবল, এই ছোড়দির সঙ্গে কথা বলছিল আর এই এখন—কত আলাদা এ দুটো। কোনটা বেশি ভাল? দুটোই দুটোর চেয়ে ভাল। স্বাতী বলল—খুব গল্প জমেছিল আপনাদের।

আমাদের? বলেই কথাটার মানে বুঝল। হ্যাঁ—কিন্তু তোমাকে দেখেই তোমার ছোড়দি আমাকে একদম ভুলে গেলেন।

আমি ভাবলাম ছোড়দির গলা না? কিন্তু কার সঙ্গে? এই নির্জলা মিথোটা স্বাতী আক্রোশে উচ্চারণ করল। জানলা দিয়ে রাস্তাতেই দেখেছিল সত্যেনকে—দাদাও ছিল সেখানে, আর দাদাই মিটিমিটি

হাসছিল আর বেশি-বেশি কথা বলছিল তার সঙ্গে। কথা কিছু না—এই আরকি... দাদাটা এমন! সতি, ছোড়দির গলা! সত্যেন হাসল—আর চোখে দেখলে তো কথাই নেই। তাই তো দেখলাম—স্বাতী না হেসে জবাব দিল। বাইরে থেকে ডালিম এলো ঘরে। ছোটো-মাসি—সত্যেনকে দেখে থমকাল।

এনেছিস? ডালিম গলা নামিয়ে বলল—বিলিতি পেলাম না—লালিমলি। দেখি।

লম্বা ডালিম একটু আড় হয়ে দাঁড়াল—যাতে সত্যেনবাবুর দিকে পিঠ পিছন-ফেরানো না হয়, অথচ তিনি দেখতে না পান। এতদিনে তার মাথায় আঁটো কালো টুপির মতো নতুন চুল গজিয়েছে। মৈমনসিং থেকে নতুন করে যে শ্যামলিমা নিয়ে এসেছিল কলকাতার কলের জলে তা ধুয়ে গেছে আবার। মুখের ভাবটা আগের চেয়েও গভীর, কিন্তু গালের এখানে-ওখানে হঠাৎ এক-একটা পাংলা কোঁকড়া চুল নির্ভুল জানিয়ে দেয় তার অতি তরুণ বয়সটাকে। তার আধখানা মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যেনের মনে পড়ল তারও একদিন ও-বয়স ছিল কিন্তু ও-রকম কোনো মাসি ছিল না। স্বাতী ডালিমের হাত থেকে জিনিসটা নিল, উপরের কাগজটা সরিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখল একটু। উদ্ভিগ্ন চাপা গলায় ডালিম জিগেস করল—ঠিক আছে? হ্যাঁ।

রং মিলবে তো?

মনে তো হয়।

ঐ রং মেলাবার জন্য কত দোকান সে ঘুরেছে, ভবানীপুরেও না পেয়ে ধরমতলায় চলে যেতে হয়েছিল, এ সব আর বলা হল না, তার পরিশ্রমের আপাতত ঐটুকু মাত্র পুরস্কার নিয়ে সত্যেনবাবুর দিকে একটা দ্রুত কটাক্ষ নিক্ষেপ করে, নিজেই একটু লাল হয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল ভিতরে। স্বাতীর কোলের উপর ছড়ানো সাদা আর ব্রাউন উলের দিকে তাকিয়ে সত্যেন বলল—তুমি বোনো নাকি?

আমি কি আর বুনি—তবে ডালিম ধরেছে তার একটা জম্পর চাই। ব্রাউন উলটাকে স্বাতী চোখে নিরীক্ষণ করল স্বাতী। নিচু মুখেই আবার বলল—ভালোই হল আমার, ডালিমের তাড়াস বড়দির কাছে শেখা হচ্ছে।

মা-র চেয়ে মাসির হাতই বুঝি ওর পছন্দ?

বড়দির বানানো একটা আছে ওর—তবে সাংঘাতিক লম্বা হয়ে গেছে কিনা হঠাৎ। আমি ভাবছি সেইটা খুলে ফেলে—আচ্ছা, হাতের দুটো উল দু-হাতে বেঁধে স্বাতী মুখ তুলল—আপনার কোন রংটা পছন্দ?

আমি ঠিক—মেয়েদের এ সব বোনা-টোনার ব্যাপারে তার মনের আদিম গভীর অবজ্ঞার চোখে সত্যেন তাকাল, কিন্তু তাকিয়ে দেখতে পেল, স্পষ্ট বুঝল, যে মানবজীবনে এই উলবোনা ব্যাপারটিরও গুরুত্ব কম না।

আমার যেটা পছন্দ ডালিমের কি আর সেটা হবে?

হবে না! ডালিমের আদর্শই তো—সত্যেনবাবু।

স্বাতী নামটা উচ্চারণ করল একটু নিচু গলায়, একটু অস্পষ্ট করে, আর স্বাতীর মুখে নামটা শুনে সত্যেনের প্রায় বিশ্বাসই হল না, যে ঐ ‘সত্যেনবাবু’ আর কেউ না, সে নিজেই। একটু

পরে বলল—তা তো জানতাম না।

বাঃ, ওর প্রাণপণ চেষ্টাই তো...কী রকম কোঁচা ঝুলিয়েছে আর পাঞ্জাবি পরেছে দেখলেন তো, একটুও মানায়নি কিন্তু।

আদর্শমতো চললে উলের জামা কিন্তু পরাই হয় না ওর। স্বাতী কপট সরলভাবে বলল—
কেন? আপনি ও-সব পরেন না?

আমি! কপটতা বুঝেও, কিংবা সেইজন্যই, সত্যেনের আত্মসম্মান আহত হল।

পরুন না একটা। বড়দিকে বলব বুনে দিতে? এত সুন্দর বোনেন বড়দি— বলে স্বাতী হাত দিয়ে কপাল থেকে চুল সরাল। ধক্ করে উঠল সত্যেনের বুকের মধ্যে। কতবার দেখেছে হাতের ঐ ভঙ্গি, আর যতবারই দেখেছে—! কিন্তু ভাল যত লাগল, খারাপও তত লাগল তার। স্বাতীর স্বাধীনতায়, অবাধ সাহসে সে যেন মরমে মরে গেল। আরো, আরো প্রবল, আগের চেয়ে আরো অনেক তীব্র হয়ে তার মনে ফিরে এল চলতি ট্রেন, মস্ত রাত, অচেনা-সবুজ ভোরবেলায় কবিতার বই। কবে যাবে? কাল—কাল কেন? আজ—আজই যাবে। সত্যেনের নিচু-হওয়া মুখের দিকে একটু ঝুঁকে তাকিয়ে স্বাতী আবার বলল—পরবেন? তাহলে আজই বলি বড়দিকে? সত্যেন মুখ তুলে বলল—না। সত্যেনের ভাবের বদলটা তখন না বোঝার ভান করল স্বাতী। তেমনি সহজ সুরে বলল—আচ্ছা, বোনা তো হোক। যদি আপনার ভাল না লাগে, তখন না হয়—

শোনো—সত্যেনের গম্ভীর গলা স্বাতীর কথায় বাধা দিল—আজ যে সকালেই এসেছি তার কারণ আছে! এসেছি এইজন্য যে পরে আর সময় হবে না। আমি আজই চলে যাচ্ছি। স্বাতী একটু চুপ করে থাকল, তারপর বলল —ও!

রাঁচি এক্সপ্রেসে যাচ্ছি, অকারণে জানাল সত্যেন। প্রথমে রাঁচি যাব—তারপর—

সে-সব আপনার লম্বা-লম্বা চিঠিতেই জানতে পারব আশা করি। সত্যেন বলল—আমার চিঠি তোমার ভাল লাগে না, জানি।

লাগে না? এত সুন্দর বর্ণনা আপনার।

সত্যি, চিঠি লিখতে আমি পারি না।

স্বাতী মুখ নামিয়ে উলের বল দুটোকে কাগজে জড়াতে লাগল। একটু অদ্ভুত মুকুট নিয়ে সত্যেন নধর বল-দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকল। কিন্তু একটু পরেই জড়ানোর শেষ হল, সাদা আর ব্রাউন রং আর দেখা গেল না। একটু অপেক্ষা করল —‘সত্যি যাচ্ছেন?’ কথা শোনার জন্য, কিন্তু ডালিমের কেনা প্যাকেটটি হাতে করে স্বাতী উঠে দাঁড়াল। সত্যেনও উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। স্বাতী বলল—যাচ্ছেন?

হ্যাঁ—তা—বড়দির সঙ্গে কি দেখা হতে পারে একবার?

বসুন।

আর পরের মুহূর্তেই সত্যেন দেখল সে একা বসে আছে ঘরের মধ্যে। বসে-বসে চেষ্টা করল আজ রাত্রে রেলভ্রমণের কথা ভাবতে—ভোরবেলা মুরিতে চা—ক-ঘণ্টা পরে রাঁচি—খুব উৎসাহ নিয়ে ভাববার চেষ্টা করল। আর যেই পরদার এ-পাশে শ্বেতার আভাস দেখল—শ্বেতা ভাল করে ঘরে আসবার আগেই—দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে বলল—বাইরে চলে যাচ্ছি আজ, তাই ভাবলাম একবার দেখা করে যাই আপনার সঙ্গে।

আজ? পিছন থেকে প্রশ্ন করল শাম্ভতী। সত্যেনের মনে পড়ল একটু আগেই এঁর কাছে সে অন্যরকম বলেছিল; তাড়াতাড়ি বলল—হ্যাঁ, আজই যাই। ছুটির দিনগুলো নষ্ট হচ্ছে মিছিমিছি—কথাটা উপস্থিত ব্যক্তিদের পক্ষে সম্মানের নয় তা বুঝতে পেরে তখনই আবার জুড়ল—ফিরে এসে—যদি তখন আপনার অনুমতি থাকে—একদিন যাব আপনার ওখানে। হারীতের এই অনিশ্চিত ব্যস্ততার মধ্যে সত্যেনকে নিমন্ত্রণ করার প্রশ্ন যে আর উঠল না, শাম্ভতী মনে-মনে তাতে স্বস্তি পেল, কিন্তু মুখে বলল—আমার অনুমতির জন্য আপনার ব্যস্ততা তো দেখতেই পাচ্ছি। পাছে সত্যি যেতে হয়, সে ভয়ে আজই কলকাতা ছাড়ছেন।

শ্বেতা বলল—বসো।

বেশিক্ষণ বসব না।

একটু বসো। সকলে বসবার পর শ্বেতা বলল—দেশে যাচ্ছে বুঝি? ঈশ্বর হেসে সত্যেন তার প্রিয় জবাব দিল—দেশ বলে আমার কিছু নেই। শ্বেতাও হাসল কথা শুনে। দেশ কি আর আলাদা কিছু? যার যেখানে স্বজন, সেখানেই দেশ।

স্বজন মানে আত্মীয়?

করুণা ফুটল শ্বেতার চোখে, দেখতে কৌতুকের মতো—তুমি বুঝি আত্মীয় ভালবাস না? কারা-কারা আমার আত্মীয় তা প্রায় মনেই নেই, একটু বাহাদুরির সুর লাগল সত্যেনের কথায়। তাঁরাও খোঁজ-খবর নেন না তোমার?

নীল পরদাটার দিকে এটুকু সময়ের মধ্যে তৃতীয়বার তাকাল সত্যেন। মুহূর্তমাত্র দেরি করে একটু নিস্তেজ গলায় জবাব দিল—খোঁজ-খবর আর কী!

কে আছেন তোমার এখানে?

এখানে? সত্যেন একটু থামল। —এক মামা ছিলেন, তিনি... তিনি আর নেই।

মামিমা? মামাতো ভাইবোন?

তারা আছে।

ক-জন?

শ্বেতার এত খবর জানতে চাওয়ায় সত্যেন অবাক হল। অনিচ্ছায় জবাব দিল—এক বোন, দু-ভাই।

বোন ছোটো?

না, না, মামিমার মেয়েই বড়ো—তার বিয়েও হয়ে গেছে।

এখানেই থাকে?

না। সে থাকে—কোথায় না থাকে বলু? বাজিতপুর? পাবনা? যাকগে—সে পাবনায় থাকে—বলে কথা শেষ করল সত্যেন।

মামিমার কাছে যাও না মাঝে-মাঝে ?

হ্যাঁ—না—মাঝে-মাঝে ঠিক না—এই—সত্যেনের গলা মিইয়ে এল শেষের দিকে। এইমাত্র সে বুঝল যে মামিমার কাছে শেষ হবে গিয়েছিল সত্যিই তা মনে করতে পারে না।

মামিমা তো আসেন তোমাকে দেখতে?

না, তিনি ঠিক—মানে, অনেক দূরে থাকেন তো, সে-ই বরানগর। ...আর সে-ই বরানগর থেকে মামিমার দশ বছরের ছেলে খুঁজে খুঁজে এই টালিগঞ্জ এসেছিল একদিন, টুকরো কাগজে জোলো

কালিতে দশটা টাকা চেয়েছিলেন মামিমা। টাকা সে তক্ষুনি দিয়েছিল, আর বলে দিয়েছিল—
মা-কে বোলো আমি শিগগিরই একদিন যাব। আর তারপর কতদিন কেটে গেল!

এর পরে শ্বেতা বলল—এক মামাই তোমার?

হ্যাঁ। সত্যেন ওখানেই থামতে চেয়েছিল, কিন্তু ইচ্ছাকে ডিঙিয়ে তার ভিতর থেকে যেন অন্য
কেউ কথা বলে ফেলল—বড়ো ভাল মানুষ ছিলেন মামা—আর অনেকটা অল্প বয়সেই—
নিজের কথাটা নিজের কানে শুনতে পেয়ে সত্যেন প্রায় জিত কামড়ে থেমে গেল। এসব কেন
বলছে আর কাকে বলছে? যে নিজেও...আর এই সেদিন! প্রমথেশবাবুর গোলগাল হাসিমুখটা
একবার মনে পড়ল তার, সেই সঙ্গে মামাকেও মনে পড়ল—ভালবাসতেন তাকে, খুব
টানাটানির সংসারেও বাড়িতে আর হৃদয়ে একটু জায়গা রেখেছিলেন তার জন্য—তারপর
তার অসতর্কতার পরিণাম দেখার জন্য একটু ভয়ে-ভয়ে শ্বেতার মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু
শ্বেতা জিগেস করল—কী করতেন তিনি?

মামা? স্কুলমাস্টার ছিলেন। আর তাই মামিমা এখন— বলতে বলতে আবার থেমে গেল
সত্যেন—সত্যি, কী কষ্টে পড়েছেন মামিমা! বরানগরে ঐ একটা বস্তিপাড়ায়—!

বড়ো ছেলে কত বড়ো?

বড়দির মুখে সত্যেন দেখল যে কথা সে বলেনি তা তিনি বুঝেছেন। খুব ছোটো না— সে যেন
আশ্বাস দিল নিজেকেই—বড়োটি একটা কাজও পেয়ে গেছে।—কিন্তু কী বা কাজ—কারখানায়
মজুর খাটা! আর যে বয়সে কলেজে পড়ার কথা সে বয়সেই! কী হবে এদের?— তবু... এই
‘তবু’টা যেন তার নিজের কোনো কিছু সফাই—ওদের কথা ভাবলেই খারাপ লাগে। আর যা-ই
হোক, পড়াশুনা তো হল না! শেষের কথাটায় এমন সত্যিকার দুঃখের সুর লাগল যে সত্যেনের
মুখটা অন্যরকম দেখাল মুহূর্তের জন্য। শাস্ত্রী—এতক্ষণ সে চুপ করে শুনছিল কথাবার্তা—একটু
অবাক হল, ঐ একটা কথায় ইন্ট্রি-করা ভদ্রতা পেরিয়ে সত্যেনের ভিতরকার মানুষকে সে যেন
দেখতে পেল, ঐ একটা মুহূর্তে অনেক বেশি চিনে ফেলল তাকে। আর, বড়দির কাছে এলেই কেন
ভাল লাগে তাও বুঝল সঙ্গে সঙ্গে। বড়দি নিজের কথা বলেন না, অন্যজনের বিষয়েই কথা
বলেন—যেন সকলের জীবনেই তাঁরও কিছু অংশ আছে—আর এটাই তাঁর স্বভাব, স্বাভাবিক সুখের
সময়ে, তেমনি দুঃখের দিনেও, আর এজন্যেই দুঃখী মানুষ তাঁকে মনে হয় না কখনো—এখনো।
শাস্ত্রী আর একবার তাকাল সত্যেনের ঈষৎ-লজ্জা-পাওয়া মুখের দিকে দীর্ঘসত্যেনও তাকাল
তখন—ব্রহ্ম চোখ সরিয়ে নিল। সেও বুঝল এখন তাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে এদের চোখে, যে
রকমটা সে দেখাতে চায় না, লুকোতে চায়। লজ্জার ভাব ছড়াল তার মুখে। তার অভ্যাস, তার চেষ্টা
কোনো কাজে লাগল না, যা বলতে চায়নি, চায় না, কখনো কোথাও বলে না, তাই বলে ফেলল...!
কখনো কোথাও বলে না? কিন্তু আর কোথাও, আর কখনো কেউ শুনতে চেয়েছে এসব?

নীল পরদা নড়ল, ঘরে এল আতা। চা-বাসন-সাজানো একটি পিতলের ট্রে সাবধানে দুহাতে
ধরে সে ঘরে এল। মুখ নিচু রেখে টিপিটিপি পায়ে এগিয়ে এসে মাকের গোল টেবিলে ট্রেটা
নামাল, তার পরেই ক্ষিপ্ততার গতিতে অন্তর্হিত হল আবার পরদার ওপারে। আর প্রায় সঙ্গে
সঙ্গেই, তাতা বিদ্যুতের মতো ছুটে এসে কাঁপিয়ে পড়ল মার গায়ের উপর। তার বাবরি চুলে
হাত রেখে শ্বেতা বলল—কী রে?

মমা—

কী?

মা—! তাতা মার কোলে মুখ ঘষল দু-বার।

মেয়ের মাথাটি দু-হাতে তুলে ধরে নিজের মুখ তার কাছে নামিয়ে শ্বেতা বলল—কী? চুপি-চুপি বল...উঁ?...ও, বুঝছি। হ্যাঁ, খুব দোষ হয়েছে দিদির... আমি বকে দেব। শাস্বতী বলল—দিদি চায়ের ট্রে এনেছে, তাই বুঝি?

সত্যি তো, ও বুঝি আর পারত না আনতে? দিদির চেয়ে ভালোই পারত তা তুমি এক কন্ড করো, খুব ভাল ভাল মশলা নিয়ে এসো তো একটা প্লেটে সাজিয়ে। আর ছোটোমাসিকে এখানে আসতে বলো।

ছোটোমাসি রাগ করেছে।

রাগ করেছে? কেন?

দিদির উপর রাগ করেছে। শোনো মা, আগে চা দিয়ে পরে তো গরম জল ঢালতে হয়—এ আর কে না জানে?—আর দিদিটা এমন—

সত্যি দিদি কিছু পারে না! ছোটোমাসিকে বল গিয়ে এখন আর রাগ করতে হবে না—মা তোমাকে ডাকছেন। তাতা খুশি হয়ে বাবরি দুলিয়ে চলে গেল, যেতে যেতে এক পলক বাঁকা-চোখ হানল সত্যেনের দিকে। শাস্বতী বলল—ওদের তুমি কী আদরটাই দিতে পারো, বড়দি!

তোর মনে পড়ে, শাস্বতী— একটু পরে শ্বেতা বলল—স্বাতী ঠিক এরকম করত তোর সঙ্গে?

ওধু আমার সঙ্গে? মেজদি-সেজদিকেও কম জ্বালিয়েছে স্বাতীটা!

তাতার খুব ইচ্ছে— সত্যেনের দিকে তাকাল শ্বেতা—তোমার সঙ্গে ভাব করার, কিন্তু লজ্জা ভীষণ। আতাও... দেখলে-না কোনোরকমে ট্রেটা নামিয়েই পালাল!

* * * * *

এতক্ষণ এ ঘরে যা কিছু হচ্ছিল তা সত্যেনকে প্রায় একটা আবিষ্টতার মধ্যে টেনে এনেছিল, শ্বেতার শেষ কথাটা যে তাকেই বলা, তা বুঝতে একটু দেরি হল তার। আস্তে আস্তে বলল—আমার অনেক দোষের মধ্যে এও একটা যে ছোটোদের সঙ্গে ভাব জমাতে আমি মোটে পারি না। বলে চোখ নামাল শ্বেতার দুটি সাদা পায়ের দিকে। কৌতুক ছিল কথাটায়, সত্যি তখন তার মনে হচ্ছিল জীবনের অনেক কিছুই সে জানে না, বোঝে না, পারে না...।

চা-টা বোধহয়— শাস্বতী টি-পটের দিকে তাকাল। —এই যে স্বাতী। আয়, চা ঢাল।

তুমি থাকতে আমি কেন? শাস্বতী হাসল—তাতা ঠিকই বলেছিল! সত্যি রেগে আছিস! শ্বেতা বলল—দেখলি তো, স্বাতীই এখনো ছেলেবেলার অভ্যেস ছাড়তে পারল না, আর তাতা তো তাতা!

আচ্ছা আমিই ঢালি, শাস্বতী এগোল—ক-চামচ চিনি আপনার?

স্বাতী ওসব জানে ঠিক, বলল শ্বেতা —ও তুই ওকেই দে।

ওকেই তো বলছি— শাস্বতী সরে এল। কিন্তু স্বাতী একটু দূরে বসল।

স্বাতী, আয়! ডাকল শ্বেতা।

স্বাতী উঠল, কোনো কথা না বলে কাছে এসে চা ঢালল নিচুমুখে। চায়ের খয়েরি রংটাকে

দুধ কেমন আস্তে আস্তে সোনালি করে দেয়, সেইটে দেখতে দেখতে নিজের মুখের রংটা লুকোবার চেষ্টা করল। সত্যেনও বোধহয় চায়ের রং দেখছিল, কিন্তু এক পেয়ালা ঢেলেই স্বাতি যখন টেবিলটা আস্তে একটু ঠেলে দিল তার দিকে, তখন চোখ তুলে, চোখ সরিয়ে বলল— আর কেউ—আপনারা—আপনি, মিসেস নন্দী?

আপনার মুখে 'মিসেস নন্দী'টা কিন্তু ভাল শুনলাম না।

তাহলে—শাস্বতী দেবী?

একেবারে দেবী? শাস্বতী হাসল।

কেনই বা ওসব হাস্যাম! তুমি ওকে ছোড়দিই ডেকো— শ্বেতা খুব সহজে সমস্যার সমাধান করে দিল।

ঐ আমার আরেক দোষ, শ্বেতা-শাস্বতীর মাঝামাঝি তাকাল সত্যেন—ও ডাক-টাক আমার আসে না। তাছাড়া বয়সে তো আমিই বড়ো।

কত আর বড়ো?

সেটা বলতে হলে একটা নিষিদ্ধ প্রশ্ন করতে হয়।

শাস্বতী বলল—আমার চক্ৰিশ। আপনার?

আমার ছক্ৰিশ। চক্ৰিশে আর ছক্ৰিশে কি তুলনা হয়?

মেয়েদের চক্ৰিশে আর পুরুষের বত্রিশেও তুলনা হয় না।

হরীতবাবুর বয়স বুঝি বত্রিশ? শ্বেতা হেসে ফেলল কথা শুনে, শাস্বতী লাল হয়ে হাসল, স্বাতিও একটু না হেসে পারল না। শ্বেতা বলল—তোমার চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, খাও।

একেবারে একাই খাব? বড়দি একটু বলুন না ওঁকে— সত্যেন চোখ দিয়ে শাস্বতীকে দেখল।

শাস্বতী হেসে উঠে বলল—এই না বললেন আপনার ডাক-টাক আসে না।

আসে না মানে কি আর—সত্যেনের লাল হওয়া মুখ থেকে শ্বেতা চোখ সরিয়ে আনল। —

শাস্বতী খা না একটু চা। স্বাতি, তুই—

না—এতক্ষণে একটি কথা উচ্চারণ করল স্বাতি।

আমরা অবশ্য তেমন চা-পিয়াসি নই, তবে... আচ্ছা, স্বাতির হাতের চা খাওয়া যাক একটু— শাস্বতী তার চেয়ারটা সরিয়ে আনল—বড়দি, তুমি সত্যেনবাবুকে কিছু খেতে বল।

না—না—আর কিছু না। শুধু-শুধু চা-ই ভাল লাগে আমার। শ্বেতা বলল—থাক, ইচ্ছা না হলে খেয়ো না।

আমি আবার শুধু চা খেতে পারি না— বলে শাস্বতী হাত বাড়িয়ে একখানা বিস্কুট নিল। শাস্বতীর হাতে ধরা বিস্কুটটার চেহারা হঠাৎ খুব ভাল লেগে গেল সত্যেনের, নিজেও নিল একটা।

তারপর—যদিও মিস্তিতে তার ঘোর অভক্তি—কথা বলতে বলতে একটা সন্দেহও খেয়ে ফেলল, আর চায়ের পরে—যদিও কোনো কিছু দিয়েই মুখের চায়ের স্বাদ নষ্ট করা তার পছন্দ না—লজ্জাজড়োসড়ো তাতার হাত থেকে মশলা নিয়েও মুখে দিল। শুধু তা-ই নয়, চূলে হাত

রেখে মুখ কাছে নিয়ে—নিজেও অবশ্য জড়োসড়োভাবে—তাতাকে একটা 'বা!' পর্যন্ত বলল।

আর সঙ্গে-সঙ্গে এ কথাটা তার মনে হল যে আত্মীয়তাকে মুখে সে এত অবজ্ঞা করে, তারই রস এখানে বসে বসে ভোগ করছে সে। তারপরেই ভাবল, কিন্তু এখন আর বসে থাকার কোনো কারণ থাকল না, এখন যেতেই হবে। — আচ্ছা, যাই। সে চায়নি, তখনই বলতে চায়নি,

কিন্তু কেউ যেন ঠেলে বের করে দিল কথাটা তার মুখ দিয়ে। আর বলা যখন হয়েই গেছে উঠতেই হল। শাম্ভতী বলল—তাহলে আজই যাচ্ছেন? তা-ই তো, আজ তো সে যাচ্ছে! কোথা? না? হ্যাঁ, রাঁচি। —আজই যাচ্ছি। একটু কড়া শোনালা সত্যোনের গলা।

কবে ফিরবেন?

ছুটি ফুরোলে। একটু আগে উচ্ছল ছিল যে মানুষটা, সে হঠাৎ কঠোর গভীর স্বল্পভাষী হয়ে গেল। —আপনাদের ছুটি তো লম্বা। শাম্ভতী আর একটু কথাবার্তার চেষ্টা করল—আর দু-চারদিন পরে গেলেও—

সে আর হয় না— সত্যেন পাতলা একটু হাসি ফোটাল ঠোটে। শ্বেতা বলল—সত্যি তো, যাওয়া যখন স্থির করেছে...। ব্যাপারটাতে কোথাও যাতে ফাঁক না থাকে, সত্যেন তাই আলাদা করে শ্বেতার আর শাম্ভতীর দিকে তাকিয়ে বলল—ফিরে এসেই দেখা করব আপনাদের সঙ্গে। আচ্ছা যাই— শেষের কথাটা বলে—এতক্ষণে, এতক্ষণ পরে—স্বাতীর দিকে চোখ ফেরাল, যেন এইমাত্রই তার মনে পড়ল যে দিদি দু-জন ছাড়া আরো কেউ ঘরে আছে। শেষ বিদায়টা সে নিয়েছিল দরজার কাছে, তার সামনে শাম্ভতী, একটু পিছনে তাতার হাত ধরে শ্বেতা, আরো একটু পিছনে... বড়দির অর্ধেক আড়ালে স্বাতী। সে তাকাতে স্বাতী একটু সরে এল, ফিরে তাকাল। আর রাস্তায় এসে সত্যোনের মনে হল স্বাতীর সেই দৃষ্টি শেষ হয়নি, এখনো চলছে, আসছে তার পিছনে, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুর মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে এইমাত্র ঢুকে গেল তার শরীরে। প্রায় কষ্টের মতো লাগল তার, শরীরের কষ্ট, কষ্টে প্রায় চোখে জল এল। দ্রুত হাঁটল, দ্রুত এল ট্রাম-রাস্তায়, ট্রামে উঠে বসল হাজরা-মোড়ে রাঁচির টিকিট কিনবে বলে।

* * * * *

ভিতরে এসে স্বাতী ডাকল—লোটন! লোটন কাছেই ছিল, ডাক শুনে ছুটে এল হামাগুড়ি দিয়ে। চল—স্নান! মাসির কাছে স্নান করবি না?

মাসির হাঁটুর কাছের কাপড় ধরে লোটন টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। মুখ তুলে চকচকে চোখে আওয়াজ ছাড়ল—মতি-ই! তা—ন্। বলতে বলতে দুই ছড়ানো হাতে চাপড় দিল আঁখায়, অল্প ভাষা তাতে পুষিয়ে বেশি হল, কিন্তু এমন বেগ দিল যে দাঁড়ানো থেকে ধপাস হল মেঝের উপর। স্বাতী হেসে উঠে বলল—মাসির কাছে তো? বসে-বসে হাত বাড়িয়ে দিল লোটন—মতি! কোয়ে?

না, কোলে নয়! স্বাতী কয়েক পা পিছনে সরল। চলে এসো হেঁটে-হেঁটে... এসো! লোটন নাকি সুরে গলা চড়াল—কোএঃ!

আচ্ছা কোলে নেব—আগে বলো কার কাছে স্নান করবে! মমা—

মা! তা-আ-আ হলে তোমার সঙ্গে আড়ি! স্বাতী গাল ফুলিয়ে চোখ ঘোরাল। —মতি-ই-ই! 'ই' টাকে টানতে গিয়ে লোটন কান থেকে কান পর্যন্ত ঠোট দুটোকে ছড়িয়ে দিল, বড়বুড়ি উঠল তার, চোখ গোল-গোল হল। —না! তোমার সঙ্গে আড়ি! স্বাতী ভুরু বাঁকাল, মুখ ফেরাল। নে রঙ্গ রাখ—শ্বেতা হাসল। আর ঐ তো এক রঙ্গ রোজ-রোজ! এবার চোখ বড়ো করে ধমকের সুরে স্বাতী বলল—ঠিক করে বোঁ; কার কাছে স্নান করবে! মুখের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল লোটন।

মা-র কাছে? লোটন জোরে মাথা নাড়ল, যেমন করে মানুষ 'না' বলে।

মাসির কাছে তো? তেমনি করেই আরো জোরে মাথা নাড়ল লোটন।

দূর বোকা। কিছু পারিস না এখনো! স্বাতী রাজি হওয়ার মাথা-নাড়া দেখাল আর লোটন তক্ষুনি সেটা শিখে নিয়ে সেই যে দম-দেয়া পুতুলের মতো মাথা নাড়তে লাগল, সে আর থামেই না। হয়েছে, হয়েছে, আর না। এবার চলো... তান্! স্বাতী কোমরে ঝাঁচল জড়িয়ে তৈরি হল। বড়দি! সত্যি দেখি স্বাতী ওকে নিয়ে চলল— ব্যস্ত হল শাম্বতী। শ্বেতা বলল —মেয়েটাও কম না! আর কাউকে যেন চেনেই না এখন।

আর স্বাতীর ভাবটা! সত্যি যেন পারবে স্নান করাতে! শাম্বতী হাসল।

করায় তো দেখি মাঝে মাঝে।

পারে? স্বাতী পারে? ঠিক এ সময়টায় শাম্বতী এল অনেকদিন পর, ব্যাপারটা তাই তার কাছে নতুন। পারি কিনা দ্যাখো! বলে স্বাতী লোটনকে পিঠে নিয়ে চলে এল ভিতরদিকের বারান্দায়। শাম্বতী নিজে কোনো শিশুকে নাড়াচাড়া করেনি—করতে হয়নি এখনো—তাই বড়দির নিশ্চিন্ত ভাব দেখেও তার অবিশ্বাস ঘুচল না।

ভাল করলে না বড়দি, ওর একটা হাত-পা না ভেঙে ফেলে স্বাতী।

আরে না!

চলো, দেখি— শাম্বতী বারান্দায় এলো, শ্বেতাও এল একটু পরে। ততক্ষণে স্বাতীর দুই সহকারিণী মহা উৎসাহে লাফাতে লেগেছে। আতা একটানে খুলে ফেলেছে লোটনের গায়ের ফ্রক, তাতা একছুটে নিয়ে এসেছে বাথরুম থেকে সাবান-তোয়ালে-তেলের বাটি, আর তাদের সোরণ্ডনে ছোটন হাম্প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মজা দেখতে এসে দাঁড়িয়েছে। স্বাতীর গা ঘেষে উদাসভাবে হেঁটে যেতে যেতে বিজন বলল—কী রে, চলে যাচ্ছে নাকি আজ? স্বাতী না শোনার ভান করল। একটু দূরে সরে, ঠিক স্বাতীর দিকে না তাকিয়ে বিজন আবার বলল—সত্যি যাচ্ছে নাকি? কী বলছিস তুই! স্বাতী অর্ধেক চোখ তুলল বিজনের দিকে।

সত্যেন নাকি চলে যাচ্ছে?

চলে আবার যাবে কোথায়? মনের কথাটা স্বাতী প্রায় মুখেই বলে ফেলেছিল, সম্মুখে নিয়ে বলল—তুই আজকাল বড্ডো বাড়ি থাকিস, দাদা!

শ্বেতা বলল, বেচারা! বাড়িতে থাকে-না বলেও বকুনি খায়, আবার থাকলেও কেউ খুশি না! দেখলে তো বড়দি! ছুটির দিনেও যে নিশ্চিন্তে জিরোবো—

এই না তোর এত কাজ যে রোববারেও ছুটি নেই? বিজন তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হয়ে বলল— ছুটি-অছুটি আমার ইচ্ছে মতো। চাকরি তো করি না কখনো!

তাই বলে ঐ ছেঁড়া গেঞ্জিটা পরে ঘুরঘুর করছিস কেন এখনো? দেখাচ্ছে কী! হাত বেকিয়ে গেঞ্জির ফুটোয় পিঠ চুলকোতে-চুলকোতে বিজন বলল—যাই, সত্যেনকে একটা কথা বলে আসি। বাড়ি গেল নাকি রে এখন? শাম্বতী নিচু গলায় শ্বেতাকে বলল—ভারি ফাজিল হয়েছে বিজুটা। স্বাতী কিছুই বলল না, মেঝেতে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে লোটনকে জাপটে শোওয়াল কোলের মধ্যে, আর লোটন তার অভ্যাস মতো হাত-পা ছুঁড়ে আসর জমাল।

কী মজা! হাততালি দিয়ে বলে উঠল তাতা। ছোটন বলল—এ মা! এ আবার একটা মজা কী!

মজা না? খুব মজা!

মোটোও না!

তবে তুই যা এখন থেকে!

কিন্তু ছোটন নড়ল না, না-মজাটাই দেখতে লাগল। তার বোন বলে পরিচিত ঐ ছোট্টো মানুষটাকে সে খুব ভাল চোখে দ্যাখে না। বিচ্ছিরি, নোংরা, এখনো বিছানায় ইয়ে করে—ছি!—আর বুদ্ধিও তেমনি, সেদিন তার লাটুটাই মুখের মধ্যে পুরে দিয়েছে—জিভ-টিভ কেটে এক কাণ্ড—মা আবার উল্টে তাকেই বকলেন! এদিকে ও যে অমন বোকা, লাটু খেতে হয় না তা পর্যন্ত জানে না—তার আর কিছু না!

মাসির তেল-মাখা হাতটা গায়ে লাগতেই লোটন এমন এক ডিলক দিল যেন উল্টে ডিগবাজি খাবে। আতা তাড়াতাড়ি বলল—হাত ধরব ছোটোমাসি?

আমি পা! জুড়ল তাতা।

না, বড়দি, শাস্তী শাসাল—আজ কিছু আছে তোমার মেয়ের কপালে!

স্বাস্তী এবার মন দিয়ে কাজে লাগল। প্রথমে আস্তে, সাবধানে, তারপর নির্ভয়ে, স্বচ্ছন্দে লোটনের মিস্তি, নরম, গরম শরীরটার উপর দিয়ে নানা ভঙ্গিতে নাড়তে লাগল তার হাত। প্রথমে এক হাতে, তারপর লোটন যখন ছটফটানি থামিয়ে আরামে গা এলিয়ে গরু আওয়াজ করে করে লর্কদের খুশি করতে লাগল, তখন দু-হাতে—বড়দিকে যে রকম দেখেছে, ঠিক সে রকম করেই চেষ্টা করল বুলোতে, চাপড়াতে, রগড়াতে, গলার ভাঁজে ভাঁজে, আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে তেলের ফোঁটা মিশিয়ে দিল, ছোট্টো টুকটুকে কান দুটিকেও ভুলল না। চূপচাপ নিচু চোখে, চূপচাপ গম্ভীর মুখে নিজেরই অজান্তে তৈরি হতে লাগল ভবিষ্যতের জন্য। ভবিষ্যৎ কাছে এসে গেছে, সে জানে। ভিতরে ভিতরে কাঁপছে সে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম যেমন দূর-চাকার মাটি-তলার ধাক্কা, অনেক আগে থেকেই একটু একটু কাঁপে। আর তাই, ট্রেনের ঘণ্টা পড়লে প্ল্যাটফর্মে যেমন ব্যস্ততা, তেমনি তারও সমস্ত শরীরে কাজের ঢেউ উঠেছে এখন, হাতের কাজ, নড়াচড়ার, চলাফেরার। সে এত বেশি বেঁচে আছে যে খানিকটা তার খরচ করে না দিলে বাঁচবে না। টান হয়ে আছে বুকের মধ্যে সব সময়, দপদপ করছে আঙুলের ডগা, ক্রান্তি কাকে বলে ভুলে গেছে, শান্তি কাকে বলে তাও ভুলেছে। চলে যাবে? আজ চলে যাবে? না যাবে না, যাবে না... আমি বলছি যাবে না। লোটন ছুঁচোলো গলায় কেঁদে উঠল হঠাৎ। এই রে! শাস্তী বলল—চোখে গিয়েছে!

না, না কিছু হয়নি! বা—বা কী সুন্দর তেল মাখে লোটন—বড়দির সুর অবিকল নকল করল স্বাস্তী—একটুও কাঁদে না—দ্যাখো তোমরা সব—কেউ পায় না এরকম—ভারি তো! ছোটনের গলা শোনা গেল—আমি ওর চেয়ে কত ভাল পারি!

সে তো সত্যি! লোটন তো দাদাকে দেখেই শিখেছে এত সুন্দর নাইতে। একথা শুনে দায়িত্বপূর্ণ দাদার মতোই গম্ভীর হলো ছোটন। শ্বেতা বলল—দিস তো ওকে ধরে একদিন ভাল করে নাইয়ে। আমি ডাকলে তো মাথা পাতে না, তা তোর কাছে বোধহয়—

ছোটন বলল—ধ্যৎ!

ছোটনের বুঝি মানে তেমন উৎসাহ নেই—বলল শাস্তী।

মামার খাত। শ্বেতা হাসল। যা কাণ্ড করে এক-একদিন নাওয়াতে হত বিজুকে!

আমার বিষয়ে কী বলছ তোমরা? বলতে-বলতে বিজু দরজার ধারে দাঁড়াল। ছেঁড়া-গোঞ্জি ঢাকবার জন্য কুঁচকানো একটা সিল্কের পাঞ্জাবি পরেছে—আরো বদ দেখাচ্ছে তাতে—হাতে জ্বলছে সিগারেট। শাস্বতী শ্বেতার দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি ওকে কিছু বলছ না, বড়দি, তোমার সামনেই সিগারেট খাচ্ছে!

বড়দি ও-সব মাইন্ড করেন না। বিজন গভীরভাবে সিগারেটে টান দিল, তারপর দু-পা এগিয়ে লোটনের দিকে তাকাল। এঃ! বিজন নাক কুঁচকে বলল—সর্বের তেল!

দ্যাখো বড়দি, হয়েছে ঠিক? বলে স্বাতী আর একবার হাত বুলিয়ে গেল ছোট, নখ, নরম, মসৃণ শরীরটাতে। সেদিকে তাকিয়ে শাস্বতী ভাবল ও রকম একটা হয়ে-টয়ে পড়লে মন্দ কী—কিন্তু হারীত কিছুতেই রাজি না। বিজন বলল—সর্বের তেলে রং কালো হয়, অলিভ অয়েল মাখাতে হয় বাচ্চাদের।

নাকি? আর কী-কী করতে হয় বল তো?

বিজন খোশমেজাজে হাসল—আচ্ছা, সব এনে দেব তোমাকে বড়দি, ভেব না।

যাক। এতদিনে, বড়দি, তুমি নিশ্চিত হলে—বলে চিক্কন লোটনকে কোলে করে স্বাতী উঠে দাঁড়াল।

দেখবি, দেখবি। আধ-পোড়া সিগারেট ঠোটের ফাঁকে বুলিয়ে চোখ মিটমিট করল বিজন। স্বাতী উঠানে নামল, সেখানে টবে করে লোটনের স্নানের জল রোদে গরম হচ্ছিল অনেক আগে থেকেই। লোটন গলাজলে বসে থাকা মেরে-মেরে জল ছিটোতে লাগল, আর কণ্ঠের আশ্চর্য কণ-এং দেখিয়ে সব ক-টা ব্যঞ্জনবর্ণ অভ্যাস করতে লাগল তারস্বরে, আর তাকে দেখতে-দেখতে, তার খুশিতে খুশি হতে-হতে স্বাতীর মনে একটু আগে যে উদ্বেগ উঠেছিল, তা হঠাৎ একেবারে মিলিয়ে গেল মনের মধ্যে। নিশ্চিত জানল যে সত্যেন যাবে না, যেতে পারে না। আতা ঘটি করে জল ঢালল লোটনের মাথায়, তাতা গায়ে একটুসানান না বুলিয়ে ছাড়লই না, ওদের দু-জনেরও আদ্রেক স্নান হয়ে গেল লোটনের দাপাদাপিতে, আর ওদের হাত থেকে লোটনকে উদ্ধার করতে গিয়ে প্রায় স্বাতীরও। লোটন হাসল, আতা-তাতা হাসল, স্বাতীও হাসল সঙ্গে সঙ্গে, আর মাথার উপর আকাশে ভেসে বেড়ালো শরতের সাদা মেঘ, আর শান্ত একটি আকাশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

ওরে! আর না, তোল! শ্বেতা ডাকল বারান্দা থেকে। কিন্তু তোলা কি সোজা? লোটন কেবল বলে—ন্না—তানন্! আর টবের কড়া আঁকড়ে থাকে দু-হাতে—একটুকু তো মুঠি, কিন্তু জোর কী!—মাসিকে একদম হারিয়ে দিল দু-বার, মুখ-টুখ ভিজিয়ে দিল, আর তাতে স্বাতীর এত মজা লাগল যে পরের বার আর চেষ্টাই করতে পারল না।

রোজই এরকম করে, বড়দি? শাস্বতী জানতে চাইল।

মাসির কাছে একটু বেশি করে। সব বিদ্যে দেখানো চাই তো।

শাস্বতী উশখুশ করল। অতক্ষণ ভিজে গায়ে থেকে জ্বর-টর হবে না তো মেয়েটার? কড়া ধরে নাচতে নাচতে উল্টে পড়বে না তো হঠাৎ? চেষ্টায়ে বলল—স্বাতী, তোল! তারপর নিজেই উঠে দাঁড়াল। মনের মধ্যে আবছা একটা ইচ্ছা জাগছিল তার উঠানে গিয়ে ওদের সঙ্গে দাঁড়াবার, লোটনকে একটু কোলে নেবার, এতক্ষণে যেন নিজের কাছেই একটা ছুতো পেল। —আমি ওকে নিয়ে আসি, বড়দি— বলে সিঁড়ির দিকে এগোল সে, কিন্তু স্বাতী তখনই নিয়ে এল লোটনকে, গলার চিৎকার আর গায়ের জল সূদ্ধ মেঝেতে নামিয়ে দিল, হাঁটু ভেঙে বসে মুছিয়ে

দিতে লাগল তোয়ালে দিয়ে। বড়দি আশ্বে বলল—স্বাতী আমাকে দে।

আমিই পারব, স্বাতী ঘাড় বঁকিয়ে নিজের ভিজে মুখটা কাঁধের কাপড়ে মুছে নিল—কী-দুই বড়দি, তোমার—কথা থেমে গেল মুখের দিকে তাকিয়ে। বড়দির চোখের ভাব বদলে গেছে...কী? স্বাতীর চোখ দ্রুত সরলো ছোড়দির, দাদার দিকে, দুজনেই কেমন সামনের দিকে তাকিয়ে—কী হয়েছে? স্বাতী লোটনকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল, আর তখনই ফিরে তাকানোর আগেই তার মনের তলায় লাফিয়ে উঠল কী হয়েছে; তাই উঠানের মধ্যখানে রোদ-লাগা লালচে মুখে সত্যেনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটুও অবাক হল না। বিজন তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে অভ্যর্থনা করল—আসুন! এতক্ষণে—মানের টবটা দেখে, সকলকে দেখে—সত্যেন বুঝল যে পিছনের দরজা দিয়ে হঠাৎ এ রকম বাড়ির মধ্যে চলে আসাটা একেবারেই শোভন হয়নি। আমি—আমি— ওটুকু বলেই থেমে গেল।

আসুন— আরো দরজা গলায় বিজন বলল।

ওদিকের দরজাটা বন্ধ ছিল—কারো সাড়া পেলাম না—তাই ভাবলাম...ভাবলাম একবার...। কী ভেবেছিল? সকালবেলায় অতক্ষণ কাটিয়ে গিয়ে এফুনি কেন আবার এসেছে এই ব্যস্ত চড়া-বেলার অসময়ে? আর একবার, শুধু আর একবার চোখে দেখতে!

তাতে কী হয়েছে? আসুন, বসুন এসে।

না, না এখন আর— সত্যেনের মন চাইল দৌড়ে আবার বেরিয়ে যেতে, কিন্তু তার শরীর নড়তে পারল না—মানে, কলের মতো নড়ল, পা টিপে টিপে উঠে এল বিজনের পিছনে সিঁড়ি ক-টা। বসুন। এই যে—না, ও-ঘরে চলুন— বিজনের নড়চড়ায় ভদ্রতা ঝরে পড়ল। কেন, এখানেই বোসো না, লোটনকে জাঙিয়া পরিয়ে শ্বেতা উঠে দাঁড়াল।

না, না, এখানে কী—আসুন—আমার সঙ্গে। মানে, বিজন একটু থামল—আপনার যা ইচ্ছে। ইচ্ছে! কথাটার অর্থ সত্যেন যেন বুঝতে পারল না, কেমন নিঃসাড়মতো বসে পড়ল সেই ভেনেস্টা চেয়ারটাতেই, বিজন যেটা প্রথমে এগিয়ে দিয়েছিল। বিজনও বসল, ঘরোয়াভাবে আলাপ আরম্ভ করল—কোথায় গিয়েছিলেন?

এখন? টিকিট কিনে আনলাম। এই যে— কোনো দরকার ছিল না, এরকম কেউ করেও না সাধারণত, তবু পকেট থেকে বের করল সবুজ রঙের রেল-টিকিটটা। অনর্থক কতগুলি টাকা একদম জলে ফেলে, একেবারে সেকেন্ড ক্লাসই কেটেছে, যাতে এরপর কিছুতেই তার না-যাওয়া না হয়, যাতে অন্তত ঐ টাকা ক-টাই তাকে হিঁচড়ে নিয়ে যায় রাঁচিতে। টিকিটটা আঙুলে ধরে ঘোরাল একটু— যেন সবাইকে দেখাতে চায়—তারপর নিজের চোখ ফেরাল এদিক ওদিক। দেখল দিদি দু-জনকে দরজার ধারে পাশাপাশি, স্বাতীকেও দেখল—আবছা দেখল—একটু দূরে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো। আড়ষ্ট, অস্পষ্ট, স্বাতী দাঁড়িয়ে ছিল অর্ধেক মুখ ফিরিয়ে। সত্যেনকে চোখে দেখার সঙ্গে সঙ্গে যেন আয়নার মধ্যে নিজের চেহারাটা দেখতে পেয়েছিল সে—চুল-টুল খুলে একাকার, শাড়িটা তেলে-জলে মাখামাখি—বদলে আসবে?—না চলে যাবে এখান থেকে?—না এখানেই থাকবে?—না, থাকল ওখানেই আর প্রতি মুহূর্তে ভাবল কেন আছি, আর ভাবতে ভাবতে দাঁড়িয়ে থাকল—না নড়ে, না বলে, না দেখে।

যাচ্ছেন বুঝি কোথাও? বিজন ভালমানুষ, জিগ্যেস করল। সত্যেন খুব গম্ভীর গলায় বলল— আজ যাচ্ছি রাঁচি। আপনি রাঁচি গিয়েছেন, বিজনবাবু?

বোসো তোমরা— শ্বেতা ভিতরে এল লোটনকে নিয়ে, আর একটু পরে শাম্ভতীও এল সেখানে, মুখে আঁচল চেপে নিঃশব্দে কিন্তু প্রবলবেগে হাসতে লাগল।

কী রে? কী হল? শাম্ভতী কথা বলতে পারল না, হাসির ঠেলায় কাঁপতে কাঁপতে দিদির কাঁধে মুখ গুঁজল। লোটনের গায়ে পাউডর দিতে দিতে শ্বেতা বলল—দ্যাখো কাণ্ড! হাসছিস কেন ও রকম?

আবার বিজ্ঞনবাবু—! হাসির ফাঁকে ঠাশ করে আওয়াজ বেরল শাম্ভতীর।

ভাল তো বিজুকে বাবু বলার একজন হল এতদিনে।

আর বিজুটাও কম না! কেমন আলাপ জুড়ল—এদিকে সাত-জন্মে একটা কথা বলে না সত্যেনের সঙ্গে!

তা এতদিন তো আর—শ্বেতা কথা শেষ না করে লোটনের ভাঁজ-করা জামাগুলি তুলে তুলে দেখতে লাগল।

সত্যি! হাসি-খামা অন্য গলায় শাম্ভতী বলল—কেন যে সত্যেন যাচ্ছে—

কেন, ঘুরে আসা তো ভালই।

ভাল? এদিকে....বাবার গলা না? পাতলা সাদা মলমলের একটা বেনিয়ান শ্বেতা পরিয়ে দিল লোটনকে।

বাবা গিয়েছিলেন কোথায়?

তোর নাকি পুজোর শাড়ি পছন্দ হয়নি—

ও মা! পছন্দ আবার হল না কবে? আমি শুধু বলেছিলাম—

ঐ হল, এটুকু খুঁতই বা থাকে কেন!

তাই বলে আবার বদলাতে গেলেন? সত্যি—। শ্রান্ত চেহারা নিয়ে রাজেনবাবু ঘরে এলেন। তাঁর হাতের কাগজের বাস্কাটা দেখেই শাম্ভতী বলে উঠল—এ তোমার ভারি অন্যায় বাবা! দ্যাখ-তো অন্যায়টা কেমন, বাস্কাটা মেয়ের হাতে দিলেন রাজেনবাবু। ডালাটা অল্প তুলে উঁকি দিয়েই শাম্ভতী তার মত জানাল—খুব সুন্দর!

না দেখেই? খুলে ভাল করে দেখার জন্য তার মনের চঞ্চলতা শাম্ভতী সামলে মিল। মনে পড়ল এসব শাড়ি বড়দি আর পরেন না, পরবেন না; তাই লজ্জা করল একটু। আমি একটু দেখেই ভাল জিনিস চিনতে পারি। কিন্তু কেন বল তো তুমি আবার—বলি এ জরিপাড় ধুতিটা বদলে আনলে ঠিক হত।

কেন? জিগ্যেস করল শ্বেতা।

উনি ওসব ভালবাসেন না, বলেন জামাই-কাপড়।

তবে ঠিকই আছে, শ্বেতা বলল—এখানকার তো জামাই সে।

আর ধুতি পরেই বা কদিন বহরে! মিছিমিছি—। শ্বেতা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—কম পরে বলেই তো ভাল পরতে হয়

হ্যাঁ! ঐ আওয়াজটা করে কী যেন একটা বলতে না পারা কথাকে শাম্ভতী পিষে দিল, আর তারপরেই বলল—সত্যেনকে দেখলে, বাবা?

হ্যাঁ, দেখা হল।

আমরা সবাই চলে এলাম—ভাল দেখাচ্ছে কি?

সত্যেনের কথা বলছিঁস? তাকে তো চলে যেতে দেখলাম।

চলে গেল এর মধ্যে? এলই তো এইমাত্র।

রাজেনবাবু কিছু বললেন না।

সকালেঃ এসেছিল একবার। রাজেনবাবু এবারেও কিছু বললেন না। শাম্ভতীও কথা পেল না আর, শ্বেতা ছোট্টো লাল চিকুনি দিয়ে লোটনের চুল আঁচড়ে দিতে লাগল, আর একটু পরে রামের-মা এল লোটনের দুধের বাটি নিয়ে। শাম্ভতী হঠাৎ চেষ্টা করে ডাকল—স্বাতী! উত্তর না পেয়ে আবার ডাকল। তারপর একটু নড়ে-চড়ে একটু যেন উদ্ভিগ্ন স্বরেই বলল—স্বাতী কোথায়?

দিদিমণি তো নাইতে ঢুকলেন, রামের-মার ফিশফিশে গলা শোনা গেল। আবার চুপ। তিনজনের একজনও অন্যজনের দিকে তাকাল না। আর মিনিটখানেক এ রকম কাটবার পর রাজেনবাবু আস্তে আস্তে অন্য ঘরে চলে গেলেন। শাম্ভতী তখনো কথা বলল না, শ্বেতাও না। মা-র কোলে শুয়ে লোটন দুধ খেতে লাগল ঢকঢক করে আর বাটি খালি হবার সঙ্গে সঙ্গেই ছবির মতো ঘুমিয়ে পড়ল।

শাম্ভতী বাড়ি ফিরল। বাড়ির খাওয়া-দাওয়া চুকল, সারা পাড়া দুপুর-চুপ। তারও মধ্যে আরো চুপ রাজেনবাবুর বাড়িতে স্বাতীর ঘরটি। সেখানে শাম্ভতীর পুরানো খাট আবার পড়েছে—আতা-তাতা রাত্রে শোয়—আর এখন সেখানে ঘুমিয়ে আছে লোটন। তার বোজা চোখের ফোলা-ফোলা, ফিকে-গোলাপি, আবার একটু নীলচে পাতা দুটি মস্ত দেখাচ্ছে এখন। কিন্তু ঘরে আর যে দুজন আছে, এই সুন্দর দৃশ্যটি তারা দেখছে না। শ্বেতা বসে আছে মেয়ের দিকে পিঠ ফিরিয়ে উঁচু-করা হাঁটুতে থুতনি রেখে আর স্বাতীর নভেল-পড়া বেতের চেয়ারটিতে বসে রাজেনবাবু মেঝের একটা বিশেষ অংশ মন দিয়ে দেখছেন। দেখে মনে হয় এভাবেই কিছুক্ষণ বসে আছে দুজনে, চুপ, যেন চিন্তিত। একটু পরে শ্বেতা নিচু গলায় বলল—তা হলে বাবা? রাজেনবাবু মেঝে থেকে চোখ তুললেন। শ্বেতা বলল—সবই তো ভাল, এক—কেউ নেই ছেলেটির—

কেউ নেই কেন? আমরা আছি। বলে রাজেনবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠ পড়লেন। যেতে-যেতে ধামলেন স্বাতীর ছোট্টো আলনার কাছে। শাড়ি, জামা, তলায় রাখা তিন জোড়া জুতো, দু-জোড়াই কোন জন্মের পুরোনো, কিছু ফেলাতে ওর মন সরে না। সরে এলেন টেবিলের কাছে, সেই কবেকার বেতের শেলফটি বইয়ের ভারে বাঁকা, নিচের তাকে স্কুলের বইগুলি ধুলোপড়া—নীল মলাটের অ্যাটলাসটা—টেবিলে এখনকার বই, গল্পের বই, খাতা। একটা বাতাস খুললেন, পোশিয়ার চরিত্র লিখেছে, তা-ই পড়লেন একটু, চশমা ছাড়া ঝাপসা দেখলেন, তবু দেখতেই লাগলেন, আর সামনের দেয়াল থেকে তাঁকে দেখতে লাগল ধুলো-পড়া ক্রীড়ার আড়ালে ছবি হয়ে যাওয়া শিশিরকণার ঝাপসা চোখ। রাজেনবাবু তা জানলেন না। খাতা বন্ধ করে জায়গা মতো রেখে পাশের ঘরে এলেন। আতা-তাতা ছোটন লুডো খেলছে সেখানে, তাঁকে দেখেই তাতা আহুদি গলায় বলে উঠল—দাদু খেলবে আমাদের সঙ্গে? খেলবে? আতা তাকাল। তাহলে আবার প্রথম থেকে আরম্ভ করি। ছোটমাসিকে এত বললাম—চারজন না হলে তো জমে না খেলা।

আমি আর দাদু! ছোটন আসনপিঁড়ি হয়ে জাঁকিয়ে বসল।

আচ্ছা তোমাদের এ পাটি শেষ হোক— বলে রাজেনবাবু বারান্দায় এলেন। উঠানে অর্ধেকটা ছায়া পড়েছে, তারে কাপড় গুঁকোচ্ছে, কোথায় একটা কাক ডাকাছে কা-কা, আর স্বাতী বসে

আছে সিঁড়িতে চূপ করে। রাজেনবাবু ডাকলেন না, কাছে গেলেন না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পিছন থেকে দেখতে লাগলেন। একটু পরে স্বাতী ফিরে তাকাল। রাজেনবাবু তাড়াতাড়ি বললেন—
আমার পানের ডিবেটা দেখেছিস নাকি রে?

ছিল তো এখানেই— দেখছি— স্বাতীও তাড়াতাড়ি উঠল।

আচ্ছা থাক, আমিই খুঁজে নেব।

আমি এনে দিচ্ছি—

স্বাতী—

স্বাতী যেতে যেতে থামল। রাজেনবাবু মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন, কিন্তু স্বাতী দাঁড়াল না, তাকাল না, বাবার চোখ এড়িয়ে চলে এল সেখান থেকে। এই প্রথম, জীবনে এই প্রথম বাবার কাছে তার লজ্জা করল। এল বড়দির কাছে, ঘুমোচ্ছেন। আর একবার তাকিয়ে ভুল ভাঙল। বড়দি শুয়ে আছেন কপালে হাত রেখে, আর চোখ-চাপা হাতটির তলা দিয়ে চোখের দু-কোণ বেয়ে বেয়ে পরিষ্কার দুটি জলের রেখা নেমে এসেছে নাকের ধার দিয়ে বঁকে ঠোঁটের কাছে, ঠোঁট একটু ফাঁক, সাদা গলার উপর সরু একটি নীল শিরা খুব আস্তে কাঁপছে। স্বাতী থমকাল, অবাক হল, চোখ ফেরাতে পারল না। বড়দিও কাঁদেন? আর সে ভেবেছিল—ভেবে নিশ্চিত ছিল—যে বড়দি মনের দুঃখ চমৎকার লুকোতে পারেন। লুকোতে!—দুঃখ না লুকিয়ে উপায় কী এই পৃথিবীতে—দুঃখের জায়গা কোথায়, সময় কোথায়? কিন্তু যদি কখনো সময় হয়? এই রকম নিরিবিলি দুপুরবেলা আর সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে, সেইসব অন্ধকার বড়ো বড়ো রাতগুলি—সে কী জানে, তার বড়দির দিন-রাত্রির কথা সে কী জানে? আর দুঃখেরই বা কী জানে—কী জানতো, আজকের আগে পর্যন্ত দুঃখেরই বা কী জানতো সে? যেই কথাটা ভাবল, যেই মনে পড়ল সত্যেন আজ ঠিকই চলে যাচ্ছে, অমনি যেন সত্যি তার বুক ফেটে কান্না এল। কিন্তু কোথায় গিয়ে কাঁদবে, কোথায় লুকোবে, কেউ না-কেউ দেখে ফেলবেই, কী বলবে তখন? বড়দির কাছেই সে সবচেয়ে নিশ্চিত—ছিল—কিন্তু বড়দিও যদি নিজের কান্না দিয়ে তাকে পর করে দেন! স্বাতী ফিরে যাচ্ছিল কিন্তু শ্বেতার চোখ খুলে গেল। একটু তাকিয়ে থেকে ভিজে-ভিজে গলায় শ্বেতা ডাকল—স্বাতী আয়। স্বাতী দাঁড়াল। আয়—শ্বেতা, আস্তে কেশে, আবার ডাকল। সে যে কাঁদছিল সেটা মনে নিল তার চোখের দৃষ্টি, কিন্তু কান্না থেমেও গেল তখনই, শুধু গলার আওয়াজে তার স্মৃতি রইল। স্বাতী এগিয়ে এল, বসল বড়দির শিয়রে।—শুবি? শো। শ্বেতা একটু সরল, আর সেই সঙ্গে হাতের উল্টোপাশে আস্তে মুখ মুছল। স্বাতী শুয়ে পড়ল, বড়দির পাশে, গায়ে গা লাগিয়ে, দু-বোন পাশাপাশি শুয়ে থাকল কেউ কোনো কথা না বলে।—হিঁয়াওঁ! ঘুমোনো লোটন কেঁদে উঠল। শ্বেতার ঝুঁকিটা নড়ল একবার।—ইশ! ভিজিয়ে একেবারে— উঠে বসে কাঁথা বদলে দিল, মেয়ের পিঠে চাপড় দিতে দিতে বলল—এ মেয়েটা বিষম হিশুনি! এ জন্যই দেখতে পারি না এটাকে! ও কথা শুনে স্বাতীর মনে হল বড়দি তার কাছে ফিরে এলেন। আবার সহজ হল, হেসে বলল—তুমি কেবল ওর নিন্দে কর, বড়দি! লক্ষ্মী মেয়ে—সেই কখন থেকে ঘুমোচ্ছে।

খাওয়া আর ঘুম ছাড়া আছেই বা কী!

কী-ই বলো। স্বাতীর গলায় ঢেউ দিলো—রোজ কথা শিখছে না নতুন-নতুন? আর দেখতে কী সুন্দর!

নাকি? শ্বেতা আড়চোখে মেয়েকে দেখলো।

ও তোমার সকলের চেয়ে সুন্দর হবে দেখো—বেমানুম বাবার কথা চুরি করে স্বাতী বললো। আমি তো দেখি না। কুচ্ছিৎ কপালটা! বলে শ্বেতা সেই কুচ্ছিৎ কপালে তিনটি আঙুল ছোঁওয়ালো। লোটনের ফোলা-ফোলা চোখের লালচে মুখে চোখ রেখে স্বাতী বললো—আমার ওকে এত ভালো লাগে বলব কী, বড়দি!

ক-দিন আর! এর পরেই একঝুড়ি দাঁত, টাশ-টাশ কথা আর ঠাশ-ঠাশ চড়!

স্বাতী আওয়াজ করে হেসে উঠল।—তখন বুঝি আর ভালো না?

এ রকম কি আর?

স্বাতী একটু ভাবল। শিশু সুন্দর, খুব সুন্দর, কিন্তু সে তো অন্যদের—বড়দের—উপভোগের; তাতে তার নিজের কী? সে তো জানে না সে সুন্দর, সে-যে আছে তা-ই ভালো করে জানে না, আর তা যেদিন জানবে সেদিনই এই সুন্দরের খতম। না, লোটনকে দেখতেই ভালো, লোটন হওয়াটা ভালো না। বেচারি ঘুমিয়েই চব্বিশ ঘণ্টার ঘোল ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছে। কত বছর, আরো কত বছর লাগবে তার এখানে পৌঁছতে, যেখানে আমি এখন আছি, যেখানে এসে মানুষ জানতে পারে সে বেঁচে আছে, জানতে পারে সে কী চায়, সত্যি কী চায়, আর শুনতে পায় বুকুর মধ্যে এই টিপটিপ কথা যে সত্যি সে যা চায় তা-ই পাবে, সত্যি যা চায় তা-ই হবে, হতেই হবে, না হয়েই পারে না। নিজের বুকুর টিপটিপ কথা কানে কানে শুনতে-শুনতে স্বাতী বলল—আমার কিন্তু মনে হয় বড়ো হওয়াটা আরো ভাল।

হ্যাঁ, ভালই তো, শ্বেতা সায় দিল। নিজের হাতে-পায়ে চলে—নির্ঝঙ্কাট।

বেশি যেন তুমি খুশি না তাতে?

খুব একটা খুশিরই বা কী? শ্বেতা আবার শুয়ে পড়ল স্বাতীর পাশে—প্রথম তিন বছরের মতো কি আর কিছু?

কী বলতে গিয়ে স্বাতী থেমে গেল। অন্য একটা কথা—অদ্ভুত কথা—মনে হল তার। এই ‘প্রথম তিন বছর’ বড়দির জীবনে লোটনই শেষ, আর বাবার জীবনে শেষ হয়েছিল তারই সঙ্গে। বড়দির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে যেন বাবার মুখটা দেখতে পেল, একটু আগে যে দেখা হল সেই কেমন-কেমন বলতে-না-পারা মুখটা, তারপর বাবা যেন মা হয়ে গেলেন, অসুখ না, কষ্ট না, পান-খাওয়া টুকটুকে ঠোটের ঝলমলে মা। আর দেখতে দেখতেই রং মুছে গিয়ে আবার সব সাদা হল। হঠাৎ বলে উঠল আচ্ছা, বড়দি, পান খাও না কেন?

শ্বেতা উত্তর দিল না।

কেন খাও না? ওতে কী দোষ?

দোষ আর কী।

তবে?—কেন?—স্বাতী আবেগ দিয়ে বলতে লাগল, যেন এই পান খাওয়া আর না-খাওয়াটাই সবচেয়ে বড়ো কথা। কেন খাও না? তুমি তো ভালবাসতে—

উনিও খুব ভালবাসতেন—ছোট্টো গলায় শ্বেতা বলল। এই প্রথম স্বাতী শুনল বড়দির মুখে সেই মানুষের কোনো কথা, যে মানুষ আর নেই, আর যার না থাকটা এর মধ্যেই সবাই মেনে নিয়েছে। সবাই—কিন্তু একজন না, আর সেই একজনের কাছে কেমন লাগে অন্য সকলকে? স্বাতী আন্তে মুখ ফিরিয়ে নিল, তার মনের অনেক তলার চুপি-চুপি কান্না আবার যেন বেরিয়ে আসার ছুতো পেল। পানের ঘর থেকে উঠে এল ফুর্তির আওয়াজ—লুডো খেলছে ওরা। সময়

কাটাবার কত উপায় বার করেছে মানুষ, তবু সময়টাই সমস্যা। তবু জীবনে এমন সময় আসেই, যখন সময় আর কাটে না।—চলে যাবে। —চলে যাবে!—একটা হাতুড়ির বাড়ি দিল স্বাভাবিক হৃৎপিণ্ড—চলে যাবে? তাহলে আমি এখন কী করি?

* * * *

কী করি, সত্যেনও তখন ভাবছিল, কী করি। রাত্রি দূরে এখন, স্টেশনে রওনা হবার সময় হতে আরো অনেক দেরি। অন্তত ছ-ঘন্টা! আর এই ছ-ঘন্টা তাকে এমনি করেই কাটাতে হবে, এমনি চুপচাপ আরাম-চেয়ারে এলিয়ে, না-জোঁগে, না-ঘুমিয়ে, না-বঁচে। কেননা সবচেয়ে যেটাকে সে ভয় করেছে, প্রাণপণে যেটাকে সে এড়িয়েছে, আজ এত দিন পর হঠাৎ তারই ঝগরে সে পড়ে গেছে, আর এই ছ-ঘন্টা সময়—যতক্ষণ না হাওড়ায় বাসে চড়ে বসতে পারে—ততক্ষণ তার কিছু নেই, কিছু করার নেই। সত্যেন এদিক-ওদিক তাকাল। পরিষ্কার ঠাণ্ডা ঘর, বই-বোঝাই শেলফ দুটোয় সাহিত্যের অধিপতিরা সারি-দাঁড়িয়ে টেবিলে, হাতের কাছে টাটকা কয়েকটা। তার মনে পড়ল ভবানীপুরের মেস থেকে এসে স্বর্গ মনে হয়েছিল এই ঘর—মনে পড়ল কোনো এক সময়ে ভেবেছিল শুধু বই পড়েই জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। জীবন! জীবন কত বড়ো? সে যা চায় তাই তো পেয়েছে। বেশি কিছু চায়নি, কিন্তু যা চেয়েছে তা-ই পেয়েছে। পেয়েছে কম-টাকার বেশি-ছুটির চাকরি, নিরিবিঘ্ন ঘর, কলকাতার জ্যাস্ট হাওয়া, পেয়েছে সেই স্বাধীনতা আর সেই মন যাতে নিজের কথা সবচেয়ে কম ভাবতে হয়। কিন্তু অন্য যেসব ভাবনা—তার মনের বই হজম-করা সতেজ পায়চারি—কোথায় তারা? বই, তোমরা আজ ফেল হলে কেন? যে সুন্দর, ছোটো ফ্রেমটাতে জীবনটাকে সে বেঁধে নিয়েছিল—যার মধ্যে, আর যাই হোক, সময় কাটাতে ভাবতে হত না কখনো—তাতে কি আর কুলোচ্ছে না? জীবনটা কি বেড়ে গেল হঠাৎ? আর কোনো চাওয়া? কি তার বাকি আছে? কিন্তু চাওয়া তো শুধু না, চাওয়া মানেই পাওয়া, নয়তো চাই-চাই বলে গলা শুকিয়ে মরতে পারে না তো। চাওয়া মানেই পাওয়া—বেশি কন্মের কথা নেই এতে। কেননা যার কাছে যেটা বেশি...বড়ো, সে তা-ই চায়—চাইলেই পাওয়া যায়, আর তা যদি না হয় তবে তো না-চাওয়া ছাড়া উপায় নেই মানুষের।

ছবি ভেসে উঠল সত্যেনের মনে। সেই যেদিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা মেয়েকে দেখেছিল মাঠ পার হয়ে হেঁটে আসতে। বর্ষাকাল তখন। নতুন এসেছে এ-কিন্তু। বৃষ্টির পর রোদ উঠেছে বিকেলে। একই সঙ্গে দেখেছিল লাল আকাশ, ছড়ানো মেঘ আর মেয়েটি যখন কাছে এল, চিনল, তার কালো চুলে হলদে রোদের ফিতে। কত আশ্চর্য ছিল তখন, নির্লিপ্ত, সুন্দরকে সুন্দর বলেই ভালবাসত। আর এখন? অন্য ছবি এবার চিত্তকোষে—বেলা, ব্যস্ত-বাড়ি, তার মধ্যে হঠাৎ...উঠানের মধ্যে দাঁড়িয়ে....সে ... কী ভেবেছিল সবাই? কী ভেবেছিল যখন সে ঐ টিকিটটা বের করেছিল পকেট থেকে! একটা কথা হল না, ভাল করে চোখেও যেন দেখল না...অনর্থক—সব অনর্থক। কোনো মানুষকে দেখে-দেখে আরো যদি দেখতে শুধু ইচ্ছা করে তবে তো তাকে না দেখলেই ভাল। তারপর, তখনই, আরও হঠাৎ তার চলে আসাটা। ঠিক বেরোবার মুখে ওর বাবার সঙ্গে দেখা—কী যেন তিনি বলেছিলেন...কোনো জবাব দেয়নি, পাছে কথা বলতে দাঁড়ায়েই তিনি আবার বসতে বলেন আর সেও রাজি হয়ে যায়। বোকামি—সমস্তটাই বোকামি! সুন্দরের ধর্মই ঋণিকতা। কষ্টিপাথরের পার্বতী মন্দিরেই মানায়, পুরীতে যারা বারো মাস থাকে

তারা সমুদ্রের দিকে ফিরে তাকায় না...তাই রক্তমাংসের মানুষ সুন্দর হতে পারে না...যদি সুন্দর লাগে, ভাল লাগে, যে কোনো কারণে কোনো জ্যাস্ত মানুষকে ভাল লাগে যদি, তাহলে তাকে আমরা যদি চাই—চাই—আর সেই তাতাথে ইচ্ছায় কোথায় সুন্দর! আর তাই মানুষকে ভালবাসতে সাবধান—কবিতা ভালবাসো, প্রজ্ঞা ভালবাসো, আকাশ ভালবাসো—কিন্তু কোনো জীবন্ত মানুষকে ভালবাসতে খুব সাবধান। এই তো সে—সভ্য মানুষ, শিক্ষিত ভদ্রলোক, সতেরো বছরের বাচ্চা ছেলের মতো আকাট বোকামি করে এল তখন, আর এখন—যদিও তার কোনো অভাব নেই, দুঃখ নেই—যেন চেয়ারে বসে বসে অথই জলে খাবি খাচ্ছে।

একটা উপমা মনে এল সত্যেনের। তীরে দাঁড়িয়ে নদীর সুন্দর দৃশ্য দেখছিল, ভাল লাগছিল, আরো... আরো ভাল, যত ভাল লাগছে ততই আরো ভাল করে দেখতে গিয়ে সরে আসতে আসতে হঠাৎ জলের মধ্যেই পড়ে গেছে। বাঁকা, চোরা, কুটিল, পিছল জল। এখানে চাপ, ওখানে টান, সেখানে ধাক্কা, যত নরম, তত নাছোড়—আর যদি কখনো পায়ের তলায় মাটি ঠেকে, তাও পিছল। কিন্তু তুমি তো জানতে...সত্যেন নিজেকে নিজেকে বলল, তুমি কি জানতে না যে জল এ রকম? নিজেই উত্তর দিল, কী করে জানব, আগে তো কখনো জলে পড়িনি। তবে এটা তো জানতে জলের অত কাছে গেলে পড়ে যেতে পার? এবার আর উত্তর দিল না সত্যেন। মরিয়া হয়ে হাত তুলল সে। আঙুলের ভঙ্গী হল যেন টেবিলে পর পর শোওয়ানো তিনটি বইয়ের উপরেরটিকে আঁকড়ে ধরবে, কিন্তু তারপরেই সেই হাত ভিজ়ে ন্যাতার মতো ঢলে পড়ল কোলের উপর...বৃথা! বই দিয়ে মুখ লুকোবে কার কাছে? কার কাছে লুকোবে যে তার সমস্ত মন পড়ে আছে এখানে, ঐ বাড়িটায়, দু-মিনিট দূরে... কিন্তু এখন যেন পৃথিবীর অন্য প্রান্তে। লুকোতে হবে না, আর ভাবতে হবে না, আর মাত্র কয়েকটা ঘন্টা, তারপরেই রাত্রি, রেলগাড়ি, অন্য দেশ। কী আছে সেই দেশে? শান্তি আছে? মুক্তি আছে? আশ্রয় আছে? না—তার এই ঘরে এখন যা আছে সেখানেও তাই আছে—শূন্যতা, শুধু শূন্যতা। তবু, এই যাওয়াটা একটা চেষ্টা অন্তত। একজন মানুষ, মাত্র একজন মানুষ যেখানে নেই, সেখানে কিছুই নেই—এই অসম্ভব অবস্থটাকে স্বীকারের চেষ্টা—আর চেষ্টা করতে গিয়ে হয়তো তার শক্তি বাড়বে, খুঁজে পাবে নিজেরই মনের পলিমাটির তলায় আরো পুরোনো পাথর। কিন্তু ফিরে তো আসবে? তারপর আবার—? না, ফিরে এসে এ-বাড়ি ছাড়বে, এ-পাড়া ছাড়বে, ছেড়ে দেবে কলেজে মেয়েদের ক্লাস। দেখা না হলেই ঠিক হবে সব। শূন্যতার ধূ-ধূ রাজ্য পেরিয়ে আবার ফিরে পাবে নিয়মের আরাম, অভ্যাসের আশ্রয়, তার সম্পূর্ণ সত্তা, তার স্বাধীন মন। ঠিক, এই ঠিক! নিজের ছাড়পত্র নিজেই লিখে, সেই করে তার একটু হালকা লাগল। একটু বেশি হালকা, যেন ডাক্তার বলেছে ভয় নেই, ব্যামো সারবে কিন্তু একটি পাকিটে ফেলা চাই। তারপরেই মনে হল—আর তো দেখা হবে না, তাহলে আজ আর একবার। মনে হতেই উঠে বসল চেয়ারে, হঠাৎ যেন বেঁচে উঠল, ফিরে পেল বাস্তবের পৃথিবীটাকে। আবার যাবে? ঐ দুপুরবেলার পর আবার! সত্যেন মনের চোখে দেখল সেই তিনটে ছাইরঙের সিঁড়ি, সবুজ দরজা, উশ্টোদিকের নীল পরদাটা, আর সেই পরদা সরিয়ে স্বাতী এসে দাঁড়াল ঘরের মধ্যে। কী বলবে? কোনো কথা নেই, আর নয়তো এত কথা আছে যা কখনো শেষ হবে না। এতদিন ধরে এত কথার পরেও তবু তো সব কথাই বাকি থাকল—বাকিই থাক। কী হবে গিয়ে...সত্যেন আবার এলিয়ে পড়ল চেয়ারে—গিয়ে তো সেই চলেই আসতে হবে আবার। বাড়ি, সিঁড়ি, দরজা মিলিয়ে গেল

তবু দাঁড়িয়ে থাকল স্বাভাৱ। তার পিছনে নীল পরদাটা, শূন্য-হয়ে-যাওয়া বিশ্বে শুধু স্বাভাৱ। যেমন মাঠের মধ্যে শুয়ে থাকলে মনে হয় আকাশের গায়ে ঐ সাদা মেঘ ছাড়া কোথাও কিছু নেই। নড়ল না, সরল না, স্থির দাঁড়িয়ে থাকল। স্বাভাৱ চোখ, চোখের ভিজ্জেভিজ্জে আভা, তাও দেখতে পেল সত্যেন—যে-ও অপেক্ষা করেছে; কেউ কিছু বলবে বলে, কোথাও কিছু ঘটবে বলে অপেক্ষা করেছে। স্বাভাৱ অপেক্ষা করেছে তার জন্য। কিছু সে বলেনি, কিছু সে ভুলে গেছে—আর সেইটে মনে পড়লে, সেইটে বলা হলেই সব মিটে যাবে, সব ঠিক হবে। এতক্ষণ শূন্যতা ছিল, অশান্তি জায়গা জুড়ল এবার। এটা তার একলার ব্যাপার নয়; আর একজনেরও অংশ আছে, তার সমান-সমানই অংশ। অথচ এতক্ষণ সে নিজের কথাই শুধু ভাবছিল, সে কেমন করে ফিরে পাবে তার শাস্ত জীবন, তা-ই ভাবছিল শুধু আর সেজন্য দুঃখ মেনে নিতে প্রস্তুত করছিল নিজেকে। তার জীবন! আর কি তার জীবনের উপর কর্তৃত্ব আছে তার? সে কি ইচ্ছে করলেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারে, যদি ইচ্ছাটাও তার একলার না হয়, আর একজনের? নিজেকে দুঃখ দিতে পারে? দায়িত্ব, দায়িত্বের ভার সত্যেনের মাথা নামিয়ে দিল কাঁধের উপর, চোখ বুজিয়ে দিল। চেষ্টা করলো না-ভাবতে, কিছু না-ভাবতে, একটা ঝাপসা, ঝিমোনা ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে যেতে। কিন্তু চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে, ভিজ্জে-ভিজ্জে আভার চিকচিকে চোখ, বোজা চোখের অন্ধকারে জেগে আছে, দেখছে তার চোখের ভিতরে, মনের ভিতরে, বিঁধছে তার শরীরে...বিঁধছে। সেই চোখ থেকে ছাড়া পেতে সত্যেন চোখ খুলে ফেলল আর সামনের মেঝেটার দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেল যে এখন একটিমাত্র উপায় আছে তার—তাদের—সে উপায় বিয়ে। বিয়ে! কথাটা অদ্ভুত শোনাল তার কানে। কেন, নিজেকে প্রশ্ন করল, এর মধ্যে কখনো কি কথাটা উঁকি দেয়নি তোমার মনে? হয়তো—কিন্তু তাই বলে সত্যি? সত্যি তো হবেই কখনো। তাই বলে এখনই! তা-ই তো ভাল, সবচেয়ে ভাল—স্বাভাবিক। স্বাভাবিক? না গতানুগতিক? তা হলে তো সবচেয়ে গতানুগতিক বেঁচে থাকাটা।

সত্যেন একবার মনটাকে দৌড় করিয়ে আনল তার প্রথম যৌবনের বছরগুলির উপর দিয়ে। সব অর্থেই স্ত্রীলোকবর্জিত জীবন তার। অভাববোধ ছিল? হয়তো, কিন্তু অধৈর্য ছিল না। অনেক দেখেছে সহপাঠীদের মধ্যে—সুবতীদের সঙ্গ পেতে অসুস্থ হীন উদ্যম তাদের। আরো সহস্রা যারা, তাদেরও দেখেছে। বীরদের বিদ্রোহ মেনে নিয়ে নিজেকে বাজে খরচ না করে ঐ বছরগুলি সে কাটিয়ে দিতে পেরেছিল কীসের জোরে? অন্যদের চেয়ে সে ভাল বশেনা—ঈশ্বর জানেন—বুদ্ধিমান বলেও না—নিঃসাড় বলে তো নিশ্চয়ই না, তার কারণ বোধহয় এই যে অল্প বয়স থেকে কবিতা পড়ে পড়ে এ বিষয়ে একটা কল্পনা জেগেছিল তার, আর সেই কল্পনার কাছে গোপন, খুব গোপন একটা প্রতিজ্ঞায় সে আবদ্ধ ছিল। কখনো মনে হয়েছে সেই কল্পনার ছবি হয়তো কোনো মানুষের মধ্যে দেখবে কিন্তু তার মধ্যে বিয়ের কোনো কথা ছিল না, অসুস্থ বাধ্যতা ছিল না। বিয়ে? না-ই বা হল—আর হয় যদি তো হবে কোনো একদিন—এই রকমের টোকায় এতদিন সে কথাটাকে মনের এপাশ থেকে ওপাশে সরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এখন আর পারল না, কথাটা হঠাৎ কাঁটার মতো এঁটে বসল। হঠাৎ? হঠাৎ বলে কিছু নেই, সবই আমরা-ইচ্ছে করে ঘটাই। বলো, সত্যি বলো, তিন বছর আগে এক সকালবেলায় কলেজের ক্লাস-ঘরে বই থেকে চোখ তুলে তুমি কি তোমার কল্পনার ছবি বাস্তবে দেখেছিলে? না কি এই তিন বছরে একটু একটু করে তুমি তোমার কল্পনাকেই ছেঁটে কেটে মিলিয়ে নিয়েছ তার

সঙ্গে? বলো, কবুল করো—এটা কি আকাশ থেকে ণ্ডল তোমার উপর না কি তুমিই দিনে দিনে এটাকে বানিয়েছ, তারপর খড়-মাটি-রঙের মধ্যে প্রাণ দিয়েছ তুমি! শুধু আমি? দুজনেই...দুজনেই, দুজন ছাড়া কি? কিন্তু দুজন আর কোথায়, দুজনের এখন এক জীবন। এখন তোমরা এক। সত্যেনের মেরুদণ্ড বেয়ে শিউরানি নামল ঠাণ্ডা। তারা এক! কখনো আর আলাদা হবে না? আর তার মানেই বিয়ে? হৈ-চৈ, পৈতে-পরা মুখ পুরু, নতুন ফার্নিচারের মদ-মদ গন্ধ। দুজনের মধ্যে যা জন্মাল, বড়ো হল, সেই জীবন্ত সুন্দরকে ঢোল পিটিয়ে বিশ্বসংসারে রটানো। কিন্তু তা ছাড়া আর উপায় কী? আর কোন উপায় আছে যাতে চোখ ফিঁদে দেখা যায়, সব কথা বলা যায়, চলে আসতে হয় না? আর কোন পথ আছে যাতে ফিরে আসা নেই? প্রশ্নটি একটু যেন ভেসে থাকল তার মনের উপর, কোনোদিক থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে আস্তে ডুবে যেতে লাগল আর তখনই মস্ত ঘোলা ঢেউ তুলে ফিরে এল সব—সেই সব, তার রাঁচির টিকিট, দু-বার করে বিদায় নেয়া, তার একটু আগের কত কিছু সংকল্প। কোনটা? তাকে মনস্থির করতে হবে—আজই, এখনই। যদি যায়, সেটা শুধু কলকাতা ছেড়ে বেড়াতে যাওয়া হবে না, ছেড়ে যেতে হবে এই সমস্তটা জীবন। যে জীবন তার—হতে পারত, হতে পারে। আর আজ যদি না হয়—তাহলে আর দেরি করতেও পারবে না। কোনটা? সত্যেন চেয়ার ছেড়ে উঠল। মনে হল তার শরীরের কোনো ওজন নেই, মেঝের উপর দিয়ে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে। শোবার ঘরে এল, আয়নার সামনে চুল আঁচড়াল, অচেনা লাগল নিজের মুখ। বসে বসে আর ভাবতে পারে না—বাইরে, যেখানে হয় কাটিয়ে আসবে। আর তো কয়েক ঘণ্টা সময় আছে, অন্তত কয়েকটা ঘণ্টা তাকে নিশ্চিত কিছু করতে হবে না। পকেটে টাকা নীল, হঠাৎ মনে পড়ল শিলং... যেদিন শেষ চিঠিটা পেয়েছিল আর পেয়েই ট্রেন ধরতে ছুটেছিল। সেদিনই বুঝেছিল আজকের মতো একটা দিন আসবে, আসবেই। সব বুঝেছে, সব জানে, স্বাভাবিক জানে। ও বাড়ির সকলেই বুঝেছে এতদিনে—এতক্ষণে; শুধু ভান, নিজের কাছে নিজের মান বাড়ানো। যা-ই করুক, যা-ই ভাবুক, পারবে নাকি এখন কলকাতা ছাড়তে? পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে! সত্যেন বেগে বেরিয়ে এল রাস্তায়। দ্রুত হাঁটল রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁষে ডান দিকের গলিটার দিকে—সাদা একতলাটার দিকে ফিরেও তাকাল না। সোজা চলে এল ট্রাম-রাস্তায়, ট্রামে উঠে একেবারে এসপ্লানেড। মেট্রো সিনেমার সামনে দাঁড়াল, যেখানে সে এ জন্মই এসেছে। সেখানে টিকিট না পেয়েই এল অন্য একটায়, ঢুকে পড়ল। জীবিত আরম্ভ হয়ে গেছে তখন। ঘরে নীলচে অন্ধকার। অতগুলি একভাবের মানুষ আর পৃথিবীর উপর কড়া আলোয় দেখানো ছায়াছবি—সব মিলিয়ে একটু উপশম আনল তার মনে। নিবিষ্ট হতে চেষ্টা করল। দুই বন্ধু একই মেয়েকে ভালবাসে। একজনকে সে বিয়ে করল আর একজন দেশ ছাড়ল নাবিক হয়ে। সময় কাটল। নাবিক ফিরল, আবার দেখা হল, আর দেখামাত্র তার প্রেমেই পড়ে গেল মেয়েটি। নাবিক কিন্তু বন্ধুকে ঠকাতে রাজি না। এদিকে স্বামী ব্যাপার বুঝে সান্ত্বনা খুঁজল এক নাচওয়ালিতে, তাতে আবার স্ত্রীর আঁতে ঘা লাগল। টানাপোড়েন চলল, সময় আর কাটে না। সত্যেনের মনে হতে লাগল চেয়ারটা তেমন আরামের না, লোকেরা বড্ডো কাশছে, এবার তো শেষ হলোই পারে। যুদ্ধ বাধল—সব সমস্যার সমাধান—স্বামী আকাশে পাইলট, নাবিক ডুবোজাহাজে ক্যাপ্তান, আর দুই বীরের ফটোগ্রাফ নিয়ে মেয়েটি গদগদ—এবার গড সেভ দি কিং বাজলেই হয়, কিন্তু সত্যেন তার আগেই উঠল, বেবিয়ে এল মিটমিটে চোখে হলদে-হওয়া

রোদ্দুরে। এখনো তো বেলা! তাহলে—? আচ্ছা, এক পেয়ালা চা। চৌরঙ্গিতে এসে প্রথম যে রেস্টোরাঁটা, সেটাতেই ঢুকে পড়ল। সে বসতেই পাশের টেবিল থেকে একজন বলে উঠল—
আ-রে সত্যেন! সত্যেন মুখ ফিরিয়ে দেখল, মটন-চপের গায়ে কাঁটা বিধিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে কিরণ বস্তু। কিন্তু যে কিরণকে সে চিনত, যে তার সঙ্গে চার বছর কলেজে পড়েছিল, সেই খন্দর-পরা খোঁচাদাড়ি কিরণ বস্তু না। গরদের পাঞ্জাবি, সোনার বোতাম, ফিটফট চুল, সবসুদু একটা একদম-নতুনের চোখে-পড়া চকচকানি।—এস না এই টেবিলেই—কিরণ অন্য হাতটা শূন্য নাড়াল আর সত্যেন তার মুখোমুখি চেয়ারটায় বসতে বসতেই আবার বলল কতকাল পর দেখা! তারপর—কী খবর?

খবর তো তোমার—সত্যেন একটোখা তাকাল কিরণের গালের দিকে—দাড়ি তো কামায়নি, যেন ছাল ছাড়িয়ে নিয়েছে, আবার পাউডারও!—কী ব্যাপার?

আর বোলো না ভাই, একটা কাণ্ড হয়ে গেল এর মধ্যে—বলতে বলতে কিরণের চিকচিকে গালে হাসির দুটো বড়ো বড়ো ভাঁজ পড়ল।

কবে?

যোলোই শ্রাবণ। কিরণ গভীর গলায় দিন-রক্ষা জানাল, যেন তার বিয়ের তারিখটা সত্যেনের কাছেও—সকলের কাছেই—বিশেষ একটা দিন। তোমাকে খবর দিতে পারিনি... বড্ডো... হঠাৎ... আর কোথায় আছ তাও ঠিক—

তাতে কী হয়েছে, চপটা খাও।

হ্যাঁ, এই যে, তুমি—তুমি কী খাবে বল।

চা।

আর--কিছু না? কিছু না? কিছু খাও! যা তোমার ইচ্ছে। আমি খাওয়াচ্ছি! সত্যেন একটু হাসল। আহা—খাও না কিছু!—কিরণ সহদয়তায় উদ্বেল হল—চপ কাটলেট ভাল না লাগে অন্য কিছু? স্যাণ্ডউইচ? কেক? ঠিক—কেকটাই তোমার পছন্দ—মনে নেই কর্ণফুলি কেবিন? সত্যেন ভাবল, কিরণ যে রকম বলছে সে রকম ঘনিষ্ঠতা ওর সঙ্গে আমার ছিল কি? আর সেই ফাঁকে কিরণ হাঁক দিল—বোয়! বোয় এনে সত্যেনের সামনে কেক রাখল, কিশমিশঘন পুষ্ট একটি আধো চাঁদ। কিরণ খুশি হয়ে বলল—বে-শ! একা বসে খেতে কি ভাল লাগে? একাই তো খাচ্ছিলে।

তুমি তো আসনি তখন—এতক্ষণে নিশ্চিত হয়ে কিরণ ফিরে গেল তার মটন-চপে—আর আগের কথায়। চিবোতে চিবোতে বলল—হ্যাঁ, বন্ধু-বান্ধব অনেকেই বাদ পড়ে গেল। আর দেখাশোনাও হয় না—সবাই ব্যস্ত—বেশ ছিল স্টুডেন্ট লাইফটা—কী বলো? বলে পিঠ-চাপড়ানো হাসল। সত্যেন বলল—তোমার ওকালতি কেমন?

আর সে কথা! আলিপুরে বেরোচ্ছিলাম—ট্রামভাড়াটাও পোষাত না। এখন ইনকাম-ট্যাক্স ধরেছি, এটাতে একটু আশা আছে—আমার শ্বশুর আবার আই. টি. ও. কিনা।

আই. টি. ও?

ইনকাম-ট্যাক্স-অফিসার। বুঝ না—ওটা একটা মস্ত ব্যাকিং। আর ইনকাম-ট্যাক্সের প্র্যাকটিসে পরস্যাও চটপট—ইশ, একটু ধার নেই ছুরিটায়...

কেনই বা ও সব হাস্যামা, হাত দিয়েই খাও। সত্যেন আঙুলে ভেঙে একটু কেক মুখে দিল।

সত্যি! ছুরি কাঁটা দিয়ে কি ঠিক মতো খাওয়া যায়! কিরণ ওসব সরিয়ে রেখে হাত লাগাল, কিন্তু একটু পরেই বলে উঠল—এঃ!

কী হল?

কিরণ ভরামুখে দুঃখীসুরে বলল—ঝোল পড়ে গেল পাঞ্জাবির হাতায়। সত্যেন তাকিয়ে দেখল কিরণের মুখে একটা সত্যিকার হায়-হায় ভাব। তার জামার হাতার দিকে চোখ নামিয়ে বলল—কই বোঝা তো যাচ্ছে না কিছু।

যাচ্ছে না?—মুখের মটনটা ভাল করে না চিবিয়েই কিরণ গিলে ফেলল। হাতটা উঁচু করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল, তার আংটির হিরে ঝিলিক দিল সত্যেনের মুখে। একটু পরে বলল—এখন জামার রঙে মিশে গেছে, কিন্তু শুকোলেই... ধুয়ে ফেলব এখনই? সত্যেন বলল—না না, তাতে আরও ছড়াবে, আর ইন্ড্রিও নষ্ট হবে।

ঠিক! তাহলে এই থাক—কী বলো? ইশ্শ! গরদের উপর ঈষৎ ভারি রঙের ক্ষুদ্র বিন্দুটির দিকে শোকের চোখে শেষবার তাকিয়ে কিরণ হাত নামাল, ঠিক হয়ে বসল। অনেকটা নিস্তেজ গলায় বলল—তারপর... তুমি তো সেই কলেজেই... এখন কোথেকে?

একটা ফিল্ম দেখে এলাম।

কোনটা? সত্যেনের মনে পড়ল, যে ফিল্মটার নাম সে জানে না, বাইরের দেয়াল-ছবিও লক্ষ করেনি। অগত্যা হাউসটার নাম করল।—ও ‘এন্ডস মিটিং’ দেখে এলে! কেমন?

মন্দ না।

ভাল শুনেছিলাম—জ্যানেট গ্রীন আছে—আমার আর দেখা হল না।

কেমন?

আর বোলো না। অনীতা আবার বাংলা-ফিল্মের পোকা—অনীতা আমার স্ত্রীর নাম। কেমন নাম?

অমিতা খুব ভাল নাম।

অমিতা না, অ-নীতা। কিরণ আওয়াজ করে হেসে উঠল। সর্ব্বাই এ ভুলটা করে। বেশ মিষ্টি—না?

সত্যেন বলল—হ্যাঁ। ভাবল—মা-বাবারা একটু ভেবেচিন্তে নাম রাখলে তো পারেন, যাতে একটা মানে অন্তত হয়। অনিলেন্দু আর অনীতায় দেশ তো ছেয়ে গেল।

হ্যাঁ—ঐ বাংলা-ফিল্মগুলো জানো তো দু-চক্ষের বিষ আমার, কিন্তু কী করব, দায়ে পড়ে যেতেই হয়—এই সপ্তাহেই দুটো হয়ে গেল। আর এও ভাবি যে আমায় কেউই যদি না যাই তাহলে একটা দিশি-ইন্ডাস্ট্রি গড়েই বা উঠবে কী করে!

সত্যেন বলল—সে তো ঠিক।

না হে, বিয়ে করলে আর স্বাধীনতা থাকে না। এই তো এই ছুটিটা—ছুটিতে তো মানুষ একটু বিশ্রাম করে—আমার কেটে যাচ্ছে কেবল শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের বাড়ি ঘুরে ঘুরে। এখন যেতে হবে দু-জায়গায়। প্রথমে ক্রিক রো, সেখান থেকে ফড়েপুকুর। এক বাড়িতে অসুখ, আর এক বাড়িতে এক বৌদির নতুন বাচ্চা হয়েছে—কেমন আছে-টাছে এই আরকি। খুব যেন বিরক্ত ভাব করে কিরণ প্লেটটার দিকে তাকাল, তারপর চপের শেষ অংশটুকু মুখে পুরল। সত্যেন বলল—সেইজন্য মজবুত হয়ে নিচ্ছ? হ্যাঁ—তা—তা বলতে পার। কিরণ খুব হাসল।

কথাটা উপভোগ করে। কিন্তু একা যে? কিরণের হাসিমুখ নিমেষে গভীর হল। একটু নিচু গলায় বলল—সেই তো! সব ঠিকঠাক, মার হঠাৎ শখ উঠল বৌকে নিয়ে কোথায় বেড়াতে যাবেন। বোয়! রাগি আওয়াজে হাঁক দিল—ফিস্কার বোল!

তাই বুঝি রাগ করে বাড়িতে চা খাওনি? কিরণ জলের বাটিতে আঙুলে আঙুল ঘষে হাত পরিষ্কার করল। রুমালে মুছে বলল—মায়েদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই, আর স্বীরা—ঠাঁরা সকলকে খুশি রেখে চলবেন—তোমাকে ছাড়া। দ্যাখো না, অসুখও এমন কিছু নয়, বাচ্চার মা-ও ভাল আছে—আমার একলা যাবার কি কোনো মানে হয়? কিন্তু না যদি যাই— কিরণ মাথা নাড়ল, ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া চা-টা এক টোকে গিলে কথা শেষ করল—বেশ আছ হে, বেশ আছ!

সত্যেন একটু পরে বলল—তোমার হয়েছে?

হ্যাঁ—চল! কেকটা তো খেলেই না দেখছি—বিল কিন্তু আমি। কিরণ বিল মিটিয়ে উঠল, আন্ত্রিন সরিয়ে সোনার কজিঘড়ি দেখল। তার চোখের ভাব বদলে গেল, একটু আপশোষের ছোট্টো আওয়াজ বেরোল। সত্যেন বলল—ওটা কিন্তু চোখেই পড়বে না কারও, যদি-না তুমি দেখিয়ে দাও।

হ্যাঁ। কিরণ সোজা হয়ে দাঁড়াল, নড়ে চড়ে বলল—আর কাচালে তো উঠেই যাবে।

হ্যাঁ, কাচালে নিশ্চয়ই উঠবে।—সত্যেন আগে রাস্তায় নামল। তুমি তো এখন ক্রিক-রো? আর বল কেন! কিরণের গালে আবার হাসির ভাঁজ পড়ল। চৌরঙ্গি পার হতে হতে বলল—তা তোমার খবর তো কিছুই শোনা হল না। সেই মেসে-ই—? বেদম আওয়াজে একটা লরি গেল, জবাব দেবার দরকার হল না। বেশ লাগল তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে— কিরণ কথা চালাল। এসো না একদিন—আমার ওখানে—মনে আছে তো সর্দার শঙ্কর রোড? কালই এসো না, অনীতাও খুশি হবে খুব। এসে চা খাবে বিকেল বেলা, ঠিক? ফুটপাতে উঠে সত্যেন বলল—খুব সুখের কথা, কিন্তু আমি আজ রাঁচি চলে যাচ্ছি।

রাঁচি যাচ্ছ? তা যাবেই-বা না কেন? স্বাধীন মানুষ তুমি—আর আমরা এদিকে—এই যে তিন নম্বর বাস। তাহলে ফিরে এসে—মনে থাকবে তো? আচ্ছা—। কিরণ তাড়াতাড়ি বাসে উঠে পড়ল, জানলায় হাত নেড়ে বিদায় নিল আর একবার।

বাসটা চলে গেলে, সত্যেন দাঁড়িয়ে থাকল সেখানেই। দিন চলেছে পশ্চিম-খোলা চৌরঙ্গি সোনার পাতের মতো জ্বলজ্বলে, এক-একটা দোকানের কাচের জানলায় রোদ ঠিকরে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল গাড়ির স্রোত, একটার পর একটা বাসের দাঁড়ানো, চলে যাওয়া। রোদের রঙ ঘন হল, ল্যাম্পপোস্টের ট্যারঙ্গ ছায়া ফুটপাত পেরিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে দোকানের সিঁড়িতে উঠল। সত্যেন ফিরল ট্রাম-স্টপের দিকে। পশ্চিমে মুখ করে দাঁড়াল। সবুজ ছড়িয়ে আছে ময়দানে, সোনালি—ঘাস, গাছ, রাস্তা, বেঞ্চি, বাচ্চাদের খেলা, পাথরের মূর্তি, সব নিয়ে সোনালি—কমলারঙের লালচে। দূরে আবছা ডিপির মতো কোর্টটাকে স্পষ্ট দেখা গেল পলকে। ইডেন-গার্ডেনের দিকটা সবুজ থেকে নীলচে হল। সত্যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল একটার পর একটা ট্রামের দাঁড়ানো, চলে যাওয়া। আয়ারা আড্ডা ছেড়ে উঠল, বিলেতি বাচ্চাদের ঘরে ফেরা শুরু হল, দূরে একটি মূর্তির কালো পাথরে হঠাৎ রক্ত-রঙের রোদ পড়ল। কঙ্ক শব্দ উঠল তার মাথার উপর, পাখি উড়ে এসে বসল সামনের গাছটায়।

সত্যেন ট্রামে উঠে পড়ল।

*

ছোটোমাসি, যাবে না?

হ্যাঁ, চলো।

চলো না! স্বাতী বলল—চলো। তাতা বলল—কখন থেকে চলো বলছ! সঙ্গে হয়ে গেল না এদিকে? শ্বেতা বলল—আঃ! কেন বিরক্ত করিস ছোটোমাসিকে। আতা চোট ফুলিয়ে বলল—বা রে! ছোটোমাসিই তো বলছিল কাল—। স্বাতী শাড়িটা ঘুরিয়ে পরে নিল, চুলে চিরুনি ছোঁওয়াল, দুজনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে।

আজ চিলড্রেন্স পার্কে, ছোটোমাসি? স্বাতী বলল—আজ চলো ঐ মাঠটায়।

না, ছোটোমাসি—

একটা শিউলি গাছ আছে ওখানে। বেশ ফুল কুড়াবে। ওঃ শিউলি! কত শিউলি আমাদের মৈমনসিংগে! শিউলি দিয়ে কী হবে!

কী দিয়েই বা কী হবে তাহলে?—তাতার কথা উড়িয়ে দিলো আতা। আমার খুব ফুল কুড়োতে ভাল লাগে, চলো। ছোটোমাসির মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে তাতা বলল—আমি অনেক বেশি কুড়োব দিদির চেয়ে—দেখো। একটু জোরে হাঁটো ছোটোমাসি।

দুই বোনঝিকে দু-পাশে নিয়ে স্বাতী মাঠে এলো। মাঠ আর নেই, পাড়া হয়ে গেছে। লাল গুরকি, রাস্তা, ইলেকট্রিকের তার, টাটকা-রঙ-করা ছোটো-ছোটো বাড়ি। কোনোটা এখনো হচ্ছে, কোনোটা শেষ হয়েও খালি, কোনোটায় শেষ না হতেই লোক এসে গেছে, আর তার সেই অনুকূলকাকার বাড়িটা—ভাড়াটে আছে সেখানে—বাইরের সাদা রঙে কালচে ধরেছে এর মধ্যেই। না, মাঠ নেই, তবু মাঝে মাঝে ফাঁকা, আর একেবারে পশ্চিমটায় খানিকটা মাঠ আছে এখনো। জায়গাটা কেমন ছিল আগে, তিন বছর আগে? কিন্তু এটাই যে সে জায়গা তা আর মনে হল না স্বাতীর—সেই মস্ত মাঠ, ঘন গাছ—বাড়ির জানলা দিয়েই দেখতে পেত তখন—সে সব বদলে এখন এই হয়েছে... তা যেন ঠিক না... সে সবও আছে, অন্য কোথাও আছে, চিরকাল থাকবে সেখানে। নিজের পাড়ায় নিজেকে তার আগন্তুক লাগল, গুরকির রাস্তা পার হল তাড়াতাড়ি, বাড়িগুলির দিকে আর তাকাল না। পশ্চিমের এবড়োখেবড়ো সন্ধ্যা ঘাসের মাঠে এসে দাঁড়াল।—কই ছোটোমাসি, শিউলি গাছ?

এই যে।

ও মা, এ—ই! দিদি, আমাদের সেই পুকুরপাড়ের শিউলি গাছটা—কেন বড়ো! আতা সঙ্গে সঙ্গে বললো—মোটোও না! মোটোও খুব বেশি বড়ো না! স্বাতী বলল—কেন বড়ো না! দ্যাখো দিদি—। স্বাতী বলল—ঐ দ্যাখো ফুল পড়ে আছে।

কই?

খুঁজলেই পাবে।

ছোটোমাসি, তুমি তুলবে না আমাদের সঙ্গে?

আমি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকি, দেখি তোমরা কে কত আনতে পারো। স্বাতী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল—কখনো আতা-তাতাকে, কখনো অন্য সব দিকে। জায়গাটা সুন্দর না, বরং উষ্টেই, কিন্তু তারও কেমন একটা ছবি হয়েছে। একটা দিক গাছপালায় কালো, আবার আর একদিকে

রসা-রোডের উঁচু-উঁচু ছাতও দেখা যাচ্ছে, আর ঐ কোণে কয়েকটা সুপুরি গাছের ছাত-ছাড়ানো ঝাঁকড়া মাথায় সূর্যাস্তের একটু রঙ আটকে আছে এখনো। স্বাতীর চোখের সামনে একটা দিন, আরো একটা দিন আস্তে আস্তে মরে গেল। জায়গাটার চেহারা বদলে গেল হঠাৎ। আলো নেই, কেউ নেই, শূন্য। আশ্বিন মাসে যেমন হয়, সারাদিন ঝকঝকে গরমের পর শীত-করা কুয়াশার সন্ধ্যা দুঃখী মুখে পাশে এসে দাঁড়ায়। স্বাতী ডাকল—আতা! তাতা!

যা—ই। স্বাতী ওদের কাছে গিয়ে বলল—বাড়ি এবার।

না ছোটোমাসি, আর একটু—বলে আবার অন্যদিকে সরে গেল ওরা। স্বাতী আবার একটু পরে ডাকল ওদের। আতা আগে এসে বলল—বেশি ফুল নেই ছোটোমাসি, এই ক-টা মোটে পেলাম। আর যা ধুলো আর ময়লা! তাতা তক্ষুনি ছুটে এসে বলল—এই দ্যাখো আমি বেশি পেয়েছি। কেমন, বেশি না?

অনে—ক বেশি!—কিন্তু স্বাতীর গলায় কিশোর উৎসাহ ঠিক ফুটল না।

কোথায় রাখি, ছোটোমাসি, ফুলগুলি? আতা বলল—আমাকে দে। আঁচলে বেঁধে রাখি সব। না! আমারটা তুমি রাখো ছোটোমাসি।

স্বাতী হাতের মুঠোয় ফুল নিয়ে বলল চলো। আতা বলল—বাড়ি তো ওদিকে।

চলো একটু ঘুরে যাই।

হ্যাঁ—তা-ই ভালো! জানো ছোটোমাসি, এখানকার শিউলি কেমন রোগা-রোগা। আর আমাদের সেই পুকুরপাড়ের শিউলিতলা—ইশ! তুমি যদি একবার দেখতে, ছোটোমাসি! মাসির হাত ধরে আতা তাড়াতাড়ি বলল—তুমি বুঝি ফুল খুব ভালবাসো? আচ্ছা কোন ফুল তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে?

আমি জানি!—স্বাতীর অন্য পাশে বলে উঠল আতা।

তুমি চুপ করো তো দিদি। বলো ছোটোমাসি, কোন ফুল?

কোন ফুল?...কোন ফুল?... স্বাতী হঠাৎ থামল, শুধু কথায় না, চলাতেও থামল। একটা দূর আওয়াজ শোনা গেল, গুমগুম। আতা-তাতাও থামল। আতা বলল—কী হল? শুনছ?

ও-তো ট্রেন! একটু পরে আতা আবার বলল—তাতে কী? তাতা বলল—ট্রেনের শব্দ তো রোজ শুনি আমরা! আতা বলল—রাস্তায় বেরোলে দেখাও যায় কত সমস্ত টালিগঞ্জের ব্রিজটা কী মজার—নিচে ট্রাম, উপরে রেলগাড়ি! একদিন রেল-লাইনে উঠবে ছোটোমাসি? স্বাতী কথা বলল না, নড়ল না, নড়তে সে পারে না—তার তা-ই মনে হল—যতক্ষণ না শব্দটা মিটি যায়। হাতের মুঠো শক্ত হল তার। ভাবল, ফুলগুলো নষ্ট হচ্ছে। শব্দের একটা প্যাঁচানো সূত্রে লম্বা হয়ে খুলতে খুলতে ফুরিয়ে গেল। স্বাতী বুঝল তার চোখে জল আসছে। আসতে দিল, অন্ধকার হয়ে গেছে ততক্ষণে।

চলো ছোটোমাসি! স্বাতী আবার হাঁটল, তাড়াতাড়ি এবার, কিন্তু বাড়ির...সেই বাড়ির—আরো কাছে এসে মৃদু, আরো মৃদু হল তার চলা। দরজা বন্ধ, ঘর অন্ধকার। উপরতলায় আলো জ্বলছে। একতলাটা বন্ধ, অন্ধকার।

উঃ! ভীত ভীত হয়ে উঠল।—দিদি আমার পা মাড়িয়ে দিল!

তুই অমন পায়ে-পায়ে হাঁটিস কেন?

শোনো ছোটোমাসি— তাতা আখুটে গলায় আরম্ভ করল, কিন্তু মাসির মুখ দেখে থেমে গেল। একটু পরে একেবারে অন্য সুরে বলল—একটা কথা শোনো, ছোটোমাসি। মাসি তাকালো তার দিকে। তাতা ফিশফিশ করে বলল—এইটে তোমার সত্যেনবাবুর বাড়ি না? স্বাতী মাথা নাড়ল। আছেন এখন বাড়িতে?

আতা হেসে উঠল—কেন? তুই যাবি নাকি? দিদির এই একটা কথা তাতা বিনা-জবাবে ছেড়ে দিল, উপরের দিকে তাকিয়ে তেমনি ফিশফিশ গলায় বলল—আছেন বোধহয়। আতা বলল—দূর বোকা! উপরে তো অন্যেরা থাকে; আর ফিশফিশ করছিস কেন ও রকম? যেন কী একটা ভীষণ গোপন কথা! আতা আবার হাসল। তুমি চুপ করো তো দিদি!— তাতা বেশ গলা চড়াল এবার। চল এখন! আতা তাড়া দিল বোনকে—রাস্তার মধ্যে আর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না! বাকি পথটুকু তর্ক করতে করতে এল দু-বোন। স্বাতী তাদের গলা শুনল, একটা কথাও বুঝল না। হঠাৎ মনে পড়ল, ফুলগুলো? আছে হাতে। বন্ধ, অন্ধকার। ট্রেন কখন? হাতটা ঘামছে। ফুলগুলি বাঁ হাতে নেব?

আতা-তাতার গলা থেমে গেল হঠাৎ। স্বাতীর কাপড়ে টান পড়ল। কী? আগের চেয়েও ফিশফিশ গলায় আতা বলল—ছোটোমাসি—। স্বাতী তাকিয়ে দেখল, সামনেই বাড়ি। আর সিঁড়ির ধাপে দরজার ধারে সত্যেন। দরজায় আঙুলের টোকা পড়ল তিনবার। আতা নিচু গলায় বলল—কী রে, কেউ শুনতে পায় না? আমি যাই ওদিক দিয়ে। আমিও— তাতা ছুটল আতার পিছনে। সত্যেন ফিরে তাকাল। স্বাতী তিনটি সিঁড়ি উঠল। সত্যেন বলল—আবার এলাম। স্বাতী কিছু বলল না। সত্যেন বলল—এলাম মানে... আসতেই হল। স্বাতী কিছু বলল না। একটু চুপ করে থেকে সত্যেন আবার বলল—আসতেই হল, না-এসে পারলাম না। তা... আমার বোধহয় সময় হল এদিকে... আচ্ছা—। স্বাতী বলল—না। হাত থেকে কয়েকটা শিউলি তার পায়ের কাছে পড়ল। আবার বলল—না, যেয়ো না। ভিতর থেকে দরজা খুলে গেল।

৫

শীতের ছোটো দিন দেখতে দেখতে ফুরোল, সন্ধ্যা নামল। দুটি ঘরের মধ্যস্থানকার দরজায় দাঁড়িয়ে তরুলতা বললেন—সতু, এবার তৈরি হয়ে নে। সত্যেন হাসল। আজ দিনের মধ্যে যতবার মামিমা তাকে ‘সতু’ বলে ডেকেছেন, ততবার ঐ একটা হাসি ফুটেছে তার ঠোটে। ঠাট্টার হাসি, আবার যেন অন্য কিছুরও। ভাবতে কেমন মজার আগে যে তাকে ‘তুই’ বলবার, ‘সতু’ বলে ডাকবার এখন এই মামিমা ছাড়া বলতে গেলে কেউ নেই। সত্যেন বলল—তৈরি আবার কী! কিরণ বস্ত্রি গম্ভীর চোখে তাকাল—সাজবে না?

সাজবো কেন? আর সেজেই তো আছি।

এই?—সত্যেনের মুখ থেকে নিচের দিকে চোখ নামিয়ে আনল কিরণ, আবার উপরে তুলে বলল—তুমি এখনো আলোতে ঠোঙা পরাওনি দেখছি।

কী হবে?

আমিও তাই বলি—কী হবে। কিন্তু আমাদের পাড়ায় এ. আর. পি-র ছোঁড়াগুলোর যা ভড় পানি! না হে—কিরণ আর একবার উপরদিকে তাকাল—আলোটা বাইরে যাচ্ছে। জানলাটা বরং

ভেজিয়ে দিই।

আরে বোসো বোসো। কিরণ উঠে জানলা ভেজিয়ে দিল। ফিরে এসে একটু নিচু গলায় বলল—জাপানিরা নাকি বর্মায় ঢুকে গেছে, রেঙ্গুনে বোমাও পড়েছে কাল। কিরণ প্রশ্নের সুরে কথা শেষ করল, তাই সত্যেনকে বলতে হল—তা হবে।

সুবিধে ঠেকছে না ব্যাপারটা। কিরণ ছোট্টা করে বলল—বর্মী গেল। তা গেলই বা, সত্যেন ভাবল। কী এসে যায়, কী আছে সেখানে? বর্মায় একমাত্র মূল্যবান ছিল স্বাতীর্থ মেজদি, তিনি তো কলকাতাতেই—হেমন্তবাবুও, যা ভাবনাই গেছে কদিন তাঁর জন্য—যাক, এসে গেছেন। তাহলে আর বর্মার জন্য ভাবনার কী রইল? অখিল ভিতর থেকে এসে সত্যেনের পাশের চেয়ারটায় রাখল একটি পাট-না-ভাঙা সিল্কের পাঞ্জাবি। সত্যেন তাকিয়ে বলল—কী?

মা তোমাকে এটা পরতে বললেন—বলে অখিল হাসল। আঁকা-বাঁকা তার দাঁতের সারি, মুখটা রোগা, কিন্তু—সত্যেন ভাবল—চোখ দুটি ভারি সজীব তো, আগে দেখিনি। এই অখিলই একদিন এসেছিল দশটা টাকার জন্য—আজ কত অন্য রকম দেখাচ্ছে। একটু তাকিয়ে থেকে বলল—খুব তো টেড়ি কেটেছো অখিল? আলতো করে চুলে হাত ছুঁয়ে অখিল ঘাড় কাৎ করে লজ্জা পেল। কিরণ বলল—সত্যেন, নখ কেটেছ? আঙুলের দিকে তাকাতে গিয়ে সত্যেনের চোখ পড়ল ডান হাতের কঙ্গিতে বাঁধা হলদে সুতো। এটা নাকি পরতেই হবে। একটু পরে নিখিল বলল—আমি ভাবছি গরদের জোড় পরে কেমন দেখাবে তোমাকে!

গরদের জোড় মানে?

বাঃ, কী পরে বিয়ে হয় জানো না?

সে সব নিয়ম আজকালও আছে নাকি?

কিরণ মিটিমিটি হাসতে লাগল, যেন একটা চমৎকার প্রতিশোধ নিচ্ছে সত্যেনের উপর। আস্তে আস্তে বলল—শোনো, চারদিকে লোক...অচেনা লোক...মেয়েরা—সব চোখ তোমার উপর—তার মধ্যে তুমি মূর্তিমান দাঁড়িয়ে আছ। দুজন লোক দু-দিকে একটা কাপড় ধরে তোমাকে ঘিরে দিল, আর তুমি যথাসম্ভব গাঙ্গীর্ষ বজায় রেখে কাপড় ছেড়ে নিলে। খুঁটিটা একটু ছোটোই থাকে সাধারণত, ঠিক পা পর্যন্ত পড়ে না, আর উড়নিটা—তা তুমি ছিপছিপে আছ। তুমি বেশ ঢেকে-ঢুকেই বসতে পারবে। সত্যেন বলে উঠল—অসম্ভব!

বললে হবে কী, সুতি পরে তো আর বিয়ে হয় না।

হয় না? সত্যেন আঁৎকানো চোখে এদিক ওদিক তাকাল। ঝপ করে সিল্কের পাঞ্জাবিটা তুলে নিয়ে বলল—ঠিক! এইটে পরে নিই, তাহলেই হবে। কিরণ হালকাভাবে বলল—জামা পরাই বারণ।

পাগল নাকি! ভাগ্যিণী এটা ছিল, আর মামিমাও বুদ্ধি করে—। চকিতে জামা বদলে নিল সত্যেন, রুমাল পকেটে নিয়ে বলল—কত হাস্যাম্বল অনর্থক। আমি ওঁদের এত করে বললাম রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হোক, ওঁরা কানেই তুললেন না। কিরণ হেসে বলল—কেন তুলবেন? তারপর তুমি যদি একদিন বলে বোসো—বাস, থাকো এবার, আমি চললাম, তখন? কথাটা বুঝতে একটু দেরি হল সত্যেনের। কিন্তু বুঝতে পেরেই উত্তর দিল—সেইজন্যেই তো। যাবার কোনো উপায়ই যদি না থাকে, তাহলে আর না-যাবার মূল্য কী?

উপায় সবটাকেই আছে—কিরণ হালকাভাবে বলল—আমরা উকিলরা নয়তো আছি কী

করতে? সত্যেন কথা বলল না। তার মনে পড়ল স্বাতীর কাছেও সে এ-কথা বলেছিল। একবার না, দু-বারও না, কয়েকবার। স্বাতী প্রথমে এমন ভাব করেছে যেন শোনেইনি, তারপর 'কী—!' বলে তুরু কঁচকেছে, আর তারপর একদিন জুলজুলে চোখে বলে উঠল—কখনো আর এ-কথা মুখে আনবে না।

কেন?

কেন আবার? তুমি কি কখনো ছেড়ে যাবে আমাকে?

না। আর সে-জন্যই ইচ্ছা ছাড়া আর বাধ্যতা চাই না।

তুমি না চাইতে পারো, আমি চাই।

তুমি বাধ্যতা চাও? স্বাধীনতা চাও না?

না! তোমাকে ছেড়ে যাবার স্বাধীনতা আমি চাই না।

কেন? এর পরেও সত্যেন বলেছিল—নিজের উপর যথেষ্ট বিশ্বাস নেই তোমার?

—না থাকলে তো তোমার মতোই অনুষ্ঠানকে ডরাতাম।— বলে স্বাতী একবার তাকিয়েছিল তার দিকে, রানির মত সেই দৃষ্টি। মুহূর্তের জন্য নিজেকে একটু ছোটো লেগেছিল সত্যেনের। বাইরে থেকে নিখিল ঘরে এল, গায়ে গরম কাপড়ের খয়েরি শার্ট, হাতে এক পয়সা দামের টেলিগ্রাফ ভাঁজ করা। ঐ শার্টটা দেখে সত্যেনের ভাল লাগল, তার চেনা ওটা, কত দেখেছে মামার গায়ে—আর দেখতেও অনেকটা মামার মতোই— বেশ ছেলে হয়েছে নিখিল। কিরণ বলল—খবর আছে নাকি কিছু?

কিছু না। সকালের কথাই ঘুরিয়ে লিখেছে—নিখিল কাগজটা ছুঁড়ে ফেলল টেবিলের উপর। কিরণ সেটা তুলে নিয়ে তাকাল। তিন দিনে পনের হাজার লোক—

আরো বেশি হবে—বলল নিখিল। ট্রেনে আর ওঠা যাচ্ছে না, দেহাতিরা সব হেঁটে-হেঁটেই ভাগল-বা!

ওদের আর দোষ কী। ভাল ভাল ভদ্রলোকরাই— কিরণ কথা শেষ করল না, ভাবল তার স্বপুত্রের কথা। ভদ্রলোক এর মধ্যেই একটা বাড়ি নিয়ে ফেলেছেন রামপুরহাটে—মোয়েদের সব পাঠিয়ে দেবেন—অনীতাকেও নাকি যেতেই হবে সেখানে। কী অন্যায় জেন্দ! হ্যাঁ—রাস্তায় আর কথাই নেই এ ছাড়া—নিখিল হাসল। এইমাত্র গুলশাম একজন বলছে—।

সত্যি, কী যে হবে!—কিরণ সত্যেনের দিকে চোখ ফেরাল—তোমার কী মনে হয়? সত্যেন অমায়িকভাবে বলল—কী আবার হবে! তুমি বুঝি ও-বাড়ি থেকে এলে নিখিল?

হ্যাঁ। তোমাকে নিতে আসছেন ওঁরা। সত্যেনের হাসি পেল—আজ বুঝি আর নিতে না এলে যেতে পারি না? কী সব নিয়ম! দিদিরা তো কবে থেকেই তাকে তাড়াচ্ছেন—এখন আর দেখাশোনা না, আর একেবারে বিয়ের সময়। আর তারপর কাল মেজদি—না, সেজদি—সরস্বতী তো সেজদিরই নাম—খুব গম্ভীরভাবে বললেন—সত্যেন, কাল কিন্তু তুমি আর এসো না, বুকেছ তো? আর তাই-তো আজ সকাল থেকেই দিনটা ঝাপসা। এই দু-মাসের মধ্যে আজই প্রথম যেদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত স্বাতীর সঙ্গে একবারও তার দেখা হল না। তরুলতা কুলো হাতে ঘরে এলেন, মেঝেতে কুলো নামিয়ে সামনে আলপনা-আঁকা পিঁড়ি পেতে ডাকলেন—সতু, আয়।

আবার কী? সত্যেন ভুরু কঁচকাল।

আয়। বসতে হয় একবার।

যত বাজে—!

ও-সব চলবে না হে— কিরণ বলল। যে যা বলবে তা-ই করতে হবে আজ।— তা-ই তো করছি, সত্যেন ভাবল— আমার আমিত্ব আর কিছুই থাকল না। সকালে হয়ে গেল এক প্রস্থ— মামিমা ছাড়লেন না কিছুতেই। পুরুত এল, টিকিওলা পূজুরি বামুন, কলাপাতার ঠোঙা, চালকলা—উঃ! দু-ঘন্টা বসে বসে কী সব বিড়বিড়—আবার প্রপিতামহীর নাম জিগেস করে!—যেন প্রপিতামহীর নাম কোনো জন্মে কেউ শুনেছে— প্রহসন! কিন্তু এই প্রহসনের পরপারেই বাস্তব...এসব মিথ্যা তাদের খোলশ ছাড়াতে ছাড়াতেই শেষ সত্যে পৌঁছবে। সে কি জানত এই সত্য, যদি সে রাঁচি চলে যেত সেদিন, দু-মাস আগে প্রথম কুয়াশার সেই সন্ধ্যায়? পৃথিবীর সব শব্দ থেমে গিয়েছিল তখন, যখন বারান্দার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে স্বাতী বলেছিল। অনেক কথা বলেছে স্বাতী, সে-ও বলেছে। মনে হয় যেন মনের সব কথা, জীবনের সব কথা, মনে হয়েছিল জীবন ভরে বললেও ফুরাবে না। কিন্তু ফুরোল, আর কথা নেই, দু-জনে আবার প্রথম থেকে আরম্ভ না করলে আর কথা নেই—এই সেই আরম্ভ।

বসে রইলে যে? কিরণ তাড়া দিল— ওঠো! সত্যেন উঠল, চিত্রি-করা পিঁড়িতে বসল। সামনে কুলোতে প্রদীপ জ্বলছে, ধানদুর্বা কী কী সব সাজানো। মামিমা উবু-হাঁটু হয়ে তার সামনে বসলেন, তার মাথায় হাত রেখে, ঠোঁট নেড়ে কিন্তু আওয়াজ না করে কী বললেন, হাত সরিয়ে এনে বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে চন্দনের ফোঁটা দিলেন তার কপালে। আমিও দিই একটু।— কিরণ এগিয়ে এসে নিচু হল। না—না— দুহাত তুলে কিরণকে ঠেকাতে গেল সত্যেন। রাখো তো!— কিরণ মোটা আঙুলে বেশ টিপে-টিপে চন্দন দিল সত্যেনের কপালে।—এই একদিনই তো বিয়ে করবে জীবনে। সরে এসে বলল—বেশ দেখাচ্ছে। তরুলতা ধানদুর্বা দিলেন তার মাথায়, প্রদীপসুন্ধু কুলোটা একবার কপালে ঠেকালেন, তারপর হঠাৎ তার ডান হাতটি টেনে নিয়ে কড়ে আঙুলে ছোট্টো কামড় দিলেন। সত্যেন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

কিরণ বলল—বাঃ, প্রণাম করলে না মামিমাকে?

থাক, থাক—তরুলতা কুলো সরালেন, পিঁড়ি তুললেন।—চটচট করছে—সত্যেন আঙুল তুলল কপালের দিকে।

না, না, মুছো না, ও-থাক—বোঝা যাচ্ছে না। আরে এতে এ রকম করছ তুমি, আর আমাকে যা শাস্তি করেছিলেন কাকিমারা! কিরণ হাসল তরুলতার দিকে তাকিয়ে। আমাদের শ্রীমানের সবটাকেই আপত্তি।—তরুলতা ঘরের চেয়ার ঠিক করলেন—তস্তাপোশের চাদরটা টান করে দে তো, নিখিল।

বোঝা যাচ্ছে না ঠিক তো?—উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করল সত্যেন। একটু গেলই বা, চন্দনের ফোঁটা তো ভাল, যখন টোপর পরে—ইশ, একেবারে সঙ সাজিয়ে ছাড়ে হে!—কিরণ ফুর্তিতে হেসে উঠল। ঘরের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তরুলতা বললেন—দ্যাখ তো নিখিল, মহেশ পান আনতে গিয়ে কোথায় লেগে রইল।

আমি দেখছি— অখিল ছুটে বেরল। আর যে কেউ এল না এখনো? কিরণ এবার রাস্তার দিকে তাকাল। কোনো উত্তর না পেয়ে আবার বলল—বন্ধু-বান্ধব আর কেউ এল না?

বলেছে নাকি কাউকে? ওর এক কাকা আছেন কলকাতায়, বাবার সাক্ষাৎ জ্যাঠাতুতো তাই—কত বললাম আমি তাঁকে খবর দিতে—শুনল কি কথা? আমি একা আর কত পারি? তক্তাপোশের টান-করা চাদরটায় আরো দুটো টান দিয়ে তরুলতা পাশের ঘরে চলে গেলেন। একা আর কত পারি! কতবার শুনল সত্যেন। কিন্তু কমও তো পারেন না—ঐ টেবিলটাই কতবার গোছাবেন দিনের মধ্যে—এত গোছাবার কী যে আছে! সত্যেন একবার তাকাল ঘরের চারিদিকে, সব পরিষ্কার ফিটফাট, নিখুঁতরকম ওছানো—আর মিথ্যেই বা কী, তার নিজের ঘর তো নেই আর। মামিমাকে নিয়ে আসতে হল দু-দিন আগেই। তারপরেই অন্য এক জগৎ জেগে উঠল এই ঘরে। লোকজন, যাওয়া-আসা, লোকজন। আবার ফাঁকা হলও বিষম ফাঁকা। আজ দুপুরবেলা স্বাতীদের ফাঁকা বাড়িটাতেই একবার গিয়ে সে—কেউ ছিল না তখন—একটু অবাক লেগেছিল স্বাতীকে ওখানে দেখতে না পেয়ে। ডালিমের খাটটায় শুয়ে শুয়ে সময় কাটিয়েছিল খানিকটা।

সত্যি? কাউকে বলোনি? কলেজের কোলীগরা? তোমার সাহিত্যিকরা? কাউকে না? বাঃ! কিরণের আওয়াজের উত্তরে সত্যেন শুধু আবছা হাসল।

না, না, এটা ভাল করোনি। আগে জানলে আমিই বলে দিতাম কয়েকজনকে—ভবেশ চন্দ আর ফণী ভট্টাচার্যকে তো নিশ্চয়ই! সত্যেন বলল—তোমার একটু একা লাগছে, বুঝতে পারছি। সেজন্য বলছি না। আর কাউকে না বলে আমাকেই শুধু বলেছ, এটা আমার পক্ষে তো গৌরবেরই। কিরণ একটু অন্য রকম তাকাল সত্যেনের দিকে। সত্যেন সলজ্জ চোখ সরাল। দৈবাৎ সেদিন চায়ের দোকানে দেখা। তা ভালই হয়েছিল, তবু একজনকে মনে পড়ল সেই সময়। আর কিরণ তো ভালই—হ্যাঁ, বেশ ভাল, তখন যাদের সঙ্গে আমি বেশি মিশতাম তাদের অনেকের চেয়েই আসলে ভাল। ছাত্রজীবনে কিরণকে সে তুচ্ছ করেছিল, তাকে নিয়ে অন্যদের তামাশাতেও যোগ দিয়েছিল, সে সব মনে করে সত্যেনের অনুশোচনা হল।

সতুদা ওঁরা আসছেন। অখিল ছুটে এল।—ম-স্ত গাড়িটা!—আবার ছুটে গেল দরজার বাইরে। একটু চুপ। সত্যেন দেখল, বেশ ভারি ক্লি চেহারা করে নিখিল দাঁড়িয়েছে দরজার ধারে। আমিমা তার পিছনে, চেয়ারে কিরণ নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসল। কেমন করে কেটে গেল দিনটা! একটা দিন সে কিছু করল না, ভাবল না, এতদিনের উথালপাথালের পর আর তার অনুভূতি নেই। স্বাতীর কথা বেশ ভাবতে পারল বুকের মধ্যে কেঁপে না উঠে। আজ সকাল থেকে আবেগ তাকে ছেড়ে গেছে, প্রতিজ্ঞা মরে গেছে, শুধু একটা অস্তিত্ব ভেবে চলেছে সময়ের স্রোতের উপর। দুজনের জগৎ ছিল এতদিন দুজনের নিজস্বের। এখন অন্যদের জগৎ... সকলের... কারোরই না—এখন বিজ্ঞাপন, ব্যাকরণ, ব্যবস্থা—মিথ্যা কথা!

কী!—আস্তে একটি হাত পড়ল তার কাঁধে। সত্যেন মুখ তুলে অরুণবাবুর সুশ্রী মুখটা দেখতে পেল। একটু কালো রঙটা—পুরুষের পক্ষে ওটাই ঠিক রঙ—উড়-উড় চুলের কালো রঙ কানের কাছে ফিকে হচ্ছে, আর সেই ধোঁয়ারঙের উপর চশমার মোটা কালো ফ্রেমটা মানিয়েছে বেশ। ঐশ্বর্য প্রথম দেখেই, শুধু চোখে দেখেই, ভাল লেগেছে তার—কথা বলে আরো—একটু লাজুক, কেমন আবছা করে কথা বলেন, মিষ্টি শোনায়—প্রথম ক-বার ‘আপনি’ বলার পর তাকে ‘তুমি’ বললেন যখন। অরুণবাবুর চশমার পিছনে বড়ো-দেখানো চোখে একবার চোখ রেখে সত্যেন বলল—কিরণ, ইনি—ইনি অরুণবাবু, আর—কিরণ হাসল।—ধাক, ধাক, ওতেই হবে।

আপনি বসুন— সত্যেনের হয়ে সেই ভদ্রতা করল। সত্যেনের পাশের চেয়ারটায় অরুণ বসল। তরুলতা কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন—আমাদের বৌমা কেমন আছেন?
আর বলবেন না! অরুণ দু-চোখের কাছে দু-আঙুল ছড়িয়ে হাতটা উপর দিয়ে নামিয়ে আনল।
কাদছে খুব?

আমি এসে অবধি তো এ-ই দেখছি।

স্বয়ংবরা হয়েও এত কান্না?

আমিও তো তাই বলি! কিন্তু বললে কী হবে—কেন্দে-কেন্দে রোগা হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য অরুণের গলা অন্যরকম শোনাল, হাসির ভাবটাও মুছে গেল মুখের। তক্তাপোশে পা তুলে বসে হেমাঙ্গ তার মিহি গলায় বলল—শুনছ তো সত্যেন, সব কান্না কিন্তু পুষিয়ে দিতে হবে তোমাকে।

সেটা পুষিয়ে যাবে জেনেই তো অত কান্না!—বরপক্ষ 'সেজে তক্ষুনি জবাব দিল কিরণ। হেমাঙ্গর কথা শুনে সত্যেন একটু হেসেছিল। কিরণের কথা শুনে আবার তাই করল। এটা তার ইচ্ছার হাসি না, অনিচ্ছারও না—অনুপায়ের। আপাতত মুদ্রাদোষ হয়ে গেছে এটা। এখনকার মতো তার কোনো ইচ্ছা নেই, শক্তি নেই, সে থেমে আছে। তাকে ঘিরে অনেক কিছু হচ্ছে, কিন্তু সে কিছু ঘটাতে পারে না, ঠেকাতেও পারে না। সে শুধু দেখবে-শুনবে আর মাঝে-মাঝে ঐ রকম একটু না হেসেই পারবে না। এখন আর শুনছেও না ভাল করে। যাতে তার কোনো অংশ নেই, এ-রকম একটা দৃশ্যের মতো দেখছে মামিমার চলাফেরা, মিষ্টির থালা এনে এনে প্রত্যেকের সামনে রাখছেন তিনি, মহেশ নিয়ে এল ট্রেতে করে অনেকগুলি জলের গ্লাস—বাং, মহেশকে বেশ ফিটফাট দেখাচ্ছে তো আজ—আর অখিল পানের রেকাবি হাতে নিয়ে ঘরে এল। মামিমা দাঁড়ালেন কিরণের সামনে—একটু ঋণে।

আমি তো এসেই খেলাম।

যাবার সময় আবার খেতে হয়। ডালিম আর কিছু—? অরুণ ডালিমের দিকে তাকাল—বলে দেব নাকি, ডালিম? দূরে দাঁড়িয়ে ডালিম লাল হল।

মেসোমশাই ডাকবে না কিছুতেই, সত্যেনদা বলে ডাকবে—এই নিয়ে ডালিম রোজ ঝগড়া করে তার মা-র সঙ্গে।

'মেসোমশাই' কথাটা শুনে সত্যেন শিউরলো, আর লাল-হওয়া মুখে অনেকখানি সপ্রতিভতা এনে ডালিম বলল—মেসোমশাই-টা কী বিস্তী—বুড়ো!

ঠিক বলেছ, ডালিম!—বলে উঠল হেমাঙ্গ। আমরাই কি আর জন্ম থেকেই মেসোমশাই ছিলাম! বলে চাঁদির ছোটো টাকে—এমন আর ছোটো কী—হাত রাখল একবার। এ কথাটা শুনে হেমাঙ্গবাবুকে খুব ভাল লেগে গেল সত্যেনের। হ্যাঁ—উনিও খুব ভাল, দেখতে একটু গম্ভীর, কথাও কম বলেন, কিন্তু বলেন বেশ। আর ডালিম—একেবারে টুকটুকে লাল হয়ে গেছে বেচারী—কী মিষ্টি দেখাচ্ছে! তরুলতার দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে হেমাঙ্গ বলল—রাতারাতি এগারোজনের মেসোমশাই। সত্যেনের চোখের পাতা মিটমিট করল, গায়ে পিন-টিন ফুটলে যেমন হয়, আর তরুলতা গম্ভীরভাবেই জবাব দিলেন—আপনাদের মতো বান্ধব পাওয়া ওর ভাগ্যই তো—তা... আপনারাও রত্ন পেলেন—ডালিম আর একটা সরের নাড়ু? রাজি হওয়া-হওয়া মুখে ডালিম তাকাল নিখিলের দিকে। নিখিল তার গাল দেখিয়ে বলল—পান খাচ্ছি।

ঠিক—পানই খাই! ডালিম এমনভাবে বলল, যেন মিষ্টির বদলে পান খাওয়াটা খুব নতুন আর আশ্চর্য প্রস্তাব। পান তুলে নিয়ে মুখে দিল। মহেশ খালা-গেলাশ সরাল, অখিল বাঁ হাতে চুল চাপল একবার। ডালিমের নিচের ঠোঁটে ঈষৎ লাল রঙ দেখা দিল। তরুলতা সত্যেনের সামনে এসে দাঁড়ালেন খালায় করে ফুলের মালা নিয়ে।—নে, সতু।

কী?

পরে নে।

মালা পরতে হবে? সত্যেন দু-হাত তুলে পিছিয়ে গেল।—না, না, কিছুতেই না, কিছুতেই পারব না!

পারব না কী রকম? আরে মালা ছাড়া যে বিয়েই হয় না! এসো, এসো! বুখা ছটফটাল সত্যেন, কিরণ ঝঞ্জি জোর করেই তাকে পরিয়ে দিল মোটা, সাদা, গন্ধভরা রজনীগন্ধার মালা। অরুণ তাকিয়ে বলল—বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে। তা আপনিও নিন একটা।

আমি? আচ্ছা! কিরণ হাসল, ছোটো একটি মালা তুলে হাতে জড়াতে গিয়ে থামল, গোল করে আঙুলে পকেটে রাখল রুমালের তলায়। অনীতাকে দিতে হবে রাহে। সত্যেন এই ফাঁকে মালা খুলে ফেলছিল গলা থেকে, কিরণ এবার হাঁ-হাঁ করে পড়ল তার উপর। কী ছেলেমানুষি করে সব সময়! রাখো!—এমন ধমক দিয়ে কথাটা বলল যে সত্যেন কেমন মিনিমুখে গলায় মালা নিয়েই দাঁড়িয়ে থাকল চুপ করে। আরো মালা ছিল খালায়। অখিল নিল, নিখিল নিজেকে নিয়ে ডালিমকেও দিল। হঠাৎ সমস্তটা ঘর রজনীগন্ধার গন্ধে ভরে গেল, আর যেন সেই গন্ধ ভাল করে নেবার জন্য সকলেই চুপ করে থাকল একটুক্ষণ। তারপর হেমাঙ্গ মুখে একটি ছোটো এলাচ দিয়ে বলল—এবার তাহলে—।

হ্যাঁ, আর আড্ডা না, সত্যেন, চলো।—অরুণ কোঁচা ধরে উঠে পড়ল। ডালিম এগিয়ে এল তাড়াহুড়ি। ট্যান্ডি আনব আর একটা? চারদিকে একবার পলকপাত করে হেমাঙ্গ বলল—আর দিয়ে কী হবে? গাড়ি দিয়েই বা কী হবে—সত্যেন ভাবল। এখান থেকে হেঁটেই যাওয়া যায় কত বার। কিন্তু স্বাভীদেব বাড়িতে হলেও বোধহয় গাড়িতেই যেতে হত এখন।^(৩) দেখুন না অন্যায়টা।—কাঁধের উপর শাল ঠিক করে কিরণ উঠে দাঁড়াল। কাউকে রক্ষা, একদম ফাঁকি দিয়েছে সবাইকে। আপনারাই বলুন, একজন বন্ধু নিয়ে বিয়ে করতে যায় কেউ? সত্যেন আজকাল একজন ছাড়া দু-জন জানে না—অরুণ আঙুলে-আঙুলে বলল, আর কিরণ কথা শুনে হে-হে করে লম্বা হাসল। হাসির শেষ দমটা সরু করে ধরে দিয়ে বলল—আচ্ছা—হু, বৌভাতের সময় শোধ নেব! সত্যেনের গায়ের কাপড়টা চেয়ারে পিঠ থেকে কাঁধে তুলে দিল অরুণ। সত্যেন ফিরে তাকাল, একটু লাল হল।^(৪) সত্যেনকে হেমাঙ্গর মিহি গলা শোনা গেল—আপনি তাহলে অনুমতি করুন। তরুলতা কথা না বলে সত্যেনের দিকে তাকালেন। সত্যেন একটু এগিয়ে এল, হঠাৎই থেমে বলল—আপনি যাবেন না, মামিমা? মামিমার ঠোঁটের হাসি দেখে আবার বলল—যেতে নই বুঝি?

ও-সব বাজে নিয়ম!—বলে উঠল অরুণ। চলুন আপনি। হাসি একটু ছড়াল তরুলতার ঠোঁটে। আমি একেবারে বরণ করে বৌ ঘরে আনব। সত্যেনের পিছনে কিরণ চুপি-চুপি বলল—এ-বাড়িতেই থাকছো বিয়ে করে?

দেখি।

আমাদের পাড়ায় অনেক ফ্ল্যাট খালি যাচ্ছে। বলো তো দেখি একটা। নতুন—সত্যেনের মনে হল সমস্তটাই নতুন। সকলেই তার কথা ভাবছে। সকলেই তার ভাল চায়, তার কাজে লাগতে চায়। এই তো মামিমা, মুখে দুঃখের শ্রী... চুপচাপ মানুষ, একলা কত কাজ করলেন এসে থেকে, আর নিখিলের যা ছুটোছুটি—সত্যি, খুব অন্যায় করেছে সে এতদিন—এখন থেকে ওদের খোঁজখবর নেবে সবসময়—নিশ্চয়ই!—তাহলে যাই আমরা? অনুমতি নেবার সুরে হেমাঙ্গ আবার বলল তরুলতাকে।

চোখ সরল সত্যেনের। মেঝের ছোট্টো জায়গাটুকুতে গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে সবাই—এ ঘরে এত লোক সে কখনো দ্যাখেনি। সকলের মুখ ছুঁয়ে এল তার চোখ—সকলেই খুশি, সুখী, মামিমার মুখেও শুধুই সুখ এখন—এত সুখী হবার কী আছে? কিছু না, সকলেই ভাল, তাই সকলেই সুখী। যেতে যেতে চোখে পড়ল মহেশকে—কেমন দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে, মনে পড়ল চায়ের দেবির জন্য একদিন বকেছিল তাকে, মনটা একটু খারাপ লাগল মুহূর্তের জন্য। সকলে বাইরে এল। তরুলতা দরজার ধারে দাঁড়ালেন, হাত দিয়ে মুখ আড়াল করে উলু দিলেন। অনভ্যাসে প্রথম বার আওয়াজ বেরোল না, তারপর আবছা, পরের বার জোর আওয়াজ হল। দোতলার বারান্দায় বেরিয়ে এল দুটি মেয়ে, তাদের পিছনে একজন মোটা গিন্নি, একটু দেখেই দুটি মেয়ের বড়োটি ঘষে চলে গেল সাজতে—তারাও যাবে বিয়েতে। ছোটো রাস্তায়, অন্ধকারে কালো গাড়িটা প্রায় মিশে ছিল। এইবার ভিতরে আলো জ্বলে উঠল, হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিল ড্রাইভার। সত্যেন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বলল—গাড়িটা খুব বড়ো তো!

বিজনের এক বন্ধু আছে মজুমদার—পিছন থেকে অরুণ জবাব দিল। তার গাড়ি, একদম নতুন। মজুমদারকে সত্যেন চেনে না, নামও শোনেনি এর আগে, কিন্তু শুনেই বুঝল এই মজুমদার ভদ্রলোকও খুব ভাল—হয়তো নিজের অসুবিধে করেও গাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন। একটু অবাক লাগল তার—এত ভাল লোক আছে পৃথিবীতে, অথচ এতদিন সে তার কিছুই জানত না! হেমাঙ্গ বলল—ডালিম, ট্যান্ডিতে যাও।

আমিও ট্যান্ডিতে—বলল নিখিল।

বাকি সকলকেই ধরে গেল মজুমদারের গাড়িতে। গাড়িতে আলো নিবল। ভিতরে অখিল আর কিরণ বসল সত্যেনের দু-পাশে, কিরণের পাশে অরুণ, আর অখিল আর সত্যেনের মাঝখানে থাকল বরের টোপরটা। শোলায় বানানো ঐ বিদ্রী বস্তুর চকচকে স্বর্ণতা হঠাৎ সত্যেনের চোখে ঝিলিক দিল। এটাও?—গাড়ি নড়ে উঠল তখনই, আর সেই মুহূর্তটিতে অন্য সব কথা ভুলে গিয়ে সত্যেন ভাবল—তাহলে সত্যি? সব সত্যি? আলো জ্বলি দরজায় তরুলতার মূর্তি সরে গেল, পিছনে পড়ে রইল সত্যেনের বইয়ে ঘেরা এককলার ঘর, দোতলার বারান্দা খালি হল। গাড়ি আস্তে আস্তে গলি পেরোল। অরুণ—তার চোখে তখনো কনট সার্কাসের উজ্জ্বলতার আমেজ—রসা রোডে পড়ে বলে উঠল, কী অন্ধকারই করেছে! হেমাঙ্গ—সে বসেছিল ড্রাইভারের পাশে—ফিরে তাকিয়ে বলল—ব্ল্যাক আউট মাটি করে দিল। খুব আলো-টালো হলে তো বিয়ে বাড়ি!

সুন্দর বাড়িটি কিন্তু। কী করে পেলেন?

কলকাতায় এখন বাড়ি পাওয়া বোধহয় শক্ত না।

তা সত্যি—বলে উঠল কিরণ। যা যাই-যাই রব! আর ঠাকুর চাকর তো আর টেকানো যাচ্ছে

না। পিছনের ট্যাক্সিতে নিখিল ডালিমের কাঁধে টাকা দিল—একটা নেবেন?

সিগারেট? ডালিমের চোখ বড়ো হল।—আপনি সিগারেট খান?

পেলে খাই, নিখিল হাসল। একটা দেখুন না—

না, না— ডালিম একটু সরে এল, তার মনে হল মা তাকে দেখছেন।

স্টেট-এক্সপ্রেস! ফাইভ ফিফটিফাইভ! নিখিল এক আঙুলে সিগারেটটাকে আদর করল।

নাকি? যুদ্ধ না থামলে আর কলকাতায় ফিরবেই না? অরুণ আওয়াজ করে হাসল। তা ভালই, বিয়েটাও সুবিধেমত হল, আর আপনিও বেশ বাড়িটি পেয়ে গেলেন রেঙ্গুন থেকে এসেই।

আপনি রেঙ্গুন থেকে এলেন?— কিরণ পিঠ সোজা করল। কবে এলেন? খবর কী বর্মার?

উনি আর বেশি কী জানবেন— উত্তর দিল অরুণ। পার্লহারবারের পরের দিনই উনি জাহাজে!

কিরণ বলল—বা! খানিকটা তারিফ করে, খানিকটা নিরাশ হয়ে। নরম গদিতে আরাম করা

আবার। অঙ্ককারে দেশলাইয়ের আলোয় লাল দেখাল নিখিলের মুখটা। দু-চোখে ভয় আর

সম্ভ্রম আর ঈর্ষা নিয়ে ডালিম দেখতে লাগল। চোখা চোটে ধোঁয়া বের করে নিখিল বলল—

বিজনবাবু মাইডিয়ার মানুষ। দেখা হলেই সিগারেট! অরুণ বলল—ওরা সব আগেই চলে

এসেছিল ভাগ্যিণী। সকলকে নিয়ে এখন আসতে হলে বিপদেই পড়তেন আপনি।

বিপদ আর কী? পলকের জন্য হেমঙ্গর মনে পড়ল তার রেঙ্গুনে চোদ্দ বছর বাস করা বাড়ি,

বাড়িভরা ফার্নিচার, শখের জিনিশ, তার মগ চাকর মধু, এইটুকু বয়স থেকে তার কাছে ছিল—

এবারে আসা মানেই যে আসা, তাও কি ভেবেছিলাম!

ভাল তো! এ রকম কিছু হয়ে না পড়লে জীবনেও তো আপনি বর্মা ছাড়তেন না। মহাশ্বেতা

খুব খুশি।

সরস্বতী কিন্তু না। কথাটার মানে বুঝে অরুণ বলল—তা লক্ষ্মী-সরস্বতীরা যাই বলুন, পেলে

আমি ছাড়ব না।

যুদ্ধে যাবেন?

তবে কি আরুইন হাসপাতালের সেকেন্ড সার্জন হয়ে জীবন কাটাতে? সত্যেনের একটু স্বাক্ষর

লাগল যে অরুণবাবুর মতো একজন চমৎকার মানুষ স্ত্রীকে ফেলে কোথাও চলে যেতে চাচ্ছেন।

নিশ্চয়ই ঠাট্টা করে বলছেন এসব। সত্যি কি আর যাবেন? কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু গাড়ি

তখনই ঘুরল। এসে গেছে। রসা রোড থেকে সাদার্ন এভিনিউ যেখানে স্ত্রীর মোড় নিয়ে বেঁকে

গেছে, সেখানে আড় করে বসানো একটি দোতলা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল। এ বাড়িটাকে

যেতে-আসতে লক্ষ্য করেছে সত্যেন, সুন্দর দেখায় বিকেলের আলোয় কিন্তু—গাড়ির মোটা

কাচের ভিতর দিয়ে সে তাকাল। আর ট্যাক্সি থেকে নামার আগে নিখিল অসীম আপশোষে

মাত্র কড়-পোড়া জ্বলন্ত স্টেট-এক্সপ্রেসটা ছুঁড়ে ফেলে দিল—ছিঃ! এটুকুতেই চলে আসবে বুঝলে

ধরাত নাকি তখন?—কিন্তু এখন একেবারে অন্যরকম, ছাতে ম্যারাপ বাঁধা, গাড়িতে বসেই

ভিতরের ভিড় বোঝা যাচ্ছে, উপরের রেলিংয়ে ঝুঁকে রঙবেরঙের শাড়ি, নিচের সিঁড়িতে কারা

সব—অন্য জগৎ এখন... অন্য, অচেনা, অদ্ভুত জগৎ, অন্যদের, সকলের—অবাস্তব, এ কিছু

না, এখনই মিলোবে আর তারপর আবার তার নিজের জগৎ—নতুন পাওয়া নিজের, যদিও

কবে যে তা ছিল না এখন আর মনে পড়ে না।— গাড়ি থেকে নামল সত্যেন, ভিতর থেকে

বাজনা বেজে উঠল ঝামঝাম, শাঁখ বেজে উঠল তীক্ষ্ণ।

মহাশ্বেতা চোখ খুলল, উঠে বসল। দুটোর পর শুয়েছে কাল রাত্রে, আবার ভোর না হতেই গায়ে হলুদ—সারাদিন ঝিমঝিম করেছে আর বিকেল থেকেই মাথাটা—কী শরীরই হয়েছে তার! পাছে মাথা ধরে আর সব মাটি হয়ে যায়, এত গোলমালের মধ্যেও জোর করে খানিকক্ষণ শুয়ে ছিল আলো নিবিয়ে। একটু ঘুমিয়ে নিয়ে এখন—হ্যাঁ, ঠিক। সে ঠিক থাকবে, কিছু বাদ দেবে না, বিয়ের ফুটির একটি ফোঁটাও বাদ দেবে না। কতকাল, কতকাল পরে এই জীবন! খাট থেকে নেমে আলো জ্বালাল। মুখোমুখি দাঁড়ানো আলমারির আর ড্রেসিং-টেবিলের দুই আয়নায় আলো ঝলসাল, জোড়াখাটের পিছল গায়ে টাটকা বার্নিশ ঝিলিক দিল। ভাল লাগল মহাশ্বেতার, বার্নিশের গন্ধের খোঁচা ভাল লাগল, নতুনের গন্ধ, নতুন জীবন—আজ রাত্রে যারা এ-ঘরে থাকবে তাদেরই শুধু নয়, তারও—হ্যাঁ, তারও। মহাশ্বেতা ঘরের দরজা বন্ধ করল। আয়নার সামনে গায়ের কাপড় ফেলে মুখে গলায় ক্রিম মাখল, তারপর গোলাপি রঙের পাউডর বুলোতে লাগল আস্তে আস্তে। দরজায় টোকা পড়ল।

কে?

আমি সরস্বতী।

আঁচলটা লোটাতে লোটাতে মহাশ্বেতা দরজা খুলে আড়ালে দাঁড়াল। সরস্বতী ভিতরে আসতেই বন্ধ করে দিল আবার।

এতক্ষণে কাপড় পরছিস তুই!

এই তো হয়ে গেল। শুয়ে থাকার জন্য চুলের যা একটু ভাঙচুর হয়েছিল, পাতলা-পাতলা আঙুলে তার মেরামত করে মহাশ্বেতা খোঁপা চাপড়াল দুবার। সরস্বতী বলল—তোর চুল কিন্তু খুব আছে এখনো। তার মানে, মহাশ্বেতা ভাবল, ঐ যা একটু চুলই আছে, আর কিছু নেই। কিন্তু চুলই বা কী—লম্বা, কিন্তু শনের দড়ির মতো পাতলা হয়ে গেছে। আর একদম টান-টান। বোনের মাথার কোঁকড়া ঘন পুঞ্জের দিকে একপলক তাকাল, শুকনো একটু হেসে বলল—চুল, লম্বা এক যন্ত্রণা—খুলতে বাঁধতে হয়রান! সরস্বতী ঠোঁটের কোণে হাসল—না, সত্যি! পরনের ঢাকাই জামদানিটা ছেড়ে ফেলে মহাশ্বেতা একটু দাঁড়াল... হাতকাটা বিনোদী শেমিজের উপর দুধ-সাদা সার্টিনের পেটিকোট পরা। সরস্বতী তার চোখের দিকে চুকিয়ে বলল—ঘুমোচ্ছিলি?

না—মহাশ্বেতা অস্বীকার করল। সাদা, সরু হাত দুটি ঢুকিয়ে দিল মিশকীলো ব্লাউজে, পেটিকোট ঢিলে করে ব্লাউজের তলার কাপড়টা ভিতরে ঢুকিয়ে দড়ি বাঁধতে-বাঁধতে বলল—শুয়েছিলাম একটু, বরং এসে গেছে না?

হ্যাঁ—চল! তোর মাথা ধরা কেমন? মহাশ্বেতা খুশি গলায় বলল—ধরল না শেষ পর্যন্ত। খাটের উপর থেকে তুলে নিল শাড়িটা, যেটা দশ দোকান ঘুরে কদিন আগে কিনেছে। ক্রিমরঙের বেনারসির সাদারুপোর আঁচলটা দেখতে-দেখতে সরস্বতী বলল—এ সব মিটে গেলে তোর শরীরটা সারিয়ে নে ভাল করে। অ্যানিমিয়ার খুব ভাল একটা চিকিৎসা বেরিয়েছে নতুন। আর চিকিৎসা! মহাশ্বেতা ভাঁজ ফেলে-ফেলে কোঁচা গুঁজল। ছেলে-পুলে হতে হতে মেয়েদের শরীরের আর থাকে কী! বলে ঝলমলে আঁচলটা কাঁধের উপর দিয়ে নামিয়ে দিল।—ও সব বাজে কথা! অরুণ-ডাক্তারের হালের মতটা উদ্ধৃত করল সরস্বতী।

কাজে তো বেশি কিছু দেখাওনি বাপু।—কচ্ছপের ডিমের মতো বড়ো বড়ো মুক্তোর একটি ফাঁস গলায় এঁটে নিল মহাশ্বেতা।—দুটির পরেই তো চূপচাপ।

তোমারই বা কী? মোটে তো চারজন! সরস্বতী পিঠ-চাপড়ানো হাসল।

পাঁচজন, সরস্বতী।—শুকনো গলায় জবাব দিল মহাশ্বেতা, মুক্তোর ঝুমকো ঝুলিয়ে দিল দুই কানে। সরস্বতীর মুখের ভাব বদলে গেল। সত্যি, মহাশ্বেতার প্রথম মেয়েটা যে আট মাসের হয়ে মরেছিল সে কথা তার মনেই থাকে না। তাড়াতাড়ি কিছু বলবার জন্যই বলল—বড়দিরও পাঁচজন। বলেই বুঝল, এটা আরো ভুল হল। অথচ, মহাশ্বেতা ভাবল, দিদি কী সুন্দর আছে এখনো। থান পরলেই মানুষকে বড়ো দেখায়, কিন্তু আমি আর দিদি পাশাপাশি দাঁড়ালে আমাকেই দিদি ভাববে লোকে। কেন আমার এ রকম হল—দিদির তো হয়নি, অনেকের তো হয় না। কেন আমার রক্ত নেই, মাংস নেই—আর হবেও না কোনোদিন। নেতিয়ে পড়া বুকের উপর শাড়িতে ছোটো-ছোটো টান দিতে-দিতে বলল—কী কষ্ট এক-একজনকে ধারণ করতে, জন্ম দিতে, বড়ো করে তুলতে। সব শুধে নিয়েছে! আয়নার দিকে তাকিয়ে, নিচু গলায়, যেন নিজের সাদা, বড্ডো সাদা মুখটাকে লক্ষ্য করেই সে কথাগুলি বলল। তারপর সেটের ছিপি কয়েকবার ছোঁয়াল কাঁধে, বুক, গলায়। সুন্দর গন্ধ, দেখি একটু—সরস্বতী কথা বদলাবার চেষ্টা করল। বোনের হাতে শিশিটা দিয়ে মহাশ্বেতা বলল—শাস্ত্রীটা বেশ আছে কিন্তু। ওর বিয়ে হয়েছে চার বছর হল না? কী করে পারে? সরস্বতী সহজ হল, চোরা হেসে বলল—এখন একটা বাচ্চা হওয়াই ওর ভাল। মোটা হয়ে যাচ্ছে!

সরস্বতীর ছিপছিপে, একটু ভারি শরীরের দিকে, আঁটো, একটু ভারি বুকের দিকে, আর তার তলায় পেটের পাতলা খাঁজটার দিকে ঈর্ষার চোখে তাকাল মহাশ্বেতা। তা সরস্বতীর তো প্রথম থেকেই জিতের হাত, ওর কপালেই অরুণ ছিল। হঠাৎ বলল—অরুণ নাকি যুদ্ধে যাচ্ছে? সত্যি? আমি জানি না!

তুই জানিস না? মহাশ্বেতা আয়না থেকে সরে এল—বারণ কর।

তুই একবার কথা বলে দ্যাখ না—সরস্বতী গম্ভীরভাবে বলল। বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে মহাশ্বেতা একটু হাসল, কিন্তু কথা বলল বিষন্ন গলায়—পুরুষমানুষ—উন্নতি ছাড়া কিছু বোঝে না।

বেশ তো! আমি কি ধরে রাখছি—না কি কেউ কাউকে ধরে রাখতে পারে? শেষের কথাটা মহাশ্বেতার মনের তলার কোনো একটা অংশকে সুখী করল। ভীষ্মমানুষের মতো বলল—এটা ঠিক বললি না, অরুণ সরকারি চাকরি পেয়েও নেয়নি ওর মফস্বল ভাল লাগে না বলেই তো?

ওঃ, তখন!—আর এখন! আলমারির লম্বা আয়নায় সরস্বতী তাকাল একটু, আর পিছনে দাঁড়িয়ে মহাশ্বেতা তাকে আয়নার মধ্যে দেখল, লক্ষ্য করল তার গলায় প্রবালের মালা, মাথার কাপড়ের তলায় ঝিকিঝিকি দুল, তাঁর ব্রোকেডের ব্লাউজ, ফ্রেঞ্চ সিল্কের শাড়ি। তারপর নিজেকে আর একবার দেখল, তার সরস্বতী তখন আবার চোখ ফেরাল আয়নার মধ্যে মহাশ্বেতার দিকে। হঠাৎ চোখাচোখি হল দু-বোনে, দ্রুত টোকা পড়ল দরজায়। সরস্বতী দরজা খুলে দিল। ঘরে এল শাস্ত্রী, ব্যস্ত-গম্ভীর, ঈষৎ হাঁপ-ধরা—বে-শ! দরজা বন্ধ করে দিবি গল্প করছ তোমরা! কী করতে হবে? মহাশ্বেতা হাসল।

একটু নড়ে-চড়ে! স্বাতীকে সাজানো এখনো আরম্ভই হল না, এদিকে একঘর অচেনা লোকের মধ্যে কী-রকম বেচারার মুখ করে বসে আছে সত্যেন!

তা' থাক না। সরস্বতী বলল—তুই কী করছিলি?

আমি? আমার কি আর সময় আছে! এই আধ-ঘণ্টার মধ্যে দশবার শুধু উপর-নিচ করলাম। উঃ! স্পষ্ট তৃপ্তি ফুটল শাস্ত্রীর গলায়।—বসি। একটু বসে চারদিকে একবার তাকিয়ে বলল—স্বাতীর ফার্নিচার খুব সুন্দর হয়েছে। হোমস্কেচ জিনিস চেনেন।

হ্যাঁ—কাঠ, লোহা, সিমেন্ট, এ-সব খুব চেনেন উনি—বলল মহাশ্বেতা। শাস্ত্রী জিগেস করল—তোমার রেস্পুনের জিনিসপত্রের কী হবে?

কী আবার হবে! জাপানিরা ভেঙে ভেঙে মশাল জ্বালবে।

কী রকম বল! একটু কষ্ট হয় না তোমার?

নাঃ! কষ্ট কীসের... বর্মা থেকে বেরোতে পেরেছে, আর কী চাই? আসবাব, বাসন, রেডিও, গ্রামোফোন, গাড়ি—সব হবে আবার, কিন্তু জীবনের ঐ বছরগুলি কি আর ফিরে পাবে? নষ্ট—জীবনের সবচেয়ে ভাল সময়টা নষ্ট হল বর্মায়, নির্বাসনে, আনন্দ ছাড়া, সঙ্গ ছাড়া, জীবন ছাড়া, শুধু স্বামীর ব্যবসার উন্নতিতে সুখী হয়ে, শুধু সম্ভ্রানধারণে আর সম্ভ্রানপালনে। চোদ্দ বছর ধরে যে বাড়িটায় তার স্বাস্থ্য আর যৌবন বাজে-খরচ হয়ে গেছে, তার জন্য কষ্ট কীসের! সুন্দর ড্রেসিং টেবিলটা—শাস্ত্রী আর একবার তাকাল। সরস্বতী বলল—তোর নিজেরটা বুঝি আর পছন্দ হচ্ছে না এখন?

বাঃ, তা কেন? আলগা শোণাল শাস্ত্রীর কথাটা—যাই আমি একবার ওদিকে। কী হচ্ছে দেখি। শাস্ত্রীর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে সরস্বতী বলল—শাস্ত্রী খামকা এত ব্যস্ত হচ্ছে। বড়দি থাকতে আর কাজের ভাবনা!

একবার সত্যেনকে দেখে আসি চল—বলে মহাশ্বেতা এগোল। ঘর থেকে বেরোল সরস্বতী মহাশ্বেতা। গলিতে ভিড়, সিঁড়িতে নতুন একদল উঠে আসছে। দু-বোন সরে দাঁড়াল। দলটি চলে যাবার পর সরস্বতী বলল—এরা কারা?

আমি চিনলে তুইও চিনতিস—সিঁড়ি নামতে-নামতে মহাশ্বেতা জবাব দিল।

তুই একমাস আগে থেকে আছিস, আর আমি তো মোটে সেদিন এলাম।

পাড়ার বোধহয়। হ্যাঁ—ঐ মোটা গিল্লিকে যেন দেখেছি।

বাবার কাণ্ড! লোকও বলেছেন!

বাবার উপরে বিজু আবার এক কাঠি। স্বাতীর বিয়ে—কেউ যেন দাঁদ না যায়। সাঁতরাগাছির নেপাল-পিসেমশাইকে বিজুরই তো মনে পড়ল।

বুড়ো মরেনি এখনো! সরস্বতী হাসল। সিঁড়ির শেষ ধাপে ছ-কোণ কাচের চশমা-পরা একটি মেয়ে তাদের দেখে থামল। আপনারা স্বাতীর দিদি? একটু হেসে এই পরিচয় মেনে নিল দু-বোন।

—আপনি বুঝি মহাশ্বেতা? একটুখানি ভুরু বাঁকিয়ে সরস্বতী জবাব দিল—মহাশ্বেতা ঐর নাম।

আমি উর্মিলা, প্রবীর মজুমদার আমার মামা। আমরা এই এলাম। সরস্বতী নিপুণ একটি হাসি ফোটাল—আচ্ছা, উপরে গিয়ে বোসো তুমি। স্বাতীর বন্ধুরা আছে।

খুব স্মার্ট তো মেয়েটি—বলল মহাশ্বেতা।

খুব। সরস্বতী সামনের ঘরের দিকে এগোল, দুজন লোক তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল এক
ঝুড়ি গেলাশ ধরাধরি করে—বিজুর খুব দেখি এক বন্ধু জুটেছে এই মজুমদার।

আর ঠোট দুটোকে কী-রকম রঙের মতো করেছে?

কলকাতায় তো এখনো কম; দিল্লিতে প্রায় সব মেয়েই রঙ মাখে আজকাল।

ছটি-সাতটি বাচ্চা মেয়ে খিলখিল হাসতে-হাসতে সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল।

তোর ভাল লাগে?

আ—র! গীতিটাই ওসব ধরেছে এর মধ্যে!

—হংকং! সামনের ঘরের দরজার কাছে আসতেই জোরালো গলা শোনা গেল। সরস্বতী
বলল—নাঃ, হারীত নন্দীকে নিয়ে আর পারা গেল না। বোমা বিনে গীত নেই ওর। দরজার
ধারে দু-বোন দাঁড়াল। হারীত বলল—হংকং ইভ্যাকুএট করে ইংরেজরা এখন—

ইভ্যাকুএট! পালিয়েছে বলুন। যমের ডরে পালিয়েছে—কথাটা বললেন মজবুত চেহারার এক
ভদ্রলোক, ঘি-রঙের ফ্যানেলের চুড়িদার-পাঞ্জাবি পরা, টেড়িকাটা চুল মাথায় যেন আঠা দিয়ে
ল্যাপটানো। শুনে অনেকে হেসে উঠল। সরস্বতী এগিয়ে এসে বলল—নন্দীর এতক্ষণে সময়
হল আসার? তার গলা শুনে অনেকেই তাকাল।

* * *

সত্যেনও তাকাল। তামাশা মন্দ না—ঘরে পা দিয়েই সে ভেবেছে—দরজায় জুতোর স্তূপ, সাদা
ফরাশের উপর হলদে কার্পেট, আর সেটার শেষে ছোটো আর একটা লাল, সেখানে ঘোর
লাল মখমলের তাকিয়া, আর লাল, প্রায় কালচে গোলাপের দুটো তোড়া। বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু
না—অরুণবাবুরা ঐ লালের রাজেই তাকে নিয়ে এলেন, ডবল-গালিচায় ছেড়ে দিয়ে উধাও
হলেন। বসতেই গন্ধে যেন দম আটকাল হঠাৎ—থোবা-থোবা গোলাপ, লম্বা রজনীগন্ধা—
কত! তা যাই হোক, গলার মালাটা এবার খুলতে পেরে হাঁপ ছাড়ল। তাকিয়ে দেখল, নিখিল-
অখিল জড়োসড়ো, কিরণও চুপ—আর সব অচেনা—একবার শুধু একপলক ছোড়দিকে
দেখল—আরো আসছে লেমনেড, চা, প্রেট ভরা-ভরা পান আর সিগারেট—কালো কালো
মাথার উপর প্যাঁচালো ধোঁয়া, কথা, হাসি, বাইরে হাঁকডাক চলাফেরা—ঘরের তিনটে দরজায়
বাচ্চা-বাচ্চা মেয়েদের উকিঝুঁকি—যাক, হারীতপাবু এলেন। যুদ্ধের কথা বলছেন ওঁরা, একটু
শুনল—তাই তো, কিছু একটা গোলমাল হলে ভারি অসুবিধে হবে লোকদের—একটা দেয়াল
যেঁষে বসতে পারলে পিঠটায় আরাম হত—এই যে।

সত্যেন প্রথম দেখল মহাশ্বেতাকে। অদ্ভুত রোগা, অদ্ভুত ফর্সা, সুন্দর, প্রায় হলদে—গালের উপর
ছোটো একটি নীল শিরা স্পষ্ট—গায়ের রঙে শাড়ির রঙে মিশে আছে, আর কালো ব্লাউজের
উপর দিয়ে বলমলিয়ে নেমেছে রূপোর পাতের মতো আঁচল। তারপর সরস্বতীকে—সোজা
দাঁড়িয়েছে, চোখে হাসি, ঠোটে হাসি, কাঁধের উপর মাথাটি চমৎকার বসানো, শাড়িটা নীল—
ময়ূরের গায়ে যে নীল থাকে, সেইরকম—আর কচুরিপানার ফুলের রঙের জামা। তারপর
একসঙ্গে দু-জনকে দেখল। সরস্বতী বলল—সব ঠিক আছে? কিছু চাই? কথাটা তাকেই বলা,
সেটা বুঝতে পেরে সত্যেন বলল—এই তোড়া দুটো কি সরানো যায়?

কেন, ফুল ভালবাসো না? বলল মহাশ্বেতা।

ফুল খুব ভাল, কিন্তু দু-পাশে দুটো তোড়া নিয়ে বসে থাকা—

—থাক না, বেশ তো দেখাচ্ছে। পিছন থেকে ভাঙা-ভাঙা ভারি গলায় একজন বলল—আচ্ছা সরিয়ে দিই। সত্যেন ফিরে তাকাল। বিজনবাবু! কী, সর্দি বুঝি?
হ্যাঁ! বিজন হাসল, দুবার কাশল, নিচু হয়ে ফুলদানিতে হাত দিল। বিজু—মহাশ্বেতা বলে উঠল—
থাক!

তাহলে আমি কি একটু সরে বসতে পারি?—মহাশ্বেতাকে আবেদন জানাল সত্যেন।
আহা—বসুন না, বললেন ঘি-রঙের ফ্ল্যানেলের পাঞ্জাবি-পরা মজবুত চেহারার ভদ্রলোক।
আপনি ভাগ্যবান—আপনাকে দেখি আমরা।
এই যে—আরাম করে বসুন। বিজন তাকিয়াটা সত্যেনের গায়ে ঠেকিয়ে দিল।—না, না, তাকিয়া
না! ব্রস্টে সরে এল সত্যেন। মহাশ্বেতা নিচু গলায় বলল—বিজুর চেহারা বড়ো খারাপ হয়েছে।
যা খাটুনি!

আর কান্না। ঐ এক দোষ ওর, বড্ডো কাঁদে!

আবার উপোস না করেও ছাড়ল না!

সত্যি, বিজুটা—সরস্বতী হাসতে গেল, কিন্তু হাসির বদলে খুব ছোটো একটা নিশ্বাস পড়ল
তার, সেইসঙ্গে মহাশ্বেতারও।

মেজদি, সেজদি—ইনি প্রবীর মজুমদার। ঘি-রঙের ফ্ল্যানেলের পাঞ্জাবি-পরা ভদ্রলোক হলদে
কার্পেটের উপর উঠে দাঁড়ালেন। ইনি সত্যেনবাবুর বন্ধু, কিরণকে দেখিয়ে বিজন বলল—
এই আমাদের অখিল আর নিখিলবাবু—আর এঁরা সব—

আমরা চেনা লোক! পিছন থেকে একজন বলে উঠল; আর অন্যরা—বেশির ভাগই দূর
সম্পর্কের বিবিধ আত্মীয়—মৃদু মর্মরে সমর্থন জানাল। সত্যেন বলল—আপনার গাড়িতেই
এলাম?

আমার সৌভাগ্য—মোটো-মোটো পায়ে আসনপিঁড়ি হয়ে মজুমদার আবার বসল।

অত বড়ো গাড়ি দিয়ে কী করেন?

—কিছু না। ছোটো গাড়িতেই ঘুরি। কিরণ বলল—ক-টা গাড়ি আপনার? মজুমদার জবাব
দিল না, বড়ো বড়ো দাঁত দেখিয়ে হাসল। মজুমদারের হাঁটু ছুঁয়ে হারীত বলল—এখনো হাসছেন
আপনারা, কিন্তু জাপানিদের মতলবটা জানেন? গায়ে গরম কোট, জাঁদরেল সাদা গৌফ
শক্তপোক্ত বুড়োমতো একজন বললেন—হংকং কি সত্যি গেল?

এইমাত্র শুনে এলাম রেডিও সায়র্গ, এদিকে ট্যাভয় ধরো ধরো! আর ঝঞ্জে নেই। এই সাংঘাতিক
খবরটা বেশ খুশি গলায় ঘোষণা করে হারীত সকলের দিকে তাকাল, কারো কারো মুখে ভয়ের
ভাব দেখতে পেয়ে আরো সুখী হল।

কলকাতায় বোমা-টোমা পড়বে নাকি, সত্যি? দূর থেকে শ্লেষাভরা গলায় জিজ্ঞেস করল একজন।
তার আগে কি আর বাঙালি বাবুদের টনক নড়বে? কিন্তু কথাটা হচ্ছে—ইনি আর কী বলেন
তা শোনার জন্য নিখিল কান খাড়া করল, কিন্তু সরস্বতী তখনই বলল—এখন এসব কথা
থাক না। আরো তো সময় আছে। হারীত চট করে মুখ ফেরাল সরস্বতীর দিকে, ঘোঁক করে
হাসল।

মা—ছোটো আওয়াজ হল মহাশ্বেতার পিছনে। ইরুকে দেখে মহাশ্বেতা আবারও যেন অবাক
হল। কে বলবে বারো বছরের মেয়ে—আর ঐ টুকটুকে লাল ক্রেন-বেনারসি পরে কত বড়োই

আজ দেখাচ্ছে। ঐ তো গীতি—ওর দুমাসের মোটে ছোটো, দেখায় দু-বছরের; আর চোদ্দ বছরের আতাকে ওর সমান-সমানই লাগে। তিনজনকে আর একবার দেখল মহাশ্বেতা, হঠাৎ সরু করে বলল—ঠোটে রঙ মেখেছিস নাকি রে তোরা? সরস্বতী ফিরে তাকাল।

আমাদের ঘণ্টা বাজল এবার—হারীত নিচু গলায় মজুমদারকে জানাল।—‘প্রিন্স অব ওয়েলস’ ‘রিপালস’ যেদিন ডুবল, সেদিনই বোঝা গেছে। সরস্বতী, মহাশ্বেতার দিক থেকে চোখ সরিয়ে এনে মজুমদার জোরে একবার মাথা নাড়ল হঠাৎ। আর নিখিল লাল-সবুজ-কমলা রঙের মেয়ে তিনটিকে আর একবার দেখতে গিয়ে হারীতের কথাটা একদম শুনতে পেল না।

ইরু তাকাল আতার দিকে, আতা গীতির দিকে, তিনজনে ফুটফুটে ঠোটে হাসল। ইরু তার হাতের খাতাটা দেখিয়ে বলল—মা, এখন বলি?

বলো।

তুমি বলো, মা। মহাশ্বেতা বলল—এরা কী বলতে এসেছে তোমাকে, সত্যেন।

এক সপ্তাহে থাইল্যান্ড, মালয়, ফিলিপাইন... এবার নিখিল মনস্থির করে হারীতের আরো কাছে সরে বসল। সত্যেন দেখল তিনটি মেয়ে তার দিকে আসছে, মাথায় প্রায় সমান-সমান, বাচ্চাও না, বড়োও না, হালকা, তিনটি রঙিন পালক ঝরেছে হাওয়ায়, টুকটুকে-লাল, কমলা-লাল, সবুজ। ইরু বলল—এই খাতাটায় আপনি একটু লিখে দিন।

এখনই? বেগুনি মলাটের অটোগ্রাফ খাতাটার কয়েকটা হলদে-সাদা-গোলাপি পাতা উল্টিয়ে সত্যেন বলল—কিছু তো লেখা নেই দেখছি। গীতি বলল—একটা আছে। হাসির বুড়বুড়ি উঠল অন্য দু-জনের। সামনের দিকে—সতুদার কাঁধের উপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে অখিল দেখল খুলে ধরা সাদা পাতাটায় লেখা আছে—‘স্বাতী মিত্র’ আর তলায় একটু ছোট করে লেখা—‘স্বাতী রায়।’ সত্যেনের চোখ লেখাটার উপর পড়তেই তিনজনের হাসি ছলকাল একসঙ্গে। উঃ, কী মজাই হয়েছিল ছোটোমাসিকে দিয়ে এটা লেখাবার সময়। লেখাটার—লেখা দুটোর—দিকে সত্যেন একটু তাকিয়ে থাকল। আপনি এ-পাতাতেই লিখুন—বলে ইরু তার হাতে দিল পিছন-কালো সরু ছাঁদের কলম।—না—এ পাতাতেই। সত্যেন নিজের নাম লিখে দিল তারিখ দিন। হাতে কলম নিয়ে সত্যেন একবার ছবিটি দেখল, তিনটি দাঁড়ানো মেয়ের রঙিন ছবি। হারীত একটু কথা থামিয়ে সদয় আমোদের চোখে ব্যাপারটা দেখছিল, তাড়াতাড়ি থাম্পট করল পনেরোই ডিসেম্বর—

না, না, বাংলাটা লেখো—কিরণ ব্যস্ত হল। উনতিরিশে অঘ্রান বলতে হবে না—মজুমদার হাত তুলল—দুটোই ওঁর মুখস্ত। হৃদয়স্থ বলুন! কিরণ একলাই হাঃ করে হাসল। খাতা হাঙ্গে মিয়ে ইরু বলল, চল। তিন জোড়া চোখে হাসি ঝলসাল, কী মজা—সকলকে দেখাবে এখন! ছুটে যেতে-যেতে বাপের সঙ্গে কলিশন হল ইরুর—না, আগে ছোটোমাসিকে।

টোকিও বলছে ক্রিসমাসের মধ্যে... হারীত আবার গলা নামাল। মজুমদার দেখল দরজার ধারে একটি টাক-পড়া মাথা, দু-বোনের মধ্যে যার কালো ভেলভেটের ব্লাউজ, তাকে কী বললেন ভদ্রলোক। ইনিই স্বামী?—তা-ই হবে, নয়তো কথা বলতে একটুও কি মুখের ভাব বদলাতো না? কালো-ব্লাউজ-পরা বোন লাল-মালা-গলায় বোনকে কিছু বলল—দু-জনে ফিরল, চলে গেল।

হারীত স্বাধীন হল। সত্যেনের দিকে তাকিয়ে বলল—খুব সময়মত বিয়েটা হচ্ছে। একেবারে তোপের মুখে! মনে মনে চটপট একটু হিসেব করে কিরণ বলল—অম্মানের মাঝামাঝি হলেও এসব গোলমাল কিছু—

দেয়িটা আমার জন্যই হল—হেমঙ্গ এগিয়ে এল হলেদে কার্পেটে। হ্যাঁ—আপনি প্রায় ভাবিয়ে তুলেছিলেন এদের। হারীত এমনভাবে কথাটা বলল যেন এঁদের ভাবনাটা নেহাত অর্থহীন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বিজনকে দেখতে না পেয়ে মজুমদার নিজেই আলাপ জুড়ল—আপনিই বর্মা থেকে?

বর্মার খবর কিছু বলুন? কিরণ হাঁটু নাচাল আর শোনার জন্য নিখিল তাকাল হেমঙ্গর দিকে। আপনার খবর কী? জিগেস করল মজুমদার—ওখানকার কারবার আপনার? হেমঙ্গ পাতলা হাসল—আপনি মিস্টার মজুমদার? পরে একদিন কথা বলব আপনার সঙ্গে। মজুমদার যেন বাধিত হয়ে মাথা নোওয়াল, মুখ তুলে চওড়া করে হাসল। চোখে-চোখে জ্ঞাতিত্ব স্থাপিত হল দু-জনের মধ্যে, প্রতিযোগিতাও। হেমঙ্গ বুঝল যে দেখতে বোকা-সোকা হলেও লোকটা কাজে ওস্তাদ, আর মজুমদার বুঝল এই মিহি গলার মেজজামাইটি ফতুর হয়ে আসেনি, হাতে আছে বেশ, আর কাজেও লেগে যাবে এখানেই... এখনই।

বর্মার খবর? হারীত এ সুযোগে কথার সুতো তুলে নিল আর নিখিল চোখ সরাল হেমঙ্গ থেকে হারীতের মুখে।

বর্মার যা খবর, তা আমাদেরও খবর হবে দু-দিন পরে, যদি না আমরা—

কিন্তু রেন্ডুনে কি বোমা পড়েছে? জেদ্যাভরা গলায় আবার প্রশ্ন হল। হারীত তাকিয়ে ঠোট বাঁকাল। এই বোমা নিয়েই যত ভাবনা এদের—যেন কোনোরকমে বোমা থেকে বাঁচলে নিশ্চিন্ত। কী অশিক্ষিত সব! মুখচোখ উদাস করে বলল—পড়লেই হল, কলকাতায় পড়তেই বা বাধা কী? হঠাৎ যেন শীতে কঁপে উঠে কিরণ হাতে হাত ঘষে হি-হি করে হাসল।—তাই তো! পড়লেই হল! যদি আজই—যদি ধরো আজ রাতেই—বলতে বলতে সত্যেনের দিকে ফিরল। আবছা হাসল সত্যেন। বোমা পড়বে? জাপানিরা এসে বোমা ফেলবে কলকাতায়? জ্ঞা না, জাপানিরা কি আর সত্যি অত মন্দ? আর ফ্যালেও যদি, যদি আজই ফ্যালে—জিহলেই বা কী? কিছু হবে না বোমাতে, কেউ মরবে না, একটি বাড়িও ভাঙবে না—আর যদি ভাঙেও, কি আগুন-টাগুন লেগে যায়, তাতে তার—তাদের কিছু হবে না অকি! তারা যে কজনকে ভালবাসে তাদেরও কিছু হবে না, সব ঠিক থাকবে। কিরণের হি-হি হাসি শুনে হারীত তার দিকে একটা আগুন-চোখ ছাড়ল, তারপর মজুমদারের দিকে ফিরে একটি পরিপাটি বক্তৃতা আরম্ভ করল—ব্যাপারটা হচ্ছে এই, ধরে নিন জাপান এদেশে আসবেই, ধরে নিন ইংরেজ আপাতত আরো হটে যাবে, এখন আমরা যদি—

চলুন আপনারা? অরুণ দাঁড়াল দরজার ধারে। চলুন, চলুন। তার গলা বেশি চড়ে না। বার-বার বলে কথাটা ছড়িয়ে দিল। নাঃ—হারীতের একটা কাঁধ জোরে নড়ে উঠল—বিয়ে বাড়িতে কথা বলা! চশমা চোখে বুশি-মুখের মানুষটিকে দেখে মজুমদার বুঝল ইনি আর এক জামাই—সেই লাল-মালা-গলার?—তা-ই হবে, বড়োজন তো বিধবা? বিজনের কাছে শুনে-শুনে সকলেই তার চেনা হয়ে গেছে, কিন্তু সত্যি তো কাউকেই সে চেনে না, মিসেস নন্দীকে ছাড়া—আর অবশ্য তাঁর ক্ষু-আলগা-মাথার স্বামীটিকে। হঠাৎ তার মনে হল, না এলেই পারতাম।

ঘরের মধ্যে মৃদু নড়াচড়া আরম্ভ হল।—চলুন, চলুন সবাই। নিখিল, অখিল, এসো। কিরণবাবু—
আপনি কিন্তু বিয়ে পর্যন্ত থাকবেন।

লগ্ন কখন?

দশটার পরে—থাকবেন, চলে যাবেন না। হরীতবাবু, আপনিও তো অভ্যাগতর দলেই—দয়া
করে উঠুন। হরীত ভদ্রতা করে হাসির মতো ভাঁজ ফেললো মুখে, একটু দাঁত দেখাল। যাক,
খেতে-খেতে শেষ করবে কথাটা, মজুমদার আবার ফশকে না যায়। হাতে রাখার জন্য খুব
মসৃণ করে বলল—মিস্টর মজুমদার, চলুন তাহলে।

ও, আপনিই! বিজনের বড়ো-গাড়িওয়ালা বন্ধুর দিকে এগিয়ে এল অরুণ—কত সাহায্য করলেন
আপনি আমাদের। এখন একটু কষ্ট করে...। অরুণ সরে গেল অন্যদের দিকে, আপনারা চলুন—
হ্যাঁ, তেতলায়—সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, জুতো পরেই যান।

বেশ বাড়িটি পেয়েছি—আবার দোতলায় উঠতে উঠতে সরস্বতী বলল। ভাল? মহাশ্বেতা
অস্পষ্ট স্বরে বলল। বাড়িটাকে আলাদা করে ভাল বলে সে বোঝেনি এখনো; এটা কলকাতা,
সে কলকাতায় আছে, থাকবে, আর তাকে কালাপানি পেরোতে হবে না, এইটা বুঝতে-বুঝতেই
দিন কেটে যাচ্ছে। ভাগ্যিস যুদ্ধটা বাধিয়েছিল জাপানিরা! তুই ক-বছর পর এলি রে?—সিঁড়িতে
মোড় দিয়ে সে জিগেস করল।

—বছর তিন হবে। তুই?

আমি পাঁচ বছর, মহাশ্বেতা সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিল—বাবা যেবার বাড়ি করলেন, এসেছিলাম;
তারপর এই।

হ্যাঁ, শাস্ত্রীর বিয়েতে তোর আসা হয়নি—সরস্বতীর মনে পড়ল।—তোর সঙ্গে আমার দেখা
হল সাত বছর পরে... সেই যতীন দাস রোডের বাড়িতে—দোতলায় পৌঁছে মহাশ্বেতা একটু
দাঁড়াল, দম নিল—আর দিদিকে দেখলাম দশ বছর পর!

দশ বছর! সরস্বতী হাসতে গেল কিন্তু হাসির বদলে নিশ্বাস পড়ল তার। সত্যি বড়দি—কথা
শেষ করল না, মহাশ্বেতাও ভাবল—সত্যি! দু-জনে দু-জনের চোখ এড়াল। দরজার পরদা
কাঁপিয়ে মাকের বড়ো ঘরটি থেকে হাসতে-হাসতে ছুটে বেরোল তিনটি ছিপছিপে মেয়ে—
একজন টুকটুকে লাল, একজন সবুজ, আর-একজন কমলারঙের। মা, দ্যাখো—কালো চোখে
আলো ঝলকিয়ে খাতাটা খুলে ধরল ইরু। হাতের লেখা কার বেশি ভাল? গীতি জিগেস
করল। ইরু বলল—আলবৎ ছোটোমাসির!

ককখনো না, সত্যেনদার—বলল আতা। মা-মাসির রায় শুনতে দাঁড়াল না তারা, রঙের ঢেউ
তুলে চলে গেল। কেমন মজার টান দিয়ে কথা বলে ইরু—সরস্বতী ভাবল, বর্মায় হয় নাকি
ওরকম? আর মহাশ্বেতা ভাবল—গীতি ওরকম নেচে-নেচে হাঁটে কেন মেমসাহেবের মতো?
হু-বোন বড়ো ঘরটির দরজার ধারে দাঁড়াল।

কী গো, মহাশ্বেতা-সরস্বতী, কোথায় ছিলে এতক্ষণ? এসো, সব ঠিক হচ্ছে কিনা দ্যাখো এসে—
কথাটা বললেন দূর থেকে তাদের দেখতে পেয়ে এক দিদিমা, তাদের ভূপেশদাদুর দ্বিতীয় পক্ষ।
গোলগাল আহুদি চেহারার মানুষ, মুখে এক টিপি পান, মাত্রই বছর দশ-বারোর বড়ো তাদের।
সরস্বতী চুপি-চুপি বলল—বুড়ো স্বামী নিয়ে আছেন বেশ কুন্দদিদিমা। এগিয়ে এল ঘরের মধ্যে।
মহাশ্বেতা কথাটা শুনল না, দেখতেই ব্যস্ত ছিল সে। কিছু আসবাব নেই ঘরটিতে, থাকলে

এখন বেশি হতো। মানুষেই ভরা। সব মেয়ে, নানা বয়সের কুমারী আর সধবা। ছড়িয়ে-ছড়িয়ে গল্প করছে দু-তিনজন করে, বসবার জায়গা নেই বলে নড়াচড়ার একটা শ্রোত চলছে চারদিকে, আর মাঝখানটায় ছোটো একটি দল গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। কারো দিকে চোখ ফেলে, কারো দিকে হাসি ছুঁড়ে সেই গোল দলটিতে ভিড়ল মহাশ্বেতা-সরস্বতী।

এবার ভাল করে চারদিকে তাকাল মহাশ্বেতা। আত্মীয় সব—বাপের বাড়ির, মামাবাড়ির দিকের, যারা তাকে ছোটো দেখেছে, যাদের সে ছোটো দেখেছে। তার সমস্ত ছেলেবেলাটা সশরীরে এই ঘরে হাজির, স্মৃতি বেরিয়ে এসেছে মন থেকে চোখের সামনে। জীবনে এদের আর দেখবে ভাবেনি, অনেককেই ভুলে গিয়েছিল, কিন্তু দেখেই বুঝেছে কাউকেই ভোলেনি, কেউ কাউকে ভোলে না। সকলেই সকলের সঙ্গে কোনো এক সময়ে আবার দেখা হবার আশায় বসে থাকে। সকলের মুখের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনতে আনতে মহাশ্বেতার শোভার চোখে চোখ পড়ল। শোভা—আগে থেকেই মহাশ্বেতাকে দেখছিল সে—একটু হেসে চোখ সরাল, আর মহাশ্বেতা মন দিয়ে দেখল এই সমবয়সী জ্যাঠাতুতো বোনটিকে, চেষ্টা করল তার আগের মুখটা মনে আনতে। নাঃ, বুড়ো হয়ে গেছে শোভাটা—কষ্টে থাকে, অবস্থা ভাল না। মনের মধ্যে একটা ‘আহা’ উঠেই মিলিয়ে গেল, নিশ্বাস পড়ল অন্যরকম। আমি—আমাকেও কি ঐ রকম দেখায়? পাশের মেয়েটি শোভার কানে-কানে বলল—মহাশ্বেতার কণ্ঠটা দেখেছ? দেখেছ মানে? না দেখে উপায় আছে নাকি? কণ্ঠার হাড় এমনি তো ঢাকে না, তাই বড়ো-বড়ো মুক্তো দিয়েই—। কিন্তু ঈর্ষা ফণা তুলেই ফিরে গেল, জিতল সুখ। সুখ শোভার মনে... এ-বাড়িতে যখন পা দিয়েছে কাল সকালে, তখন থেকেই সুখ... আর তারপর বেড়েই চলেছে কেবল। আজ রাত্রিটাও সে এখানে, আর আজকের রাত আরম্ভও হয়নি এখনো। দুটো দিন, আস্ত দুটো দিন রাজেনকাকা বাঁচালেন, নেই-নেই আর আর-পারিনা-র সংসার থেকে। সে না-রোঁধেই খাচ্ছে, কিছু না-করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাসছে, সাজছে, গল্প করছে ইচ্ছেমতো আর গল্প করার লোকও কত—সকলেই! এত আত্মীয় তার আছে এই কলকাতাতেই—তা যেন আর ভাবতেও পারে না আজকাল। দেখাও হয় না কারো সঙ্গে, মনেও পড়ে না সাত জন্মে, কিন্তু এই তো—কেমন আপন-আপন লাগছে এখানে আবার সকলকে সকলেরই। একটা ছোঁয়াছে ভাল্লাগা সকলের থেকে সকলের মনে ছড়াচ্ছে—সত্যি, একটা বিয়ের মতো আনন্দের ছায়া কিছু না। আর এর পরেই সবাই যে যার বাড়ি চলে যাবে, যে যার সংসারে ঢুকবে, আমার সবাই তেমনি দূর, তেমনি পর; আবার ভোর থেকে রাত পর্যন্ত— না এখন না, এখনো না। শোভা চোখ নামাল। চোখে পড়ল সাদা সুন্দর মেঝেতে সুন্দর সাদা চিকনপাটির উপর সাদা দুটি পা, শাশ্বতীর হাতের তুলিতে লাল হচ্ছে ধারে ধারে, আর বাঁকানো পিঠে ছড়ানো একঢাল কালো। পিছনে হাঁটু ভেঙে বসে চিরুনি টানছেন উষা-বৌদি। কেমন ছবির মতো বসে আছে স্বাতী, উঁচু করা হাঁটুতে থুতনি রেখে, হাঁটুর নিচেটা দুহাতে জড়িয়ে, চোখ নিচু করে চুপ। তা ওর আর নিচু চোখের দরকার কী, নিজেই নিজেরটা ঠিক করল, আমাদের মতো বোজা-চোখের বিয়ে তো না। চোখেও দেখিনি আগে, কিছুই জানিনি, রাতারাতি সর্বেশ্বর হয়ে বসল একেবারে অচেনা একজন—এই গতানুগতিক চিরাচরিতে শোভা হঠাৎ অবাক হল—তা ওতেও তো বেশ কেটে যায় জীবন আর এতেই কি ভাল হয় সব সময়?

সরস্বতী, কী রকম চুলবাঁধা হবে বলো-টলো!

—আমি তোমাকে বলব উষাবৌদি! তুমি হলে চুলবাঁধার ওস্তাদ।

দিল্লির ফ্যাশন বলো দেখি দু-একটা—উষাবৌদি খুশি হয়ে ফিতে হাতে নিলেন। না হয় মহাশ্বেতাই বলো। বর্মায় তো খুব খোঁপার বাহার।

বর্মায় না, জাপানে— স্বাতীর পা থেকে চোখ না তুলে শাস্বতী বলল। কী সব শুনছি রে? বললেন পান মুখে টোপলা গালে কুন্দদিদিমা—আমাদের নাকি জাপানি রাজা হবে এর পরে? জিনিসপত্র সস্তা হবে তো তা হলে?

আর চুলবাঁধা! উষাবৌদি ঘাড়ের কাছে চুলটা গোল করে চেপে ধরলেন—এ সব পাটাই থাকবে না কদিন পরে দেশে—আঁটো করে বেঁধে ফেললেন ফিতেটা। কেন? থাকবে না কেন? একটি অল্পবয়সী মেয়ে হাসির সুরে জিগেস করল। সব বব ছাঁট হবে! উষাবৌদি তাঁর চোখ দুটিকে ভাসিয়ে দিলেন উপরদিকে, যেন ভবিষ্যৎ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সেখানে। মহাশ্বেতার চোখে চোখ পড়ল।

তা মন্দ কী—বড়িখোঁপার চেয়ে ববছাঁটই ভাল! কথাটা বলে নিজের কথা ভেবে নিজেই খুব হাসতে লাগলেন মহাশ্বেতার পাশে দাঁড়িয়ে তাদের লীলামাসি। যারা শুনল, তারাও যে-যার চুলের দশা ভাবল একটু। ফিতে-বাঁধা মোটা গোছটায় উষাবৌদি আস্তে দুটো চাপড় দিলেন। সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে বললেন—কী চুল ভাই তোমাদের বোনদের—হিংসে হয় সত্যি! স্বাতী দু-একটা কথা-টতা বল!—হাসি-হাসি চোখে তাক করে কুন্দদিদিমা বললেন—কাণ্ডটি তো ভালই ঘটালি—আর লজ্জা কী!

স্বাতী এখন কথার বাজে খরচ করবে না—কোমর থেকে জড়িয়ে-জড়িয়ে চুলগুলি উপরে তুলতে লাগলেন উষাবৌদি। সব জমিয়ে রাখছে।

তা বাপু, কিছু তো খরচ হয়ে গেছে আগেই— দিদিমা টেনে টেনে বললেন—তা-ই থেকেই দু-একটা নমুনা শুনি আমরা। কী এমন কথা বলিস রে তুই, যা দিয়ে এত বড়ো বিদ্বানকে জয় করলি! হ্যাঁ রে, পৃথিবীর সব বই নাকি পড়ে ফেলেছে?

পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল বইটি পড়তে আরম্ভ করবে এতদিনে— দুহাতে পাকিয়ে-পাকিয়ে উষাবৌদি খোঁপা গড়তে লাগলেন। শোভা কথা শুনে হাসল। স্বাতীর মুখ দেখার জন্য তাকাল। কিন্তু মুখের বদলে দেখল একদিকের গালের খানিকটা। একটি চোখের কালো পলক নড়ল। হাতের জড়ানো আঙুলগুলি ছাড়িয়ে নিয়ে স্বাতী যেন চমকে তাকাল। যতবার আওয়াজ হয়েছে ততবার চমকেছে আর যতবার তাকিয়েছে ততবার অবাক হয়েছে। স্বাতী এবারও অবাক হল তার হাতের দিকে তাকিয়ে—চুড়ি, কঙ্কণ কত!—তার ঐ ঝকঝক চঞ্চল চুড়িগুলির পাশে হলদে সুতো জড়ানো শাঁখাটা কী সুন্দর, কী শান্ত সাদা... শাঁখা ঝকঝক শব্দ নাকি, টিপে-টিপে অনেকক্ষণ ধরে পরাতে হয়, পাছে ভেঙে যায়; কিন্তু ছোট শাঁখাটা যেন নিজে-নিজেই চলে এল তার হাতে, আঙুলের গাঁটে মোটে ঠেকল না। সুলক্ষণ, সবাই বলল। স্বাতী আস্তে বলল—ছোড়দি হল তোমার?

এই হল। শাস্বতী হাত সরাল, মাথাটি একটু দূরে সরিয়ে দেখল একবার। তারপর হাতে টিপে সুরু করে নিল তুলিটা—পা-টা উঁচু কর তো একটু। মেঝেতে গোড়ালি রেখে পায়ের আঙুল উঁচু করল স্বাতী। তুলিটা শুড়শুড়ি দিল আঙুলের ফাঁকে। স্বাতী নড়ে উঠল, তুলি সরে গেল। নড়িস না—হ্যাঁ, এই ঠিক। ঠিক এইভাবে থাক। শাস্বতী খুব মন দিয়ে আঙুলের গলিতে তুলি বুলোতে লাগল আর স্বাতী তাকিয়ে থাকল তার পায়ের পাতার হলদেমতো রঙের দিকে।

সন্ধেবেলা কাঁচা হলুদে স্নান, তারপর এই মোটা, কোরা লালপাড়-শাড়িটা পরতে হল—শাড়িটা ওরা পাঠিয়েছে—ওরা—সে—শাড়িটা সে পাঠিয়েছে আমার জন্য। পায়ের পাতার একটু উপরে টকটকে-লাল পাড়টার দিকে স্বাতী একবার তাকাল। কাকে নাকি দিয়ে দেবে এটা। এটাই? অন্য শাড়ি দিলে হয় না?

কই গো রাজকন্যারা, কোথায় সব? শাশ্বতী মুখ তুলল, স্বাতীও। দু-বোনে চোখাচোখি হল, দুই জনেই বুঝল একই কথা মনে হয়েছে দু জনের। কথাটা, বলার ধরনটা, এমনকি গলার আওয়াজটাও অনেকটা বাবার মতো— সেই আগেকার দিনে যেমন করে বলতেন বাবা—বারেবারেই ভুল হয়। বাবার কথা মনে হতেই স্বাতীর বুকের মধ্যে আঁটো কষ্ট মোচড় দিল আবার, আর মহাশ্বেতা-সরস্বতীর মনে পড়ল ছেলেবেলায় এই বড়োপিসি যখন এসেছেন, তাঁর কাছে শোয়া নিয়ে কত ঝগড়া করেছে তিন বোনে।

এখন আর রাজকন্যা না—কুন্দদিদিমা হাসলেন—সব রাজরানি। শাশ্বতী নিচু গলায় বলল—পা নামা এবার। স্বাতী পা পাতল—প্রত্যেকটি নখে একটি লালের ফোঁটা দিয়ে শাশ্বতী উঠে দাঁড়াল। বেশ হয়েছে। লীলামসি তারিফ করলেন। সাদা চুলে সিঁদুর নিয়ে বড়োপিসি এদিকে তাকালেন, ওদিকে তাকালেন। ভাঙা গালে মিষ্টি হেসে বললেন—পঞ্চকন্যা, একসঙ্গে আবার। রাজুর অনেক দিনের একটা সাধ মিটল।

আমাদেরও—আলগোছে বলে নিয়ে উষাবৌদি মস্ত ঘন কালো খোঁপটায় কাঁটা বসাতে লাগলেন।

তা সত্যি। আমাদের মেয়ে কটিও তেমনি তো। রূপে-গুণে এমন আর দেখলাম না।—বলতে-বলতে নিঃসন্তান বড়োপিসির তোবড়ানো গালের ফোকরে-ফোকরে হাসি ঝরল। পিসিমার আর কাণ্ডজ্ঞান হল না, মহাশ্বেতা ভাবল, একঘর মেয়ের সামনে এ রকম বলতে হয়! কথাটা চাপা দেবার জন্য একটা জানা কথাই জিগেস করল—পিসিমা, শাশ্বতীর বিয়েতে এসেছিলে?

ও মা! গালে হাত দিয়ে বড়োপিসি অবাক হল—আমার অসুখ না তখন? তোমাদের পিসে তো ভেবেছিল আমি মরেই যাব... হুঁ, আমার মরা যেন সোজা—কলেরা-টাইফোট কতই ছিলোলাম, আমার কাছে সব ফেলটুশ! ঘরে একটা হাসির হাওয়া বইল। স্বাতী ভাবল, বড়দির কথাও অনেকটা এরকম—আর সুখের কুয়াশা আরো ঘন হয়ে ঘিরল শোভাকে, মুখখুঁজি বাপসা দেখল সে, যেন নাক-চোখ কারোরই স্পষ্ট না, শুধু একটা হাসিতে—একই হাসিতে প্রত্যেকটা মুখ সেজে আছে। সকলেই স্বাতীদের আত্মীয়, সে ভাবলো, কিন্তু সকলেই সকলের আত্মীয় না। অনেকে অনেককে চেনেও না ভাল করে, অনেকে অনেককে জীবনেও আর দেখবে না। তবু এখন... এখনকার মতো, কেউ কারো দূর নয়, পর নয়, সকলকেই একবাড়ির লোক করে দিয়েছে বিয়েবাড়ি, আর এই সকলের মধ্যে সেও আছে।

স্বাতীর পরবার সোনালি-লাল বেনারসির ভাঁজ খুলতে-খুলতে সরস্বতী বলল—যাক, স্বাতীর পয়াতে সকলের সঙ্গে সকলের দেখা হল। কতকাল এরকম হয়নি। কতকাল কেন, মহাশ্বেতা ভাবল, কোনোদিন না... কোনোদিন হয়নি। একসঙ্গে এদের সকলকে কোনোদিন দেখিনি আমি, আর অনেক সব বৌ জামাই আর ছোটোদের তো এই প্রথম দেখলাম। আর একবার সে চোখ ঘুরিয়ে আনল ঘরের মধ্যে, তারপর বড়োপিসির কুঁকড়োনো মুখে চোখ রেখে ভাবল, আমরা সকলেই একসঙ্গে বেঁচে আছি, আমিও আছি সকলের সঙ্গে। কথাটা ভেবে অবাক লাগল তার,

ভারি ভাল লাগল। হ্যাঁ, সকলের সঙ্গেই সঙ্গের— মহাশ্বেতা বলল—কেউ বাকি নেই।
 কেউ বাকি নেই? একটা বোবা চিংকার উঠল স্বাতীর মনে—জামাইবাবু! কারো মনে পড়ে
 না একবার, মানুষটা যে ছিল তাও মনে পড়ে না? এক কাপটে ফিরল তার মনে ছোড়ির
 বিয়ে, পরের দিনের সকালবেলা, বাটের উপর পায়ে পা তুলে সেই হা-হা হাসি, সেই একটুতেই
 অবাক হওয়া গোল-গোল চোখের অফুরন্ত ভালমানুষি। সব মুখে গেল? এর মধ্যেই? চাপা
 কষ্ট ছাড়া পেল, ছড়াল, অনেকক্ষণ পর ঠেলে উঠল গলার কাছে। এখন সে আর সে-মেয়ে
 নয় যাকে সে চেনে না, যার হাতে শাঁখা, পায়ে আলতা, পরনে 'তার' পাঠানো কোরা শাড়ি,
 আর যাকে ঘিরে সকলের সুখ, আনন্দ—এখন সে আবার স্বাতী... পাঁচ বছরের...এগারো
 বছরের...পনেরো বছরের স্বাতী... কৌকড়া চুলের, আঁকড়ে ধরা, কেঁদে-কেঁদে না-খেয়ে ঘুমিয়ে
 পড়া, বৃষ্টি-পড়া রাত্রে জেগে উঠে ভয় পাওয়া, লালপাড় শাড়িতে মাঘের সকাল আলো করা—
 এখন সে আবার তার মা-র শরীর—এখন সে আবার তার বাবার মেয়ে। স্বাতী হাঁটুতে মুখ
 লুকোল। সোনালি-লাল বেনারসিটা হাতে নিয়ে সরস্বতী কাছে এল—স্বাতী ওঠ, শাড়ি পরবি।
 স্বাতী—শাস্বতী আরো নরম করে ডাকল। সিঁড়িতে শোনা গেল জুতোর শব্দ, একসঙ্গে অনেক,
 আরো অনেক লোক উপরে উঠছে একসঙ্গে। স্বাতী মুখ তুলে হাতের পাতায় চোখ মুছল।
 মস্ত কালো খোঁপা-বাঁধা মাথাটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লালচে চোখে তাকাল চারদিকে। দেখল হাসি,
 শাড়ি, রঙের ছড়াছড়ি, গলার হারে-কানের দুলে রেযারেশি, ধবধবে ইলেকট্রিকের আলোয়
 মস্ত ময়ূর পেখম ছড়াল, আনন্দ দাঁড়িয়ে আছে তাকে ঘিরে। সকলের আনন্দ। মুখ থেকে মুখে
 সরলো তার চোখ, কী যেন খুঁজল। শাস্বতী বলল—কিছু চাই, স্বাতী? খুব ছোট্টো গলায় স্বাতী
 বলল—বড়দি কোথায়?

বড়দি? বড়দিকে চাই? ডেকে দিচ্ছি—শাস্বতী দরজার দিকে এগোল, জুতোর শব্দ মিলোতে
 লাগল দোতলা পার হয়ে ছাতের দিকে, সত্যেনকে একবার দেখে আসতে হয় এখন। এই যে
 বড়দি, তোমার খোঁজেই যাচ্ছিলাম। স্বাতী ডাকছে তোমাকে। শাস্বতী আর দাঁড়াল না, সিঁড়ির
 দিকে এগোল। ঐ তো বড়দি, সরস্বতী বলল—এস, তুমি না এলে স্বাতী শাড়ি পরবে না।
 তোমরা যাও উপরে, বলতে বলতে শ্বেতা কাছে এল—লীলামাসি, তুমি এঁদের নিয়ে যাও।
 পিসিমা, বলো সকলকে। কুন্দদিদিমা বললেন—পুরুষদের হোক।

আজকাল আর ও সব নেই! বড়োপিসি হাত নাড়লেন—পুরুষদের সঙ্গে সমান-সমান স্বীলোক!
 আসুন আপনি, তোরা সব চল রে।

দূর দেয়াল থেকে একটা নড়াচড়ার হাওয়া মাঝের দলটি পর্যন্ত পৌঁছল। সিঁকে-সোনায় ঝিলিক
 দিল, পান্না-চুনি চিকচিকোল। আর ঘরভরা ঐ চপল-সেন্সি আর মুখর-জড়োয়া আর সিঁকে-
 সাটিন-ব্রোকেডের আশ্চর্য নাচের মধ্যে স্বাতী দেখল বড়দিকে... আরো আশ্চর্য... সাদা থান
 পরা, তার হাতের চুড়িগুলির পাল্লে শাঁখাটার মতোই আশ্চর্য সাদা, আর সেইরকমই শান্ত,
 সুন্দর!—কী স্বাতী? স্বাতী চোখ নামাল, শ্বেতা তার পাশে এসে বসল। নিচু গলায় বলল—
 কিছু একটু খা, কেমন?

না।

একটু নেবুর জল করে আনি—ভাল লাগবে, তেঁস্তা তো পায়।

এখন না। একটু বোসে' বড়দি।

স্বাতী—সরস্বতী তাড়া দিল।

আচ্ছা, একটু পরেই পরবে। স্বাতীর পাশে বসে শ্বেতা তাকে এক হাতে জড়াল, তার হাতে পৌঁছল স্বাতীর ভিতরকার কাঁপুনি। ঘরের ভিড় কমল... কমে এল... পাটির উপর পড়ে রইল শাড়ি, জামা, ওড়না, গয়না... ছাতে আরম্ভ হল খেতে বসা।

সিঁড়ির মাঝপথে শাশ্বতী দেখল হারীতের সঙ্গে উঠে আসছে প্রবীর মজুমদার। শাশ্বতী থামল, মজুমদারও থামল তাকে দেখে। আগের মতোই হাত জোড় করে অনেকখানি মাথা নোওয়াল, আগের মতোই সমস্ত মুখ ভরে হেসে বলল—মিসেস নন্দী, ভাল আছেন? শাশ্বতী ঘাড় হেলিয়ে বলল—আপনি ভাল?

ভাগ্য আমার—শাশ্বতীর মুখের উপর চোখ রাখল মজুমদার—আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। শাশ্বতী হাসল। কী বলবে ভেবে পেল না। সেই যেদিন মজুমদার তার মুখে—তাকেই বলতে হয়েছিল কথাটা—প্রত্যাখ্যানের পাকা খবর নিয়ে ফিরে গিয়েছিল—তারপর শাশ্বতী আর দ্যাখেনি তাকে, ভাবেনি আর দেখবে। স্বাতীর বিয়েতে মজুমদার আসবে তাও ভাবেনি। আসা তো কম কথাই—মজুমদারের বেশ উৎসাহই যেন। উপহার পাঠিয়েছে একেবারে একটা গ্রামোফোন। গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে সারাদিনের জন্য, আর দেখাচ্ছে তাকে আগের মতোই খুশি। মানুষটা কী?—নিঃসাড়? মহৎ? না কি তখন একটা উড়ো খেয়াল হয়েছিল—সত্যিকার কিছু না? আপনার গ্রামোফোনটি খুব সুন্দর—শাশ্বতীর মনে হল এ কথাটা বলা যায়, উচিতও বলা। আমার তো না!—মজুমদার হাসল। হারীত তাড়া দিল—চলুন! এই কথাবার্তাটা বাজে লাগছিল তার, কানও দেয়নি, কিন্তু মজুমদার কী রকম বিগলিত! আবার বলল—চলুন।

আচ্ছা, খুব ভাল লাগল দেখা হয়ে—মজুমদার বিদায় নিল। আমারও—আবার হাসল শাশ্বতী, মাথার একটু ভঙ্গি করল। শাশ্বতী নামল, মজুমদার উঠল, হারীত একবার ফিরে তাকাল, আর শাশ্বতী যেন সেটা আশা করেই যেতে-যেতে চোখ তুলল। নিজের দ্বীকে হঠাৎ খুব সুন্দর দেখল হারীত।

না—মজুমদার ভদ্রলোক, আর কিছু না, যাকে ভদ্রলোক বলে তা-ই। কত ভাল লাগল মজুমদারের এই—এই অসাধারণ ভদ্রতায়—হ্যাঁ, অসাধারণ বইকি! যা হল না সেটিকে কেমন মেনে নিল, সুখী হল সকলের সুখে। শাশ্বতীর সুখ এতে বেড়ে গেল, ভাবল এটা আমার উপরি পাওনা। দিদিরা কেউ জানেই না ব্যাপারটা, স্বাতীর বিয়েতে আমার মতটা, ততটা ওদের কারোরই না। ভাবল, ভুল করেছিলাম তখন, কিন্তু স্বাতী কখনো, সত্যেন ছাড়া কারো সঙ্গেই ওকে মানাত না—সত্যি!—ঠিক মানুষের সঙ্গে ঠিক মানুষের দেখা হয়েছে, বিয়ে হচ্ছে, সুখী হবে ওরা, কত সুখী হবে...একটু বৃত্ত থাকবে না কোথাও। শাশ্বতীর মন সুখে ভরে গেল, যেন আর ধরে না, যেন হাওয়ায় ভেসে-ভেসে চলে এল সামনের ঘরটির দরজায়।

* * * * *

মেক-জোড়া ফরাশের উপর হলদে কার্পেট পড়ে আছে। পানের থালা, ছাইয়ের বাটি ছড়ানো, লাল-কার্পেট থেকে সরে এসে মস্ত ঘরে একলা বসে আছে সত্যেন। তাড়াতাড়ি কাছে এসে শাশ্বতী বলল—বাঃ! সত্যেনের চোখে আভা দিল ম্যাজেস্টা রঙের শাড়ি, হলদে আর সবুজে মেশানো জামা, সবুজ আর লাল পাথরে জাল-বোনা নেকলেস। প্রথমে সে ঠোট দুটির নড়া দেখল, তারপর কথা শুনল—আপনাকে একা ফেলে চলে গেছে সবাই, বেশ।

অরুণবাবু ছিলেন। আসবেন আবার। আর একা আমার ভালই লাগছিল—সত্যেনের নরম চোখে তাকিয়ে, নরম গলার কথা শুনে শাস্ত্রীর মন উচ্ছল হল। এখন ঠিক সুখে না, সুখ ছাপানো অন্য কিছু, নতুন বোধ এটা। আর কোনো মানুষের জন্য তার জাগেনি। মনে হল, আমি এর জন্য কী করতে পারি? শাস্ত্রী অবাক হয়ে ভাবল, স্বাতীর চেয়েও কি বেশি হল সত্যেন? অবাক হয়ে ভাবল—একেই স্নেহ বলে?

একই ভাল লাগছিল? তাহলে আমি না এলেই ভাল হত? সত্যেন তাড়াতাড়ি বলল—না, না, এটা আরো ভাল। শাস্ত্রী হাসল; এদিক-ওদিক চোখ ফেলে বলল—এখানে ফুল ছিল না?

আমি সরিয়ে রেখেছি। আর যদি অনুমতি করেন একবার উঠে দাঁড়াই।

নিশ্চয়ই।

সত্যেন উঠল, তার পিছনে ঝলক দিল লাল গোলাপের তোড়া দুটো। শাস্ত্রী বলল—ক্লান্ত লাগছে, না? চা খেয়েছিলেন এসে?

বোধহয়।

বোধহয় মানে?

সত্যেন কার্পেটের উপর কয়েক পা হাঁটল—মানে—সকলকে যখন চা দিচ্ছিল আমাকেও দিয়েছিল এক পেয়ালা, কিন্তু খেয়েছিলাম কিনা ঠিক মনে পড়ছে না। সত্যেনের প্রত্যেকটা কথায় তাকে আরো ভালোবাসল শাস্ত্রী—আর একটু খাবেন এখন? অবশ্য উপোশের উপর বেশি চা খাওয়া ঠিক না।

উপোশ কেন? আমি তো খেয়েছি-টেয়েছি।

বে-শ! এদিকে আমাদের মেয়ে কিছু খায়নি সারাদিন।

খায়নি? আমি বলেছিলাম তো খেতে। শাস্ত্রীর হাসি পেল কথা শুনে, হাসি চোখে বলল—আমরাও বলেছিলাম, কিন্তু খেল না কিছুতেই। আর একটা দিন না-খেলেই বা কী, আপনি তাহলে—আমি চা নিয়ে আসি, কেমন? এক্ষুনি আসব।

আমি ভাবছিলাম—

কী?

অন্য কোথাও বসা যায় কি?

কেন, এখানে কী হল?

একটা চেয়ার যদি থাকে কোথাও—

ও! শাস্ত্রী চোখ দিয়ে হাসল—আচ্ছা আসুন। সত্যেনকে নিয়ে এল ভিতরের দরজা দিয়ে ছোটো একটা ঘরে, সেখানে তিন-পিস ড্রয়িংরুমের আসবাব ঘেঁষাঘেঁষি করে রাখা। সত্যেন একটা চেয়ারে বসে পিঠ জিরোল। শাস্ত্রী জিগেস করল—এখন আরাম হচ্ছে?

খুব, একটু বেশিই।

নীল রঙটা কেমন?

এই চেয়ারের? খুব সুন্দর।

যাক, আপনার অপছন্দ হয়নি? তাহলেই হল।

কথাটা বুঝতে না পেরে সত্যেন বলল—কেন?

বাঃ, আপনার জিনিস—

আমার কেন? সত্যেন একটু পরে আবার বলল—আমি এসব দিয়ে করব কী? আর রাখবই বা কোথায়?

ওসব ভাববার লোকও তো হল। হাসির একটা ঝলমলানি রেখে শাম্বতী চলে গেল, একটু পরে ফিরে এনে ধোঁয়া-ওঠা এক পেয়লা চা রাখল সত্যেনের পাশে হলদে কাচ বসানো টেবিলে। সত্যেন বলল—আপনি একটু বসুন এবার।

না, বসব না। আপনি খান। চায়ে চুমুক দিয়ে সত্যেন বলল, বাঁচলাম। এতক্ষণে বুঝল ভিতরে ভিতরে চায়ের তেষ্ঠাই পাচ্ছিল তার।

ঠিক হয়েছে? চিনি বেশি হয়নি?

ঠিক, চমৎকার। শাম্বতী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু সত্যেনকে দেখল, তারপর বলল—একটা কথা বলি আপনাকে।

বলুন!

আমাকে কিন্তু ‘ছোড়দি’ ডাকতে হবে।

ডাকব।

আর আমি কিন্তু কাল থেকে আপনাকে ‘তুমি’ বলব।

সত্যেন মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—নিশ্চয়ই।

আপনিও আমাকে ‘তুমি’ বলতে পারেন ইচ্ছে করলে।

তা-ই বলব। কাল থেকে তো?

হ্যাঁ, কাল থেকে। আগু হেসে উঠল দুজনে একসঙ্গে। অরুণ ব্যস্তভাবে ঘরে এসে বলল—

বাঃ, সত্যেনকে এখানে এনে লুকিয়ে রেখেছ, শাম্বতী! এদিকে আমি ভাবছি কী হল।

আপনাদের ভাবনা তো দেখলাম। মানুষটাকে একলা ফেলে চলে গিয়েছিলেন সব!

উপরটা দেখে এলাম একবার। সত্যেন তৈরি তো? বেশি আর দেরি নেই কিন্তু।

আমিও যাই। ওঁকে দেখবেন, অরুণদা—হারিয়ে-টারিয়ে না যায়— শাম্বতী যেতে-যেতে একবার ফিরে তাকাল সত্যেনের দিকে।

সোজা ছাতে এল। মেরাপ-বাঁধা, সামিয়ানা-খাটানো মস্ত ছাত, ব্ল্যাক-আউটের আর শীতের জন্য টেনিস লনের মতো মোটা নীল পরদা-ঘেরা, আর একটা পরদা টুলে গেছে চিলেকোঠা বরাবর ছাতটাকে ছোটো আর বড়ো দুটো অংশে ভাগ করে দিয়ে। ছোটো দিকটায় বিয়ে হবে আর বড়োটায় খাবার জায়গা—খাওয়া হচ্ছে। সরু-সরু লম্বা টেবিলে মুখোমুখি ডবল সারিতে বসে গেছে সব। পাঁচটা টেবিল ভরে পুরুষরা। আর তিনটে ভরে মেয়েরা, দেখাচ্ছে বেশ। দু-সার পিঠের মধ্যে দিয়ে সরু পথে এগিয়ে এল শাম্বতী। খয়েরি শাট দেখে দাঁড়িয়ে বলল—ভাল করে খাচ্ছে তো নিখিল? এক টুকরো ভেটকি ফ্রাই মুখে তুলতে গিয়ে নিখিল ঘাড় ফেরাল, শাম্বতীকে দেখতে পেয়ে অনেকখানি লাল হল। শাম্বতী আবার বলল—কী, কিছু চাই? না, কিছু না—নিখিল চোখ নামাল টেবিলে পাতা ঘি-রঙের পাতলা কাগজে, ছোটো-বড়ো খুরিতে ঘেরা মাটির লাল থালায়। চাইবার কী আছে? শাক থেকে রসমালাই পর্যন্ত আমিষ-নিরামিষ-চাটনি-মিষ্টি মিলিয়ে আঠারো রকম খাবার—হ্যাঁ, আঠারো, সে শুণে দেখেছে—একই সঙ্গে সাজানো সুগন্ধি কেওড়া জল, আলাদা একটি ছোটো থালায় লবঙ্গ-বেঁধা একটি পান

পর্যন্ত— সঙ্গে, পান যারা খায় না তাদের জন্য একটু সুপরি, মৌরি আর আস্ত একটি বড়ো এলাচ। বিয়ের যে ছবি নিখিলের মনে আঁকা আছে, ছেলেবেলায় অনেকবার যা দেখেছে তার সঙ্গে কিছুই এর মেলে না। সেই কুশাসন-কলাপাতার ঘেঁষাঘেঁষি, গায়ের জামার নিচের দিকটা ভিজ়ে যাওয়া, বেগুনভাজা পাতে নিয়ে ডালের জন্য বসে থাকা, ঝালের উপর অম্বল, আর অম্বলের উপর দইয়ের গড়িয়ে যাওয়া, অন্য সব দিয়ে খাওয়া যখন প্রায় শেষ তখন হঠাৎ পোলাও-মাংসের জাঁকালো আমদানি—ঘাম, গন্ধ, পরিবেশনের পরিশ্রম, কিছুই না। আর সবচেয়ে যা ভাল...আশ্চর্য, নিখিলের কাছে নতুন—চ্যাচামেচি হাঁকডাক নেই, চুপচাপ, যারা খাচ্ছে তাদেরই কথাবার্তার গুনগুনানি শোনা যাচ্ছে শুধু। খাওয়াও হচ্ছে বেশ বেছে-বেছে, আরামে বসে, স্বাধীনভাবে। আর যদিও আঠারো রকম খাবার, তবু সবই বেশ অল্প-অল্প বলে কোনোটাই প্রায় ফেলতে হয় না। ভেটকিটা শেষ করতে করতে নিখিল আশেপাশের কথাবার্তায় কান দিল।

—কথাটা হচ্ছে, আমরা এখন কী করব?

আমরা? গলাবন্ধ লম্বা কালো কোট পরা শৌখিন চেহারার মাঝবয়সী একজন ভদ্রলোক হারীতের দিকে চোখ তুললেন—আমরা আর কী করব! গোলাম আছি, গোলামই থাকব। কেউ কেউ হাসল কথাটা শুনে। হারীতের মুখ লাল হল, তার ছোট্টো হাসি ঘক করে উঠল। শাল কাঁধে আর একজন বলল—তাই বা কেন? এই হয়তো আমাদের সুযোগ।

সুযোগ নিশ্চয়ই! তীরের মতো প্রস্থ ছোটাল হারীত—কিন্তু কীসের?

ছেলার ডালের ছেঁচকি দিয়ে মটরশুটির কচুরি খেতে খেতে মজুমদার একবার চোখ তুলে দেখল মিসেস নন্দী সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছেন। একটু তাকিয়ে থাকল কিন্তু চোখাচোখি হল না। শাস্ত্রী এগোল, জলের জগ হাতে দুজন লোক দুদিকে চলে গেল, দূরে দাঁড়িয়ে রেঙ্গুনি জামাইটি কাকে দেখে হাসলেন, আর অন্য দিকে মেয়েরা যেখানে বসেছে সেখানে একবার ঝলক দিল কালো মখমল-কাঁধের উপর রূপোর মতো আঁচল। না এলেই পারতাম, আবার ডাবল মজুমদার। সত্যি, কেন এসেছি? মনে পড়ল মিসেস নন্দীর কাছে শেষ যেদিন...অনেক কথাই বলবে ভেবেছিল কিন্তু বেশি বলতে হল না... হল না! বিজন তারপর এসেছিল একটা পালকঝরা পাখির মতো চেহারা করে, ফোঁশফোঁশ গর্জেছিল, তার প্রায় কিছু সে শোনেনি, তার কানে আওয়াজ দিচ্ছিল অনেকক্ষণ ধরে শুধু ঐ কথাটা—হল না! কষ্ট পেয়েছিল? বুক ফেটে গিয়েছিল? না তো! এ অবস্থায় যে রকম বর্ণনা নভেল-টাইপে লেখে সেরকম কিছুই তার লাগেনি। কষ্ট কিছু না; আর কিছু না, শুধু অপমানের রিঙ্কর জ্বলুনি, না-পাবার খিঁকার। সে পারল না, ফেলল হল। সে প্রবীরচন্দ্র মজুমদার, কুচোকেবানির ডালভাত খেয়ে বড়ো হওয়া বড়ো ছেলে, আজ দেড়শ লোকের মনিব, বড়ো গাড়ি আর ছোটো গাড়ির মালিক, এই প্রথম সে কিছু চেষ্টা করে পারল না। না কি তেমন করে চেষ্টা করেনি, তেমন করে ইচ্ছা করেনি—যেমন করে ষোলো বছর আগে মুঠো চেপে বসেছিল—টাকা আমার চাই।

...কিছু বোঝে না কেউ! আপনি কী বলেন?— হারীত নন্দীর অন্তরঙ্গতা মজুমদারের কান কাড়ল। —আমি? আমি ঠিক...

কথাটা খুব সোজা। আপনি কি ফ্যাসিস্টদের জয় চান? হারীতের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থাকল মজুমদার। গালের ভাঁজে-ভাঁজে বিনয় ঝরিয়ে নরম সুরে বলল—আচ্ছা, ফ্যাসিস্ট কাকে

বলে? হারীত হাত নেড়ে হেসে উঠল। দয়া করে যদি একটু বুঝিয়ে দেন, মিস্টার নন্দী—
গম্ভীর মুখে আর নরম গলায় অনুনয় করল মজুমদার—আমি লেখাপড়া শিখিনি, কিছু বুঝি
না।

আমি তো কবে থেকেই ছেলেদের বলছি—শ্লেষা-ভরা চড়া গলায় আওয়াজ হল তাদের
পিছনে— বেশি আর পাশ-টাশ করে কাজ নেই, বাপু, এবার জাপানিটা শেখো! লোকটার
চেহারা দেখার জন্য হারীত ক্ষিপ্ত ঘাড় ফেরাল আর মজুমদার সেই সুযোগে হাত দিল সর্ষে
দিয়ে ভাপানো চিংড়িতে। পারল না, চেষ্টা করে পারল না, আশা মরে গেল, তবু লোভ তাকে
ছাড়ল না। এই সেদিন বিজ্ঞান যখন এল কেমন চোর-চোর মুখে বোনের বিয়ের খবর দিতে,
নেমস্তম্ভ করতে—তাকেই দেখাতে হল খুশি, উৎসাহ—বিজ্ঞানের কিস্ত-কিস্ত ভাবটা তাকেই
ঝটাতে হল। আর দেখাতে গিয়ে সেটাই যেন সত্যি হয়ে গেল। উপহার পাঠাল চারশো টাকার
গ্রামোফোন, উপকার পাঠাল সারাদিনের জন্যে বড়ো গাড়িটা আর নিজেও এল সময়মতো
ভাগনিকে নিয়ে মূর্তিমান সৌজন্য সেজে। কেন? কৃতজ্ঞ করতে? মহত্ত্ব দেখাতে? বাজে... যে
কোনো সূত্রে, যে কোনো শর্তে একটু সম্পর্ক পাতা, সম্বন্ধ রাখা, এই কি সে চায়? এই কি
সে চায় না? এত কাঙাল সে?

...তা পেনশনটা দেবে তো ঠিকমতো? একজোড়া জাঁদরেল সাদা গোঁফের ফাঁক দিয়ে সরু একটি
প্রশ্ন পড়ল মজুমদারের ঠিক পিছনে, আর তার মুখোমুখি বসে কিরণ বস্ত্রি রুইমাছের ফুলকপিটি
মুখে তুলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল।... সত্যি কি এখন কলকাতার বাইরে ফ্যামিলি পাঠানো
দরকার? কিরণ বস্ত্রির প্রশ্নটা হারীতকে লক্ষ্য করেছিল, কিন্তু হারীত মুখ তুলে দু-গালের পেশি
একবার একটু নাচাল; শুধু হাসতেই চেয়েছিল কিন্তু দেখাল ভেংচির মতো। কিরণের খালি
হওয়া গেলাসে জল ঢেলে দিল তার পিছনে দাঁড়িয়ে কৌকড়া চুলের এক নবযুবক। নিখিল
ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল, ডালিম এর মধ্যে আবার পোশাক বদলেছে, তোলা-পাঞ্জাবির বদলে এখন
তার গায়ে ছাইরঙের ডোরা-কাটা সিল্কের শার্ট, আস্তিন গুটোনো, কজিতে আবার সোনার
ঘড়ি—ঘড়িটা কেন? চোখাচোখি হতে নিখিল বলল—কটা বাজল, ডালিমবাবু? ঘড়ির দিকে
তাকাতে গিয়ে ঠাট্টা বুঝে লাল হল ডালিম, এগিয়ে গেল টেবিল-ফাঁকের গলি দিয়ে।

...এখন যাদের পেনশন হবো-হবো তাদের আর ভাবনা কী, চাইলেই এক্সটেনশন!

নাকি?

বাঃ, এ. আর. পি. সাপ্লাই—এই-যে এখানে একটু জল। আঃ, খাশা পোনা! কথাটা শুনতে
পেয়ে হেমাঙ্গ ছুটে এল—আপনাকে আর একটু... আর কিছু...
আচ্ছা জাপানিরা কি সোজা প্লেনে এসেই বোমা ফেলবে কলকাতায়, নাকি এয়ারক্রাফট-কেরিয়ার
নিয়ে বে-অফ-বেঙ্গলে আসবে? কিরণ বস্ত্রির এই সূক্ষ্ম সামরিক প্রশ্নের উত্তরে হারীত মুখ
পর্যন্ত তুলল না, যেন চারদিকে নির্বুদ্ধিতার ভারে নুয়ে পড়ে পোলাওয়ের পেস্তা-বাদাম খেতে
লাগল খুঁটে খুঁটে, তারপর হঠাৎ দ্রুত-আড়ুলে মাংস মেখে নিয়ে চাখল—মন্দ না তো, বেশ।
একটু খেয়ে নিয়ে খুব নিচু গলায় আরম্ভ করল—শুনুন, ফ্যাসিস্ট হচ্ছে তারাই, যারা...
আপনি এক্সটেনশন নিচ্ছেন নাকি?

নাঃ, আমি আর...বস্তার মুখের চর্চ পদার্থে বাকি কথা চাপা পড়ল—তবে রাজেন বোধহয়...
রাজেন বাবু? তিনি তো পেনশনের দিন গুনছিলেন।

তপাল! তপাল!—এতক্ষণে প্রথম কথা বললেন খুব বড়ো একজন, রাজেনবাবুর সাক্ষাৎ ভগ্নীপতি... সেই বড়োপিসির... সাদাচুলের লাল-সিঁদুর যাঁর বেঁচে থাকার ইস্তাহার—বড়ো মেয়েটা বিধবা হয়ে...। ডালিম তাড়াতাড়ি সরে গেল অন্যদিকে। শাশ্বতী তাকে দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে ডাকল, আর হারীতের নাছোড় ঘ্যানঘ্যান শুনতে-শুনতে, গানে, না-শুনতে-শুনতে হঠাৎ একবার চোখ তুলতেই সেই হাতনাড়াটুকু মজুমদারের চোখে পড়ল।

তেন রাজেনের তপালে এ-রতম?—দাঁত-পড়া মুখে ‘ক’ গুলি সব ‘ত’ শোনাল, তারপর একটু জোর দিয়ে বলতে গিয়ে ‘স’-টা সুদ্ধ ‘ত’ হয়ে গেল—মানুষটা তৎ, তাই!

তা সত্যি!—সঙ্গে সঙ্গে সায়া দিলেন রেবতী সিংহ, রাজেনবাবুর প্রতিবেশী। অতি সজ্জন রাজেনবাবু! আমাদের পাড়ার মধ্যে—

দে তো আমাকে একটু জল, উঃ এমন ঢেকেছে চারদিকে—

ভাগ্যিশ শীতকাল! ডালিম গম্ভীর গলায় বলল—গরম পড়লে যে ব্ল্যাক-আউটে কী করে... তদ্দিনই থাকবে ব্ল্যাক-আউট? শাশ্বতীর চিন্তা হল—কী যে হান্সামা, সত্যি! তা তুই যে জল নিয়ে? ঐ ওরা সব আছে তো।

আমিও তো আছি—ডালিম মিষ্টি করে হাসল। তারপর হঠাৎ হাতের জগটা নামিয়ে কব্জিতে বাঁধা ঘড়িটা খুলে পকেটে রাখল।

খুলে রাখলি যে?

অসুবিধে লাগে— ডালিম একটু আবছা করে হাসল।

মানিয়েছিল কিন্তু। জামাইবাবুর ঘড়িটা—না? হান্সা গলায় একথা বলে শাশ্বতী চলে গেল মেয়েদের টেবিলের দিকে। ডালিম একটু দাঁড়াল, আলগোছে আবার পরে নিল ঘড়িটা।

...স্বাতীটা, তার বাপের প্রাণ! তাকে বিয়ে দিয়ে এখন—কথা শেষ না করে কুন্দদিদিমা পাতের দিকে তাকালেন, বেসনে ভাজা চাকতি-বেগুনে কামড় দিলেন এতক্ষণে। ও সবই সয়ে যায়, সবই ঠিক হয়ে যায়—হাসি-হাসি লীলামাসি পৌঁছলেন মাছের মুড়ো দিয়ে বাঁধা বাঁধা-কপির ডালনায়। চিংড়িটা কী অদ্ভুত ভাল!—শোভার ভরামুখ থেকে উৎসাহ উপচাল। কোন্টো না? তক্ষুনি বলে উঠলেন বড়োপিসি—প্রতাপ ঠাকুরের রান্না, এর উপর কি আর কথা আছে? একটু দূর থেকে অনেকটা কমবয়সের একজন মহিলা জিগেস করলেন—বিশ্বাস্ত বুঝি প্রতাপ ঠাকুর?

ও মা! বড়োপিসি গালে হাত দিয়ে অবাক হলেন—প্রতাপ ঠাকুরের স্ত্রী শোনে ননি আপনি? তার বাপ ছিল বিক্রমপুরের শ্রেষ্ঠ ঠাকুর, সারা দেশেও তো তার মতো...। পিছনে দাঁড়িয়ে মহাশ্বেতা ছোট্ট চিমটি কাটল বড়োপিসির কাঁধে।

বাঃ! জলপাইয়ের টকে এইমাত্র চিকচিকে হওয়া সাদা গৌফের ফাঁক দিয়ে আওয়াজ বেরল—রাজেন ব্যবস্থাটি করেছে পরিপাটি, তা বলতেই হয়।

হ্যাঁ, উত্তম!

তোফা রান্না!

শেষ মেয়ের বিয়ে, খরচ করেছে খুব। আর জামাইরাও সব যোগ্য—

এটি কিন্তু পয়সায় খাটো হল— একটু নিচু গলায় মন্তব্য করলেন, সোনার চশমা পরা, টাক পড়া প্রৌঢ়, স্বাতীদের প্রভাত মেসোমশাই, লীলামাসীর স্বামী। তা হোক—টম্যাটোর চটনিতে

ভেজানো আঙুলটা মুখ থেকে বের করে রেবতীবাবু মত দিলেন—ছেলে খুব ভাল! এতদিন ধরে দেখছি, আমার বাড়িতেই তো, চোখ তুলে তাকায় না কারো দিকে।

যেখানে তাকাবার সেখানে ঠিক তাকিয়েছে!—শ্রেয়ান্ধরা চড়া গলার আওয়াজ হল। রুইমাছের লম্বা সাদা কাঁটাটি খালের ধারে সাজিয়ে চিত্রা বলল—মনে মনে স্বাতীর এই ছিল!

আমি তো কবেই বুঝেছিলাম—অনুপমা হাসল।

কবে বুঝেছিলি?—চিত্রা যেন অবিশ্বাস করল কথাটা।

অনার্স ক্লাসে তো দেখিসনি। সত্যেনবাবু একবারও তাকান না স্বাতীর দিকে, আর স্বাতী কক্সনো বই থেকে চোখ তোলে না।

মস্ত, বয়স্ক, অত্যন্ত-সাজা, বিয়ে-না-হওয়া, বেমানান ইভা গাঙ্গুলি পুরুষের মতো মোটা গলায় বলল—তা তোমরা যে যা-ই বল, প্রোফেসরের সঙ্গে ছাত্রীর এ রকম...

আস্তু! ঐ যে স্বাতীর ছোড়দি—

আপনি মুগের ডালটা খেলেন না? একদম অচেনা একজনের দিকে ভুরু কঁচকোলেন বড়োপিসি। কত খাব! লাজুক মহিলাটি নিচু গলায় বললেন। একটু মুখে দিয়ে দেখুন— বড়োপিসির হাসিতে স্পষ্ট এই কথাটা ফুটল যে এমন মুগের ডাল পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম রান্না হল, দ্বিতীয়বার আর হবে না। আপনি তো কই খাচ্ছেন না, শুধু কথাই বলছেন— বললেন লাল পাড় গরদ-পরা একজন পরিতৃপ্ত শ্রীচা, হারীতের মা। এই যে খাই— বড়োপিসি পোলাওয়ে হাত দিলেন। তা-আ-বেশ!— মুখ খুলে খুলে সোনা-বাঁধানো দাঁতে মাংস চিবোতে চিবোতে বয়সের পক্ষে বেখাপ্পারকম রঙচঙে শাড়ি পড়া এক গিন্নির এই মাত্রই যেন মনে পড়ল নিমন্ত্রণের উপলক্ষটা— বে-শ বিয়ে হল...যা দিনকাল, তাতে মেয়ের পাত্র জোটানো...। যা বলেছেন! বড়োপিসি খাওয়া খামিয়ে গভীর মুখে তাকালেন—চারদিকেই তা-ই, একটি-দুটি পার করতেই গলদঘর্ম এক একজন, আর আমাদের পাঁচ-পাঁচটি মেয়ে... বড়োপিসির সমস্ত মুখ মধুর একটি হাসিতে উদ্ভাসিত হল, চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সকলের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন—পাঁচটিরই যেন উড়াল দিয়ে বিয়ে হয়ে গেল—একটার বেশি কথা না—চোখে দেখল কি লুফে নিষিদ্ধ আর জামাইও এক-একটি...

আঃ! থামো তো তুমি!—মহাশ্বেতার ফিশফিশে গলা অনেকেই শুনল, কিন্তু কথাটা ঠিক বলা তিনিই যেন শুনতে পেলেন না। তা দেখুন, আমাদের মেয়েরা তো আর নিজেরাই বর ধরতে ছোটো না— বললেন রেবতী-গিন্নি, টেবিলের একধারে বসে পাশের চেয়ারের পাশের বাড়ির মেজবৌ-এর কানে কানে। মেজবৌ কথা না বলে হাত ওলটালেন। তাঁর আংটির পাথর থেকে একদানা পোলাও ঝরে পড়ল।

স্বাতী নিশ্চয়ই কলেজ ছেড়ে দেবে?

সে তো দিতেই হবে— জবাব দিল ইভা গাঙ্গুলি, তার ভাইসপ্রিন্সিপাল মামার কর্তৃত্বের সুরে। বেশ ছিল স্বাতীটা—একটু বিবাদ লাগল অনুপমার গলায়—মনে আছে সেই এনশেন্ট ম্যারিনারের ক্লাস?

আর সেই যে একদিন ট্রায়ে ফিরছিলাম, সত্যেন রায় উঠলেন? এক্সসঙ্গে ছোটো নিশ্বাস পড়ল অনুপমার, চিত্রার। সে সব দিন যেন কতদূরে চলে গেছে এরই মধ্যে। সুপ্রীতির চিঠিপত্র পাস? —কই আর? বিয়ে হয়ে গেলে আর বন্ধুরা!

কে সে কার মধ্যে কী দেখতে পায়!—ইভা গাঙ্গুলি তার পুরুষের গলা অনেকটা নামাল, কিন্তু তাও বেশ চড়া শোনাল অন্য দুজনের নিচু গলার পরে—সত্যেন রায়ের মতো ব্রিলিয়ান্ট ইয়ং ম্যান, তার আরো... আরো একটু— কথা শেষ না করে ইভা গাঙ্গুলি এখনো না-হোঁওয়া খাবার থেকে চোখ দিয়ে বাহতে লাগল। একটু দূর থেকে তার মুখের উপর পড়ল ছ-কোণ চশমা পরা তীক্ষ্ণ চোখ আর এতদিনের মধ্যে এই প্রথম তার মুখে সত্যেন রায় সম্বন্ধে সপ্রশংস কিছু শুনে চিত্রা-অনুপমা অবাক হয়ে তাকাল।

—তার আরো অ্যাম্বিশাস হওয়া উচিত ছিল, টকের খুরি থেকে আলগোছে জলপাইটি তুলে নিয়ে কথা শেষ করল ইভা—মামা তো বলেনই, কেন যে সত্যেন এখানে পড়ে আছে জানি না, কত ভাল চাকরি ওর হতে পারে। ঐ ওর দোষ, অ্যাম্বিশন নেই।

কিছু মনে করবেন না—যেঁষায়েঁষি টেবিলে যতটা সম্ভব এগিয়ে এল ছ-কোণ চশমা পরা রঙমাখা মুখটি—কিছু মনে করবেন না, আপনাদের কাউকে চিনি না, আপনাদের কথার মধ্যে কথা বলছি—আপনারা স্বাতীর বন্ধু তো? আমিও স্বাতীর বন্ধু—আর আমি এ কথা নিশ্চয়ই বলব যে স্বাতী অসাধারণ মেয়ে এবং সত্যেনবাবু অসাধারণ ভাগ্যবান। এই সোচ্চার বক্তৃতাটি শুনে ইভা গাঙ্গুলি সুদুর্ভাগ্যবান আর চিত্রা যেন এতে জোর পেল তার আন্তরিক একটি অভিমত ব্যক্ত করার—সত্যেনবাবু দেখতে কিন্তু ভাল না।

দেখতে ভাল কিনা জানি না, তবে খুব অ্যাট্রাক্টিভ—স্পষ্ট উচ্চারণে কথাটা বলে উঠল ছিপছিপে কালো একটি মেয়ে, মাত্রই একটি ঢাকাই শাড়ি পরা, এবার তাদের সঙ্গে নতুন ভরতি হওয়া। এখন আবার বেশি অ্যাট্রাক্টিভ হলে বিপদ—ইভা বাঁকা হাসল কালো মেয়েটির দিকে তাকিয়ে। আপনাদের কারো কিছু... আর কিছু?—শাশ্বতী তাদের কাছে এসে দাঁড়াল। উর্মিলা বলল—একটু জল, ছোড়দি। বিজনকে বিজুদা বললেও শাশ্বতীকে এর আগে ছোড়দি বলেনি সে, কিন্তু এখন বলল এইজন্য যাতে অন্যেরা বুঝতে পারে তার সঙ্গে এদের কত ঘনিষ্ঠতা। জল? এই যে—এদিক ওদিক তাকাতে শাশ্বতীর চোখাচোখি হল ডালিমের সঙ্গে, চোখ দিয়ে তাকে ডাকল। কর্তব্যপরায়ণ ডালিম বাঁধ্য হয়ে এগোল। এতক্ষণ ঘুরে ঘুরে অন্য সব টেবিলের অনেক খালি হওয়া গেলাসেই সে জল দিয়েছে, সময়ে এড়িয়ে গেছে এই একটি টেবিল। ওখানে যারা বসে আছে, তাদের দিকে দূর থেকে তাকাতে গেলেও চোখের পাতা যেন ভারি হয়ে নেমে আসে। কেন এ রকম? কেন মেয়েরা এত সুন্দর, আর কিছুতেই কেন তাদের কাছে যাওয়া যায় না? শক্ত, গম্ভীর মুখে প্রাণপণে লাল-না-হবার চেষ্টা করতে করতে, উর্মিলার গেলাসে জল ঢালতে লম্বা ডালিম নিচু হল। একটা গন্ধ/লাফিয়ে উঠল তার দিকে—কেমন... কেমন-কেমন... নতুন, অদ্ভুত, আশ্চর্য! আমাকে একটু জল দিন তো—স্পষ্ট গলায় কথাটা যে বলল, ডালিম তাকে আগেও একবার দেখেছিল, বড়োমাসির কীরকম ননদ যেন—আর খানিক আগে সিঁড়িতে একবার—ঠিক দ্যাখেনি, ঠিক দেখতে পায়নি, শুধু একটা রূপের আভা, রঙের ঝলক চমকে গিয়েছিল তার চোখের সামনে। টিপিটিপি কয়েক চেয়ার সরল ডালিম, আস্তিন-গুটোনো, ঘড়ি-বাঁধা ফর্সা হাতে জলের জগ উচু করল, আর ঠিক তখনই, একেবারে অকারণে রূপসীটি মুখ তুলল। নড়ে উঠল চাকার মতো কানবালা, ঠোঁটের উপর পাতলা গোঁফে আলো পড়ল। জগটা হঠাৎ ভারি হয়ে গেল ডালিমের হাতে, আর এমন বেয়াড়া হয়ে উঠল যে ডালিম গায়ের জোরে চেপে ধরতে-ধরতেও উপচে পড়ল জল, গেলাস ছাপিয়ে, টেবিলের

পাতলা কাগজ ভিজিয়ে, ঝরে পড়ল বলমলে বেনারসিতে, গড়িয়ে নামল মখমলের জুতোয়, পৌঁছল আশেপাশে ছোট্টো ছিটে হয়ে। মহাশ্বেতার কী-রকম-যেন ননদটি একবার নিচু হয়েই ক্ষিপ্ত মুখ তুলে কটমট করে তাকাল ডালিমের দিকে, তার রম্য-ঠোটার উপর পাতলা-সোনালি গোঁফ আরো স্পষ্ট দেখা গেল এবার। আশেপাশে হাসি বইল ঝিরঝির, শাস্ত্রীর মেজো-জা, যিনি শাণ্ডি়র সান্নিধ্য এড়াবার জন্য তরুণী-টেবিলেই বসেছিলেন—অবশ্য নিজেও তরুণী, কিন্তু বিবাহিত আর অবিবাহিত মেয়েতে তো জন্মান্তরের তফাৎ—শাস্ত্রীর মেজো-জা বেদরকারি ছোটো-ছোটো জলের টোকে হাসি চাপতে চেষ্টা করলেন আর টেবিলের একধারে বসে জলতরঙ্গ বাজনার মতো হেসে উঠল তিনটি ফুটফুটে পরী পাশাপাশি—একজন লাল, একজন সবুজ, অন্যজন কমলারঙের। মুখভরা সন্দেহ খেতে-খেতে গরম লেগেছে বলে খয়েরি শার্টের গলার বোতামটা খোলা, নিখিল হাসির শব্দে ঘাড় ফেরাল। হাসতে গিয়ে তিনজনেই পিছনদিকে হেলেছে, তাই তিনজনকেই এবার একটু স্পষ্ট দেখতে পেল নিখিল আর খুব স্পষ্ট দেখল ডালিমকে। ছিমছাম, সুশ্রী, গ্রে-স্ট্রাইপের দুরন্ত একটি শার্ট পরা, নিচু মাথায় চুলের ডেউ দেখিয়ে জলের জগ হাতে সেইখানটাতেই দাঁড়িয়ে। নিখিল কিছু জানল না, শুধু দেখতে পেল। তার মনে হল ডালিমের মুখও হাসি-হাসি। হঠাৎ ঈষার একটা ঝাপটা দিল তার মনে, কাঁচা-ছানার চমৎকার বরফিটা আটকে গেল গলায়।

কিরণ বক্সি জিগেস করল—তাহলে সত্যি জাপানিরা বোমা ফেলবে কলকাতায়? কাকে জিগেস করল নিজেই জানল না। ‘তাহলে’টাও অর্থহীন, কেননা এর আগে তার আরো দুটো সৃষ্ণতর, গুরুতর প্রশ্নের—কলকাতা ছেড়ে মিনিমম কত মাইল দূরে ঠিক নিশ্চিত বলা যায়? ডিরেক্ট হিট না হলে তো আর কিছু হবে না?—কোনো তরফ থেকে কোনো জবাব পায়নি। খেতে-খেতে নিজের ভাবনা ভেবেছে... আর স্বপ্নেরের গোঁ... তার আসন্ন, অনিশ্চিত, অনীতাহীন অবস্থা—চিরস্থায়ী কলকাতায় এই কল্পনাভীত অঘটন, আর তারই সুতো ধরে-ধরে এইমাত্র পাতে-পড়া পঁপড়ভাজা ভাঙতে গিয়ে এই আদি প্রগটাই আবার খুব জরুরি সুরে বেরিয়ে গেছে তার মুখ দিয়ে।

না, বোমা ফেলবে না—মসৃণ জবাব দিলেন লম্বা কোট পরা, লম্বা জুলপিওলী শৌখিন ভদ্রলোকটি—গোলগাল শহরটিকে আস্ত মুখে পুরবে—এইরকম, বলে মুখ উঁচু করে দু-আঙুলে ধরা রসগোল্লাটি একটু দূর থেকে আস্ত ফেলে দিলেন জিভের উপর—ফিফ্‌থ কলাম! সব ফিফ্‌থ কলাম! না, সব না, আমরা আছি। লড়ব, রুখব, জিতব আমরা... ছারপোকার মতো টিপে টিপে মারব এক-একটাকে—ভাবতে-ভাবতে হারীতের মুখ হিঁস হয়ে উঠল, আঙুলগুলি দ্রুত নড়তে লাগল থালার উপর, খামকা কিছু একটা তুলল থালা থেকে। থাওয়া তার হয়ে গিয়েছিল অনেকক্ষণ, আদ্যেক জিনিসই ছোঁয়নি—চোখে না দেখে চিবিয়ে ফেলল টোম্যাটো-চাটনির আদার কুচি—ওঃ ঝাল! আমাকে পঁপড় না...

জিভের ঝাঁঝে, মনের ঝালে মিশে কথাটা ব্রুদ্ধ শোনাল, উগ্র ধমকের মতো। হারীতের শিস-টানা শুনে মজুমদার তার মোলায়েমতম গলায় বলল—কোনটা ঝাল লাগল, মিস্টার নন্দী? উত্তরে হারীত একটু ভালোমানুষি হাসির চেষ্টা করল। একটু মিষ্টি খান, এই এটা বেশ উপায়ে মনে হচ্ছে—মজুমদার তার পরিষ্কার পাতে খুরিসুদ্ধ রসমালাই তুলল, একটু একটু পঁপড় ভেঙে তাই দিয়ে তুলে তুলে খেতে লাগল।—দেখছেন তো পঁপড়ের সুবিধে, চামচেতে চামচে.

খাওয়াতে খাওয়া। কিন্তু আপনি বুঝি পঁপড় ভালবাসেন না? বলে সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে হারীতের দিকে তাকাতে গিয়েই হঠাৎ তার মুখের ভাব বদলাল, চোখ সরে গেল, মাংসল ঠোঁট কমনীয় হল, চোখে ফুটল ঠাট্টার বদলে গভীরতা, চোখাচোখি হল সামনে দিয়ে চলে যাওয়া শাস্ত্রীর সঙ্গে।

থাকছেন তো?—ঘাড় হেলিয়ে কথাটা বলে শাস্ত্রী একটু তাড়াতাড়ি এগোল। নিচে এখন...এতক্ষণে স্বাতীকে সাজানো বোধহয়... কিন্তু মোড় নিয়ে হঠাৎ থামল বাবাকে দেখতে পেয়ে। দূরে, কোণে, যেখানে আলো একটু কম, সেখানে জলের জালা আর থালা-প্লাসের স্তুপের কাছে বাবা দাঁড়িয়ে আছেন হেমাঙ্গদার পাশে। শাস্ত্রী যেন অনেকক্ষণ পর বাবাকে দেখল, যেন অন্যরকম দেখল। বাবার মুখটা যেন ছোটো, মানুষটাই যেন ছোটো হয়ে গেছেন আগের চাইতে। রেখা-পড়া মুখ, কুঁকড়োনো চোখ, গলার চামড়া ঢিলে, গায়ে সেই ছাইরঙা আলোয়ানটি কেমন বিষণ্ণতার মতো জড়ানো—দূর থেকে, আর বাবা অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলেন বলে, সবই যেন খুব স্পষ্ট দেখল শাস্ত্রী। ফিরল—যদিও নিচে যাবার গরজ তার খুব... টেবিল-ফাঁকের উজ্জ্বল গলি দিয়ে, যুবকদের চকচকে চুল আর মেয়েদের রঙবাহার শাড়ি-গয়নার ধার ঘেঁষে, পঁপড় পরিবেশকদের বুড়ির ধাক্কা বাঁচিয়ে, দূরের কম আলোর কোণের দিকেই শাস্ত্রী যেতে লাগল। বাবাকে বলার কোনো জরুরি কথা যে তার মনে পড়ে গিয়েছিল তা নয়, বাবাকে বলার কিছু কথা যে তার ছিল তাও নয়, কিছু না, শুধু মনে হল একবার যাই।

* * * * *

আমাদের দেশের অসুবিধে হচ্ছে যে কোনো পলিটিক্যাল এডুকেশন নেই—আদার ঝাল সামলে নিয়ে হারীত তার গান্ধীর্ষে ফিরল। মজুমদার তখন জল খাচ্ছিল কিন্তু জলের প্লাস নামিয়েই কথা বলল না। নেবুতে কচলে নিয়ে প্লাশের বাকি জলে ডুবিয়ে হাত ধুল, বাঁ হাতে বিলিতি সুতির রুমাল বের করে ঘষে ঘষে হাত মুছল। সেটা দুমড়ে বাঁ পকেটে ফিরিয়ে ডান পকেটে থেকে বার করল মস্ত ময়ূরকণ্ঠী সিল্কের রুমাল, সেটি একবার ঠোঁটে বুলিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে বলল—সিল্কের রুমালের অসুবিধে এই যে তাতে ঠিকমতো হাত মোছা যায় না। সিল্কের বিয়ের নিমন্ত্রণে আসতে হলে আমি দুটো আনতে ভুলি না। হারীতের দিকে একচোখি তাকিয়ে তখনই আবার বলল—কিন্তু আপনার কথা খুব সত্যি। এই দেখুন না, আমি এটা পর্যন্ত জানতাম না যে জাপানিরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে জ্যান্ত গরু কেটে-কেটে খায়! কত শিখলাম আজ আপনার কাছে...। হারীতের নাকের বাঁশি দুটি একটু ফুলে-ফুলে উঠল, মজুমদারের রেশমি রুমাল তাতে উপহার দিল ল্যাভেন্ডারের গন্ধ, হারীত ফোঁশ করে নিশ্বাস ফেলল—না, রাগবে না, রাগলে কিছু হবে না। শত্রুপক্ষকেও কাজে লাগানো চাই, তবে তেঁা আপাতত লোকটার সঙ্গে জুটতে পারলে এই খেয়ে-টেয়ে আর হাঁটতে হয় না। হারীত অমায়িক তাকাল, যেন ঠাট্টা বোঝেনি কিংবা সেও যোগ দিচ্ছে ঠাট্টায়। আলগোছে বলল—আপনি এখন কোন দিকে?

আমি এখন? মজুমদার থামল... এখন বাড়ি? এখনই? আর কোথায়? কোথাও সুখ নেই—সুখ! যারা কিছুই পেল না, সুখ নামক বিখ্যাত বস্তুটা তো তাদেরই কনসোলেশন প্রাইজ! সে কী করবে সুখ দিয়ে?

যদি আপনার পথে পড়ে আমাকে নামিয়ে দিতে পারেন? হারীত খুলেই বলল কথাটা। মজুমদার ফিরে তাকাল—আপনি থাকছেন না? অবাক হওয়ার সুর লাগল তার গলায়।

আমি ভাবছিলাম... মানে, কথাটা হচ্ছে, এই বিয়ে ব্যাপারটা এত বোরিং!

কোনটা? অনুষ্ঠানটা না পরের অবস্থাটা?—কিছু মনে করবেন না, আপনি অভিজ্ঞ, আপনার কাছে জেনে নিচ্ছি। কথাটা কিরণ বস্ত্রির বিব্রী লাগল, সেই জুলপিওলা ভদ্রলোকটি আর আরো দুজন হাসলেন কথা শুনে। কিন্তু হারীত হাসতে গিয়ে থেমে গেল, যেন এইমাত্রই তার মনে পড়ল যে মজুমদার স্বাতীর জন্য সচেষ্টিত হয়েছিল। আর হঠাৎ, এমন যে চৌকশ ছেলে হারীত নন্দী, তারও একটি অপ্রতিভ লাগল যেন। আর সুখী শাম্বতী বাবার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল দৃশ্য দেখতে লাগল। ভাঙবার আগে আসর জমাট। আগের চেয়ে সব এখন, গলা আরো খোলা, অনেকের খাওয়া শেষ, তারা সোৎসাহে কথা ছিটোচ্ছে আশেপাশে, আর দূরে বসা চেনা লোকের দিকে হাত নাড়ছে। কেউ হেলান দিয়ে পান চিবোচ্ছে আরামে, কেউ টেবিলে হাত রেখে ওঠার জন্য তৈরি, অনেকে গ্লাসের জলে হাত ধুচ্ছে। মেয়েদের আর বুড়োদের টেবিলে মিষ্টি চলছে এখনো, ভূপেশদাদু চোদ্দটা রসগোল্লা খেলেন, সবাই খুব হাসল।

চমৎকার খাওয়া হয়েছে, বাবা! খুব ভাল খেয়েছে সবাই—শাম্বতী জুলজুলে মুখে বাবার দিকে তাকাল। না, না, আপনি থাকবেন না তা কি হয়?—মজুমদার নিচু গলায় বলল হারীতকে—কী মনে করবে সবাই? আর মিসেস নন্দী...। শাম্বতী বলল—বাবা, চলো এখন। সিঁড়িতে ভিড় আরম্ভ হলে আর—

আপনাকে থাকতেই হবে—মজুমদার হারীতকে পীড়াপীড়ি করল।

আপনি থাকছেন?

থাকব? মিসেস নন্দী বলে গেলেন না?... আঃ, ও-রকম তো সকলকেই বলে। আর বললেই থাকতে হবে? না... খুব হয়েছে, আর না। নন্দীকেই বা আমি কেন? আমি কে? আমার কী? আর এই হিন্দু বিবাহের পবিত্র পুতুলখেলা দেখার চাইতে আরো অনেক ভাল-ভাল ব্যাপার আছে কলকাতায় শীতের রাতে। এই লড়াইখাপা জগাইটাকে সেখানে ধরে নিয়ে গেলে কেমন হয়? মজুমদারের বেজায় হাসি পেল কথাটা ভেবে কিন্তু হাসি চেপে গম্ভীর গলায় হারীতের প্রশ্নের জবাব দিল—আমি? আপনি এখানকার যা আমি কি তা-ই? কথার শেষে বড়ো বড়ো দাঁত দেখিয়ে হাসল। হারীত মনে-মনে খুব তারিফ করল লোকটাকে। এরকম বলতে, এরকম হাসতে সেও পারত না।

*

মেয়ের সঙ্গে যেতে-যেতে রাজেনবাবু একবার বয়স্কদের টেবিলে দাঁড়ালেন... শোভা ভাবল নিচে গিয়েই পেটিকোটের দড়িটা টিলে করতে হবে...নিখিল ছাঁবল, ডালিমকে আর দেখছি না কেন...ইভা বলল—কলকাতার ক্রিসমাসটা এবার মাটি হল, তোমরা কোথায়...লীলামাসি ভাবলেন, উনি তো এখনই যেতে চাইবেন, কিন্তু আমি বিয়ে না দেখে... কুন্দদিদিমা একসঙ্গে চারটে পান মুখে পুরলেন... হারীত ভাবল, আচ্ছা তাহলে তামাশাটা...কিন্তু আমরা সব বসে আছি কার জন্য... শাম্বতী বাবার জামা ধরে টান দিল... তার মেজো-জা ভাবলেন বাবলাটা উঠে পড়েনি তো এতক্ষণে...উর্মিলা আরো ক-টি এলাচদানা মুখে দিল... আর মহাশ্বেতা ভাবল মেয়েটির চুল কি ঐরকমই না কলে কৌকড়ানো... আমরা ছুটি হলেই জামতাড়া, তারপর কী হয় না হয়—বলতে-বলতে ইভা উঠল... হারীত উঠল, প্রভাত-মেসো আর রেবতী-গিন্নি উঠালেন, সবাই একসঙ্গে উঠল স্ব-উ-উশ্ শব্দে... যুবকরা কেউ-কেউ উঠতে-উঠতেই সিগারেট

ধরাল, নিখিল ছুটল একতলায় পকেটের স্টেট-এক্সপ্রেসের নিরিবিলি সদগতি করতে... চেয়ার...
 ঠেলা... চলাফেরা শুরু হল... দাঁত-পড়া পিসেমশাই কাশলেন... একবাড়ির মেয়ে-পুরুষ
 পরস্পরকে ঝুঁজল... যাক, ট্রামের সময় আছে, এবার তাহলে...হেমঙ্গ সরে-সরে এল কম
 আলোর কোণ থেকে বিয়ে হবার দিকটায়... উর্মিলা তার মামাকে বলল... আর গৌফওলা মেয়েটি
 বলল মহাশ্বেতাকে... মহাশ্বেতা এগোল সিঁড়ির দিকে...আর তার পাশ দিয়ে বলকে চলে গেল
 লাল-কমলা-সবুজ তিনজন, হালকা নামল সিঁড়ি দিয়ে, হাসতে-হাসতে মাঝপথে ছাড়িয়ে গেল
 দাদুকে আর মাসিকে, লাফিয়ে নামল দোতলায়... দুম্।

* * * *

দোতলায় এসে শাস্বতী বলল—স্বামী যা উপহার পেয়েছে, সব তুমি দেখেছ বাবা?

সব দেখিনি—একটু যেন ভেবে রাজেনবাবু জবাব দিলেন।—দেখবে? এসো, এসো না
 একবার—শাস্বতী বাবাকে নিয়ে এল সেই ঘরে, যেখানে বর আসার সময় মহাশ্বেতা গুয়ে
 ছিল। টাটকা নতুন ড্রেসিং-টেবিলে বসে ডালিম খুব নিবিষ্ট হয়ে চলে চিরুনি টানছিল, ঘরে
 আওয়াজ পেয়ে তড়াক করে উঠল।

ডালিম এখানে?

আমি? এই... এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম—দেখলাম ঘরটায় কেউ নেই, তাই... অনেক সব জিনিস-
 টিনিস তো আছে, খালি ফেলে রাখা কি ঠিক?

মোটোও ঠিক না! ঠোট গোল করে, চোখ টান করে শাস্বতী বলল। আর সবাই তো প্রায়
 তেতলায়— গভীর ডালিম আরো যুক্তি দিল—আমি তাই...

তুই বুঝি কোনো কাজে না লেগে ছাড়বিই না? ডালিম ঘাড় পর্যন্ত রাঙল। তাকে অত লাল
 হতে দেখে শাস্বতীর মনে পড়ল সেই জ্বল ঢালার দুর্ঘটনা, যেটা অবশ্য, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ভুলে
 গিয়েছিল সে—তবে এক কাজ কর, নিচে তোর নতুন মেসোকে একবার দেখে আয়।

না সেজোমাসি, মেসো না।

আচ্ছা, তবে তোর সত্যেনদাকেই—

নিশ্চয়ই! ডালিম সৈনিকের মতো সোজা হল—কিছু বলতে হবে?

এই—একটু কথা-টুখা বলবি আরকি। একাই হয়তো আছে এতক্ষণ।

আচ্ছা— নিস্তেজ শোনাও ডালিমের গলা। এর চেয়ে সেজোমাসি তাকে বললেন না কেন এই
 আলমারিটা ঘাড়ে করে নিচে নিয়ে যেতে? সত্যেনদার সঙ্গে কী কথা বলবে সে? প্রথমে কী
 বলবে? না কি ঐ উনিই আগে কিছু বলবেন? চিন্তিত ডালিম এগোল, দরজার ধারে থামল।
 তেতলার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। মুখ ফিরিয়ে হালকা গলায় বলল—সেজোমাসি, ঐ তো নেমে
 আসছে সব...আমি তাহলে...কী বলো? সেজোমাসি জবাব দিলেন না, মনে হল না শুনতে
 পেয়েছেন। তাঁর আঁচলঝরা পিঠের দিকে একবার তাকিয়ে ডালিম সরে পড়ল। —এই টিঙ-
 শাড়িটা দিয়েছেন লীলামাসি... সচ্চা রূপো বাবা—থরে থরে শাড়ি সাজানো আলনার কাছে
 দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে দ্রষ্টব্যগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে শাস্বতী বলতে লাগল—আর তপনদা এই ফ্রেঞ্চ
 শিফন... স্কাই-ব্লু... রান্তিরে রংটা ঠিক... পরেশ কাকা এই মেরুন-রঙের মুর্শিদাবাদ সিল্ক... আর
 এই, এই ঢাকাই জামদানিটা... এটা শোভাদি দিয়েছে। শেষের কথাটায় শাস্বতীর গলা নিচু হল,
 একটু লজ্জিত যেন, যেন বলতে চায় শোভা তাঁর অবস্থার পক্ষে খুব দিয়েছে। বেশ জামদানিটা—

রাজেনবাবু মেয়ের দিকে তাকালেন একবার। হ্যাঁ, খুব ভাল—একটু যেন বেশি উৎসাহ শাস্বতীর গলায়—ভিটের শাড়ি, টাকা-বারো কি দাম হবে না?... আর জংলি শাড়িটা দ্যাখো... এ-রকম দুটো হয়ে গেল... আর জানো বাবা, শোভনা-শাড়ি... ঐ যে নতুন একরকম ডুরে বেরিয়েছে আজকাল—সে রকম পাঁচখানা পেয়েছে।

আচ্ছা আমি—রাজেনবাবু নড়তেই শাস্বতী তাঁকে কাঁধের কাছে ধরে বলল—এদিকে... এদিকে একটু দেখে যাও বাবা—নিয়ে এল ড্রেসিং-টেবিলের ধারে।—ফুলদানি দুটো বেশ নতুন ধরনের, না বাবা?... আর এই গালার কাজ-করা ছোটো বাস্কাটা কী মিষ্টি... আর এই জয়পুরি মিনেরটা! আর দ্যাখো—শাস্বতী দেবরাজ ধরে টান দিল—এই কলমটা, নিউ মডেল লেডিজ পার্কার, স্বাতীর বন্ধুরা মিলে দিয়েছে... আর দেখেছ, কণ্ডুলো সিঁদুরকৌটো... আমার এই হাতির দাঁতেরটাই সবচেয়ে ভাল লাগে...কিন্তু কী-বা হবে এত দিয়ে!...আর এই রূপোর ফ্রেমের আয়নাটা? শাস্বতী এক দেবরাজ বন্ধ করে আর এক দেবরাজ খুলল... তারপর আরো একটা। কিছু এফটা হুঁলো, কোনো একটা তুলে দেখল আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেই নিজের উৎসাহে অনর্গল বলতে লাগল—টয়লেট সেট...টিংকেট বস্কা...কাস্মিরি কাজ...।

কই গো, এ-ঘরে কেউ আছে-টাছে নাকি?—দরজার কাছে গিম্মি-গলার ভারি আওয়াজ হল। রাজেনবাবু তক্ষুনি সরলেন মেয়ের পাশ থেকে। দেখি, মেয়ে কী পেল-টেল—বলতে বলতে রেবতী-গিম্মি ঘরে এলেন, রাজেনবাবুকে দেখামাত্র ঘোমটা টেনে চওড়া বপুতে ঈষৎ জড়োসড়ো হলেন। আসুন—শাস্বতী হেসে এগিয়ে এল, রাজেনবাবু দেখাল ঘেঁষে দাঁড়ালেন। ঘরে এলেন রেবতী-গিম্মি আর তাঁর পিছনে আরো দুজন, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ প্রায় শেষ হল। রাজেনবাবু বেরিয়ে যেতে-যেতে শুনলেন—তোমরা দিদিরা কে কী দিলে সেটা দেখি আগে...

স্বাতী যে-ঘরে আছে সেদিকে রাজেনবাবু তাকালেন না, কোনোদিকেই তাকালেন না। সোজা এলেন সামনের দিকের বারান্দায়, যার রেলিঙে ঝুঁকে সারি-সারি মেয়েরা বর আসা দেখেছিল। এসেই ধমকালেন। বিজু পড়ে আছে তক্তাপোশে হাত ছড়িয়ে উপুড় হয়ে, কাঁধ দুটো ফুলে ফুলে উঠছে, ঘাড় থেকে কোমর পর্যন্ত কাঁপছে, বেড়ালের ফোঁশফোঁশের মতো কেমন একটা বিস্তীর্ণ আওয়াজের ঝাপটা দিচ্ছে এক-একবার, আর তার মাথার কাছে ঝুঁকে আছে স্বিতা, গায়ে হাত বুলিয়ে আস্তে কী বলছে। রাজেনবাবু কাছে গিয়ে বললেন—কী হয়েছে?

আর বলো কেন!—স্বেতার গলা ফিশফিশে শোনাল—বিজুটা এমন....। রাজেনবাবুর মুখ কঠোর হল, বিরক্তির রেখা ফুটল কপালে। স্বেতা ডাকল—বিজু, এই... লক্ষ্মী তো, ওঠ... আর সময় নেই।—আর কেঁদেহ্-কেঁদে কী হবেহ্—এইহ্—সংসারের এইহ্ নিয়ম! রাজেনবাবু ফিরে তাকালেন। তাড়াতাড়ি বারান্দার অন্য দিকে এসে বললেন—কী রে বেলি, খুব কষ্ট? একেবারে ফিকে-হয়ে-যাওয়া অস্পষ্ট বয়সের একটি বিধবা মেয়ে বাধো-বাধো গলায় কথা বলল—টান উঠলে ফাঁকায় ভাল থাকেন, তাই এই বারান্দায়—

বেশ করেছ, বেশ করেছ—তা আর কিছু, কোনো ওষুধ-টষুধ—একটু যদি আরাম হয় কিছুতে—।

নাহ্—কিছু নাহ্—কিছুতে কিছু হয় নাহ্—আমিহ্—আমি বিজনকে বলছিলাহম...

আর কথা বোলো না দাদা—বলে বিধবা মেয়েটি হাঁটু ভেঙে বসে তালপাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগল। কিন্তু হাঁপানিতে ধুকতে-ধুকতেও নেপালবাবু কথা ছাড়লেন না—বলছিলাম যে এমন

দিনেহ্—এমন দিনে কিহ্—এমন দিনে কি কাঁদতে আছেহ্—আর কাঁদবাহ্...

রাজেনবাবু কথাগুলি ভাল শুনতে পেলেন না, এমন মন দিয়ে তিনি মানুষটাকে দেখছিলেন। মেঝেতে বিছানো কম্বলে নেপালবাবু বসে আছেন উব-হাঁটু হয়ে, পাশে পিকদানি, কোমরের কাছে কে-জানে-কতকালের বালাপোশাটি। চোঙের মতো হাঁটু দুটোর উপর দিয়ে এসে দড়ির মতো হাত দুটো ঝুলছে। ধসা মাটিতে এক আধটা ঘাসের মতো গর্তগালের ফোকরে-ফোকরে দাড়ির কুচি। আর ঘোলা দুটো চোখ যেন তাদের উপরওলা কপালের দিকে তাকাতে সাংঘাতিক সচেষ্টি—রক্তমাংস সব চেটে-পুটে খেয়ে গেছে, তবু জীবন্ত। আর ওরই মধ্যে গলাটা... চামড়ার দেয়ালে ভাগ করা কামরায় মোটা-মোটা শিরা আর পিণ্ডের মতো একটা কষ্টমণি নিয়ে গলাটা যেন নিশ্বাস নেবার কোনো আশ্চর্য যন্ত্রের মতো আলাদা করে জীবন্ত। কাঁদবার হয়েছে কীহ্—এ তো সুখের—কত সুখের—আমিহ্—আমি যখন—যখন সেইহ্—সেইহ্— নেপালবাবু হয় আর বলতে পারলেন না, নয় কী বলছিলেন ভুলে গেলেন। রাজেনবাবু সেখানে আর দাঁড়ালেন না। তাঁর মনে পড়ল যে ইনিও একদিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন—একটিই মেয়ে, একমাত্র সন্তান তাঁর। মেয়েটা মরে গেল বিয়ের পরে দু-বছর না পুরোতে, নাতনিকে এনে রাখলেন দাদা-দিদি, তারপর তারও বিয়ে দিলেন, বিধবা হয়ে ফিরে এল সে, আর এখন সেই নাতনিকে নিয়েই সাতগাছিতে বেঁচে আছেন ছত্রিশ টাকা পেনশন নিয়ে এই জীর্ণ বিপল্লীক। আর ইনি মারা গেলে বেলিটার...কিন্তু ভাবনা কোথাও এসে থামেই।

পুরুতঠাকুর উপরে গেছেন, সত্যেনকে ডাকতে যাচ্ছে, বিজু শিগগির—বড়দির এই কথায় বিজু বয়লারের স্টিমের মতো আওয়াজ ছাড়ল। রাজেনবাবুর উপরের ঠোঁট নিচেরটির উপর চেপে বসলো। কপাল এমন ঘন হয়ে কুঁচকালো যে চোখ দুটি ছোট দেখাল। ছেলের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে ডাকলেন—বিজু, ওঠ। বিজুর সমস্ত শরীর কাতরিয়ে উঠল একবার, তক্তার কর্কশ ধারটা মুঠোয় আঁকড়ে স্তব্ধ হল। ওঠ—ছোটো, ছোটো আওয়াজ হল শ্বেতার। কী? ব্যাপার কী? বিজুর পায়ের দিকটায় দাঁড়াল এসে মহাশ্বেতা-সরস্বতী। শ্বেতা বলল—কিছু না, ওদিকে কন্দুর?

প্রায় তৈরি, বিজু উঠছে না কেন?

এই উঠবে এবার, একটু শুয়ে নিল—যা খাটুনি যাচ্ছে!

ছোট দু-বোন বিশ্বাস করেছিল দিদির কথা, কিন্তু বিজু উঠে বসতে ব্যাপার বুঝল। চোখ দুটো এমন ফুলেছে যে চেনা যায় না। দুবোন চোখাচোখি করল, সরস্বতী ঠোঁট বাঁকাল আর মহাশ্বেতার ঠোঁটে সেই ভঙ্গিটি প্রতিফলিত হতে-হতে হঠাৎ তার মুখের ভাবই বদলে গেল, আর সেই বদলানো ভাবটা প্রতিফলিত হল সরস্বতীর মুখে। দুজনেই মুখ ফিরিয়ে নিল।

বিজুহ্ন—যাওহ্—তোমাহ্ৰ কাজ—কত সুখেহ্—কতহ্—কতহ্—খ্খ্খ্খ্! কোনো পুরোনো কিন্তু শক্ত জিনিসের ফেটে যাওয়ার মতো আওয়াজ হল। নেপালবাবু তাঁর ভিতরকার অফুরন্ত শ্লেথার একটি টুকরো টেনে তুললেন, মাথা ঢলে পড়ল, বিধবা বেলি পিকদানি ধরল মুখের সামনে। সরস্বতী বাঁকা চোখে একবার সেদিকে তাকাল, তারপর বাবার কাছে এসে বলল—বাবা, স্বাতীকে একবার দেখবে চলো—সাজানো বোধহয় ভালই হয়েছে। ওতে তার নিজের কারিগরি অনেকটা বলে বিনয় করে বলল।

ওঠ না!—হঠাৎ যেন ধমক দিলেন রাজেনবাবু, অস্বাভাবিক শোনালা তাঁর গলা। কুঁকড়ে বসে

থাকা বিজু বাবার দিকে মুখ তুলল, তার ঠোট নড়ল, কিছু বলতে গেল বোধহয়, কিন্তু দুটো নাকই বন্ধ আর শস্যে একদম আওয়াজ নেই। মুখ দিয়ে জোরে একবার নিশ্বাস ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল, কারো দিকে তাকাল না। বাবা স্বাতীকে একবার—। কিন্তু এবারেও সরস্বতীর কথাটা বাবার মনে কানেই গেল না।

এখানে বিছানা করে দিক ভাল করে—একটু ব্যস্তভাবেই তিনি বলতে লাগলেন—বালিশ দিয়ে উঁচু করে দিক, আর নেপালবাবুকে এখানে... অসুস্থ মানুষ... কী যে সব— ‘সব’ মানে কারা, আর নির্দেশগুলোই বা কাকে দিচ্ছেন তা ঠিক বোঝা গেল না। একটি শীর্ণ হাত নিষেধ জানিয়ে ন্যাতার মতো নড়ল, আর বেলি মৃদুস্বরে বলল—এ-ই বেশ আছে, আপনারা মিছিমিছি...। না—না—তা কি হয়, হেলান দিয়ে উঁচু করে বসাতে হয়—আর একটু নিরিবিলা—কেমন অসহায়ের মতো রাজেনবাবু এদিক-ওদিক তাকালেন। সরস্বতী সঙ্কমভাবে বলল—আমি দেখছি। লোক ডেকে আনল সে। তারা তত্তাপোশে পুরু করে বিছানা পাতল, গোটাপাঁচেক বালিশ দিল, বেলির সঙ্গে ধরাধরি করে রাজেনবাবু রোগীকে এনে বসিয়ে দিলেন, পিঠে ঘাড়ে বালিশগুলি অকারণেই নেড়েচেড়ে বললেন—কেমন? ঠিক আছে? এখন ঠিক আছে? বেলি বিব্রত হয়ে বলল—আপনি কেন... আমি... আমি দিচ্ছি সব ঠিক করে।

এই যে রামের মা—তোমাকে এখন আর কিছু করতে হবে না—এখানে বসে থাকো, যদি কিছু লাগে-টাগে—

কিছু লাগবে না রাজেনদাদু... মিছিমিছি... এমনতেই কত—মোছা-মোছা বেলির কুণ্ঠিত কথা এর বেশি এগোল না, ঝলমলে দুই বোনের দিকে আদ্রেক পিঠ ফিরিয়ে দাদার গা ঘেঁষে এমন করে সে বসল যে দেখা যায় কি না যায়। নেপালবাবু আর কথা বলার চেষ্টা করলেন না, কী হচ্ছে তাও যেন বুঝলেন না। তাঁর গোল-গোল ঘোলা চোখ উপরদিকে তাকিয়ে কেমন স্থির হল, ছেঁড়া জুতোর হাঁ-করা চামড়ার মতো ঠোট দুটো খুলে থাকল, মুখের কালো গর্তটা ভরে ভরে হাঁপরের মতো তিনি হাওয়া টানতে লাগলেন... হাওয়া, শুধু হাওয়া...নিশ্বাস। হয়তো নরম বিছানায় পাঁচ বালিশে হেলান দিয়ে একটু আরাম তাঁর হয়েছিল কিংবা হয়তো অসহায়ের মতো ডুবে ছিলেন সেই নির্বোধ উদাসীনতায়, যা রোগযন্ত্রণার সবশেষের আসান। মহাশ্বেতা সরস্বতী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্যটি দেখল, সরস্বতী চেষ্টা করল বাবাকে চোখে ডাকতে, কিন্তু চোখে চোখ ফেলতেই পারল না। ফিরে যেতে-যেতে ফিশফিশিয়ে বলল—বাবার সবটাই বাড়াবাড়ি!

বুড়ো এখানেই মরবে-টরবে না তো?—একটু উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করল মহাশ্বেতা।

আরে না! হাঁপানিতে কেউ মরে না।—এ কথা শুনে মহাশ্বেতার চিন্তা হল নেপালপিসে তাহলে কীসে মরবেন। কিন্তু সেটা প্রকাশ না করে বলল—এঁকে বিজু না আনলেই পারত।

বিজুর বুদ্ধি!—সরস্বতী থামল কনে-সাজানো-ঘরের দরজায়। নেপালবাবু একটি পা টান করলেন, আর একটা উঁচু হয়েই থাকল, বেলি আস্তে সেটিও টান করে বালাপোশে ঢাকল, আর রাজেনবাবু দাঁড়িয়ে থাকলেন সেখানেই। তাঁর মুখে চিন্তা... প্রায় দুশ্চিন্তা। কী যেন একটা জরুরি কথা তিনি ভুলে গেছেন, কিছু একটা তাঁর করা উচিত... এখনই করা উচিত, কিন্তু সেটা যে কী তা কিছুতেই মনে পড়ছে না। বেলির দিকে, নেপালবাবুর দিকে চোখ ফেললেন, হঠাৎ মনে হল—এরা কে? এদিক-ওদিকে তাকিয়ে আর কাউকে দেখতে পেলেন না—কোথায়

সব? রাজেনবাবু বারান্দা পার হলেন, মুখোমুখি ঘরগুলির মাঝখানের গলি দিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ ডাক শুনলেন—বাবা! কিছু না, মেয়েলি গলায় ঐ ডাক জীবনে লক্ষবার তিনি শুনেছেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁর যেন দম বন্ধ হল। একটু পরে বুঝলেন, পরদা-ঢাকা দরজার সামনে শাশ্বতী। বাবা! শাশ্বতী হাসল—তুমি যেন আমাদের চেনেই না আজকাল? রাজেনবাবু কথা বললেন না, হাসির কোনো চেষ্টা করলেন না।—এসো একটু এ-ঘরে, শাশ্বতী নিচে যাচ্ছিল বিয়ে আরম্ভ হবার আগে সত্যনকে আর একবার দেখতে, বাবাকে দেখে থেমেছিল, বাবাকে নিয়ে ফিরল। ভিড় নেই এখন, ঘরের চারিদিকটা ফাঁকা, কিন্তু মাঝের গোল দলটি আগের চেয়ে বড়ো আর আগের চেয়ে নীরব, নিবিষ্ট। সকলেই যেন মন দিয়ে একজনকে দেখছে, কেউ বেশি কিছু বলছে না। বাবা এসো!—শাশ্বতী ঘরে এসে আবার ডাকল—দ্যাখো, কী সুন্দর দেখাচ্ছে স্বাতীকে! তার গলা পেয়ে কেউ-কেউ ফিরে তাকাল। সরস্বতী এগিয়ে এল, উষাবৌদি মাথায় কাপড় টানলেন, বড়োপিসির মুখটা একটু করুণ হল। গোল-দাঁড়ানো মেয়েরা দুটো অংশে ভাগ হয়ে জায়গা করে দিল। শাশ্বতী আর সরস্বতী বাবাকে নিয়ে এল ঠিক মাঝখানটায়... মুখোমুখি। স্বাতী...সাদা সুন্দর মেঝেতে সুন্দর সাদা চিকনপাটির উপর স্বাতী দাঁড়ানো। পায়ের পাতা সোনালি পাড়ে ঢাকা। শুধু আঙুলের ডগাটুকু ফুটে আছে। মাথার চুলও সোনালি পাড়ে ঢাকা, শুধু সর্ষির সরু রেখাটি যেন নতুন ফুটে আছে। স্বাতী! সোনার তারা-জ্বলা শাড়ি লাল উঠে গেছে ঝিলিক তুলে-তুলে, আবায় নেমেছে সোনালি, কালো চুলের উপর দিয়ে সাঁকোর মতো—তরুণ ঝিনুকের মতো যে কান দুটি এইমাত্র পান্নার দুলে ভারি হল—তার পাশ দিয়ে অন্তরঙ্গ পদ্ম-লাল জামার কাঁধে উজ্জ্বল পান্না-চুনি মেশানো নেকলেসটিকে পাশ কাটানো, এখনকার মতো স্বাধীন-শক্তিহীন বাহুটির কম-ফর্সা বাইরের দিকটাকে ছুঁয়ে-না-ছুঁয়ে পড়ন্ত...স্বাতী! তার কপালে যেখানে একটি না একটি চুলের গোছা প্রায় সব সময় অব্যাহা লোটাত, টান করে বাঁধা চুলের তলায় সেই কপালটি এখন নতুন চাঁদের মতো মসৃণ আর চাঁদের গায়ে দাগের মতো ফোঁটা-ফোঁটা সাদা চন্দনে সাজানো। আর সেই চুলের গোছা তুলে দিতে যে হাত বারেবারেই উঁচু হত, সে হাত দুটি এখন বেকার ঝুলছে পাশে। বাঁ হাতের আংটি-পরা আঙুলটি বোধহয় অনভ্যাসে বেঁকে আছে, গোলাপি নখটি বোধহয় না জেনেই সোনালি পাড়টিতে পড়েছে। স্বাতী... তার মুখ...সুখদুঃখের ব্যস্ত সেই রঙ্গমঞ্চ—এতদিন পরে একটু যেন বিরতি পেলে। আলো জ্বলে আছে, দৃশ্যপট সাজানো কিন্তু কুশীলব নেই। ফাঁকা, চুপ, চোখের উপর ভাষা হয়ে নেমেছে একটু ফোলা-ফোলা গোলাপি দুটি পাতা। ভরা-ভরা সজল ঠোট দুটি বোজা, নাকের একটি বাঁশির চোখে-না-পড়ার মতো ঈষৎ স্পন্দন ছাড়া সমস্ত মুখে আর ভাষা নেই। রাজেনবাবু এসে দাঁড়াবার পর মিনিটখানেক স্তব্ধ থাকল ঘর, তারপর নতুন করে গুঞ্জন উঠল—সুন্দর...কী সুন্দর দেখাচ্ছে...সুন্দরী সত্যি।

শাশ্বতী নিচু গলায় বলল—শাড়িটায় খুব মানিয়েছে, না বাবা? কিন্তু রাজেনবাবু শাড়ি দেখছিলেন না। সোনালি-লাল উজ্জ্বল সেই শাড়ি, পদ্ম-লাল জামা, পান্নার দুল আর পান্না-চুনির হার, হাতের সাদা শাঁখার পাশে ঝকঝকে নতুন চুড়ি আর করুণ—এসব কিছুই তাঁর চোখে পড়ছিল না। যাকে ঘিরে এত লোক এখন দাঁড়িয়ে, এত জোড়া চোখ দূর দিকে এখন নিবিষ্ট, সেই মানুষকে যেন চোখেই দেখছিলেন না তিনি—কিন্তু তাকেই দেখছিলেন...রাজেনবাবু স্বাতীকেই দেখছিলেন—ফ্রক-পরা ছোট্টো, দূরন্ত, অস্থির স্বাতীকে... ছোড়দির সঙ্গে ছলছুল ঝগড়া-করা...

মা-র কাছে ধমক খেয়ে কেঁদে-কেঁদে ঘুমিয়ে পড়া... কৌকড়া মাথাটা বাবার কাঁধে রেখে না-খেয়ে ঘুমিয়ে পড়া। হঠাৎ রাজেনবাবুর চোখের সামনে কুরাশা নামল... মস্ত ঘর, আলো, লোকজন মিলিয়ে গেল। স্বাতীকে শাস্ত করে ঘুম পাড়িয়ে এইমাত্র শুইয়ে দিলেন তার মা-র কাছে, আর বিছানায় হাঁটু উঁচু করে বসে রোগা মুখের বড়ো বড়ো চোখে ঘুমন্ত মেয়েকে দেখতে লাগলেন মা। রাজেনবাবু মেয়েকে ভুলে মা-কেই দেখতে লাগলেন... মুখ তুলবে... কিছু বলবে এখনই। কিন্তু রোগা মুখের ক্লান্ত চোখ দুটি নড়ল না... শুধু চুপ করে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকল।

শোনো—

রাজেনবাবু কেঁপে উঠলেন। কে কথা বলল? বাবার কানের কাছে সরস্বতী বলল—গয়না সব পরাইনি, বাবা। জবড়জং হয়ে যায়। রাজেনবাবু নিশ্বাস ছাড়লেন। আবার সব স্পষ্ট হল, বাস্তব হল। দেখলেন চোখের সামনে উজ্জ্বল, সুন্দরী, সুদূর স্বাতীকে। কবে বড়ো হল? এত বড়ো হল কবে? রাজেনবাবু অবাক হলেন।

স্বাতী, একটু তাকাও তো এদিকে— একটু দূরে দাঁড়িয়ে উষাবৌদি সূক্ষ্ম চোখে সন্দেহ করছিলেন যে সিঁথির ঠিক পাশেই একটা ছোট্টো চুল এর মধ্যেই দলছুট, তাই আবার বললেন—দেখি একটু... আহা, মুখটা আবার নামালে কেন? কিন্তু স্বাতীর মুখ আরো নিচু হল। মনে মনে বলল— বাবা... আজ সারাদিন বাবাকে সে চোখে দ্যাখেনি। আজ কতদিন বাবা তার মুখের দিকে তাকান না—তাকাতে পারেন না। সেও যায় না বাবার কাছে, কাছে গিয়ে দাঁড়ায় না, কিছু বলে না। আবার মনে মনে বলল—বাবা...বাবার আলোয়ানের ফ্যাকাশে রঙ দেখল... জামার হাতা... একটি হাত... তারপর সে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই হাতটি নিচু হল, তারপর দেখল ধূতির ভাঁজ, কোঁচা, চটি। বাবার মুখের দিকে তাকাতে পারল না স্বাতী, মেয়ে হয়ে জন্মাবার লজ্জায়, গৌরবে, দায়িত্বে তার চোখ আরো নিচু হল।

* * *

নিচে তখন অতিথিরা চলে যাচ্ছে, রাস্তা পর্বস্ত সরগরম। বিদায়-ব্যাপারে খামকা দেহিঁ করে বেশির ভাগ চটপট ছুটেছে ট্রাম ধরতে। ছোটো-বড়ো দলে ভাগ হয়ে, ছুঁচোলো আর ভারি জুতোর শব্দে, সরু-মোটা গলার কথায়, আলো-নেবানো ডর-লাগা কলকাতার শীতরাতের চুপচাপ রাস্তায় হঠাৎ একটা চঞ্চলতার ঢেউ তুলেছে তারা। এদিকে দূরে দাঁড়ানো খাননশেক গাড়ি ঘন-ঘন শিঙে ফুঁকতে-ফুঁকতে পিছু হটে-হটে একে-একে বিয়েগাড়ির ফটকে দাঁড়াচ্ছে। কেউ রাস্তায় এসে ট্যান্ডি খুঁজছে কি রিকশা নিচ্ছে। কেউ বলেছে—হেঁটেই যাই চলো, আর পথ-চলা কেউ-কেউ ভিড় বাঁচাতে থামছে, বাড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে বোমাবিরত চিঙে ভাবছে—বাঃ, আবার বিয়ে! ফটকের কাছে দু-জন লোক পিছু-হটা গাড়ির তদারকে ব্যস্ত, আর বারান্দায় যেখান দিয়ে সবাই বেরোচ্ছে তার দুদিকে ইরু আর গীতি রূপোর থালায় পান নিয়ে দাঁড়ানো— যদি যাবার সময় আর একটার ইচ্ছে হয় কারো। আর সিঁড়ির প্রথম ধাপটায় হেমাঙ্গ দাঁড়িয়ে অতিথিদের বিদায় দিচ্ছে। বয়স বুঝে, সম্পর্ক বুঝে, চেনার মাত্রা বুঝে প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গে একটি করে কথা বলছে সে, আর যারা একেবারে অচেনা, তাদের বলছে— আচ্ছা, নমস্কার। তার এই অভিবাদন অনেকে লক্ষ্যই করছে না। নিজেদের মধ্যে কথা বলতে-বলতে কিংবা ট্রাম পাবে কিনা ভাবতে-ভাবতে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হেমাঙ্গ যখনই আবার

অচেনা কাউকে দেখছে, তেমনি মাথা হেলিয়ে, ঠিক তেমনি করেই আবার বলছে—আচ্ছা, নমস্কার। ভিড় যখন অনেক হালকা, থলথলে গিল্লি আর ভর-বয়সী কুমারী দুটি মেয়েকে নিয়ে রেবতীবাবু বেরোলেন। হেমাঙ্গ একে আগে একবারই একটুখানি দেখেছিল, কিন্তু দেখেই চিনল, মানুষের মুখ তার খুব মনে থাকে। হাতে হাত ঘষে বলল—আপনারা এখনই—

হ্যাঁ, যাই—হেমাঙ্গর কথাটা শেষ হবার আগেই রেবতীবাবু জবাব দিলেন—থাকবার তো ইচ্ছে ছিল খুব—এঁদের তো খুবই, স্ত্রীর দিকে মাথা নোয়ালেন তিনি, আবার মহিলাটি যেন এই চপলতায় স্কুন্ধ হয়ে শক্ত মুখ ফিরিয়ে নিলেন—তবে আমার শরীরটা তেমন, আবার না ঠান্ডা-ফান্ডা লেগে...। হেমাঙ্গ তাড়াতাড়ি বলল—তাহলে আপনাকে একটা গাড়ি—

কিছু না! রেবতীবাবু হাত তুললেন—আরে এইটুকু তো পথ, এর জন্য আবার... আচ্ছা, খুব ভাল হল, চমৎকার। বলতে বলতে সপরিবারে সিঁড়ি ক-টা নামলেন। এর পরে দেখা গেল ভাগনির সঙ্গে মজুমদারকে। তাকে দেখে হেমাঙ্গর মুখ প্রথমে হাসি-হাসি হল, তারপর নিরাশ হল—আপনিও যাচ্ছেন?

আপনিও!... কেন, আমি কি বিশেষ কেউ? মজুমদার সংক্ষেপে বলল—যাচ্ছি।

আমরা খুব আশা করেছিলাম আপনি—উর্মিলার দিকে তাকিয়ে হেমাঙ্গ তাড়াতাড়ি নিজেকে শোধরাল—আপনারা থাকবেন।

খুব বেশি আশা করাটা কিছু না—মজুমদার হাসল না, এমন করে কথাটা বলল যে প্রায় রুঢ় শোনাল। তারপরেই যেন নিজেই সেটা বুঝে চওড়া হেসে আবার বলল—আজ চলি, আবার দেখা হবে। আপনি তো এখানেই—এই বাড়িতেই? উর্মিলা এই সুযোগে তার মনের ইচ্ছাটা আর একবার ব্যক্ত করল—একটু থাকি না, মামা। মজুমদারের মুখের ভাব মুহূর্তে বদলে গেল—কঠোর চোখে ভাগনির দিকে তাকাল। মামার এই দৃষ্টি তার চেনা—এটার মানে হচ্ছে যে আমার কথামত ঠিক-ঠিক চল তো সব পাবে, আর তা যদি তোমার পছন্দ না হয় তোমাকে অবিলম্বে ফেরৎ পাঠাচ্ছি তোমার মার কাছে নাথুরামপুরে। উর্মিলা কঁকড়ে চুপ করল। আবার হাসিমুখে মজুমদার হেমাঙ্গকে বলল—আপনাদের যদি অসুবিধে না হয়, পশ্চিয়াকটা নিয়ে যাই? মানে, অস্টিনটা আবার ড্রাইভার ফিরিয়ে নিয়ে গেল কিনা! এমন করে বলল যেন ড্রাইভার নিজের বুদ্ধিতেই এটা করেছে, কর্তার কোনো হাত ছিল না। হেমাঙ্গ মনে-মনে হাসল—ছেলেমানুষ, নতুন গাড়ি কিনেছে—নিশ্চয়ই, আপনার গাড়ি আপনি দিয়ে যাবেন তাতে আর কথা কী? আর আদ্যদের কাজ তো সব হয়েই গেছে। সত্যি, কত উপকার করলেন আপনি আমাদের! হেমাঙ্গ বুঝল যে মজুমদার এটা আরো একবার শুনতে চাচ্ছে, সেইজন্য শেষের কথাটা বলল। মজুমদারের শুনতে ভাল লাগল, কিন্তু সেই সঙ্গে চিড়িক করে উঠল মাথার মধ্যে রাগ। উপকার! পরোপকার কি তার পেশা? মনে পড়ল হারীত নন্দী তার সঙ্গেই উপর থেকে নামছিল—উঃ, বকতেও পারে লোকটা—দোতলায় আসতেই সেই লাল-মালা-গলায় বোন কোথেকে বেরিয়ে এসে বলল—নন্দী, যাচ্ছে কোথায়? আরে শোনো—এদিকে এসো! মুহূর্তে যেন ঘোড়ার মতো মানুষটাকে ভেড়া বানিয়ে টেনে নিয়ে গেল, আর এরই মধ্যে তার দিকে একবার মাথা হেগিয়ে, মিলুর দিকে একটু হাসল। নন্দীর হাত থেকে এতক্ষণে রেহাই পেয়ে তখন মজুমদার হাঁফ ছেড়েছিল, কিন্তু মাত্রই কয়েক মিনিট পরে ঘটনাটা মনে করে অপমান লাগল তার। নিজের মনে যতই বুঝল যে অপমানের কোনো কথাই এতে নেই, ততই মাথা

আরো গরম হল; ইচ্ছা করল কোনো একটা কড়া কথা শোনাতে, বেশ বিঁধবে এমন কথা, কিন্তু ভদ্রতা বাঁচিয়ে কী এমন বলা যায় তাও ভেবে পেল না, আর তাকিয়ে দেখল মেজ-জামাইটি এইমাত্র বেরোনো অন্য এক দলের দিকে মন দিয়েছে। বড়ো দল, পানের থালা হাতে লাল আর কমলা শাড়ি-পরা মেয়ে দুটির সঙ্গে কথা বলছেন ময়লাস্নতো সূত্রী এক আধবুড়ো, বয়স কম হলে নন্দীর মতো দেখাত।

ফাইন গার্লস! ফাইন ইয়ং উইমেন! বলে হারীতের উৎসাহী বাবা অস্বাভাবিক সাদা নকল দাঁতে হাসলেন। নিজেদের সম্বন্ধে 'ইয়ং উইমেন' আখ্যা শুনে ইরু আর গীতি সারামুখে চাপা হাসল, তারপর সরে এসে চোখাচোখি করে খামকা হেসে উঠল শব্দ করে আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় সিগারেটটি নিঃশেষে টেনে ফিরে আসতে-আসতে সেই শব্দের শেষ তরঙ্গটি পৌঁছল খয়েরি ফ্ল্যানেলের পুরোনো শার্ট পরা নিখিলের কানে।

আপনি একটা পান? হেমাঙ্গ ফিরে তাকাল মজুমদারের দিকে। ইরু তাড়াতাড়ি সামনে এসে থালা বাড়াল। টুকটুকে লাল শাড়িপরা ফুটফুটে মেয়েটির দিকে মজুমদার একবার চোখ রাখল, একটু হাসল, একটি পান তুলে নিল। একটু যেন ব্যস্তভাবে হেমাঙ্গ বলল—আমার মেয়ে। হেমাঙ্গর ব্যস্ততা মজুমদার লক্ষ্য করল না, রাগ ভুলে গেল। ঠিক সেখানে সেই মুহূর্তে হালকা ছির্পাছেপে সূত্রী কিশোরীটির কাছে এসে দাঁড়ানোয় তার মনের কোনো একটা নরম জায়গায় যেন চাপ পড়ল, হঠাৎ একটি লাভগ্যের রেখা বেরোল তার ঠোঁটের কোণে যখন সে বলল—বুঝেছি। নয়তো কি আর এমন রূপ? একথা শুনে চাঁদির ছোট্টো টাকে হাত বুলিয়ে হেমাঙ্গ বর্ধন সবিনয়ে হাসল, যেন কন্যার এই রূপের কৃতিত্বটা একান্তই তার। আর তারপরেই আবার এগোল শাখতীর শ্বশুরবাড়ির দলটির দিকে, তারা তখন সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে।

পিছনে সরতে গিয়ে মজুমদার শুনল মিলুর নম্র গলা—মামা, চলো আমরাও...। মিলুর দিকে অর্ধেক ফিরে মজুমদার বলল—আচ্ছা, তুই থাক। তৎক্ষণাৎ উজ্জ্বল হল ছ-কোণ-চশমা-পরা রঙিন মুখ। উর্মিলা অবাক হল না। মামার এই হঠাৎ মতি বদলে সে অভ্যস্ত। বোকা নয়, সে বুঝে নিয়েছে মামা তার অধীনদের নাচাতে ভালবাসেন, নিজের কর্তৃত্ব নানাক্ষণিক করে চাখতে ভালবাসেন। উর্মিলা তখনই একটু চাটনি যোগাতে যাচ্ছিল মামার পছন্দমতো কিছু কথা বলে, কিন্তু সময় পেল না। সুবীরকে দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দেব ঘন্টাখানেক আগে—মজুমদার ভাগনির দিকে দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করল না, হেমাঙ্গকে সামনে দেখে মাথা নুইয়ে—আচ্ছা চলি, বলেই টপকে সিঁড়ি নামল, নন্দী-পরিবারকে ছাড়িয়ে প্রায় দৌড়ে বেরোল রাস্তায়, অন্ধকারে মিশে থাকা কালো পন্টিয়াকটায় উঠে বসে যেন বন্ধুকে ফিরে পেরে কোথায়...এখন কোথায়?...কোথায় আর—বাড়িতেই, সেই বাড়িতে, যেখানে গলা পর্যন্ত আরাম কিন্তু সুখ নেই। সুখ না থাক ঘুম তো আছে, আর তারপরেই আবার দিন, আবার কাজ। কিন্তু এখনই ঘুম? শোওয়ামাত্রই টুপ করে, তবে তো? তাহি ক্লান্তি চাই, আরো ক্লান্তি। মজুমদার গিয়ার বদলালো—কোথায়? ডন জুয়ানের হুমোড়? গীতালি? না কি আজ—? না কি বাড়ি ফিরে আপিশের ম্যানেজারকে তলব করে পাঠাবে, লেপের তলা ছেড়ে কাঁপতে-কাঁপতে ছুটে আসবে বুড়ো মানুষটা। না, কোথাও না, কোথাও কিছু নেই। কেবল খোশামোদ। বাবা সুদ্ধ হাত কচলে কথা বলেন—ঘেমা করে। টাকা না থাকলে কী জঘন্য, আবার টাকা থাকলেও জীবন কী জঘন্য। মা যদি মরে না যেতেন—শু শ শ—মজুমদার খিস্তি করে ব্রেক কবল। সামনে ওটা—গরু? দ্যাখো

কাণ্ড, সাথে কি আর গরু বলে! মজুমদার লম্বা হর্ন দিল, কিন্তু মানুষের পিঁলে চমকানো সেই নিউ-মডেল ইলেকট্রিক হর্নের আওয়াজে গরুটা একটুও বিচলিত হল না, প্রকাণ্ড দামি পন্টিয়াক গাড়িটা তার জন্যই যে থেমে আছে তা বুঝলই না মোটে, দিব্যি নিশ্চিত্তে এক-পা দু-পা সরল, নড়ল কি নড়ল না, যেন কায়ক্বেশে কিঞ্চিৎ পাশে সরে ঠিক গাড়ি যাবার মতো জায়গাটুকু করে দিয়ে ওখান থেকেই গলা বাড়িয়ে সাদার্ন এভিনিউর মাঝখানের জমির শুকনো ঘাস ছিঁড়তে লাগল আর মজুমদার তার ল্যাজ ঘেঁষে একটা বদমেজাজি মোড় নিয়ে ল্যান্সডাউন রোডে বেকল— এই এক ফাঁকড়া হয়েছে ব্ল্যাক আউট— গাড়ি চালিয়েও সুখ নেই।

* * * * *

ততক্ষণে বিয়েবাড়ির একতলার কাপেট-মোড়া বড়ো ঘরটির ভিড় কমে-কমে মাত্রই জন পনেরো পুরুষে ঠেকেছে। নিকট আত্মীয়, কি যারা স্ত্রীর কথা ঠেলতে পারেনি কিংবা যাদের নিজেদেরই উৎসাহ কি কৌতূহল বেশি—বরের কাছাকাছি সরে বসেছে তারা। সংখ্যায় কম, প্রায় সকলেই সকলের চেনা, সকলেই এইমাত্র খুব ভাল খেয়েছে। একটু বেশি বয়স্ক, যাদের এখনই চোখ ঘুম-ঘুম, তাদের বাদ দিয়ে সকলের মুখেই কথার আগ্রহ। এখন আর যুদ্ধের কথা বলছে না কেউ—কিরণ বস্ত্রি সুদু আপাতত বোমা ভুলেছে। হারীতও ওখানে নেই যে মনে করিয়ে দেবে। আজ রাত্রির ঘটনা নিয়েই কথা হচ্ছে এখন, সামনে উপস্থিত নায়কটিকে লক্ষ্য করেও মস্তব্য পড়ছে মাঝেমাঝে। ...এইটুকু থেকে দেখে আসছি তো— গোল মুখে সোনার সরু চশমা পরা প্রভাতমেসো বলছিলেন—চমৎকার মেয়ে, চমৎকার বুদ্ধিমতী। রাজেনবাবুর ভারি ভাবনা ছিল এ-মেয়েকে কার হাতে দেবেন। অবশ্য রাজেনবাবুর মুখে এ বিষয়ে কোনো দুর্ভাবনার কথা কখনো তিনি শোনে ননি, কিন্তু বলতে দোষ কী— তা মেয়ে নিজেই বাপের ভাবনা ঘোচাল... বেশ, বেশ! বলে সপ্রশংস কৌতুকের কটাক্ষ করলেন সত্যেনের দিকে। আজকাল তো এ রকম বিয়েই বেশি হচ্ছে—বললেন তপনদা, টাটকা বিলেতফেরত ঝকঝকে ব্যারিস্টার। বেশি? বেশি কী হে? সমস্ত দেশের মধ্যে ক-টা হয় এরকম? চোদ্দটা রসগোল্লা খাবার পরেও অকাতরে তর্কে নামলেন ষাট-পেরোনো ভূপেশদাদু। না হয় তো হওয়া উচিত—জোরগলায় ঘোষণা করলেন তপনদা, কেননা বিয়ের যোগ্য ছেলেমেয়ে থাকা দূরের কথা, তিনি নিজেই অবিবাহিত। রূপ, গুণ আর বাপের পয়সা- প্রতিপত্তির হিসেব মিলিয়ে-মিলিয়ে দুটি তরুণীর সঙ্গে কিছুদিন ধরে পূর্বরাগ চালাচ্ছেন, এখনো মনস্থির করতে পারছেন না। উচিত কেন? এঞ্জিনিয়ার পরেশকাকা ভূপেশদাদুর পক্ষ নিলেন।

আমাদের এই কনে-দেখা-বিয়েটা একটা বর্বরতা।

আঁ! বর্বরতা! খুতনি উঁচু করে প্রভাতমেসো হা-হা হাসলেন—দেশসুদু লোককে বর্বর বলে দিলে?

দেশসুদু কেন, পৃথিবী ভরেই এই নিয়ম—অকাটা কথা যে বলে তার গলা যেমন নিচু হয়, তেমনি নিচু গলায় পরেশকাকা বললেন—সব দেশেই বেশির ভাগ মা-বাবাই সব ঠিক করে দেয়, তারপর ঐ একটা নিয়মরক্ষা আরকি।

নাকি? তপনদা বাঁকা চোখে তাবলেন।

অবশ্য ভাল ভাল ঘরের কথা বলছি। সেখানে বিলেত-টিলেতেও কড়াকড়—পরম প্রত্যয় ফুটল পরেশকাকার কথায়, কেননা, ইংলন্ড, স্কটলন্ড আর জার্মানির কল-কারখানার এলাকায় প্রায়

নিবিঘ্নেই যৌবন কাটিয়ে এসে গ্লাসগোতে একবার তাঁকে বিয়ে করতেই হয়েছিল। মেয়েটি, তাঁর নিজেরই মত-মাফিক, ‘ভাল ঘরে’র অবশ্য ছিল না, কিন্তু ছাড়ান পেতে বেজায় নাজেহাল হয়েছিলেন, আর এখন তাঁর কুড়ি বছর আগের বিয়ে করা কিছু-লেখাপড়া-না-জানা বাঙালি স্ত্রী সুদু সাহেব-স্বামীর সাবেকি মতে এক-এক সময় চমকায়। ছোকরা ব্যারিস্টরের চোখের ঠাট্টা লক্ষ করে এঞ্জিনিয়ার আবার বললেন—দশ বছর ছিলাম ও-সব দেশে, আমি জানি। সে কোন জন্মের কথা! ঠোঁটের ভঙ্গিতে অবজ্ঞা ফোটালেন তপনদা—এখন বদলে গেছে সব। বদলে গেছে? এই সেদিন না এডওয়ার্ড দি এইটথ্কে রাজ্যপাট ছাড়তে হল?

ও, সে কথা! তার কারণ অন্য। কিন্তু—

এ নিয়ে এত বলার কী আছে? প্রভাতমেসো চড়া গলায় বাধা দিলেন—আরে আমাদের সব মা-বাবাই তো বিয়ে দিয়েছিলেন... তা মন্দ কী... জীবনটা তো কেটে গেল একরকম...হাঃ—মোজা পরা পায়ের পাতায় হাত বুলিয়ে কোমর থেকে কাঁধ পর্যন্ত শরীরটি একটু দোলালেন তিনি, সমস্ত গোল মুখটি ভরে নিঃশব্দে হেসে আবার একটু লালও হলেন হঠাৎ। কিন্তু অন্য দুজন লক্ষ্যই করলেন না তাঁর কথা। অন্য সকলকে বাদ দিয়ে—প্রায় ভুলে গিয়ে—শুধু নিজেদের মধ্যে তখন কথা বলছেন পরেশকাকা আর তপনদা। ইওরোপ বিষয়ে কে বেশি সবজান্তা তাই নিয়ে একটা প্রতিযোগিতা দাঁড়িয়ে গেছে দুজনের মধ্যে। পরেশকাকার যুক্তি এই যে তিনি ছিলেনও বছরদিন ঘুরেছেনও বিস্তর, অতএব তাঁর কথার উপর কথা বলার এখানে অসম্ভব কেউ নেই। আর তপনদা বলতে চাচ্ছেন যে যেহেতু তিনি সদ্য গিয়েছিলেন, তাই বিলেত বিষয়ে তিনিই ঠিক ওয়াকিবহাল।

প্রভাতমেসো একটুক্ষণ তর্কটা শুনলেন, কিছুই সুবিধে করতে না পেরে ফিরে তাকাতেই গলা বাড়ানো কিরণ বস্ত্রির সঙ্গে চোখাচোখি হল। কিরণ বস্ত্রি অনেকক্ষণ ধরে কিছু বলি-বলি করছিল। খুব মন দিয়েই কথাবার্তা শুনছিল সে, শুনে অস্বস্তি হচ্ছিল, খারাপ লাগছিল রীতিমত। কী রকম বলছে সব বিয়ের বিষয়ে, যেন ওর উপর কোনো জন্মে কোনো মানুষের হাত আছে। ওটা একটা... একটা—কী, তা কিরণ ভেবে পেল না, কথা খুঁজে পেল না, কিন্তু নিজের মনে গভীরভাবে বুঝল। এই তো অনীতা—কদিন বা বিয়ে হয়েছে, এই সেদিনও তাঁর কথা কিছুই জানতাম না, কিন্তু মনে হয় কত কালের, কত জন্মের—এই রকম আলাপ। আগে তো কত খোঁজাখুঁজি, কত মেয়েই দেখেছেন মা, আমিও মাঝে-মাঝে... কিন্তু এখন কী আর অনীতা ছাড়া আর কাউকে কল্পনা করতেও পারি আমি? তেমনি সত্যেনও—আর এই সত্যেনের সামনেই এঁরা কি না—কী যে সব! কিরণ মনে-মনে এসব ভাবছিল আর গলা বাড়িয়ে-বাড়িয়ে একবার এর দিকে, একবার ওর দিকে তাকিয়ে কথা বলার সুযোগ খুঁজছিল; প্রভাতমেসোর চোখে চোখ পড়তে সে আর দেরি করল না—আমি আপনার সঙ্গে একমত, বলে কথা আরম্ভ করল কিরণ। ‘আমি টায় জোর দিয়ে বলল। মেসোটি অবাক হলেন, বিব্রতও। ভেবেই পেলেন না, কখন তিনি এমন কী বললেন যার সঙ্গে একমত হয়ে বসে আছেন—আর কেউ না, একেবারে জামাইয়ের বন্ধু! ঐ আপনি বিয়ের বিষয়ে যেটা বলছিলেন, কিরণ তাঁকে মনে করিয়ে দিল—সত্যি তো? বিয়েটাই আসল, কেমন করে ঘটল সেটা কিছু না। বস্ত্রা যে তাঁর মতেরই সমর্থক সেটা ভুলে গিয়ে প্রভাতমেসো তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে সায় দিলেন—ঠিক!

ঐদের কথার কোনো মানে হয় না, কিরণ চোখ দিয়ে অন্যদের দেখল—আসলে... আসল

কথাটাকে হঠাৎ খুঁজে পেয়ে যেন আঁকড়ে ধরল সে—আসলে বিয়ে হচ্ছে একটা—একটা—কিরণ কথা খুঁজতে থামল, কিন্তু তখনই প্রভাতমেসো আবার বলে উঠলেন—ঠিক, ঠিক কথা! বলে আরো মাথা নাড়লেন, তারপর জামাইয়ের দিকে ফিরে মোলায়েম মিহি সুরে বললেন—তুমি না কোন কলেজে প্রোফেসর? সত্যেন হঠাৎ বুঝল যে তাকে কিছু বলা হচ্ছে। কিন্তু কী? কী বললেন উনি? তার দেরি দেখে কিরণই জবাব দিল তার হয়ে, তার কলেজের নামটা জানিয়ে দিয়ে। বেশ, বেশ—সত্যেনের দিকে তাকিয়ে প্রভাতমেসো আবার বললেন—তা বিলেতটা ঘুরে এসো একবার। দেখছ তো, বিদ্যে তোমার যতই থাক, বিলেতি ছাপ না থাকলে কিছু না। উত্তরে সত্যেন অমায়িক হাসল। আমাদের হারীত কেমন বেশ... আর চাকরিতেও নাকি উন্নতি করেছে— এই প্রফুল্ল, সদয়, চশমা-চোখে চমৎকার ভদ্রলোকের আগের কথার সঙ্গে পরের কথার সম্বন্ধ বুঝতে না পেরে সত্যেন আবারও হাসল, এবার একটু বোকার মতোই।—বেশ, বেশ! কার বা কোনটার তিনি তারিফ করছেন সেটা প্রভাতমেসো স্পষ্ট করলেন না, অনুমোদনের সুখী চোখে চারদিকেই তাকিয়ে বললেন—তা হারীতকে দেখছি না এখানে? কোথায় সে?

তখন দোতলায় সিঁড়ির চত্বরে দাঁড়িয়ে সরস্বতী অরুণকে বলছে—নন্দীকে নিয়ে যাও। নিজের নামটা কানে যেতে হারীত একবার উদাস চোখে তাকাল। তার এখনকার দূরদৃষ্ট বীরের মতো মেনে নিয়েছিল সে। দেয়াল ঘেঁষে ঢিলে দাঁড়িয়ে ছিল এমন ভঙ্গিতে, যাতে স্ত্রীলোকের আর অনুষ্ঠানের এই বোকা জগৎটার উপর তার মহৎ অবজ্ঞা সারা শরীরে স্পষ্ট ফোটে। তবু আটকে ছিল ওখানেই। নড়তে পারেনি, কেননা হয় সরস্বতী, নয় মহাশ্বেতা, নয় একসঙ্গে দুজনে ফাঁকে-ফাঁকেই আলাপে টেনেছে—বাজে কথা সব—কিন্তু—আচ্ছা, এঁরা যখন না বলেই ছাড়বেন না, তখন শোনাই যাক। সরস্বতীকে ইংরেজিতে একবার একথাও বলেছিল, আপনার বয়স কিন্তু একদিনও বাড়েনি, আর সে-কথা শুনে সরস্বতী যখন হেসেছিল, সেও হেসেছিল সঙ্গে। আর দেরি কোরো না—স্বামীকে তাড়া দিল সরস্বতী। অরুণ তার উড়-উড় চুলে হাত বুলিয়ে হারীতের সামনে এসে দাঁড়াল—চলুন নন্দী সাহেব।

কোথায়? অন্য কার কী একটা কথা শুনতে-শুনতে সরস্বতী চট করে মুখ ফিঁসিয়ে বলল—নন্দী যাও। বর নিয়ে এসো।

বর আনব মানে? সে তো কখন এসে বসে আছে! কথাটা শুনে একসঙ্গে গমক দিয়ে হেসে উঠল সরস্বতী, মহাশ্বেতা, আর যাবার আগে আর-একবার নন্দীকে মহাশ্বেতার পাতলা গোঁফওলা রূপসী ননদটি। হারীত লাল হল, ভেবেই পেল সে কথাটায় এত হাসির কী আছে। আরে চলুন, চলুন—অরুণ আস্তে হাত ছোঁওয়া হারীতের কাঁধে, চপলমতি মহিলাদের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করে নিচে নিয়ে এল।

পরেশকাকা আর তপনদার তর্ক তখনও চলছে। এঞ্জিনিয়ার একবার তাঁর বয়সের সুবিধে নিয়ে বললেন—তুমি কিছু জান না হে! ব্যারিস্টার আইনমাফিক জবাব দিলেন—অনেক ভুল না জেনে অল্প ঠিক জানা ভাল। পরেশকাকা আর ফিরে জবাব দিলেন না, তপনদাও আর কিছু বললেন না। দুজনেই বুঝলেন ঠিক সেই সময়টায় ঘরের অন্যেরাও কেউ কিছু বলছে না। তাই তাঁরাও কথা থামালেন। কোনো একটা ঘটনার অপেক্ষায় লোকেরা যখন বসে থাকে,

তখন যেমন মাঝেমাঝেই হয়, তেমনি হঠাৎ একসঙ্গে সবাই চুপ হয়ে গেল। ঘরে এল অরুণ আর হারীত, সকলের চোখ তাদের দিকে ফিরল। অরুণ এর মধ্যে মুখে প্রায় ডাক্তারি গান্ধীর্ষ্য এনে ফেলেছে, আর মুখে যেন অনুগ্রহের হাসি ফুটিয়ে পিছনে আসতে আসতে হারীতের চকিতে মনে পড়ল তার নিজের বিয়ের রাত্রিটি। অরুণ এসে সত্যেনের পাশে দাঁড়াল। আগে তাকে ‘তুমি’ বলেছে, সে-কথা ভুলে গিয়ে বলল—চলুন। সত্যেনের পাশে রাখা মালাটি দু-হাতে তুলে কিরণ বলল—নাও। এবার আর সত্যেন বিদ্রোহের চেষ্টা করল না, মালা হাতে নিল। আলোয়ানটা আর কেন? বলে কিরণ সত্যেনের কাঁধ থেকে নিজেই সেটা তুলে নিয়ে কাছে দাঁড়ানো নিখিলকে রাখতে দিল।—নাও, পরো এবার। সত্যেন মালা পরে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিতরা প্রায় সকলেই উঠলেন, শুধু ঘুমোচোখ বুড়োরা কেউ-কেউ বসে থাকলেন। কিন্তু বর চলতে গিয়ে থপ করে ব্যাঙের মতো লাফ দিল। অরুণের ডাক্তারি গান্ধীর্ষ্য টিকল না, হেসে ফেলে বলল—কী হল?

ঝিঝি ধরেছে—

ঝিঝি? হারীত হাসি চাপল—তা ঝিঝির দোষ কী, এতক্ষণ একভাবে বসে থাকা।

আমার হাত ধরো না-হয়— কিরণ হাত বাড়াল।

না, না—ঠিক আছে। বলে একপায়ে আর একটা লাফ দিল সত্যেন, কিরণ ফিশফিশ করে বলল, পা-টা জোরসে ঝেঁকে নাও একবার।

কিছু লাগবে না!—লাফের বদলে আড় করে পা পেতে-পেতে সত্যেন খুঁড়িয়ে এগোল, তার প্রত্যেক পা-ফেলার তালে মালাটা লাফিয়ে উঠল গলায়। ওরই মধ্যে মুখের ভাবে যথাসম্ভব মান বজায় রাখল সে, কিন্তু কষ্ট আর কষ্ট লুকোবার চেষ্টায় মিশে তার মুখটা দেখাল যেন দুটু ছেলে মাস্টারের কাছে শাস্তি নিতে যাচ্ছে, কিন্তু ক্লাসের সকলকে দেখাতে চাচ্ছে থোড়াই পরোয়া। সেই মুখ দেখে সত্যেনকে হঠাৎ কেমন ভাল লেগে গেল হারীতের। ঘরের বাইরে এসে বলল—কী, কমল?

কমেছে—বলে সত্যেন জুতো পরতে গেল, কিন্তু অরুণ বলে উঠল—জুতোটা ঝুঁক না। পরেই নিই— পা বাড়াল সত্যেন, কিন্তু তখনো ফুলে থাকা বাঁ পা-টা জুতোয় ঢুকল না। দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে কসরৎ করল, কিন্তু পা ঢুকল না। কিরণ বলে উঠল—কী মশকিল! জুতো পরে বিয়ে করবে নাকি?

আচ্ছা, থাক—যেন নিরাশ, দুঃখিত হয়ে সত্যেন খালি পায়েই চলল। তার দুপাশে অরুণ আর হারীত, ঠিক পিছনে কিরণ, কিরণের পরে নিখিল, আর তারপর কন্যাপক্ষের লম্বা, বাঁকা লাইন। সিঁড়ির গোড়ায় তার কাঁধে চাপ দিল কিরণ। সে ফিরে তাকাতে চাপা গলায় বলল—কী? কেমন লাগছে?

কিছু লাগছে না—সকলের শোনবার মতো খোলা গলায় তখনই জবাব দিল সত্যেন। হ্যাঁ! কিরণ ঘাড় নেড়ে উড়িয়ে দিল কথাটা, কিন্তু সত্যেন নিছক সত্যই বলেছিল। সত্যি তখন তার কিছুই লাগছিল না—কোনো শিহরণ, কোনো নূতনত্বের শিহরণও না। সবই যেন জানা, যেন সে কত আগে থেকেই জেনে রেখেছে ঠিক এই সময়ে ঠিক এরকম এরকম হবেই। ঠিক আজকের তারিখের এই মুহূর্তে এই বাড়ির এই লাল সিঁড়িটায় সে পা রাখবে, তারপর এটাতে। আবেগ

আজ সকাল থেকেই নেই। কিন্তু নেই বলে অভাবের আবছা চেতনা ছিল এতক্ষণ, এখন তাও নেই। সেই অভাবের চেতনায় দিনটা ঝাপসা হয়ে ছিল সকাল থেকে, এখন আর ঝাপসাও নেই। এখন সব পরিষ্কার—অর্থাৎ সাধারণ। সাধারণ লাগছে তার, একেবারেই সুস্থ, মাথা-ঠাভা। মনে কোনো কম্পন, কোনো অনুকম্পনও নেই। না আশা, না ভয়, না সন্দেহ, না আনন্দ। যেমন ছাত্রজীবনে কোনো পরীক্ষার আগের রাতে উৎকণ্ঠায় সে ঘুমোতে পারেনি, কিন্তু পরের দিন পরীক্ষা দিতে যেই বসেছে, প্রশ্ন বিলোবার খলখলে আওয়াজ খেমে গিয়ে যেই স্তব্ধ হয়েছে মস্ত হল, তখনই নিরুৎসুক, নিরুদ্বেগ। স্থির হয়ে গেছে তার মন। তেমনি এখন তার কাছে সব পরিষ্কার, সহজ, এত সহজ যে সাধারণ। নিজেই এতে অস্বস্তি হলে, কোনো অনুভূতির চেষ্টা করল এমনকি।—কিন্তু কিছুই অনুভব করল না, পা-টা এইমাত্র পুরোপুরি ছেড়ে যাবার আরাম ছাড়া। সত্যেন স্বচ্ছন্দে উঠল সিঁড়ি দিয়ে, দোতলা পার হয়ে তেতলার দিকে, শেষ ধাপটার আগে অরুণ হারীতকে হঠাৎ ছাড়িয়ে সকলের আগে একলা এগোল আর—সহজ, স্বাধীন, নিশ্চিত—দাঁড়াল আলো-জ্বলা ছাতের দরজায়।

ছাতের বড়ো অংশে, যেখানে খাওয়া হয়েছিল, সেখানে চুপচাপ। চেয়ারগুলি এর মধ্যেই তুলে ফেলেছে। সারি-সারি শূন্য টেবিল শুধু পড়ে আছে। আর আগে যেখানে দু-চারজনের শুধু চলাফেরা ছিল, সেই ছোটো অংশ এখন ব্যস্ত, গুনগুন ব্যস্ত, হাসি-হাসি রঙিন, আবার গভীরও। আতা এতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে বিয়ের সাজে ছোটোমাসিকে দেখছিল, হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে সখী দু-জনকে দেখতে না পেয়ে ছুটে ছাতে এল। কই? কিন্তু ইরু-গীতির খোঁজে ঘুরে না বেরিয়ে আতা সেখানেই একটা সুবিধেমতো জায়গা বেছে দাঁড়াল—বিয়েটা প্রথম থেকে দেখা চাই তো। এখন ওরা এসে পড়লেই হয়।

দেরি হল না, একটু পরেই ছোট্টো চড় পড়ল তার পিঠে।

এই তো!—আমি বলছি না নিশ্চয়ই ছাতে! চকচকে সুখী চোখে তাকিয়ে আতা বলল—কোথায় ছিলি তোরা?

আমরা? গীতি এমন করে তাকাল যেন এর মধ্যে কতই রহস্য লুকোনো। ইরুর দিকে ফিরে বলল—তুই ক-টা খেয়েছিস রে?

ছাব্বিশটা।

চালিয়াৎ!

ইরু বলল—তা দশটা-বারোটা তো হবে।

আমি সন্ধে থেকে গুনে-গুনে ঠিক আঠারোটা— বলল গীতি।

পান তো? আতা ঠোট ফুলিয়ে চোখ বাঁকাল—ও! তোমরা এই করছিলে এতক্ষণ! লুকিয়ে পান খাচ্ছিলে?

লুকিয়ে কেন? ইরুও ভঙ্গি করল চোখের—প্রকাশ্যে, সর্বসমক্ষে। আমরা সকলকে পান দিচ্ছিলাম, আর সকলকে দিতে দিতে নিজেদের মুখে টপাটপ—

আমার জন্য আনিসনি? অভিমানের ঢেউ দিল আতার গলায়। ইরু কথা না বলে আতার ডান হাতটা নিজের বাঁ হাতে ধরল, তারপর ডান হাতে বন্ধ-মুঠি বুলে সেখানে রাখল তার হাতের তাপে গরম হওয়া একটি লবঙ্গ-ফোঁড়া ছোট্টো খিলি। তখন আতা বলল—আমিও ঢের পান

খেয়েছি। কত, তার অস্তু নেই, তা তুই এনেছিস এটাও খাই। পান মুখে দিয়ে চোখে হেসে ইরুকে বলল—তোর ঠোট বেজায় লাল হয়েছে রে! গীতি তাড়াতাড়ি জিগেস করল—আমার? আতা বলল—তোর ঠোট আবার লাল হবে কী! এমনিই তো চিঠির বাস্ক করে রেখেছিস! আতার এই মস্তব্য মিথ্যা প্রমাণ করে গীতির রঙ-বোলানো গাল আরো লাল হল। আ-হা—ইরু বুঝি রঙ মাখেনি? বলে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিল ইরুকে।

একটু সরে দাঁড়াও মা লক্ষ্মীরা—তামার থালায় কী সব সাজাতে সাজাতে রোগা পুরুতঠাকুর আশাতীত মোটা গলায় বললেন। ঢেউয়ের মতো সরে গেল লাল-সবুজ-কমলা শাড়ি। ‘মা লক্ষ্মী’ শুনে ইরু-গীতির বড্ডো হাসি পেল, চাপতে গিয়ে গপগপ উপচোল। হাসছিস কেন? হাসির কারণ বুঝে ভুরু বাঁকাল আতা। পুরুতের গায়ে ওটা কী রে? গীতি জিগেস করল কানে কানে। আতা হাসল একবার—এও জানিস না? ওটা তো নামাবলী।

ও! একেই নামাবলী বলে? গীতি গম্ভীর হল, কিন্তু তখনই আবার খুক করে হেসে ফেলল—টিকিটা দেখেছিস? ইরু বলল—টিকটিকি! একথা শুনে আতারও হাসি পেল, সামলে নিয়ে হাসিতে শাসন মেশানো গলায় বলল—কী বাজে—! জানিস, ইনি আজ্ঞে-বাজে পুরুত না, কোন স্কুলের হেডপণ্ডিত।

যাঃ! পুরুত বুঝি আবার পণ্ডিত হয়— বলল গীতি।

বা, আমি জানি যে! আচ্ছা, মামাকে জিগেস করিস—

আতার কাঁধে টোকা দিয়ে ইরু বলল—চুপ! ঐ মামা এলেন। আরম্ভ হবে এবার। তিনজনে আর একটু ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়াল।

*

*

গরদের চাদর জড়ানো বিজন একটু অস্বাভাবিকরকম তাড়াতাড়ি হেঁটে পুরুতের সামনে এসেই ধপ করে বসে পড়ছিল, পুরুত হাত তুলে বাধা দিলেন—ঐ আসন তোমার, উত্তর দিকে মুখ। বিজন উত্তর দিকে মুখ করে কুশাসনে বসল। বসেই কেঁপে উঠল। পুরুত বললেন—স্থির হয়ে বোসো। বিজন স্থির হল। তাকে একটু লক্ষ করে দেখল অনেক জোড়া চোখ—তৎক্ষণে আরো অনেকে হাজির হয়েছে সেখানে, মেয়েই বেশি। ইভা গাঙ্গুলি চিত্রাকে জিগেস করল—ইনি কে? মনে হচ্ছে ইনি সম্প্রদান করবেন?

নাকি? ঐটুকু ছেলে সম্প্রদান করবে? কাছে দাঁড়িয়ে উর্মিলা শুনলো কথাটা। চোখের কোণ থেকে একটা দৃষ্টিপাত করে বলল—ইনি স্বাতীর দাদা।

কোণকাটা চশমাটা ইভা চিনল, খেতে বসে লক্ষ না করে উপায় ছিল না। এখন আরো একটু ভাল করে তাকাল মুখের দিকে। একটু চেনা-চেনা হাসল। উর্মিলা তখনই ফিরে হেসে কাছে ঘেঁষল। ইভা জিগেস করল—আপনি বুঝি বাড়ির কেউ?

না, না, বাড়ির কেউ না। বললাম না তখন, আমিও বন্ধু! তবে—এক দমকে অনেক কথা বলে ফেলল উর্মিলা। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার সঙ্গে ইভা গাঙ্গুলির সেই বন্ধুতা জন্মাল, যা রেলগাড়িতে আর বিয়েবাড়িতে দুজন মেয়ের মধ্যেই শুধু সম্ভব, আর কোথাও কারো মধ্যে না। পরস্পরের বিষয়ে প্রধান তথ্যগুলি জেনে নেবার পরে উর্মিলা বলল—বিজনদাকে কীরকম বেচারী দেখাচ্ছে ওখানে বসে! স্বাতীর দাদার কথা বলছি। ইভা বলল—উনি তো কিছু করছেন

না, শুধু বসেই আছেন।

না, না, ঠোট নাড়ছে দেখতে পাচ্ছেন না?

হ্যাঁ! ইভা হাসল—মস্ত-টম পুরুতই যা হোক বিড়বিড় করে, অন্যদের ঠোট নাড়াই কাজ।

উর্মিলাও হাসল—হাস্তামাও! সংক্ষেপে সারতে পারে না?

দেখতে কিন্তু মন্দ না—মৃদু মস্তব্য করল অনুপমা।

হ্যাঁ, অন্যদের পক্ষে খুব ভাল—ইতার পুরুষ-গলায় আশেপাশে কেউ-কেউ ফিরে তাকাল—কিন্তু যাদের বিয়ে, তাদের কী কষ্ট!

খুব কি কষ্ট? চিত্রা বলে উঠল ফশ করে। হাসির হাওয়া দুলিয়ে গেল অনুপমা থেকে উর্মিলা পর্যন্ত চারটি পাশাপাশি তরুণীকে। চিত্রার আঁচলে টান পড়ল এমন সময়। বছর দশেকের একটি মেয়ে ফিশফিশে গলায় ডাকল—দিদি—। ফিরে তাকিয়ে মা-কে দেখতে পেয়ে চিত্রার হাসিমাখা মুখটা নিমেষে করুণ হল—এখন যাবে, মা?

হ্যাঁ চল, রাত হল, আবার ব্ল্যাক আউট। তুমিও তো আমাদের সঙ্গে?—বলে চিত্রার মা অনুপমার দিকে তাকালেন। এখনই যাবেন?—অনুপমার কথাটা কাকুতির মতো শোনাল। ইভা বলল—একটু থাকুন না। আমিও যাব একটু পরে, এক সঙ্গেই যাব। কাছেই তো, আর এখান থেকে একজন লোক নিয়ে নিলেই হবে। কিন্তু স্বামী-সংসার নিয়ে বিব্রত চিত্রার মা আর থাকতে রাজি হলেন না। হঠাৎ তাঁর দিকে গলা বাড়িয়ে উর্মিলা বলল—একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না। আমাদের নিতে গাড়ি আসবে খানিক পরে, আপনাদের সকলকেই নামিয়ে দিতে পারব।... কিন্তু ছোটো গাড়ি আসে যদি?... তাহলে দু-বারে যাওয়া যাবে, এমন আর মুশকিল কী! উর্মিলা নিশ্চিত হয়ে আবার ভদ্রমহিলার দিকে তাকাল—সুবিধে হবে? ঝকঝকে মুখের অচেনা এই মেয়েটির আমন্ত্রণের উপরে চিত্রার মা তখনই কিছু বলতে পারলেন না। থাকবার ইচ্ছে অবশ্য মনে-মনে তাঁরও, কিন্তু ইচ্ছেমতো আর কতটুকু হয় সংসারে! তাঁর দ্বিধার সুযোগ নিয়ে চিত্রা আবার বলল—থাকো. না মা।

আচ্ছা—তোর ঘুম পায়নি তো টুন্টি?

না তো! একটুও ঘুম পায়নি—দশ বছরের মেয়েটি খুব বড়ো করে চোখ খুলে তার কঁথার চাক্ষুষ প্রমাণ দিল। তারপরেই নড়ে উঠে ব্রস্ত গলায় বলল—মা! ঐ তো বর! ছোটো মেয়েটির কথাটা যেন হাওয়ায় ছড়াল, চঞ্চল হল সবাই। বরের সঙ্গে-সঙ্গে, পিছনে, অনেক এল, সবাই পুরুষ, আর তাদের পিছনে এল পাঁচ থেকে দশ পর্যন্ত বয়সের এক দল ছেলেমেয়ে। তাদের মধ্যে দু-চারজন সাহসী অনেকটা কাছে এগিয়ে বসেই পড়ল, আর তাদের কেউ কিছু বলল না দেখে অন্য বাচ্চারাও টিপটিপ বসে পড়তে লাগল।

সত্যেন আলপনা-আঁকা পিঁড়িতে পুঁব দিকে মুখ করে বসল। তার পাশে খালি থাকল আর একটা পিঁড়ি, একটু ছোটো, আলপনাও তার অন্যরকম। বসে চারিদিকে একবার তাকাল সত্যেন, প্রথমেই চোখ পড়ল লেপটে বসা বাচ্চাদের দলটিতে। ঐ তো—আহা, কী যেন নাম দিমির দিদির ছেলের?—হ্যাঁ, দীপু।—আর বর্মার দিদির মাথায় প্রায় সমান-সমান ডিন ছেলে পাশাপাশি—আর ছোটন তো স্কুলের সামনে—আসনপিঁড়ি হয়ে কেমন বসেছে দ্যাখো না, খুঁতি-পাঞ্জাবি পরা ফুলবাবু! ওদিকে তাতাও তার দলবল নিয়ে, সব বলমলে শাড়ি আজ, সব

ঠোট পান খেয়ে লাল—আর বাচ্চা হলে কী হবে, মেয়ের দলে আর ছেলের দলে স্পষ্ট আলাদা ভাব। সত্যেন চোখ সরাল সেখান থেকে, হঠাৎ অখিলকে দেখতে শেল তার কাছের। রোগা মুখে উপলক্ষের উপযোগী গাভীর এনেছে অখিল, বুকের উপর হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়েছে। সত্যেন আস্তে বলল—অখিল বোসো না! সতুদা বিয়ে করতে বসে তার সঙ্গে কথা বলবেন এত বড়ো সৌভাগ্য অখিল কল্পনাও করেনি। মুহূর্তে তার গাভীর ঝরে আঁকাবাঁকা দাঁতের সারি হাসিতে বেরিয়ে পড়ল। সত্যেনের কথাটা শুনে পেয়ে অখিলের কাঁধে হাত রাখল অরুণ। তুমি এখানেই বোসো—বলে তার সতুদার প্রায় গা-ঘেঁষে বসিয়ে দিল তাকে। অখিলের আরাম হল। এর আগে অনেকক্ষণ সে বসেনি, কিন্তু সতুদার অত কাছে বসা কি উচিত? খানিকটা সরে বসল সে, কিন্তু বাচ্চাদের দিকে ঘেঁষল না—ছি! ঐ পুঁচকেদের সঙ্গে!—বেশ, আসল জিনিসই ফেলে এসেছিলে—বলে হেমাঙ্গ পিছন থেকে নিচু হয়ে বরের টোপরটা সত্যেনের একেবারে কোলের উপর নামাল। সত্যেন ভুরু কুঁচকে তাকাল, শোলায় আর রাংতায় বানানো চিকচিকে বিস্ত্রী বস্ত্রটাকে আস্তে দু-আঙুলে সরিয়ে কাতর মুখে বলল—এটা পরতে হবে? পুরুত বললেন—মস্তকে স্থাপন করো।

—এখনই? বরের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে পুরুত বললেন—আচ্ছা, পরে হবে। আর এক কথা, আমি কিন্তু এই জামাটামা পরেই থাকব— বলে সত্যেন পুরুতের কাঁচাপাকা ঘন ভুরুর তলায় নিস্ত্রভ চোখে চোখ রাখল। ভেবেছিল একথা শুনে পুরুতের তাক লাগবে। কিন্তু সেরকম কোনো লক্ষণই টিকিওলো বামুনের পরিষ্কার কামানো, শীর্ণ মুখে ফুটল না। ঈষৎ স্নান স্বরে বললেন—যথাসময়ে উত্তরীরের আচ্ছাদন হলেই চলবে। সত্যেন খুশি হল। কিন্তু এত সহজ সমাধানে তত যেন খুশি হল না, তেমন যেন জিত-জিত লাগল না তার।

* * * * *

বিয়ে আরম্ভ হল। বিজনের সামনে একটি তামার থালা ধরে পুরুত বললেন—ডান হাতে এক মুঠো তণ্ডুল তোলো। বিজন ডান হাতে এক মুঠো আতপ চাল তুলল।

—এবার বাঁ হাতটি ডান হাতের উপর ন্যস্ত করো। বিজন তা-ই করল। বিজনের বাঁ হাতটি ঠিকভাবে বসিয়ে দিয়ে পুরুত বললেন—এবার ডান হাতে জামাতার দক্ষিণ হাতের স্পর্শ করো। শরীরের কোন অংশকে ‘জানু’ বলে বিজনের তা হঠাৎ মনে পড়ল না। পুরুতের মুখের দিকে তাকাল। পুরুত নিজেই সম্ভ্রদাতার ডান হাতের একটি আঙুল জামাতার ডান হাঁটুতে ঠেকিয়ে দিলেন। বিজনকে সত্যেনের দিকে অনেকটা হেলতে হল, তার চক্ষুর সরে গিয়ে ভিতরকার খোলা গায়ের এক চিলতে চামড়া সত্যেনের চোখে পড়ল। পুরুত থেমে থেমে সংস্কৃত বললেন, আর অশ্লুট, ফিশফিশে, বসে যাওয়া গলায় খানিকটা ঐ রকমই কিছু একটা আউড়িয়ে চলল বিজন। সত্যেনের আঙুল-ঠেকানো-হাঁটু শুড়শুড় করে উঠল, একটু পরে ঠোটচাপা হাসি ফুটল মুখে। সেটা লক্ষ করে উষাবোধি বললেন—বর বেশ সপ্রতিভ তো, হাসছে। ঘটনাস্থল থেকে চোখ না সরিয়ে শোভা বলল—হ্যাঁ, খুব! আর কেনই বা হবে না! ভাবতে চেষ্টা করল, আগেই খুব চেনাশোনা থাকলে ঠিক বিয়ের সময়টায় কেমন লাগে, কিন্তু মুহূর্তেই ভাবনা ছেড়ে আবার দেখতেই নিবিষ্ট হল তার মন। বরের হাঁটু থেকে আঙুল সরিয়ে বিজু সোজা হল, পুরুতঠাকুর ঘাড় ফিরিয়ে হেমাঙ্গবাবুকে কী বললেন, হেমাঙ্গবাবু ইশারা করলেন অরুণবাবুকে, অরুণবাবু

ব্যস্ত হয়ে ছুটলেন। কাছে-বসা বাচ্চারা ঘাড় বঁকিয়ে দেখতে লাগল। তাদের মধ্যে, নিজের দুই মেয়েকে চকিতে দেখল শোভা, চকিতেই তার চোখ সরে গেল—কতকাল পরে পাওয়া এই আনন্দের কাছে, তার পক্ষে এই শেষ আনন্দের রাত্রিটিতে সন্তানকেও তার তুচ্ছ লাগল। পিছনে ঠানদি-গলায় কে বললেন—বর যে বসেই রইল! জোড় পরবে না?

—কনে আনতে গেল? অনেকটা কাঁচা গলার আওয়াজ হল সঙ্গে সঙ্গে। কনে আনতে? কনে আসছে? মেয়েদের গুনগুন রব রাস্তার দিকের কার্নিশ থেকে ছড়িয়ে সিঁড়ির চিলেকোঠায় চূপ করল। দোতলাও চূপ। কনে সাজানো ঘরে আর ভিড় নেই। যে কজন আছে তাদের মুখেও কথা নেই। উশকোখুশকো অরুণ হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে বলল—স্বাতী, চলো! কথাটা পড়ল মেঝের উপর সিসের টুকরো। বড়োপিসিমা আর কুন্দদিদিমা চোখাচোখি করলেন, তারপর কুন্দদিদিমা ডাকলেন—স্বাতী, আয় পিঁড়িতে বোস। স্বাতী নড়ল না। তেমনি দাঁড়িয়ে ছিল সে—মুখ নিচু, হাত দুটি নিঃসাড়, যেমন তাকে রাজেনবাবু দেখেছিলেন; তবে সাজসজ্জায় তফাৎ হয়েছে। একটি গোলাপি রঙের স্বচ্ছ রেশমি ওড়নায় তার মুখ এখন অর্ধেক ঢাকা, সিঁথিতে বাঁধা শোলার মুকুট, আর পান্না-চুনি সোনালি-লালের উপর দিয়ে নেমে এসেছে গলা থেকে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত মস্ত মোটা, ধবধবে সাদা সুগন্ধি মালা। লীলামাসি আস্তে বললেন—হেঁটেই যাক না।

হেঁটে! শান্ত, একটু বিষম চোখে বড়োপিসি স্বাতীকে দেখছিলেন এতক্ষণ, কিন্তু কথাটা শোনামাত্র সারা শরীরে তাঁর ব্যস্ততা জাগল—বিয়ের কনে হেঁটে যাবে? কী যে সব বলে আজকাল, হেসে বাঁচিনে। চোখের ঝলকে কুন্দদিদিমার মুখ থেকে সমর্থন কাড়লেন তিনি। তারপর আড়চোখের দ্রুত দৃষ্টিতে লীলামাসিকে যেন ভঙ্গ করে দিয়ে একটু ভাঙা-ভাঙা গলায় হাঁক দিলেন—কই, কে কে পিঁড়ি ধরবে এসো। ডোরাকাটা শার্টের আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে এল ডালিম। আর?...

আমি আছি—অরুণ বলল পিছন থেকে। আয় স্বাতী, বোস—বড়োপিসির গলার আওয়াজ বদলে গেল হঠাৎ, নরম হল, ভিজ়ে এল। স্বাতী নড়ল। হলদে, সাদা আর লাল রঙে আঁকা পিঁড়িটায় উঠে দাঁড়াল, বসল পিঁড়িতে আসনপিঁড়ি হয়ে, রজনীগন্ধার মালার প্রায় অর্ধেকটা গোল হয়ে কোলে পড়ল, লাল বেনারসির উপর সাদা। দিদিরা তাকে ঘিরে দাঁড়াল। মনোমুগ্ধতার আর সরস্বতীর মাঝখানে শ্বেতাকে দেখাল স্বাতীর গলার মালার মতোই সাদা-শাস্বতী হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল স্বাতীর পিছনে। পিঠে হাত রেখে কত আস্তে যে ডাকল—স্বাতী! হঠাৎ কান্না পাচ্ছিল তার, নিশ্বাস নিতে পারছিল না তাই অত আস্তে। স্বাতী কেঁপে উঠল। ওড়না-ঢাকা মুখ তুলল, মুখ ফেরাল, সব ঝাপসা দেখাল, ঝাপসা চোখে রুড়দিকে দেখল। বোকা মেয়ে! হাসি—হাসির ছায়া শ্বেতার ঠোঁটের উপর ভেসে গেলো।... কই, অরুণ—শাস্বতী উঠল, দিদিরা সরে দাঁড়াল, অরুণ আর ডালিম দুদিকে নিচু হয়ে পিঁড়ি ধরে তুলল। খানিকটা শূন্য হতেই স্বাতী নড়ে উঠল, তাড়াতাড়ি দুহাত বাড়িয়ে গলা জড়াল দুজনের। সোজা হয়ে অরুণ বলল—পারবে, ডালিম? ডালিম বুক টান করে বলল—খুব!

না, না, দুজনে হবে না। দাঁড়াও— বলে শ্বেতা তাড়াতাড়ি এল দরজার কাছে, পরদা ধরে দাঁড়িয়ে ডাকল—পরেশকাকা আসুন, পিঁড়ি ধরবেন।

পিঁড়ি ধরব? অল রাইট! হাতের সিগারেট ফেলে পরেশকাকা প্রথমেই দরজার পরদা ধরে টান দিলেন। সরাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আলাগা-বসানো পরদা পিতলের রডসূঁছু পড়ে গেল। তুলে

নিয়ে সরিয়ে রাখল শ্বেতা। এস হে ব্যারিস্টার সাহেব—বেঁটে কিন্তু গাঁটা-জোয়ান পরেশকাকা পা ফেললেন।—আমিও? আচ্ছা। তপনদা বাবুমানুষ, আস্তে এগোলেন। তর্কের ঝাঁঝটা তখনো ভুলতে না পেরে ঈষৎ ঠেশ দিয়ে বললেন—আপনি আর কেন, পরেশদা?

কী, ভাবছ পরেশদার বয়েস হয়েছে? আরে এখনো তোমাদের মতো আধডজনকে—ধরো! চার জোয়ান চারদিকে পিঁড়ি ধরল। স্বাতী শূন্যে চড়ে যাত্রা করল জীবনের দিকে। শাঁখের ফুঁ উঠল উলুধ্বনি ছাপিয়ে, মেয়ের দল পিছনে এল, বারান্দায় তন্দ্রা-লাগা নেপালপিসে চমকে কেঁপে উঠলেন, বেলি তাকে ফেলেই একটু উঠে এল দেখতে, গলিতে রাজেনবাবুর ছাইরঙের আলোয়ানটা চকিতে দেখা গেল। সিঁড়ির কাছে এসে পরেশকাকা বললেন—সাবধান এবার। ডালিম বলল—ঠিক আছে। স্বাতী সিঁড়ি উঠল, দুপাশে অরুণ আর ডালিম, পিছনে পরেশকাকা আর সামনে তার মুখোমুখি তপনদা। তপনদার কষ্ট কম, কিন্তু অসুবিধে বেশি, কেননা তাঁকে পিছু হেঁটে সিঁড়ি উঠতে হচ্ছে। অর্ধেক সিঁড়িতে মোড় নেবার সময় কোঁচায় পা বেধে তিনি হোঁচট খেলেন। পিঁড়ি সামনের দিকে ঝুঁকল, বিষম টান পড়ল অরুণ, ডালিমের গলায়। পরেশকাকা দেখলেন স্বাতীর পিঠটা সঁতারুর মতো বেঁকেছে। চট করে এক হাতে তাকে ধরে ফেলে বললেন—থাক, তুমি ছেড়ে দাও, তপন। আপনি বরং এদিকে আসুন—জবাব দিলেন তপনদা। পরেশকাকা আর তপনদা জায়গা বদল করলেন, কিন্তু এর পরেও ছাদের দরজায় এসে পিঁড়ি একবার ঠেকে গেল। পিঁড়ি আড় করে, নিজেরা কাৎ হয়ে, মুখঢাকা নিচুমাথা সোনালি-লাল নতুন স্বাতীকে নিয়ে চারজনে যেই ছাতে পৌঁছল, অমনি আরো জোরে ছড়াল মেয়েলি গলার গুনগুন—ঐ যে...কনে এল! স্বাতী!...বাঃ, সুন্দর!...

* * *

পায়রার ঝাঁক হাওয়ায় উঠল, পাখার শব্দ করে নানা দিকে উড়ল। যেমন নাটকের বড়ো দৃশ্য আরম্ভ হবার আগে এদিকে ওদিকে তাকানো ছেড়ে, ঘরোয়া ভাবনা থামিয়ে, প্রোগ্রামের ভাঁজ মুড়ে সবাই ঠিকঠাক বসে নিয়ে সামনে তাকায়, তেমনি ঝিরঝির চঞ্চলতার গায়ে-গায়ে-হোঁয়া কয়েকটা ঢেউয়ের মিলিয়ে যাবার পরে সকলে আরো স্থির হয়ে তাকাল। কেউ পিঁড়ি, কেউ এগোল, সতুদার বেকার আলোয়ান নিয়ে ঈষৎ বিব্রত নিখিল শরীরের ভার এক পা থেকে আর এক পায়ে বদলি করল। অনুপমা হাত রাখল চিত্রার কাঁধে, কিরণ বস্ত্রের ভাঁজ-না-ভাঁজ শাল বাঁ থেকে ডান কাঁধে ঝুলল, নিখিল মনে-মনে বলল, এখন আর কোনোদিকে তাকাবে না, বাচ্চাদের কয়েকজন ভাল করে দেখার জন্য আসনপিঁড়ি ছেড়ে-হাটু ভেঙে বসল, শরীরটাকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে ঘুম তাড়াল ছোটন। সত্যেন তাকিয়ে দেখল আরো অনেক লোক—হাসিমুখ শাস্ত্রী সামনেই দাঁড়িয়ে—জায়গাটা ভরে গিয়ে কেমন অন্যরকম দেখাচ্ছে।

পিঁড়ি নামানো হল। হলদে, সাদা আর লাল রঙের আঁকা পিঁড়ি ছেড়ে স্বাতী এবার বিয়ের পিঁড়িতে বসল সত্যেনের বাঁ পাশে। পুরুত জিজ্ঞেস করলেন—কন্যা কি হেঁটে প্রদক্ষিণ করবেন?

না, ঘোৱানো হবে—বলে হেমাঙ্গ চচ্চড় শব্দে পাটরঙের পাটকাপড়ের কড়কড়ে উড়নিটার ভাঁজ খুলে ফেলল। সত্যেনের কাঁধের উপর সেটা ফেলে বলল—জড়িয়ে নাও। সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রী নিচু হয়ে টোপর পরিয়ে দিল বরের মাথায়। লজ্জায় অধোবদন সত্যেন হাসির শব্দের অপেক্ষা

করল; কিন্তু না, কেউ হাসল না, সত্যেন রায়কে বিয়ের টোপর পরতে দেখে ওখানে উপস্থিত অতগুলি মানুষের মধ্যে একজনও হাসল না। সত্যেন রায় একটু অবাক হলেন। পুরুত বললেন—জামাতা দণ্ডায়মান। টোপর-মাথায় মালা-গলায় সত্যেন উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে উড়নিটা জড়িয়ে নিল। নেহাৎ মন্দ লাগল না, একটু যেন শীত-শীত। বিজনবাবুর গায়ে তো জামাও নেই, শীত করছে না তো? বিয়ের পিঁড়ি ধরে আবার স্বাতীকে উঁচু করল ডালিম, অরুণ, পরেশকাকা—চারজনের বদলে তিনজনেই সুবিধে। বাদ পড়ে তপনদা মুষড়ে গেলেন না, বরং খুশি হয়ে সরে দাঁড়িয়ে দৃশ্য দেখতে লাগলেন। স্বাতীকে শূন্য করে সাত-পাক ঘোরাতে ঘোরাতে ডালিমের ফর্সা হাতের শিরা ফুলে উঠল, অরুণের উপরের ঠোঁটটা মুখের মধ্যে ঢুকে গেল, পরেশকাকারও চোখমুখ বেশ শক্ত হল। তিনজোড়া হাতের উপর স্পষ্ট আরো ভারি হতে লাগল স্বাতী, আর যেন ও-তিনজনকে উৎসাহ দিয়ে হেমাঙ্গ চেষ্টা করে গুনতে লাগল— এক...দুই...চার...।— ভুল হল! এই তিনবার—বলে উঠল চিত্রা। অনুপমা বলল—না ঠিক আছে।

ঈশ, স্বাতীর মুখটা দেখাই যাচ্ছে না।

—দেখা যাবে কী রে? মুকুটটা সুতো দিয়ে বেঁধে দেয় তো ঘোমটা যাতে সরে না যায় সেইজন্যই।
—মুখ তো বরেরও ঢাকা, সামনে একটা কাপড় ধরেছে আবার, রাবিশ—ইভা কটাক্ষ হানল উর্মিলাকে।

বাঃ! বাঁকা হাসল উর্মিলা—শুভদৃষ্টির আগে মুখ দেখতে নেই যে!

ও, শুভদৃষ্টির আগে মুখ দেখতে নেই বুঝি—ইভা তার পুরুষগলায় এমন হেসে উঠল যে আশেপাশে অনেকে চমকে তাকাল।

...পাঁচ। পিঁড়ি ধেমে গেল। সুরু গলায় আরো চেষ্টা করে হেমাঙ্গ আবার বলল—পাঁচ—পাঁচ— আর দু-বার! পরেশকাকা বললেন—ডালিমের কষ্ট হচ্ছে?

নাঃ! ফোঁশ করে নিশ্বাস ফেলল ডালিম। চলো— পিঁড়ি আবার চলল। অরুণের উপরের ঠোঁট খুলে গেল, নিচেরটির উপর জিভ বুলিয়ে খুব নিচু গলায় বলল—স্বাতী, আস্তে আস্তে স্বাতী বোধহয় কথাটা শুনল না, কি বুঝল না, তেমনি শক্ত করেই গলা আঁকড়ে থাকুন। পিঁড়ি এবার ঘুরতেই ইভা গাঙ্গুলির চোখে পড়ল লম্বা ডালিমকে, কোঁকড়া চুলের তলায় এখন অন্য কারণে লাল হওয়া তার কিশোর মুখটা। উর্মিলার কাঁধে টোকা দিয়ে জিগেস করল—স্বাতীকে ঘোরাচ্ছে কারা জানেন?

ঐ চশমা-পরা জন তো জামাইবাবু। অরুণকে আজই প্রথম দেখেছিল উর্মিলা, এ-বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্কটা দেখামাত্রই ঠাউরেছিল। কিন্তু কথাটা বলল এমন করে, যেন জামাইবাবুটি তার কতই চেনা। আর অন্যজন? ঐ ফর্সা ছেলেটি? বেঁটেমতো, বুড়োমতো তৃতীয়জনের অস্তিত্বটাই মানল না ইভা। ফর্সা ছেলেটিকেও উর্মিলা আগে দ্যাখেনি, কিন্তু খেতে বসে শাস্ত্রীকে শুনেছিল তাকে ডালিম বলে ডাকতে; আর তাদের বাড়িতে অবিরতই যাওয়া-আসা রাখা বিজনের মুখে কবে একবার শুনেছিল এই ভাগনেটির কথা। কোনো খবর, যে কোনো খবর—যতই যেমন-তেমন করে বলা হোক—একবার কানে ঢুকলে উর্মিলা ভোলে না, তাই স্বচ্ছন্দে জবাব দিল— ও তো ডালিম, স্বাতীর বড়দির ছেলে। কী কাণ্ড তখন... জল ঢালতে গিয়ে, বেচারী! উর্মিলা

হাসল। ঘটনাটা ইভারও মনে পড়ল, কিন্তু হাসি পেল না। বলল—যারা ঘোরাচ্ছে তাদের কী কষ্ট!

এমন আর কী—বলল অনুপমা।

কষ্ট না? সব বড়ো-বড়ো মেয়ে আজকাল, তাদের কি আর—

স্বাতীকে কিন্তু ছোটো দেখাচ্ছে।

বিয়ের সময় সব মেয়েকেই ছোটো দেখায়— মার মুখে শোনা এই কথাটার সঙ্গে চিত্রা স্বাধীন একটু মন্তব্য জুড়ল—তাই বলে ইভাকে দেখাবে না।

ভাগ্যিণী! ইভা হাসল, বড্ড জোরে। আবার কেউ কেউ ফিরে তাকাল তার দিকে। চিত্রার দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে উর্মিলা কোনো কাগজে পড়া একটা বোল ঝাড়ল—মেয়েরা আজকাল স্বাধীন বলে লম্বাতেও বাড়ছে, আগে...

...সাত! হেমঙ্গর মিহি গলা তীক্ষ্ণ বেজে উঠল। ঢেউয়ের মতো এগিয়ে এল মেয়ের দল, বাচ্চারা উঠেই দাঁড়াল অনেকে, হেমঙ্গর কাঁধের উপর দিয়ে গলা বাড়াল কিরণ বস্তু, হেমঙ্গ সরে গিয়ে বরযাত্রীকে খাতির করল, তার পাশে এসে দাঁড়াল শাম্বতী। অগত্যা-উপস্থিত হারীত নেহাৎ কৌতূহলের চোখেই স্বাতীর দিকে তাকাল। পিঁড়ি দাঁড়াল বরের মুখোমুখি। হেমঙ্গ বলল—অত উঁচুতে না।

পিঁড়ি নামল।

আর একটু উঁচু। চোখে চোখে ঠিক লেভেল হওয়া চাই—পিঁড়ি উঁচু হল আবার। পরেশকাকা চোখ কঁচকে হেমঙ্গর দিকে তাকালেন—দ্যাখো হে, লেভেল হয়েছে? হেমঙ্গ তাকিয়ে বলল—এই...আর একটু কাছে—হ্যাঁ, ঠিক! পিঁড়ি স্থির হল, বরের মুখের সামনে এতক্ষণ ধরে রাখা কাপড়টা সরে গেল, স্বাতীর দুদিকে দাঁড়িয়ে ঘোমটা সরিয়ে দিল মহাশ্বেতা আর সরস্বতী। কিন্তু স্বাতী চোখ তুলতে পারল না। সরস্বতী বলল—স্বাতী, তাকা! ওদিকে কিরণ বলল—তাকাও, সত্যেন।

কিন্তু সত্যেন তাকিয়েই ছিল। এই স্বাতী! চোখে পড়ল নিচু চোখের লম্বা কালো পেলক। এই স্বাতী! চোখে চোখ পড়ল, শাঁখ বাজল। কী কারণে কেউ জানে না, কিন্তু উপস্থিত মেয়েপুরুষ ছেলেবুড়ো প্রত্যেকের মন বিশেষ একটু সুখী লাগল সেই মুহূর্তে। পিঁড়ি মেঝেতে নামল, বরের পিঁড়ির মুখোমুখি স্বাতীকে বসিয়ে এতক্ষণে ছাড়া পেল ডালিম, অরুণ, পরেশকাকা। অরুণ প্রথমই গলায় হাত বুলাল, ডালিম হাতে হাত ঘষল, পরেশকাকা শুধু তাঁর চওড়া, ব্যায়ামী বুক ভরে নিশ্বাস নিলেন একবার। হেমঙ্গ বলল—এখন শালিষদল। স্বাতী, দাঁড়াও। সাত-পাক ঘোরার পর দাঁড়াতে পেরে আরাম হল স্বাতীর শরীরে। কিন্তু সেই আরামের বোধ পলকে মুছে গেল। তার সামনে, কাছে, মুখোমুখি দাঁড়ানো সত্যেনকে ছাড়া আর কিছুই সে অনুভব করতে পারল না সেই মুহূর্তে। সে জানল না যে সারাদিনের উপোসে তার পা এখন কাঁপছে। বুঝল না, শাড়ি-গয়নায় জড়ানো তার শরীরের অস্বাচ্ছন্দ্য। ভুলে গেল বাবাকে ছেড়ে যাবার অসহ্য কষ্ট, মুহূর্তের জন্য অন্য কোনো বাধা তার থাকল না শুধু সত্যেনকে অনুভব করল—দেখল না, শুধু অনুভব করল।

মালা হাতে মুখোমুখি দাঁড়াল দুজনে। টোপ-পরা মাথা নিচু হল, সত্যেনের গলা বেয়ে বুক

উপর নামল স্বাতীর গলার সাদা ফুলের মালা। ওড়না-ঢাকা মাথা নিচু হল, স্বাতীর বুকের উপর পড়ল সত্যেনের গলার একটু ছোটো, একটু মলিন হওয়া মালা। কোনো কারণ নেই, কোনো অর্থ নেই এ-সবের। লক্ষ অনুষ্ঠান ব্যর্থ, হৃদয়ে যদি সত্য না থাকে...কিন্তু তখনকার মতো সুখের, আনন্দের, কল্যাণের হাওয়া দিল ঝিরঝির... দিকে দিকে ছড়াল... শোভার বিহীন চোখ থেকে হারীতের কৌতুকে-বাঁকানো ঠোট পর্যন্ত পৌঁছল। কৌতুকটা যেন মন্দ লাগল না হারীতের। শাস্ত্রী মৃদুস্বরে বলল—স্বাতী, বোস এখন। সত্যেনও বসবার জন্য নিচু হল, কিন্তু হঠাৎ বর্ষীয়সী কালো একজন মহিলা তার কাছে এসে বললেন—আগে একবার নিচে চলো তো বাপু!

নিচে, কেন?

আছে, আছে, চলো— কালো মহিলাটি চোখ টিপে হাসলেন। সত্যেন কেমন-কেমন চোখে চারদিকে তাকাল, কিন্তু কেউ তাকে কিছু বলল না, কেউ বুঝিয়ে দিল না ব্যাপারটা কী। চলো, কুন্দদিদিমা, আমিও যাই—বলে শাস্ত্রী এগোল। সত্যেন অসহায়ভাবে বলল—আমাকেও আসতে হবে?

এসো—গম্ভীর মুখে কাছে এল সরস্বতী—ভয় নেই কিছু।

আমি একাই? সত্যেন ঈষৎ মুখ ফেরাল স্বাতীর দিকে। ফুরফুর হাসি বইল তার প্রশ্নের উত্তরে, তারপর মহাশ্বেতা চোখ টান করে বলল—না, না, না, একা তোমাকে ছেড়ে দেব না। আমরা নিয়ে যাচ্ছি পাহারা দিয়ে, চলো।

তিন দিদি আর কুন্দদিদিমা সত্যেনকে এমনভাবে ঘিরে দোতলায় নিয়ে এল যেন শত্রুপক্ষের খোদ কর্তাকেই পাকড়েছে। এল সেই ঘরে, যে-ঘরে মহাশ্বেতা শুয়েছিল সন্ধেবেলা, যে-ঘরে বাসর হবে। বড়োপিসি অপেক্ষা করছিলেন সেখানে। সত্যেন ঘরে আসতেই বড়োপিসি একটা লাঠি নিয়ে তাকে তাড়া করলেন। সত্যেন একটু অবাক হল, কিন্তু সাদাচুলের মহিলাটি তাকে মারলেন না, লাঠি দিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার মাপলেন শুধু। তারপর একবার তাকে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হল, একবার মেঝেতে কয়েক পা হাঁটতে হল, একবার কালো মহিলাটি কী বিড়বিড় করতে করতে তিন-তিনটি টোকা দিলেন তার মাথায়। এরপর অবাক হওয়া ছেড়ে দিল সত্যেন। কী সব দিয়ে সাজানো একটি তামার থালা হাতে করে তার সামনে দাঁড়ালেন সাদাচুলের মহিলা। জিগেস করলেন—আমার হাতে এটা কী বলো তো?

সত্যেন অবোধ, জবাব দিল—থালা।

—স্বাতী তোমার গলার মালা। সত্যেনের কান পর্যন্ত গরম হল, সারা মুখে পিন ফুটল। আর তার ঐ অবস্থাটা শুধু বড়োপিসি আর কুন্দদিদিমা না, দিদিরাও নিঃশব্দে সহাস্যে উপভোগ করলেন, শাস্ত্রী সুদু, যদিও শাস্ত্রীর সত্যেনের জন্যও খারাপ লাগছিল, আর এ-সব সেকেন্দ্রে কাণ্ড তারও ঘোর অপছন্দ।

আচ্ছা, এবার বলো তো এটা কী? কুন্দদিদিমা থালায় রাখা পানের পাতাটি আঙুলে ছুলেন। ওটা? সত্যেন থামল। পান? তার মানেই ‘প্রাণ!’ অতএব—ওটা তাম্বুল, বলে বিজয়ী সত্যেন কুন্দদিদিমাকে চোখে বিধল। কেমন? শাস্ত্রী হাতে তালি দিয়ে হাসল—এবার? কিন্তু একটুমাত্র...একটুখানি দেরি করে কুন্দদিদিমা সগৌরবে বললেন—স্বাতীর যে নিশ্চয় করে

তোমার সে চক্ষুশূল।

বাঃ! বাঃ! তিন দিদি একসঙ্গে হেসে উঠল দিদিমাকে তারিফ করে, সত্যেনের মুখেও হাসি ফুটল।—বেশ বলেছে কিন্তু চট করে।

এখন যেতে পারি? সত্যেন সপ্রতিভ, পাকাচুলের মহিলার দিকে তাকাল। বড্ডো ব্যস্ত যে! আচ্ছা, এদিকে এসো—। মহিলারা তাকে নিয়ে এলেন ঘরের এক কোণে, সেখানে কুলোয় জ্বলছে প্রদীপ। মামিমার কুলোর মতোই, তবে চিত্রি-বিচিত্রি বেশি, জিনিস আরো বেশি সাজানো, তার কোনো-কোনোটা সত্যেনকে ছুঁতে হল, তারপর সেই পানের পাতাটি ঘটে ডুবিয়ে তার গায়ে জ্বল ছিটোলেন কালো মহিলা। এখন কপালে কুলো ঠেকানো হবে ভেবে সত্যেন আগে থেকেই ঘাড় বাড়াল কিন্তু কোনো এক রহস্যময় কারণে সেটা বাদ পড়ল, মহিলারা উঠলেন, পুরো দলটি ছাতে ফিরল তাকে নিয়ে, পাকাচুলের মহিলা সুদ্ধ।

* * * * *

ছোটনের পিঠে পিছন থেকে খোঁচা দিয়ে তাতা ডাকল—এই—! ঘুমোচ্ছিস নাকি?

না তো— দুলে-পড়া মাথাটা একটানে সোজা করল ছোটন। শুয়ে থাক না নিচে গিয়ে— এটুকু দিদিগিরি ফলিয়েই তাতা ফিরল বিজলীর দিকে। শোভার বড়ো মেয়ে বিজলী, এই দু-দিনেই জমাট ভাব হয়ে গেছে দুজনে। এই মাত্র ফিরে আসা বরের দিকে তাকিয়ে বিজলী বলল—
বিয়েতে কিন্তু মেয়েদেরই জিত।

জিত কেন?

কস্তু শাড়ি গয়না পায়! কী মজা না রে?

মজা না হাতি, এদিকে মাকে ছেড়ে থাকতে হয় যে? বাব্বা রে বাবা!

কিন্তু স্বামীমাসির তো মা নেই—মনে পড়ল বিজলীর।

মা না থাক বাবা তো আছে! ও একই হল।

তাতার চকিতে মনে পড়ল তার নিজের বাবাকে, কিন্তু তখনই আবার বলল—মজা তো ছেলেদেরই। বলতেই বলে জামাই-আদর। আর স্বশুরবাড়িতে মেয়েদের?

ছেলেরা তো আর স্বশুরবাড়িতে থাকে না—বলে উঠল পাশ থেকে আর একটি মেয়ে—জামাই আদর কদিন আর! এই কথাবার্তা শুনতে পেল বুলন, মহাশ্বেতার মেজ ছেলি। ভাবল—চ্ছেঃ! বয়ে গেছে ছেলেদের স্বশুরবাড়িতে থাকতে। মেয়েগুলো কী রে! খালি বিয়ে-বিয়ে মন! তা ওরা বিয়ে করে করুক—তা ছাড়া আর হবেই বা কী মেয়েগুলোকে দিয়ে, কিন্তু ছেলেরা কেন যে—! আচ্ছা দাদা, মনের কথাটা সে না বলে আর পারল না—ছেলেরা কেন বিয়ে করে? কী বোকার মতো কথা! অমল, তার দেড় বছরের বড়ো, ছোটো ভাইয়ের অজ্ঞতায় হাসল।
স্বেকার মতো কেন—?

বা রে! বুলনের কথায় বাধা দিল ওটু, তার দুবছরের ছোটো—বিয়ে করে বলেই তো লোকের ছেলেপুলে হয়।

ওটু— তাতা ধমক দিল পিছন থেকে। কী যে অসভ্য ছেলেগুলো...সত্যি! তাতাদির দিকে একটা কস্টার দৃষ্টি হুঁড়ে ওটু চুপ করল, আর বুলন ভাবল, ছেলেপুলে? ছেলেপুলেও তো মেয়েদেরই হয়! তাহলে—আর ঐ ওএগুও...ওএগুও বাচ্চাগুলো যেন হতেই হবে। কিছু বোঝে না ওটুটা।

বুলন আরো খানিকটা ভাবল, কিন্তু কিছুই ভেবে পেল না, আবার মন দিল পুরুষ হয়েও বিয়ে করতে রাজি-হওয়া নতুন মানুষটিকে দেখতে। ততক্ষণে সম্প্রদান আরম্ভ হয়েছে। মুখোমুখি বসেছে বর-কনে, আর তাদের মাঝখানে মঙ্গলঘট রেখে তার উপর লম্বা করে কুশ সাজাচ্ছেন পুরুতঠাকুর। হঠাৎ অরুণকে পাশে দেখে কিরণ বস্ত্র জিগেস করল—বরপক্ষের পুরুত আসেনি?

আবার বরপক্ষের? অরুণ আবছা হাসল। হ্যাঁ— কিরণও হাসল— আর সত্যেন যে রকম... কথা শেষ না করে চোখ নামাল। পুরুত বললেন—বরের দক্ষিণ হস্ত এখানে স্থাপন করো। সত্যেন ঘটের উপর উপুড় করে হাত রাখল।

হস্ত উত্তান করো। সত্যেন পুরুতের দিকে তাকাল, পুরুত তার হাতটি হাতে ধরে ঘটের উপর চিৎ করে দিলেন। উত্তান মানে চিৎ?—বাঃ! সুন্দর একটা নতুন কথা শিখে সত্যেন খুশি হল, আর একটু পরেই স্বাতীর ডান হাতটি আস্তে নামল আকাশের তলায় মেলে ধরা তার হাতের উপর। উত্তান হাত, মৃদু, অসীম মৃদুতা তার... প্রায় স্পর্শহীন। পুরুত একগাছা কুশ দিয়ে দুই হাত বেঁধে দিলেন, তারপর বিজনের মুখোমুখি বসে পুঁথি খুললেন। বিজন এতক্ষণ একভাবে বসে ছিল, নিচু মাথায়, খুতনি প্রায় বুকে ছুঁয়ে, আবার মন্ত্র শুনে ভিত্তি চোখে তাকাল। পুরুতের মুখের উপর চোখ রেখে অশ্রুট স্বরে ঠোট নাড়ল সে। আর সত্যেন একটু চেষ্টাই করল মন দিয়ে সবটা শুনে নিয়ে স্পষ্ট করে বলতে, যেন এখানেও তার শিক্ষার মানরক্ষা চাই। পুরুত বললেন—এনাং কন্যাং সালংকারাং— বিজন আণ্ডাল—এনাং কন্যাং শঙ্করালাং—

সবদ্বাচ্ছাদনাং—

শস্ত্রচ্ছেদনাং—

প্রজাপতিদেবতাকাং—

প্রজাপতিদেবাতাতাং—

তুভ্যমহং সম্প্রদদে—

তুমব্ভয়ং সম্প্রদদে।

বরের হাতে ওটা কী দিল রে?—জিগেস করল অনুপমা। কে জানে! চিত্রা ফিসফিস ইভার দিকে—
ঐ মেয়েটিকে দ্যাখ!

কোন?

ঐ বেগনি শাড়ি। নেকলেসটা নতুন রকমের, না?

নতুন আর কী! ঐ তো রেডিও-মালা।

এভিঃ কন্যা ময়া দস্তা রক্ষণং পোষণং কুরু—পুরুতের মোটা গলা ইভার কানে বাজল। হেসে বলল—রক্ষণং পোষণং কুরু! কেন, মেয়েরা বুঝি আর নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না? বলে ঈষৎ তাকাল উর্মিলার দিকে, কিন্তু এমন একটা মনঃপূত কথার পিঠেও তার নতুন বান্ধবী শুধু চোখের পাতা নেড়ে সায় দিল, কিছু বলল না। বলল না, যেহেতু উর্মিলা তখন একটু বিশেষভাবে ব্যস্ত ছিল। ব্যস্ত ছিল বিজনকে দেখতে। বিজনের মুখটা যেন মার-খাওয়া, তয়-পাওয়া আর সেইসঙ্গে দারুণ গম্ভীর। কিছুই মেলে না তার বিজনদার সঙ্গে, যাকে সে চেনে, যাকে সে মনে-মনে জানে তার দেখন-হাসির এক নম্বর বাজিয়াৎ। সেই বোকা... ভাল... সুশ্রী...

মজার...সব মিলিয়ে ইচ্ছে-করা মুখটার কোনো চিহ্ন কোনো একটু খিলিক উর্মিলা তাকিয়ে-তাকিয়ে খুঁজল। কিছুই পেল না। এমন একটি মুহূর্ত পেল না বিজনের মুখের ভাব যখন বদলাল, এমন একটি মুহূর্ত পেল না যখন বিজন মুখ তুলে চারিদিকে দেখল, তাকে দেখতে পেল—অতক্ষণ ধরে তাকিয়ে থেকে আর তারপরে ঘন-ঘন তাকিয়েও, তার বিজনদার সঙ্গে একবার চোখাচোখি করতে পারল না উর্মিলা। শুধু উর্মিলাকে না, তখনকার মতো অন্য সবই ভুলে ছিল বিজন। স্বাতীর সম্প্রদানের ভার যে তারই উপর পড়ল, এর গুরুত্ব সে আজ সকাল থেকে অভিজ্ঞত। আচারে-অনুষ্ঠানে একটু ফাঁক সে থাকতে দেবে না, সারাটা দিন ঠায় উপোস করে আছে বেচারা। বিকেলের দিকে বড়োপিসি বুঝি একবার বলেছিলেন—স্বাতী একটু ফল মিষ্টি খেয়ে নিক না, ওতে কী আছে? বিজন শোনামাত্র ব্যাকুল বাধা দিল। কী আছে! কে জানে কী আছে? কিন্তু আমরা জানি না বলে যে কিছুই নেই তা-ই বা কে জানে! কিছু না থাকলে নিয়ম থাকবে কেন? আর বোনের বিয়ে দিতে বসে এই অবাধ হওয়া কে-জানে-কী ভাবটা তাকে ছাড়ছিল না, ওরা যেন দূরে চলে গেছে, গল্পের মানুষ হয়ে গেছে। দীনবন্ধু হাইস্কুলের ষাট টাকা মাইনের হেড-পণ্ডিতের তোবড়ানো মুখটা দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল মহাপুরুষ, আর সেই মহাপুরুষের কথামতো এই যে সে কোশার জলে হাত ডোবাল, ডান হাতে ত্রিপত্র ধরল, আবার সেই ডান হাতের উপর বাঁ হাতটি উপুড় করল আর তারপর এইমাত্র যে সামনের শস্ত, শূন্য মেঝেটায় মাথা ঠেকাল—এর প্রত্যেকটাই^১ খুব আশ্চর্য লাগছিল বিজনের, আশ্চর্য, রহস্যময়... প্রায় অলৌকিক। পুরুত একবার পিঠ সোজা করলেন, গায়ের নামাবলীর ভাঁজ বদলালেন। তারপর অন্য কয়েকটা কোশাকুশি ঠিকঠাক করে সাজিয়ে আবার পুঁথি খুলে বরের দিকে তাকালেন—ওঁ যা অকৃন্তনবয়ন...

হারীত হঠাৎ বলল—আশ্চর্য! সব মন্ত্রই বরের? কন্যার কিছু নেই?

আবার কী? মৃদু টিপনি করলেন তপনদা—মেয়েদের তো শুধু রাজি হওয়ার পাট।

তাতে তাদের সুবিধেই—অরুণ একচোখে তাকাল ব্যারিস্টারের দিকে—স্বামীদের দিয়ে সাংঘাতিক সব প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিজেরা দিব্য নিশ্চিন্ত! অরুণের কথাটা উপভোগ করে কিরণ বলল—আর বরের মন্ত্রগুলো? খালি তো খোশামোদ!

পুরুত হঠাৎ থামলেন। স্কুলের ক্লাসে খুব বেশি গোলমাল হলে যেমন করে তাকান, সেইরকম ক্লাস্ত...অনিচ্ছুক...মাছের মতো জোলো চোখ তুলে কন্যাকর্তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—কন্যার মন্ত্র কি জামাতা বলে দেবেন? হেমাঙ্গ তৎক্ষণাৎ বলল—বেশ।

কেন? কন্যাই বলুন না—বলে উঠল অরুণ। পুরুত স্বামীদের দিকে তাকালেন। সত্যেন বলল—নিশ্চয়ই, কন্যাই বলবেন। পুরুষদের গলার মৃদু হাসি উঠল। হাসির শব্দ মিলোবার পর পুরুত কন্যার দিকে তাকিয়ে আগের চেয়েও আস্তে আস্তে বললেন—ওঁ প্র মে পতিযানঃ পত্ন্যঃ কল্লভাং, শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গমেয়ম্। পুরুতের মোটা গলা, আর সংস্কৃতের ছন্দ, স্বাতীর বুকের মধ্যে হঠাৎ যেন গুমগুম আওয়াজ তুলল, স্বাতী বলতে পারল না। খুব নিচু গলায় বিজন বলল—স্বাতী বল। স্বাতী দাদার দিকে চোখ ফেরাল, যেন এতক্ষণে দাদার অস্তিত্ব অনুভব করল তার কাছে...অত কাছে। এতক্ষণে দাদার মুখটা স্পষ্ট দেখল। কিন্তু যে দাদাকে সে চেনে, জন্ম থেকে যে তার একসঙ্গে আর জন্ম থেকেই তার সঙ্গে যার আড়ি—সেই গোঁয়ার-বদরাগি-

ঝগড়াটে-স্যাৎসেঁতে-কাঁদুনি-হিংসুক-নিষ্কর্মা-অসত্য দাদাকে একেবারেই দেখতে পেল না। এ যেন অন্য কেউ, অন্য মানুষ। একে সে আগে কোনোদিন দ্যাখেনি। পুরুত আবার বললেন—
ওঁ প্র মে পতিযানঃ পস্থাঃ। স্বাতী বিসর্গ বাদ দিয়ে আস্তে আস্তে বলল—ওঁ প্র মে পতিযান পস্থা
কল্পতাং, শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গমেয়ম্। পুরুষের মোটা গলার পাশে পাশে তার উপোস করা
মেয়েলি ক্ষীণ স্বর অদ্ভুত শুনল সত্যেন। অদ্ভুত, অস্বাভাবিক, স্নিগ্ধ... অসীম তার স্নিগ্ধতা। পুরুত
পুঁথি বন্ধ করে দুই হাতের কুশের বাঁধন খুলে দিলেন। যাক, হল। সত্যেন পিঠ টান করল
প্রথমে। তারপরেই বাঁ হাতে আলগোছে ধরে ঐ বিশ্রী বস্তুটাকে নামাল মাথা থেকে। ও কী!
মহাশ্বেতা বলে উঠল—টোপর খুললে কেন?

আর কী হবে— নিশ্চিন্ত মোলায়েম জবাব দিল সত্যেন। সরস্বতী সংক্ষেপে বলল—আরো
আছে, বাচ্চারা সরে বসো তো এবার। ছোটন চোখ টান করে তাকাল, বাচ্চারা এই ফাঁকে একটু
সোরগোল করে নিয়ে সরে বসল। বিজন আসন ছেড়ে উঠে হেমাস্রর পাশে দাঁড়াল। সামনের
ফাঁকা হওয়া জায়গাটুকুতে পুরুত হোমের আগুন জ্বালালেন, স্বাতী উঠল পিড়ি ছেড়ে। পিড়িটা
সরিয়ে আনল শাস্বতী, স্বাতী আবার বসল সত্যেনের পাশে। কাঁধের কাছে হালকা হেঁওয়া
পেয়ে সত্যেন ফিরে তাকাল—কী?

কিছু না—বলে সরস্বতী তার পাটরঙের উড়নিটার একটা কোণ তুলে ধরল, স্বাতীর গোলাপি
ওড়নার প্রান্তটা এগিয়ে দিল মহাশ্বেতা। ক্ষিপ্ত আঙুলে দুটোয় বেঁধে দিয়ে সরস্বতী আবার
বলল—কিছু না।

এইরকম থাকবে? সত্যেনের চোখ বড়ো হল, এতকিছুর পরেও এটা যেন অবিশ্বাস্য লাগল।
হ্যাঁ, এইরকমও— বলে সরস্বতী টোপরটা তুলে আবার চাপিয়ে দিল তার মাথায়। সত্যেনের
মাথা হেঁট হল, শোলার ফুল শুড়শুড়ি দিল কানে। শোভা বলে উঠল—এখনই যজ্ঞ যে?
হলেই হয়— জবাব দিলেন লীলামাসি।—না, না, পরের দিন সকালে তো? উষাবৌদি
বললেন—সে ভাই এক-এক দেশের এক-এক আচার—আমার বাপের বাড়িতেই তো বিয়ের
রাত্রেই সব সেরে দেয়।

ভালও তা-ই। যা কষ্ট আবার পরের দিন বেলা দুপুর অবধি—ধোঁয়ায় যা চোখ জ্বলেছিল
এখনো মনে আছে—বলে লীলামাসি একটু হাসলেন।

নীলচে ধোঁয়া উঠল সত্যেনের চোখের সামনে। রথুবংশ মনে পড়ল তাঁর, যজ্ঞের ধোঁয়ায় লাল
হওয়া সীতার চোখ। স্বাতীর চোখও—? তাকাতে যাচ্ছিল, কিন্তু পুরুত তখনই তার হাতে
বাচ্চাদের ঝিনুকের মতো কী একটা দিয়ে বললেন—অগ্নিতে অর্পণ করো। সত্যেন প্রথমে
ভেবেছিল ঐ ঝিনুকটাকেই বুঝি আগুনে ফেলতে হবে, তারপর দেখল—না, ওতে ঘি আছে।
আগুনে ঘি দিল সে, ছ-বার দিতে হল, ওরকম। ঘি-খাওয়া আগুন আরো লাল হল, নীল ধোঁয়া
ফিকে হল। তারপর মন্ত্র। চলল মন্ত্র পড়া। ঠিকমতো খলার চেষ্টা করতে করতে সত্যেন হঠাৎ
একবার ভাবল—কত? কখন ফুরবে? জায়গাটা যেন আগের চেয়ে চূপচাপ, পুরুতের পেশাদার
গলা আরো ভারি শোনাচ্ছে। মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক তাকাল সত্যেন। লাল মালা, রূপোলি
আঁচল, ছোড়দির হাসিমুখ এখন গভীর—ছোড়দি ডাকবে কাল থেকে? একবার বড়দিকে দেখল
লোটনকে কোলে নিয়ে, একবার রাজেনবাবুর ছাইরঙা আলোয়ানটা আবছা চোখে পড়ল।

আরে! ছোটন যে ঘুমিয়ে পড়ল এদিকে!

ছোটনকে চট করে তুলে নিয়ে গেল ডালিম। রাত বাড়ল, কিরণের পিছন থেকে সরে নিখিল এসে বিজনের কাছে দাঁড়াল। শীত বাড়ল, সতুদার আলোয়ানটার ভাঁজ খুলে বিজনের পিঠের উপর ছড়িয়ে দিল নিখিল। বিজন সেটা জড়িয়ে নিতে-নিতে কিছু না বলে নিখিলের দিকে তাকাল, খানিকটা সময় কেউ যেন কিছু বলল না। চারদিকের চাপা কথার গুনগুনানি থামল। শুধু জাগিয়ে-রাখা আগুন পটপট শব্দে সংস্কৃত বলতে লাগল, অন্য সব চুপ করে থাকার উপর দিয়ে স্মৃতির মতো ভাসতে লাগল সংস্কৃত ছন্দ, প্রতিশ্রুতির মতো মাথা তুলেই ডুবে গেল। মহাশ্বেতা-সরস্বতীর মনে পড়ল সেই রাতটির কথা, যখন তারা একই সঙ্গে একই হাতের দুটো অংশে এইরকম সেজে, এইরকম পিঁড়িতে ঠিক এমনি করেই বসেছিল। দু-বোনে চোখাচোখি করল। সরস্বতী তাকাল অরুণের দিকে, মহাশ্বেতা হেমঙ্গর দিকে, তারপর মহাশ্বেতা অরুণের দিকে তাকাল। অনুপমা, চিত্রা ভাবল যে তারাও একদিন এমনি পিঁড়িতে বসবে—কবে? কার সামনে? কে?—ভাবতেই লাল হল দুজনে, আর ঠিক তখনই দুজনের চোখাচোখি হল। উর্মিলার হঠাৎ তার মাকে মনে পড়ল...তার ছেলেবেলা...নাথুরামপুর...চোদ্দ বছর বয়সে তার সেই বিয়ের সম্বন্ধ—ছেলেটা লুকিয়ে চলে এসেছিল আড়ে-ঠারে তাকে একটু চোখে দেখবে বলে—প্রায় হয়েই যাচ্ছিল, কিন্তু বাবা হঠাৎ—যদি বাবা হঠাৎ মরে না যেতেন, যদি চোদ্দ বছর বয়সে লুকিয়ে চোখে দেখতে আসা সেই ইন্দু নাগের সঙ্গেই... নামটা মনে আছে এখনো—তার বিয়ে হয়ে যেত, তাহলে এতদিনে কেমন হত? উর্মিলা সেই কথাটা ভাবল একটু। আর ইভা গাঙ্গুলির চোখ কাকে যেন, কী যেন খুঁজে খুঁজে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তালিমের কোঁকড়া চুলের তলায় ফর্সা মুখের উপর স্থির হল...আহা, বড্ডো ছেলেমানুষ।

ডালিমকে ঠেলে কুন্দদিদিমা সামনে এলেন হাতে একটা মাটির ভাঁড় নিয়ে। এসেই নিচু হয়ে সেই ভাঁড়ে আঙুল ডুবিয়ে ডুবিয়ে বর-কনের সামনে কোণাকুণি করে সাতটা গোল-গোল পিটুলির দাগ একে ফেললেন, মেঝের উপর। এটা কী রে? জিগেস করল ইরু। আতা জবাব দিল—সপ্তপদী।

সপ্তপদী মানে?

দেখবিই— আতা গম্ভীর মুখে আরো একটু খবর দিল—এটাই তো আসল বিয়ে। বর-কনে উঠল, নড়তে গিয়ে টান পড়ল সত্যেনের পিঠে। ও, সেই বাঁধা আছে এখনো। কতক্ষণ থাকবে? এবার নামো গো পিঁড়ি থেকে—কাছে এলেন বড়োপিসি। গাঁটছড়া দিয়ে সন্তর্পণে পা ফেলল দুজনে, সেই গোল-গোল দাগের সামনে পাশাপাশি দাঁড়াল। পিঁড়ি বললেন—স্বাতী সামনে আয়। স্বাতীর এগোবার টানে এবার সত্যেনের উড়নিটা প্রায় খসেই পড়ল কাঁধ থেকে। সরস্বতী পিছন থেকে সেটা ঘুরিয়ে ঠিক করে দিল। স্বাতী সামনে এল, সত্যেন, পিছনে থাকল। স্বাতীর দুপাশ দিয়ে বাড়িয়ে দুহাত অঞ্জলি করে মেলে ধরল সত্যেন আর সেই হাতের উপর স্বাতী তার দুহাত অঞ্জলি করে পাতল। তাদের দুপাশে চট করে দাঁড়িয়ে গেল মহাশ্বেতা আর সরস্বতী, আর শাম্ভতী হাজির থাকল খইয়ের থালা হাতে নিয়ে। বড়োপিসি গুনগুন করে বুঝিয়ে দিলেন কী করতে হবে—প্রথমে ডান পা, তারপর বাঁ পা...এক-একবার এক-একটা গোল দাগে...আর তুমি স্বাতীর হাত দিয়ে এক-একবার এক-এক মুঠো খই। ঠিক ঈশানকোণে একেছেন তো?—পিসি

ফিরে তাকালেন ভাঁড় হাতে কুন্দদিদিমার দিকে। কুন্দদিদিমা জবাবের বদলে মুচকি হাসলেন। হ্যাঁ—এর অণুকোটি তাঁর মুখস্ত, তাঁর ভুল হবে? প্রথম ডান পা, তারপর বাঁ পা, উত্তর-পূর্ব কোণের প্রথম মণ্ডলে পা পড়ল। বাঃ, ঠিক পড়েছে! শাস্ত্রী স্বাতীর মুঠো ভরে খই দিল, সত্যেন চোখ দিয়ে একটু তাক করে নিজের হাতটা ঠেলে দিল উপরদিকে। স্বাতীর হাত থেকে খই ছিটোল, মাত্র কয়েকটা আঙুনে পড়ল, বেশির ভাগই বাইরে।

ওঁ সখা সপ্তপদী ভব, সখ্যন্তে গমেয়—। পুরুতের গলা উঠল আবার—সখ্যন্তে মা যোষাঃ, সখ্যন্তে মা যোষ্ঠাঃ। হঠাৎ একটু ঝিমুনি এসেছিল হেমাঙ্গর, তার রেঙ্গুনের আপিশের কাঠের সিঁড়িতে উঠতে উঠতে হাঁচট খেল...বিয়ে—কলকাতা, ভাল—মহাশ্বেতার এতকালের ইচ্ছে মিটল, এখন ওর শরীরটা সারলেই—ওর মা যে রকম ভুগে ভুগে শেষটায়—কী বাজে কথা ভাবছি...মুখে একবার হাত বুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল হেমাঙ্গ, সামনে দেখতে পেল অরুণকে। অরুণ হাসল, কিন্তু হেমাঙ্গর জন্য না, হাসল সেই দিনটির কথা ভেবে, যেদিন দামি চকোলেট এনেছিল বলে শিশিরকণা তাকে বকেছিলেন। ভাগ্যিণী বকেছিলেন, তাই তো সে জানতে পেল ওখানেই তার মন বাঁধা। আর তারপরে ছুটিতে যখন দেশে যাচ্ছে তখন ট্রেনে শুয়ে-শুয়ে কেমন করে যেন জানল যে মহাশ্বেতা খুব ভাল হলোও সরস্বতীর কাছে...কী সব ভাবছে! আর এতকাল পরে মনেই বা পড়ল কেন?

ওঁ সমঞ্জস্তু বিম্বে দেবাঃ, সমাপো হৃদয়ানি নৌ। সম্মাত্রিষ্ণা সং ধাতা, সমু দেষ্টী দধাতু নৌ। ঘি পড়ল আঙুনে, খই পড়ল আঙুনে, মেয়েরা শূন্যে খই ছিটোল...সামনের দিকের এর মধ্যেই ফিকে হওয়া দাগে নতুন করে পিটুলি টানলেন কুন্দদিদিমা। শোভা ভাবল—শেষ, প্রায় শেষ, ছুটি ফুরোল, নটে মুড়োল। আবার সেই—হঠাৎ ভাবল—সে! ও হ্যাঁ, চলে গেছে। কখন গেল? বলে গেল না একবার? বলাবলির আর কী আছে—আর যা মুখচোরা মানুষ—আর যা ভিড়—আর যা খাটুনি সারাদিন—আমিও তো দুদিন ধরে এখানেই, নাকি রাগ করল? এমনিতে সাত চড়ে রা ফোটে না কিন্তু আমার উপর রাগ আছে ঠিক!

ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু, মম চিত্তমনু চিত্তং তে অস্তু। সামনে স্বাতী, পিছনে সত্যেন, হাতে হাতে অঞ্জলি পাতা—সুন্দর, কী সুন্দর মানিয়েছে! বড়োপিসির চোখে জল এল। স্বাতীর পিসে দেখল না? ঘুমুচ্ছে নিচে। ঘুমুচ্ছে তো? ঘুম ভাঙলেই তো জল চাই, পান চাই, পান আবার ছেঁচে দিতে হবে—ফোকলা বড়োকে নিয়ে জ্বালাতন কি কম! আর এই মানুষই কী ছিল দেখতে, যখন...বড়োপিসির হাসি পেল।

ওঁ অন্নপ্রাশেন মণিনা প্রাণসূত্রেন পৃথ্বিনা... শেষের কাছাকাছি এসে পুরুতের যেন উৎসাহ বাড়ল, গলা চড়ল—বধামি সত্যগ্রহিণী, মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে। মানে কী কথাগুলির?—উষাবৌদি ভাবলেন। শুনতে কিন্তু সুন্দর। উনি নাকি সংস্কৃত পড়েছিলেন কলেজে। তা কী-বা হল ও সব পড়ে-টড়ে—জন্ম ভরে তো রেলের চাকরি, আর চাকরিও বাবা, বারোমাসে চোদ্দ-চুয়ার লেগেই আছে। আসবার কথা তো শুকুরবারে—এখন কে জানে—আর এই বিয়ের জন্য দুটো দিন আগে এলেই হত। না, তেমন মানুষই না! চাকরিই প্রাণ!

যদেতদ্দৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম। যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব। হৃদয়! কথাটা হঠাৎ কানে গেল ইরু, গীতি, আতার—একটু কঁপে উঠল লাল-কমলা-সবুজ শাড়ি। হৃদয়! ওটা

এখনো মজার কথা তাদের কাছে, ঠাট্টার কথা, কোনো ছাপা বইয়ে চোখে পড়লে হাসির শুড়শুড়ি লাগে। কিন্তু এখন তারা কাঁপল, কৌতুকে না—কৌতুহলেও না, কথাটা শুনে মুহূর্তের জন্য রোমাঞ্চ হল তাদের। যে যৌবন তাদের ঠিক জাগেনি কিন্তু জাগল বলে, তারই একটু বিদ্যুৎ চকিতে বয়ে গেল তাদের শরীরে, আর নিখিলের হঠাৎ মনে হল কারখানায় পেরেক ঠোকে তাতে কী... কষ্টে আছে তাতে কী... কোনো ভয় নেই, কোনো দুঃখ নেই, সে সব পারে, তার সব আছে। আর কিরণ বস্তু বুঝল, স্পষ্ট বুঝল—যা এর আগে এমন নিশ্চিত বোঝেনি—যে অনীতাকে ছেড়ে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব... অসম্ভব। না, দেবে না যেতে। শ্বশুর রাগ করে করুক, মা-বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয় তো হোক। বোমার ভয়ে কলকাতা সুদূর লোক ভাগলেও অনীতা যাবে না, সেও যাবে না—নয়তো দুজনই একসঙ্গে যাবে। সেই মালাটা তখন রেখেছিল না পকেটে? হ্যাঁ, আছে...

শেষের গোল দাগটিতে পা পড়ল, আবার খই পড়ল আঙুনে, আরো খই, আরো মন্থ, শাঁখ...সেই কেমন-কেমন চূপচাপের বেড়া ভেঙে গিয়ে আবার কথা। হাসি, চলাফেরা, সংখ্যায় কমে যাওয়া বাচ্চার দল উঠে পড়ল। প্রভাতমেসো ভাবলেন লীলা কি আর থাকতে চাইবে? বিজনের কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে হেমাঙ্গ বলল—তুমি এবার...আর ডালিম নিখিলকে বলল—আপনি কী...আর শাস্বতীর মুখ থেকে চোখ সরিয়ে ভিড় থেকে সরে দাঁড়াল হারীত। ইশ! কতসময় নষ্ট হল, এতক্ষণে সে ইস্তাহারটা লিখে ফেলতে পারত। আবার সব তার মনে পড়ল—জাপানের কুচক্র, রাশিয়ার বিপদ, নির্বোধ বাঙালি বাবুরা, মনে পড়ল তাদের প্রতিরোধ-সংঘের প্রকাশ্য দায়িত্ব! কী কাণ্ড... ভুলেই ছিলাম এতক্ষণ! সাথে কি আর আফিং বলেছে! নাঃ...এই মুহূর্তে বাড়ি, হেঁটেই, গিয়েই ঘুম, তারপর কাল সকালেই—হারীত গৌ নিয়ে নেমে গেল সকালের আগে, কিন্তু দোতলায় এসেই থামল। শাস্বতী কি—? না সে তো থাকছে, সে তো বজতে গেলে আজকাল বাপের বাড়িতেই—বাঙালি মেয়েদের এই বাপের বাড়ি এক ব্যাপার। আজ থেকে স্বাতীরও বাপের বাড়ি। দোতলা থেকে একতলায় একটু শীরে নামল হারীত। নামতে নামতে কেন যে মনে পড়ল সেই যতীন দাস রোডের বাড়ি...এদিকে গাঁটছড়া-বাঁধা স্বাতী-সেতিনকে মেয়ের দল ঘিরে ফেলল...স্বাতীর জন্মদিনের গানের আসর, সেই প্রথম ও বাড়িতে... এ বাড়িতে হাঁটি-হাঁটি পা-পা বর-কন্যা চললেন... খুব কিন্তু শুনিয়েছিল স্বাতী সেই গাহিয়েটিকে... পিছন-পিছন সবাই চলল... বাজে ছোকরা...আর শাস্বতী সেদিন...আর শাস্বতী স্বাতীর পিঠে হাত রাখল। বিজন শীতে কোঁপে উঠল একবার... ছাতের দূরের অর্ধেকটা খালি হল আর মহাশ্বেতা স্বাতীর ঠিক পিছনে... প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়েই মহাশ্বেতার কেঁদে উঠেছিল যে এখনই তার মাথা ধরবে।

*

*

কিন্তু বাসরঘরে এসেই মাথা ধরার কথা ভুলে গেল। এই ঘরেই সন্ধ্যাবেলা শুয়েছিল সে? তার মনে হল আলো এখন অনেক বেশি উজ্জ্বল। ঘরটাকে আরো বড়ো লাগল, সজীব লাগল। যেন প্রাণ পেয়েছে এতক্ষণে, যেন তাদের সকলের অচেতন এই হঠাৎ-ভাড়া-করা-বাড়ির এই ঘর ঠিক এরই জন্য তৈরি হয়েছিল। আর তৈরি হবার পর থেকে ঠিক এই মুহূর্তটাই অপেক্ষায় ছিল। আলনায় সাজানো শাড়ির রঙবেরঙের আলো চোখাচোখি দেখল মহাশ্বেতা— চোখে চোখে

বলছে—এসেছ? এসেছ? আলো ভরা আয়না থেকে পিছল বার্নিশে জবাব ঝরল— এই তো! এই তো! এসেছে! ঘরের প্রত্যেকটা জিনিস হেসে-হেসে একথা বলল। চারটে সাদা দেয়ালও তাই বলল। চারদিক থেকে ফিরল মহাশ্বেতার চোখ, স্বাতী-সত্যেনের দিকে ফিরল, মেঝের বিছানায় বসল ওরা। বসতে গিয়ে ভুল করল... স্বাতী এদিকে আয়। স্বাতী এল সত্যেনের বাঁ দিকে...আমিও একদিন ঐ রকম... কেমন লেগেছিল?—কে জানে কেমন? কিছু মনে পড়ে না...কিন্তু এই গন্ধটা যেন চেনা-চেনা—কীসের? কোনো কিছুর না, বাসরঘরেরই গন্ধ এটা...নতুন, নতুনের...নতুনের সূক্ষ্ম-সুন্দর-অদ্ভুত সুবাস। মহাশ্বেতা বুক ভরে সুবাস নিল—মাথাটা হঠাৎ... না। না, মাথা ধরল না মহাশ্বেতার, কি ধরে থাকলেও সে বুঝল না। শেষ পর্যন্ত ঠিক থাকল, ফুটির একটি ফোঁটাও হারাল না। সব দেখল— চাল-খেলা, জলে শোলা-ভাসানো, শাশ্বতীর বেশি বেশি ব্যস্ততা—ভাবটা যেন ও না-থাকলে কিছুই হত না—সব শুনল। ভাঙা গলায় এক-কথা দশবার বলা বড়োপিসি, সরস্বতীর টিপ্পনি, কুন্দদিদিমার মশকরা—কতবার যে কারণে-অকারণে হাসল! তারপর প্রভাতমেসো হঠাৎ কোথেকে এসে বললেন, আমরা তাহলে...লীলা মাসি নড়লেন, উষাবৌদি বললেন আমিও তাহলে...আরো কেউ কেউ নড়ল, উনি এসে বললেন চলুন—গলায় আবাস মাফলারটা কেন?—আপনি আর কেন... চলুন... যাই তাহলে...আচ্ছা যাই, যাচ্ছি...ভিড় কমল। গীতির মাথা আতার কাঁধে ঢুলল, কথা কমল। চোখে হঠাৎ ঝাপসা দেখল মহাশ্বেতা, হাসির শব্দ থেমে গিয়ে হাওয়ায় শুধু রেশ থাকল। রেশ কাঁপল, থামল... তারপর হঠাৎ সব চূপ।

ছোট্টো হাই চেপে সরস্বতী বলল—এবার ওদের ছুটি দাও কুন্দদিদিমা, যমোক্ত।

সত্যেনের বুদ্ধি ঘুম পেয়েছে? কুন্দদিদিমা কটাক্ষ হানলেন।

তাদের বিয়েতে, মহাশ্বেতা? বড়োপিসির মনে পড়ল—দুটোয় লগ্ন তায় আষাঢ় মাস, বাসরেই—

হ্যাঁ, বাসরেই ভোর! মুখের কথা কেড়ে নিলেন কুন্দদিদিমা—মজাই হয়েছিল।

আর কেমন বৃষ্টি নামল বিয়ের মধ্যে, আর ঠিক তখন কিনা বড়োবৌ—বড়োপিসি বলতে বলতে থামলেন। বড়োবৌ? মা? মহাশ্বেতা সরস্বতীর দিকে তাকাল। মাঝে মনে পড়ল দু-বোনের। মনে পড়ল তাদের বিয়ের মধ্যে মা হঠাৎ এমন অস্থির হয়ে পড়েছিলেন যে ঐ রাত্তিরে আর ঐ বৃষ্টিতে তখনই ডাক্তার ডেকে ইঞ্জেকশন দিতে হয়েছিল—তারি শুনেনি পরের দিন...ঈষৎ বিষন্ন লাগল তাদের। সেটা বুঝতে পেরে বড়োপিসি কথা বদলালেন—আর পরের দিন বিয়ে দেখল না বলে স্বাতীর কী কান্না!

মেজদি-সেজদির বিয়েতে স্বাতী অন্য কারণেও কঁদেছিল—শাশ্বতী মুখ টিপে হাসল, চোখাচোখি করল মেজদি-সেজদির সঙ্গে। দু-বোনের মনে পড়ল ‘আমি অরুণদাকে বিয়ে করব’ বলে পাঁচ বছরের স্বাতীর খুনোখুনি। ভিন-বোনের চোখে-চোখে বয়ে গেল অন্যদের না-জানা নিঃশব্দ কৌতুক, কিন্তু মহাশ্বেতাকে এই কৌতুকটা কোথায় একটু খোঁচাও দিল। স্বাতীর দিকে ফিরে শাশ্বতী হাসল—বলে দেব নাকি? অরুণ কাশল। শ্বেতা ঘরে এসে কাছে দাঁড়াল—স্বাতী, আমি এখন যাই রে—

যাচ্ছে দিদি? মহাশ্বেতা তাকাল—থাকো না।

না, যাই— স্বাতীর দিকে সত্যেনের দিকে ফিরে, যেন তাদের সম্মতিটাই আসল, এমনি সুরে
শ্বেতা বলল—কাল সকালেই চলে আসব, কেমন?

তুমি করলে কী এতক্ষণ? জিগ্যেস করল সরস্বতী।—এই বাচ্চাগুলোকে একটু ঠিকঠাক
করে...রণক্ষেত্রের মতো পড়ে ছিল তো সব! আতা, গীতি এবার শুয়ে থাক না গিয়ে—ঘুমে
চুলছিস তো!

ইরু? মেয়েকে হঠাৎ মনে পড়ল মহাশ্বেতার।

তোর মেয়ে বেনারসি পরেই ঘুমুচ্ছে রে—শ্বেতা হাসল। ঘুমুচ্ছে? গীতির কানে গেল কথাটা।
কে? আমি? না, আমি তো জেগে আছি—এই তো! কিন্তু চোখ তখনই আবার জড়াল, ট্রেনের
দোলা লাগল শরীরে, ট্রেন...এই টুন্ডলা এল, মা।

শোভা কালই যাবি? শোভার মুখ দেখতে মাথা একটু কাত করল শ্বেতা। শোভা তখন মহাশ্বেতার
পিছনে বসে মহাশ্বেতার গলার কচ্ছপের ডিমের মতো মুক্কা খুঁটিছিল, চকিতে হাত সরিয়ে
সলজ্জ বলল—হ্যাঁ, শ্বেতা, কালই যাব।

তোর শাশুড়িকে একটা—আচ্ছা, কাল বলব। শ্বেতা সরে এল স্বাতীর কাছে, নিচু হয়ে তার
ঘোমটা-ঢাকা মাথায় হাত রাখল, সত্যেনের চোখে চোখ ফেলল একবার। সোজা হতে-হতে
বলল—বেশি আর জাগিয়ে রেখো না পিসিমা, ওদের আবার না শরীর-টরীর খারাপ হয়।
স্বাতীরও তা-ই নাকি? এবার স্বাতীকে তাক করলেন অক্লান্ত কুন্দদিদিমা। আচ্ছা— স্বাতী-
সত্যেনের কাছে আর একবার চোখে বিদায় নিয়ে শ্বেতা ঘরের বাইরে এল। এসেই ডালিমের
সঙ্গে দেখা। ডোরাকাটা সিল্কের শার্টের উপর এখন একটা খয়েরি পুলওভার তার গায়ে। ডালিম
বলল—রিকশ এনেছি, মা!

বেশ—শ্বেতা চলে যাচ্ছিল, ডালিম তাড়াতাড়ি আবার বলল—আমি... আমি আর না গেলাম,
মা।

না, না, তুই যাবি কেন, থাক। আর কিন্তু রাত জাগিস না। মুখোমুখি ঘর থেকে বেরিয়ে এল
বিজু। এমন করে আলোয়ান মোড়া যে হাত দুটো সুদু ঢাকা। শ্বেতা বলল—বিজু মুমোসনি?
বিজুন ফ্যাশফেশে গলায় জবাব দিল—ঘুমোব কেন? তুমি যাচ্ছ?—হ্যাঁ রে। ট্যাক্সি এনেছে?
ডালিম বলল—কোনো ট্যাক্সি আসতে চাইল না, মামা। রিকশ আনলাম।
ভারি নবাব হয়েছে তো ট্যাক্সিওলারা! দেখো বড়দি, লোটনকে ভাল করে ঢেকে-ঢেকে নিও,
আবার ঠান্ডা না লাগে।

হয়েছে, হয়েছে! বিজনের গালে ছোট্ট চড় দিল শ্বেতা। তার দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বলল—কার
আলোয়ান রে ওটা?

এটা? এটা সত্যেনের।

ও, সত্যেনের আলোয়ান বুঝি বেশি গরম? বিজুন যেন গুনতেই পেল না কথাটা। বাসরঘরের
দরজার দিকে তাকিয়ে বলল—ওসব আর কতক্ষণ?

এই শেষ হবে এবার।

কত রাত হল! নাঃ, পিসিমাকে বলি এখন— বলতে-বলতে বিজুন এল বাসরঘরের দরজায়,
ডালিম তার সঙ্গে এল, মামা-ভাগনে বাসরঘরে ঢুকল। দু-সার ঘরের মাঝের গলি দিয়ে শ্বেতা

এগোল, এল সামনের বারান্দায়, যেখানে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাবেলা বর আসা দেখেছিল মেয়েরা। ঠান্ডার জন্য একদিকের চিক ফেলে দিয়েছে এখন। তক্তাপোশের বিছানায় নেপাল-পিসেমশাই, চোখ আধ-বোঝা, স্থির, হাঁ-খোলা, ঠোট ঝাঁক, হঠাৎ দেখলে—না, বালাপোশের তলায় ফাঁপা বুকটা উঠছে পড়ছে—আহা ঘুমোক—বেলিও-ঘুমোচ্ছে মেঝেতে কসল-মুড়ে—খেয়েছিল কিছু? হ্যাঁ। শ্বেতা সরল, বারান্দার অন্যদিকে দেয়ালঘেঁষা ইজিচেয়ার, ছাইরঙা আলোয়ান, বাইরে চোখ...বাবা।

বাবা—শ্বেতা আস্তে ডাকল। রাজেনবাবু মুখ ফেরালেন।

রিকশ এসেছে, বাবা।

চল—রাজেনবাবু উঠলেন, মেয়ের একটা কাঁধ চোখে পড়ল, মোটা লংকুথের জামা।

তোর গায়ে গরম কিছু—

আছে, চলো।

রাজেনবাবু চলতে চলতে বললেন—হেমাস্ত ফিরেছে?

ফেরেনি এখনো, অনেককে নামাতে হবে তো!

দেরি হচ্ছে না?

দেরি হবে কেন? এই তো খানিক আগে... তোমার ভাবনা হচ্ছে নাকি?

না, না, রাত হল তো, আবার ব্ল্যাক আউট—

কিছু না! একটু দাঁড়াও, বাবা।

দোতলায় সবচেয়ে বড়ো যে ঘরটিতে স্বাতীকে তখন সাজানো হয়েছিল, সেই ঘর থেকে ঘুমোনো লোটনকে কোলে করে নিয়ে এল শ্বেতা। লোটনকে জড়িয়ে নিয়েছে গোলাপি উলের স্কার্ফে, নিজের পিঠের উপর সাদা একটি স্কার্ফ ফেলা। একটু পরে শ্বেতা আবার থামল—বাবা, একবার দেখে যাবে নাকি?

*

*

বাসরঘরের দরজায় রাজেনবাবু থামলেন। সামনে দাঁড়ানো বিজু আর ডালিমের ঝাঁক দিয়ে একবার স্বাতীকে দেখলেন, ডালিম আর অরুণের ফাঁকে একবার সত্যেনকে, আঁতা, গীতিকে ধাক্কা দিয়ে বলল—ওঠ না... সরস্বতী বলল—সত্যেন তাহলে... উজ্জ্বল আলোর সিঁড়ি দিয়ে নামল দুজনে। উজ্জ্বল একতলা পেরোল। কেউ নেই, চুপ। শাস্ত্রী বলল—স্বাতী কি...শোভা ভাবল ঘুম। অন্ধকার কলকাতা কালো। রিকশ দুই চোখই উজ্জ্বল। টুংটাং, চুপ...সব চুপ। টুংটাং, আরো কালো মাথার উপর আকাশ, আরো উজ্জ্বল আকাশের তারা... তারা... কত! মহাশ্বেতা বলল শাস্ত্রী তুই...কুন্দদিদিমা বললেন সত্যেন, এই প্রদীপ কিন্তু সারা রাত...টুংটাং রিকশ... অন্ধকার। কেউ নেই... চুপ। চোঙায় ঢাকা... মিটমিট আলোর পোকা, বড়ো বড়ো বাড়ি, অন্ধকার। এই রইল খাবার জল, আর এই... আর রাতে যদি...কালো গাছগুলি কালো, শূন্য ট্রামলাইন কালো...শূন্য ফুটপাতে একলা বিড়াল। অরুণ বেরিয়ে বলল—কোন ঘরে, বিজন বলল—হেমাস্তদা এখনো... এই তো হেমাস্তবাবু...চলো ডালিম...শ্বেতা বলল—বাবা তোমার শীত... রাজেনবাবু বললেন—লোটন তো খুব...রিকশ টুংটাং, অন্ধকার...অন্ধকারে পাহাড়ের মতো রেল-লাইনের বাঁধ। টালিগঞ্জের ব্রিজ... প্রদীপ-জ্বলা কুলো দেয়াল বেঁধে সরিয়ে রাখলেন

বড়োপিসি। শোভা ভাবল শেষ, এরপর...বাবু কাঁহাপর... শোভার হাই উঠল, শেষ...শাস্বতী বলল—পিসিমা...কুন্দদিদিমা সরে এসে...রিকশ মোড় নিল, নিঃসাড় পাড়া, ঝলমল জোনাকি, ঝলমল শাড়ি... মহাশ্বেতা-সরস্বতী উঠল। টুংটাং চুড়ি...রিকশ থামল টুং। আচ্ছা, আচ্ছা...চলি। চলি, রাজেনবাবু আগে নেমে লোটনকে কোলে...শ্বেতা নেমে বাবার কোল থেকে মেয়েকে মহাশ্বেতা-সরস্বতী বেরোল ... শোভা, শেষ...রাজেনবাবু তিনটি সিঁড়ি উঠলেন... শূন্য। শাস্বতী... কুন্দদিদিমা যেতে-যেতে ঘরের আলো নিবিয়ে...অন্ধকার, অন্ধকার। বন্ধ... পকেট থেকে চাবি... বড়োপিসি বাইরে এসে দরজা ভেজিয়ে...রাজেনবাবু দরজার সামনে নিচু হয়ে .. চুপ... সারা বাড়ি চুপ... পৃথিবী চুপ... শ্বেতা একবার আকাশের দিকে মুখ তুলল...তারা, চুপ। স্বাতী নড়ল না, সত্যেন নড়ল না, চুপ...কুলোর প্রদীপের ছায়া-ছায়া আলো... লুকোনো, লাঙ্কুক... বলতে-না-পারা কথা, ভুলতে-না-পারা...দরজা খুলে গেল... অন্ধকার। কেউ বলল না... কেউ ভুলল না... অন্ধকার ঘরে দুজনে। অন্ধকারে দুজনে, পাশাপাশি, কঁকড়োনো, টান...বলল না...ভুলল না। শ্বেতা দাঁড়াল...রাজেনবাবু দেয়ালে হাত তুলে...টান, দুটো প্রাণ... জীব... হৃৎপিণ্ড... স্পন্দনের পিণ্ড...চোখ নেই, চোখ খোলা, খোলা জানলা কালো...বাইরে কালো, কালো আকাশে তারা... দূরে... পারে... পরপারে... হয়ে-যাওয়া... না-হওয়া... হতে-থাকা... চিরকালের... আকাশ-ভরা স্তব্ধ তারা তাকিয়ে থাকল।
